অর্ঘ্য

অষ্টম বর্ষ।

বৈশাখ হইতে চৈত্র

১৩২৪ সাল।

সম্পাদক

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন

ও

শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত, বি, এল।

অর্ঘ্য ।

অষ্টম বর্ষ ।

বর্ণানুক্রমিক সূচী ।

বৈষ্ণব কবির অব্যক্তানুকরণ।

প্রথম প্রস্তাব।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম্‌-এ, বি-এল্‌]

গ্রীক কবি হোমর তাঁহার কাব্যে "পক্ষযুক্ত শব্দের" (winged words) উল্লেখ করিয়াছেন। পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞানের মতে পশুপক্ষিগণের কণ্ঠ-নিঃসৃত অব্যক্ত ধ্বনির অনুকরণে মানব-সভ্যতার আদি যুগে শব্দ সৃষ্টি করিয়া মানব-ভাষার সূত্রপাত করিয়াছে। শব্দতত্ত্ববিৎ কোন ও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, মানুষ নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য ভাববিশেষের অনুরূপ শব্দ সৃষ্টি করিতে যাইয়া কিয়ৎ পরিমাণে পশুপক্ষিগণের শব্দের অনুকরণ করিয়াছে এবং চীৎকার বা আকস্মিক মনোভাব-প্রকাশক (interjectional) শব্দসকল হইতে কিছু শব্দ সংগ্রহ করিয়াছে। এক জন বিখ্যাত ইংরেজ ভাষাতত্ত্ববিৎ বলেন, "পুরাকালে কেবল প্রাচ্য মনীষিগণ পক্ষিগণের ভাষা বুঝিতেন।" তাঁহার মতে মানবের মন প্রকৃতির অব্যক্ত ধ্বনির সহিত অর্থ যোজনা করিয়া তাহাকে ভাষায় পরিণত করিয়াছে। অব্যক্তানুকরণ যে ভাষা-সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কেবল যে মানব-ভাষা পশুপক্ষীর ধ্বনি অনুকরণ করিয়া শব্দসম্পদে গরীয়সী হইয়াছে, তাহা নহে; হিন্দুশাস্ত্রমতে সঙ্গীতের সা রি গা মা পা ধা নি এই সপ্ত স্বরও মানুষ পশুপক্ষিগণের নিকট শিক্ষা করিয়াছে। সঙ্গীতশাস্ত্রকার ভরত মুনি বলেন—

"ষড়জং রৌতি ময়ূরোহি বৃষো নদতি চার্ষভং।
অজা রৌতিঃ গান্ধারং মধ্যমং রৌতি ক্রৌঞ্চকঃ॥
অশ্বাশ্চ ধৈবতং রৌতি নিষধং রৌতি কুঞ্জরঃ।
পুষ্প সাধারণে কালে কোকিলো রৌতি পঞ্চমং॥"

হস্তী অশ্ব বৃষ ছাগ—এই চারি পশু ও ময়ূর কোকিল বক—এই তিন পক্ষীর

নিকট আমাদের সপ্ত সুর শিক্ষা হইয়াছে। বৈষ্ণব কবি প্রকৃতির সঙ্গীতভবনে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যাহার কণ্ঠে যে মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিয়াছেন, তাহারই অনুকরণে সুললিত শব্দ সৃষ্টি করিয়া অতুলনীয় শিল্পকৌশলে তাঁহার গীতি-কবিতার গীতিসৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিয়াছেন। অনন্ত প্রেমময়ী প্রকৃতির হৃদয়ে অনন্ত কাল ধরিয়া যে প্রেম সঞ্চিত হইয়া আসিতেছিল, প্রেমময়ের লীলা-বর্ণনে তাহা কোকিল, ভ্রমর, মধুকর, ময়ূর, চাতক, কপোত, শুক-সারী প্রভৃতির সঙ্গীতে উছলিয়া পড়িয়াছে।

প্রতীচ্য শব্দশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা অব্যক্ত ধ্বনির অনুকারী শব্দের উৎপত্তি-সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এক শ্রেণীর শব্দ সজীব পদার্থ হইতে এবং অপর শ্রেণীর শব্দ জড় পদার্থ হইতে উদ্ভূত। প্রথম শ্রেণীতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির ধ্বনি ও মানুষের উত্তেজিত মনোভাব-প্রকাশক শব্দের এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্যাদির আঘাতে উৎপন্ন শব্দসমূহের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইংরেজী ভাষায় এই উভয় শ্রেণীভুক্ত শব্দের সংখ্যা খুব বেশী বলিয়া বোধ হয় না। ইংরেজী কাব্যসাহিত্যে এই দুইটিয়ের অনুকৃত শব্দের প্রচুর প্রয়োগ লক্ষিত হয় না। বৈষ্ণব কবির রচনায় শব্দের আভাসে পক্ষিগণের সঙ্গীত, বাদ্যযন্ত্রের শব্দ, অলঙ্কারের মধুর ধ্বনি কবিতার বর্ণে বর্ণে ঝঙ্কৃত হইতেছে। বিদ্যাপতির রাস-রস-বর্ণন পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন সুমধুর অব্যক্ত ধ্বনির ঐক্যতান শুনিতেছি।

বাজত দ্রিগি দ্রিগি ধোদ্রিম দ্রিমিয়া।
নটতি কলাবতী শ্যামসঙ্গে মাতি
করে কর তাল-প্রবন্ধক ধ্বনিয়া॥
ডগ মগ ডম্ফ দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল
রুণু ঝুণু মঞ্জীর বোল।
কিঙ্কিণী রণ রণি বলয়া কনয়া ধনি
নিধুবনে রাস তুমুল উতরোল॥
বীণ রবাব মুরজ স্বরমণ্ডল
সা রি গ ম প ধ নি বহুবিধ ভাব।
ঘেটিতা ঘেটিতা ধেনি মৃদঙ্গ গরজনি
চঞ্চল স্বরমণ্ডল করু রাব॥

শ্রমভরে গলিত   লোলিত কবরীযুত
মালতী-মাল বিথারল মোতি।
সময় বসন্ত   রাস-রস-বর্ণনে
বিদ্যাপতি-মতি ক্ষোভিত হোতি।

এই পদটিতে বসন্তোৎসব যেরূপ সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার তুলনা কাব্য-সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। নিধুবনে রাসক্রীড়ার উচ্চধ্বনির মধ্যে আমরা ডম্ফ মাদল মুরজ স্বরমণ্ডল মৃদঙ্গ বীণা রবাব প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ও তৎসঙ্গে মঞ্জীর কিঙ্কিনী, বলয় প্রভৃতি অলঙ্কারের মধুর সঙ্গীত শুনিতে পাই। কলাভিজ্ঞা শ্রীমতী শ্যামের সহিত তালে তালে করতালি দিয়া নৃত্য করিতেছেন কবি এই লীলারস যথোচিত বর্ণন করিতে পারেন নাই বলিয়া ভণিতায় নিজের ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। বসন্ত-লীলা বর্ণন করিয়া বিদ্যাপতি আর একবার বসন্ত রাগে গাইয়াছিলেন—

"রঙ্গিণীগণ সব সঙ্গহি নটই।
রণ রণি কঙ্কণ কিঙ্কিণী রটই॥
রহি রহি রাগ রচয়ে রসবন্ত।
রতিরত রাগিণী রমণ বসন্ত॥
রটতি রবাব মহতীক পিনাশ।
রাধারমণ করু মুরলী বিলাস॥"

রাসলীলায় বিভোর হইয়া রাই শ্রীকৃষ্ণের সহিত লীলারসে অবগাহন করিতেছেন, সঙ্গে রাধিকার সখীগণ নৃত্য করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং মুরলী বাজাইতেছেন। নায়ক-নায়িকা ও রঙ্গিণীগণ থাকিয়া থাকিয়া বসন্ত রাগেরই রচনা করিতেছেন।

• জ্ঞানদাসের রাসোৎসব-বর্ণনাও চমৎকার। ভ্রমর শুক কোকিল ময়ূর কপোত নৃত্যগীত করিতেছে। শারদ-যামিনীতে বিবিধ ফুল ফুটিয়াছে। মঞ্জীর ঘুঙুর বলয় কিঙ্কিণী বাজিতেছে। "বিবিধ যন্ত্র একই তান, গাওত বাওত অখণ্ড মান।" মৃদঙ্গ তাতা থ্রিমি থ্রিমি বাজিতেছে। বিশাল পিনাক মন্দিরা ডম্বু বীণ উপাঙ্গ পাখোয়াজ প্রভৃতিক বাদ্য শুনা যাইতেছে। "নূপুর ঘুঙর মধুর বোল, ঝন নন টন লোল।" যুগলে মণ্ডলী করিয়া নৃত্য হইতেছে। কবির বসন্ত-লীলা-বর্ণনাতেও কঙ্কণ কিঙ্কিণীর ঝুন্ ঝুন্ রণ রণি শুনা যায়। বীণ রবাব মুরজ পিনাশ প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্রের

বিলাস-গীতি শ্রুত হয়। যখন চাতক কপোত শুক গান করে, "কোকিলা কুহরত, ভ্রমরা ঝঙ্কৃত," করকমলে কঙ্কণ ঝমকে, চরণে মঞ্জীর ধ্বনিত হয়, "কটিতে কিঙ্কিণী বাজায় কিনি কিনি", তখন রাধা-মাধব সখীগণের সহিত মণ্ডলী করিয়া নৃত্য করেন। মধুবনে যখন ফাগু ক্রীড়া হয়, বৃন্দাবনের তরুলতা তখন রাতুল বরণে শোভিত হয়; "রাঙ্গা ময়ূর নাচে, রাঙ্গা কোকিল গায়; "রাঙ্গা ফুলে রাঙ্গা ভ্রমর রাঙ্গা মধু খায়।" বায়ু ও যমুনার জল রাঙ্গা হইয়া যায়। কাব্য-শিল্পে এমন অখণ্ড জীবন্ত চিত্র আর কোনও কবি একটা মাত্র বর্ণ বিন্যাস করিয়া দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। রাতুল বর্ণে আধিক্য পাছে, আমাদের নেত্রপীড়া হয়। সেই জন্য কবি এই বিরাট দৃশ্য তাললয়-সমন্বিত বিচিত্র সঙ্গীতে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। শব্দের বিচিত্র মৃদু কম্পন আশ্চর্য্য শিল্পকৌশলে কাব্যের ভাষায় অভিব্যক্ত। জ্ঞানদাসের অব্যক্তানুকরণ-নৈপুণ্য তাঁহার নৌকা-বিহার-বর্ণনাতেও প্রকাশ পাইয়াছে। "প্রাবৃট সময়ে, উঠয়ে ঘন ঘূর্ণন গরজন দুকূল পাথার।"

"মানস গঙ্গার জল, ঘন করে কল কল, দুকূল বহিয়া যায় ঢেউ।
গগনে উঠিল মেঘ, পবনে বাড়িল বেগ, তরণী রাখিতে নারে কেউ।"

"কল কল কল হিল্লোল কল্লোল" শুনিয়া কাহার না ভয় হয়? নৌকা বুঝি বা ডুবিয়া যায়। "হেলিছে দুলিছে তুলিয়া ফেলিছে চলবল স্রোতসা।" রচনার সহিত বহির্জ্জগতের এমন ঐক্য, অনুকরণে এমন স্বাভাবিকতা কোথাও দৃষ্ট হয় না।

চিন্তাশীল লেখক স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের মতে, "ফুসফুসনী ফোঁস-ফোঁসানী, ফোঁসলান, ফসকান, ফিকির প্রভৃতি শব্দ বাঙ্গালা ভাষার খাঁটী নিজস্ব দেশজ সামগ্রী বলিয়া বোধ হয়; "ফুসফুসনী," "ফোঁসফোঁসানী" শব্দের স্বভাবানুকারিতার চিহ্ন, এখনও উহাদের সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত রহিয়াছে। * * * ভাষা সৃষ্ট হওয়ার ও উন্নতি লাভ করার পরও উচ্চ শ্রেণীর ভাষা, নূতন শব্দনির্ম্মাণকালে সম্পূর্ণরূপে স্বভাবেরই অনুকরণ করে; কারণ শব্দ ভাবার্থের অনুরূপ হওয়া উচিত; নচিলে তাহার মূল্য অতীব অল্প হয়।" (জন্মভূমি ১২৯৯)। চণ্ডীদাস রাধার অবস্থাবিশেষ বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন, "ফুঁপায়ে ফুঁপায়ে কাঁদয়ে রাধা।" রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, প্রকৃতিবাদ অভিধানোক্ত সপ্তবিংশতি সহস্র শব্দ মধ্যে অষ্ট শত শব্দ দেশজ, কিন্তু ইহাদের অধিকাংশেই সংস্কৃতের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। অব্যক্ত ধ্বনির

অনুকরণে সৃষ্ট অনেক শব্দের উপাদান যে সংস্কৃত তাহাতে সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয়, বৈষ্ণব কবির লেখনীমুখে অব্যক্ত ধ্বনির অনুকারী যে সকল শব্দ বাহির হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি সংস্কৃত ও কতকগুলি প্রাকৃত হইতে এবং অবশিষ্ট মৈথিল ও দেশজ শব্দ হইতে উৎপন্ন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পূর্ব্বেই যে প্রাকৃত কথিত ও লিখিত ভাষার পদবী হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, তাহা সুনিশ্চিত। ইহার পর প্রাদেশিক ভাষাসকল প্রাকৃতের স্থান অধিকার করিয়া লইতে যত্নচেষ্ট হয়। হিন্দি, মৈথিল, বাঙ্গালা, উড়িয়া প্রভৃতি স্থানীয় ভাষা প্রাকৃতকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া আপন আপন প্রয়োজনানুযায়ী নূতন ভাষায় পরিণত করিবার জন্য যে চেষ্টা ও যত্ন করে, তাহার ফলে শব্দের বিভক্তিতে নানা পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় এবং খাঁটী বাঙ্গালা ভাষার বিভক্তিশূন্য শব্দের প্রকৃতি অনেক সময়ে নূতন বাঙ্গালা ভাষায় অনুসৃত হয়। অধিকাংশ বৈষ্ণব কবিই সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং তাহারা এই ভাষা-বিপ্লবের যুগে যে সকল কবিতা রচনা করেন তাহাতে আবশ্যকমত সংস্কৃত প্রাকৃত মৈথিল ও দেশজ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিল এবং যোগ-বিয়োগ প্রভৃতি নানা উপায়ে বিভক্তির রূপান্তর করিয়া নূতন কাব্যের উপযোগী সুমধুর ঝঙ্কারযুক্ত ভাষা সৃষ্টি করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব কবির অব্যক্তানুকরণে এই নূতন কাব্য-শিল্পের আশ্চর্য্য কারুকার্য্য লক্ষিত হয়। পদাবলীর গীতিসৌন্দর্য্য পরিস্ফুট করিবার জন্য বৈষ্ণব কবি যে আবশ্যকমত বিভক্তি বাছিয়া লইয়াছেন, তাহা তাঁহার রচনা-পাঠে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ক্রিয়ার বিভক্তি কখন সংস্কৃতের, কখন প্রাকৃতের, কখন মৈথিলের আবার কখন বাঙ্গালার অনুরূপ হইয়াছে। ঝং ঘুম্ কুচ ধ্বন্ কল্ চল্ গুন্জ কন্ গদ দ্রু ঝল ঝর্ প্রভৃতি প্রকৃতি হইতে যে সকল শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে, বৈষ্ণব কবির প্রতিভা সেই সকল শব্দ হইতে অন্যান্য বহু নূতন শব্দের সৃষ্টি করিয়া অব্যক্ত ধ্বনির অনুরূপ যে মনোহর ও সুদীর্ঘ নূতন মালা রচনা করিয়াছেন; বঙ্গভাষার কণ্ঠে তাহা চিরকাল শোভা পাইবে। বৈষ্ণব কবি নূতন পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া তাঁহার গীতি-কাব্যের বর্ণে বর্ণে মধুরতা ঢালিয়া দিয়াছেন। কেবল এক অলঙ্কার হইতে যে কত বিচিত্র মধুর ঝঙ্কার শুনা যায়, তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। পদকর্ত্তা গোবিন্দ দাস শ্রীমতী কিশোরীর অলঙ্কারসকল হইতে "কনক ঝঙ্কৃত" শুনিয়াছেন। দ্বিজ হরিদাস বলেন, অভিসারিকা রাধার "কিঙ্কিণী রণ রণি চলইতে সুমধুর বাজে।"

অলঙ্কারের অব্যক্ত ধ্বনিতে যে বৈচিত্র্য আছে, তাহা বৈষ্ণব কবি অদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্যসহ ব্যক্ত করিয়াছেন। বিদ্যাপতি বলেন, অবস্থাবিশেষে "কিঙ্কিণী কিনি কিনি, কঙ্কণ কন কন, ঘন ঘন নূপুর বাজে।" নূপুর-শ্রবণে বৈষ্ণব কবির উল্লাস তাঁহার কাব্যের নানা স্থানে বর্ণিত হইয়াছে।

"নূপুর-রণিত-কলিত নব মাধুরি শ্রবণ উল্লাস।"

(কানুরাম দাস)

"নূপুর খপুর রণিত বর মাধুরী শুনইতে শ্রবণ উল্লাস।"

(গোবিন্দ দাস)

শ্রীকৃষ্ণ আসিতেছেন, তাঁহার নূপুর শুনিয়া রাধা উল্লসিত হইয়াছেন, আবার যখন নিশাশেষে শ্রীকৃষ্ণ রাধার কুঞ্জে আসিতেছেন, তখন তাঁহার পদবিক্ষেপ দৃঢ় ও স্থির নহে, সেই জন্য মঞ্জীরের শব্দ মধুর বোধ হইতেছে না।

"টলমল চরণ— যুগল মণি-মঞ্জির
ঝনর ঝনর ঝন বাজে।
কহ বলরাম দাস হই বিপরিত
হেরত নাগর-রাজে।"

"ঝনর ঝনর ঝন" এই কয়টি শব্দের ভিন্ন ভিন্ন পাঠ আছে, যথা—"ঝনর ঝনর ঘন", "ঝনর ঝনর ঝন," "ঝনর ঝনর রণ", "ঝনর ঝনর রণু।"

পদকর্ত্তা নরহরি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন, শ্রীকৃষ্ণের কিঙ্কিণী-জাল্ অতি "রসাল"; কিন্তু তিনি এক্ষণে উপরোক্ত অবস্থায় শুনিলেন উহা "বিরমি বিরমি বাজে।" বলরাম দাসও পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের নূপুরে চটকিনীর মৃদু-মধুর শব্দ শুনিয়াছিলেন।

"ক্ষীণ কটী তটে, নীল শাটী শোহে, কনক কিঙ্কিণী রোলই।
চরণে নূপুর, শবদ সুন্দর, বৈছে চটকিনী বোলই॥"

রাধামোহন বলেন, "কঙ্কণ রণ রব বাজ।" কবির মতে নূপুর দূর হইতে কলরব মাত্র। "নূপুর কলরব, শুনইতে মাধব, কুহুক হোই বাহার।" জ্ঞানদাস যে কত প্রকার অব্যক্ত ধ্বনি শুনিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন।

"কণক বরণ ধটি কটির শোভন।
ক্ষুদ্র ঘণ্টা সারি তাহে বাজে রুণু রুণ॥"

আবার, "নানা আভরণ অঙ্গে করিতে কিঙ্কিণী।
চরণে মঞ্জীর বাজে রুণু ঝুণু শুনি॥"

সঙ্গীত-লহরীর শেষ নাই—"কটিতে কিঙ্কিণী বাজে রুণু ঝুনু গান," "চলিতে

নূপুর বাজে রুণু রুণু শুনি," "চলিতে নূপুর বাজে রুণু ঝুনু রুণী" "কণয়া কিঙ্কিণী জাল, ঝুনু রুণু বাজে ভাল।" গোবিন্দ দাসও কিঙ্কিণীর ধ্বনি ও নূপুর শুনিতে ভালবাসেন—"নূপুর রুনু ঝুণু বাজে," "নূপুর রুণু ঝুনু বাজনি," "মণি মঞ্জীর বাজত রুণু ঝনিয়া," "নূপুর রণ ঝন," "কিঙ্কিণী রণ রণি," "মঞ্জীর রুণু ঝুনু," "অরুণ চরণে মণি নূপুর রণ রণি," "চরণ নূপুর বাজত রণু ঝুনু।"

বৈষ্ণব কবির উপর নূপুরের প্রভাব অত্যন্ত অধিক। বলরাম দাস যমুনার কূলে কদম্বমূলে শারদ-যামিনীতে বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গীত শুনিয়া যত না সুখী, নূপুর শুনিয়া ততোধিক সুখী। "বীণা কপিনাস পিনাক তাল, সপ্ত-স্বর বাজত ভাল, এ স্বর-মণ্ডল মন্দিরা ভহু কেলি কতহুঁ গায়নী। নূপুর ঘুঙুর মধুর বোল, ঝনন ননন নটন লোল, হাসি হাসি কেহুঁ করত কেলি, ভালি ভালি বোলনী॥" কবি বসন্ত-রজনীতে, "অবিরত কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজ" "অনুখন কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজ," "অনুখন কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝঙ্কারু" বোধ হয় শ্রুতিসুখকর মনে করেন না, সেইজন্য তিনি এই বিরামবিহীন ধ্বনিতে ঝঙ্কারমাত্র শুনিয়াছেন। একবার তিনি নূপুরের শব্দ বন্ধ করিবার জন্য অভিসারিকাকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

"নূপুর মুখে ভরি তূলক পুঞ্জ।
মন্থর গতি চলু কেলি নিকুঞ্জ॥"

বিদ্যাপতির রাধা একদিন নূপুর-শ্রবণে নিদ্রার ভাণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত কৌতুক করিয়াছিলেন।

"নূপুর ঝুনু ঝুনু আওল কান।
কৌতুকে হাম মূদির ভলু নয়ান॥"

কবিশেখর একবার মাত্র শুনিয়াছিলেন, "নূপুর রুণু রুণু কিঙ্কিনী বাজ।" তিনি যে "কনক ঝঙ্কৃত" শুনিয়া মুগ্ধ হন না তাহা তাঁহার পদাবলী-পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়। শ্রীকৃষ্ণ কবির মনের ভাব বুঝিয়া রাধিকার সহিত একদিন কৌতুক করিয়াছিলেন। সে কথা রাধিকা স্বয়ং কবিকে বলিয়াছেন।

"লহু লহু পদ করি, নূপুর পরিহরি
কৈছে আওল সেই ধীট।
ধীরে শপথি দেই সখিগণে নিষেধই
লুকি রহল মঝু পীঠ॥"

সুবোধের পরীক্ষা

[শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ, বি-এ]

প্রশ্নপত্র লয়ে হাতে, বাৎসরিক পরীক্ষাতে,
'সুবোধ পরীক্ষা গৃহে-শূন্যে চাহি' ভাবে,
একটী উত্তর বিনা শেষ দিনে আজি কি না
'প্রথম' হ'বার আশা পণ্ড হয়ে যাবে ?
সারাটি বছর ধরি,' পড়িলাম যত্ন করি,'
প্রশংসা পেয়েছি নিত্য শিক্ষকের কাছে;
প্রতি পরীক্ষায় আমি থাকি সদা অগ্রগামী,
সহপাঠী সকলেই রহে মোর পাছে।
আজি সেই উচ্চ মান হয় বুঝি অবসান;
"উত্তরটী কিছুতেই মনে নাহি আসে !
' ছ'মিনিট আছে বাকি, পরীক্ষার খাতা রাখি,'
লেখা সাঙ্গ করি সবে যায় নিজ বাসে ;
গবেশ(ও) চলেছে ঘরে, মুখেতে হাসি না ধরে,
কহিছে গণেশে ডাকি স্ফীত করি বুক,—
কি সহজ প্রশ্নপত্র ! ছাড়িনি ক এক ছত্র
একটী প্রশ্নেরো আজ অংশ এতটুকু !
শুনি সে গরব-বাণী আপনারে হেয় মানি'
ভাবিছে সুবোধ পেয়ে মনে ঘোর লাজ,
"সময় বহিয়া যায়, ধিক মোরে নিরুপায়,
গবেশের(ও) কাছে মাথা হেঁট হ'ল আজ !
হেন কালে চাহি দেখে কাছে তার বই রেখে,
পরীক্ষক ভুলে দূরে গিয়াছে কোথায়—
রাখি সেই পৃষ্ঠা খুলি, সুবোধ যা' গেছে ভুলি'
ঠিক সেই উত্তরটী ছাপা আছে যায় !

সুবোধের হ'ল লোভ, থাকে কেন মনে ক্ষোভ,
দেখি না একটীবার বইখানি পানে ?
কেহ নাহি টের পাবে নিমেষে চুকিয়া যাবে,
পরীক্ষায় রবে নাম উচ্চতম স্থানে।
সহসা সে সন্ধিক্ষণে, সন্দেহ জাগিল মনে,
অন্যে জানিবে না বটে—বিবেক কি ক'বে ?
এ কথা স্মরণে এলে, মলে শান্তি যাবে চলে,
না না ছি ছি ! কাজ নাই যা হয় তা হবে।
ক্ষণে প্রলোভন ছাড়ি, উঠিল সে তাড়াতাড়ি,
পরীক্ষার খাতা দিয়া হইল বাহির,
গৃহে আসি ক্ষুণ্নমনে, পিতৃ-কাছে নিরজনে,
নিবেদিল সব কথা করি চিত্ত স্থির।
শুনি পিতা তারে কহে— আনন্দের অশ্রু বহে—
ক্ষুব্ধ কেন হে আমার বিজয়ী তনয় ?
পাঠের পরীক্ষা তুচ্ছ, তা' হতে অনেক উচ্চ—
ধর্ম্মের পরীক্ষা তুমি করিয়াছ জয় !

ব্যর্থ শাসন।

[শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়]

কত মনু দিয়ে গেছে কতই বিধান !
কত অপরাধি-প্রাণ গেছে বলিদান।
শাসন যতই হ'ক—কঠোর, কঠিন
অপরাধী বৃদ্ধি পায়—হয় না বিলীন !

নবেল।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়]

কাব্য অর্থে রসাত্মিকা কথা। নবেল অর্থে রসের অভিনব কথা। নবেলও এক প্রকারের কাব্য। কিন্তু কাব্য কত প্রকারের?

প্রকৃতিভেদে প্রকার। কাব্যের প্রকৃতি এত প্রকার যে, কাব্য কত প্রকার তাহার সংখ্যা হিসাবের একটা নির্দ্দিষ্ট অঙ্কে আবদ্ধ করা কঠিন। কাব্যের এবং কবিতার 'লক্ষণ' নির্ণয় করিয়া নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কতকগুলি কথার দ্বারা একটা সংক্ষিপ্ত 'সূত্র' গাঁথিতে বসা যেমন মহা 'বিড়ম্বনা, কাব্য কত প্রকারের হইতে পারে, তাহা 'খড়ি পাতিয়া' গণিয়া বুঝান তেমনি বা ততোধিক কর্ম্মভোগ। পুরাতনের মধ্য দিয়া নূতনের 'বিবর্ত্তন', নূতন হইতে নূতনতরের বিকাশ; কাল ও কল্পনাভেদে কাব্যের এবং কবিতার আকার-অবয়বের, ভাবের এবং ভঙ্গীর গঠন ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং হইতেছে; সে এতাধিক যে, আলঙ্কারিক এক সময়ে একটা 'সূত্র' বাঁধিয়া কাব্য ও কবিতাকে অনন্ত কাল তাহার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে পারেন্ না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে 'সূত্র' সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। 'সূত্র' সর্ব্বকালব্যাপী হইলেও বহুব্যাখ্যাসাপেক্ষ হয়। ফল কথা এই যে, কল্পনাকে যেমন 'কাঠরা'বন্দী করিতে পারা যায় না, কল্পনার পুত্রকন্যাগুলিও তেমনি, "ফিরিস্তি" করিলে ফুরায় না। তাহাদের ভাগ, বিভাগ, বিভাগের ভাগ করিতে পার, শ্রেণী ও সম্প্রদায় নির্ব্বাচন করিতে পার; কিন্তু সংখ্যা ও সীমা নির্দ্দেশ করিতে পার না। এ অপারগতার প্রমাণ মনুষ্যের সাহিত্যেতিহাসে প্রকাশ। কিন্তু এত কথায় আমাদের আবশ্যক নাই। এ স্থলে কেবল ইহাই বুঝুন যে, কাব্য বহু এবং বিবিধ প্রকারের, তাহার মধ্যে 'নবেল'ও এক প্রকারের কাব্য। কিন্তু নবেল কি প্রকারের কাব্য?

কাব্য কবিতাময়ী রচনা। কবিতা আকার প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয় ছন্দযুক্ত ভাষায়। ছন্দযুক্ত ভাষা সাধারণতঃ দুই মহাভাগে বিভক্ত; পদ্য এবং গদ্য। কবিতা পদ্যে প্রকাশিত হয়, গদ্যেও হয়। কারণ পদ্যের ন্যায় গদ্যও ছন্দযুক্ত ভাষা, শব্দ-শক্তিবিশিষ্ট এবং ভাবপ্রকাশ-সক্ষম। গদ্যে অক্ষর 'বরাদ্দ' না থাকিলেও গদ্য একটা ছন্দ বটে, যে হেতু ছন্দে এবং ছন্দ-সুমিষ্টতার

যে কিছু আসল উপকরণ আবশ্যক, গদ্যে তাহার সমস্তই আছে;—গদ্য তাহা সমস্তই আত্মসাৎ করিতে সমর্থ। মাত্রা, যতি, মিলন, আবেগ, উচ্ছ্বাস, সুরসম্ভার, শব্দ-সঙ্গতি, লয়-তাল-মান, শক্তি, গতি, স্থিতি, এই সবই গদ্যে বিদ্যমান, গদ্য এ সবই আত্মব্যবহারে নিযুক্ত করিতে অধিকারী। কবিতা পদ্যের ন্যায় গদ্যেও প্রকাশিত হইতে পারে,—প্রকাশিত হয়। তবে পদ্যের বয়ঃক্রম অত্যন্ত অধিক, পদ্যের তুলনায় গদ্যের বয়স অতি অল্প। ইহা কেবল আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যে নহে। সর্ব্বদেশীয় সর্ব্বজাতীয় সাহিত্যেই পদ্যের বয়স অপেক্ষা গদ্যের বয়স অনেক অল্প। পদ্য প্রাচীন এবং প্রবীণ; সুতরাং বৃত্তি-সম্পত্তি তাহার অনেক, অলঙ্কার-ঐশ্বর্য্য বিস্তর। গদ্য নবীন, অনেক স্থলে শৈশব বলিলেও চলে, গদ্যের গঠনমাত্র আরম্ভ হইয়াছে; সকল অঙ্গই যখন এখনও সুগঠিত, সম্পূর্ণ গঠিত হয় নাই, তখন আর তাহাতে অলঙ্কারাধিক্য কিরূপে সম্ভবে; পরন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে পদ্যের ন্যায় তত অলঙ্কার-ঐশ্বর্য্য সঞ্চিত হইবেই বা কিরূপে? কিন্তু এ কথা এ স্থলে আর অধিক বুঝিতে হইবে না; যতটা বলিলাম ততটা বুঝিলেই আমাদের উপস্থিত কার্য্য উদ্ধার হইবে।

কাব্য কবিতাময়ী রচনা। সে রচনা কেবল পদ্যে পর্য্যবসিত হয় না; গদ্যেরও তাহাতে উপযুক্ত অধিকার আছে। কবিতা পদ্য-পরিচ্ছদের ন্যায় গদ্য-পরিচ্ছদও ধারণ করিতে পারে, ধারণ করে। আমরা আমাদের আমলে যে প্রকৃতির পুস্তককে 'নবেল' বলিয়া থাকি, তাহা কবিতার গদ্যময়ী রচনা বা গদ্য কাব্য। কিন্তু 'গদ্য কাব্য' না হইলেই যে নবেল হইতে পারে না, তাহা নহে। কবিতার পদ্যময়ী রচনাও 'নবেল' নামে অভিহিত হইতে পারে। পদ্যময় 'নবেল' আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যেই বিদ্যমান আছে। আমাদের 'মঙ্গল-গ্রন্থ' গুলি আমার বিবেচনায় নবেল-কাব্য। চণ্ডী-মঙ্গল, অন্নদা-মঙ্গল, মনসা-মঙ্গল প্রভৃতি পুস্তক নবেল কাব্য। 'বিদ্যাসুন্দর' একখানা বিশিষ্ট নবেল। এই সকল কাব্যকে আমি 'নবেল' বলিতেছি কেন, তাহার কৈফিয়ৎ ইহার পরবর্ত্তী কথার মধ্যেই পাওয়া যাইবে; এ স্থলে কেবল এই বক্তব্য যে, আমাদের 'মঙ্গলকাব্য'-নিচয়ের কবিগণ নিজেই স্ব স্ব কাব্যকে নবেল নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

কর সবে অবধান, রচেছি নূতন গান।

পুনশ্চ, * * * রচিতে নূতন গান

করিলা আরতি।

মঙ্গল-কাব্যের কবিগণ মঙ্গল-কাব্যগুলিকে "নূতন গান" বলিতেন। সেই "নূতন গান" আর কিছুই নহে,—নবেল। অতএব নবেলের আভাস এবং আস্বাদ যে আমরা একমাত্র য়ুরোপীয় সাহিত্য হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা নহে;—যদিও আমাদের আধুনিক নবেল-নিচয় সম্পূর্ণরূপে আমাদের ইংরেজী শিক্ষাসম্ভূত। পরন্তু নূতন গ্রন্থ বা নূতন কবিতা বলিয়াই যে 'মঙ্গল-কাব্য'-গুলিকে "নূতন গান" বলা হইত, তাহা নহে। তাহাদিগকে "নূতন গান" কি না "নবেল" বলা হইত, আমার বিবেচনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কারণে। সে কারণের কথাও পরে বলিতেছি।

"নবেল" নামটা কিন্তু ইংরেজি। তা এ নাম আমরা আমাদের সাহিত্যসাৎ করিতে সম্মত আছি। এখন এই ইংরেজী নাম তাহার প্রকৃতি ও পরিচয়ের সহিত বাঙ্গালায় বিশেষ করিয়া দেখা যাউক কি পাওয়া যায়।

নবেল শব্দের অর্থ "অভিনব"। কিন্তু শব্দার্থের সহিত ভাবার্থ ও ব্যবহারিক অর্থ ধরিলে নবেল গ্রন্থ বলিতে বুঝায় রসযুক্ত অভিনব উপন্যাস,—অথবা অভিনব রসোপন্যাস—অথবা ঔপন্যাসিক অভিনব কাব্য। মোটের উপর নবেল কথাটা হইতে আমরা পাইতেছি তিনটি কথা,—রস, উপন্যাস এবং অভিনবত্ব। নবেলে রস চাই, উপন্যাস চাই এবং সে রসে ও উপন্যাসে অভিনবত্ব চাই। কেবল মাত্র কাব্যরসে নবেল হয় না, তাহার সহিত উপন্যাস চাই এবং সে উপন্যাস অভিনব হওয়া চাই। কেবল মাত্র অভিনব উপন্যাস হইলেও নবেল হইবে না, তাহার সহিত কাব্যরস চাই। কেবল মাত্র উপন্যাস যাহা, তাহা নবেল নহে, টেল tale অর্থাৎ আখ্যান বা উপাখ্যান। পরন্তু কাব্য-রস গীতিকাব্যে পাওয়া যায়, নাট্যকাব্যেও পাওয়া যায়, অতএব তাহা নবেল নহে। এ সকল কাব্যের কোনওটীই নবেল কাব্য নহে। নবেল কাব্যে কাব্যরসের সহিত অভিনব এবং অখণ্ড উপন্যাস চাই।

এখন প্রথম ধর 'রস'। এ শব্দটী বড় সাধারণ নহে। ইহা সংস্কৃত 'সূত্রে'র শব্দ অতএব বহুব্যাপক। রস কথাটা বিশ্লেষ করিলে, তাহার মধ্যে বহু বস্তু পাওয়া যায়। স্বয়ং ভগবানই 'রসস্বরূপ' বলিয়া উক্ত এবং অর্চ্চিত হইয়াছেন। পরন্তু অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত রস সমগ্র সুকুমার সাহিত্যের অস্থিমজ্জা ও প্রাণেরও অধিক; উহা তাহার আত্মা পরমাত্মা। কাব্য-সাহিত্যের রসের বিষয় উল্লেখ করিলে বুঝিতে হইবে অনেক কথা; কারণ কাব্যের কাব্যত্ব তাহার রসেতেই নিহিত। কাব্যের রূপলাবণ্য, রুচি, ভাব বৈচিত্র, মাধুর্য্য,

মোহ, আবেগ, নাটকত্ব, লালিত্য প্রভৃতি যাবতীয় সৃষ্টি এবং সৌন্দর্য্যরসের অন্তর্নিবিষ্ট। রস বলিলে এ সমস্তই বুঝায় এবং ইহাদের অস্তিত্ব ও অভাবের তারতম্য অনুসারে কাব্যগত সৌন্দর্য্যের অর্থাৎ কাব্যরসের ইতর-বিশেষ হয়। এখন আর একটী কথাও বলা অতিরিক্ত যে, নবেল কাব্যের রস অর্থে কি বুঝিতে হইবে এবং কত প্রকার স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হইলে নবেল রসযুক্ত হইবে।

'রসের' পর নবেলের লক্ষণনির্ণয়সম্বন্ধে এখনও আরও দুই কথার ব্যাখ্যা বাকি; যথা 'অভিনব' এবং 'উপন্যাস'। অভিনব ও উপন্যাস দুই কথাই একত্রে ধর। প্রথমতঃ উহাদের অর্থ কি? অভিনব উপন্যাস বলিতে কি বুঝিবে? আষাঢ়ে গল্প কি অস্বাভাবিক আখ্যান? না, উহাদের কিছুই নয়। অভিনব উপন্যাস মানে অদ্ভুত কেচ্ছাও নহে; অস্বাভাবিক কাহিনীও নহে; অভিনব অর্থে অস্বাভাবিক নয়, উপন্যাস অর্থে বিধি-সৃষ্টি-সংসারবহির্ভূত অসঙ্গত আখ্যায়িকা নয়। স্বকপোলকল্পিত ঘটনা-সংযোজনায় উপন্যাস; ঘটনা যে সত্যই ঘটিয়াছিল, বা ঘটা চাই বা ঘটিতেই হইবে তাহা নহে, ঘটনা স্বভাবে সম্ভব ও সঙ্গত হইলেই হইল। অতএব স্বভাবে সম্ভব ও সঙ্গত ঘটনার অর্থাৎ স্বকপোলকল্পিত স্বাভাবিক ঘটনার সংযোজনায় উপন্যাস-ঘটনার সৃষ্টিও করিতে হইবে—সংযোজনও করিতে হইবে। গঠন ও গ্রন্থন দুইই চাই। উপাদান বিধি-সৃষ্টি-সংসারেই আছে, কিন্তু তাহার অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করিবেন কবি; ঘটনা স্বভাবে সম্ভব ও সঙ্গত; কিন্তু তাহার সৃষ্টি ও সংযোজনে, আবিষ্কারে ও উদ্ভাবনে, উপন্যাসের উপন্যাসত্ব ও অভিনবত্ব। কল্পনার স্বাধীন সংগঠনে সৃষ্টি, বৈচিত্র, সৃষ্টিবৈচিত্রের বিশেষত্বই অভিনব, কিন্তু অস্বাভাবিক নয়। উপন্যাস অভিনব হইবে, কিন্তু অস্বাভাবিক হইবে না; সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক হইবে অথচ স্বভাবাতিরিক্তও হওয়া চাই; ইহাই শিল্পের উদ্দেশ্য, ইহাতেই শিল্পীর নৈপুণ্য-প্রকাশ। স্বাভাবিক অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, একথা অসঙ্গত নহে। স্বভাবাতিরিক্ত অর্থে অস্বাভাবিক নহে; যাহা স্বভাবে সচরাচর এবং সাধারণত দেখা যায় না, তাহাই স্বভাবাতিরিক্ত। স্বভাবের বিশেষত্বের বিকাশ-প্রদর্শনই স্বভাবাতিরিক্ত! প্রবৃত্তিবিশেষের বা প্রকৃতিবিশেষের পূর্ণত্ব-প্রদর্শন বা চিত্রাঙ্কনকেই স্বভাবাতিরিক্ত বা স্বভাবের অসাধারণত্ব বলি। স্বভাবের অসাধারণত্ব সাধারণ স্বভাবের আদর্শ এবং উপদেশ ও আমোদস্থল। পরন্তু তাহা কাব্য রস-উৎপাদনের প্রশস্ত ক্ষেত্র।

স্তরে স্তরে প্রকৃতির বিকাশের সহিত তাহার পূর্ণত্ব দেখান চাই ; স্বভাব-অতিরিক্তকে সহজ সরল ভাবে উপস্থিত করা চাই। স্বভাবের সাধারণত্বকেও শিল্পসৌন্দর্য্যে শোভিত করা চাই। চিত্র চরিত্রের অনুরূপ হওয়া চাই। চিত্রের এবং চরিত্রের প্রত্যেক রেখা, প্রত্যেক শিরা স্বতন্ত্র থাকিবে, অথচ চরিত্র বা চিত্রটী সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর দেখাইবে। কার্য্য কঠিন তাহাতে সন্দেহ কি ?

নবেল রসাত্মক অভিনব উপন্যাস। রস এবং অভিনব উপন্যাস জিনিসটা কি আমরা একরূপ বলিয়াছি ; কিন্তু এখনও কিছু বলিতে বাকি আছে।

উপন্যাসের উপকরণ স্বভাব হইতে সংগৃহীত বা সংগঠিত ; উপকরণের সংযোজন কবির নিজের। এখন সেই 'উপকরণ' সম্বন্ধে এক আধটী কথা।

উপকরণ স্বভাব হইতে গৃহীত। স্বভাব বিশ্ব-সংসারের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। স্বভাব ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকাল-ব্যাপী। স্বভাব অতীতেও ছিল, এখনও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। জড়-স্বভাবও বটে ; জীব-স্বভাবও বটে। নৈসর্গিক স্বভাব ও মনুষ্য-স্বভাব লইয়াই কবি অধিকাংশ স্থলে কার্য্য করেন এবং সেই কার্য্যোপযোগী উপকরণ স্বভাবের সর্ব্বস্থল ও সর্ব্বকাল হইতে আহরণ করেন। উপন্যাসের উপাদান বর্ত্তমান হইতে যেরূপ লওয়া যাইতে পারে, অতীত ও ভবিষ্যৎ হইতেও তদ্রূপ গ্রহণীয়। সংসার, বিশেষ সমাজ বা সম্প্রদায়বিশেষের ন্যায়, পুরাণেতিহাস রাজনৈতিক পুরাবৃত্ত হইতে সে উপকরণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে। পরন্তু উপন্যাসের দৃশ্য ও ঘটনাবলী ভবিষ্যতের সুদূর সাম্রাজ্যেও সংস্থাপিত করা যাইতে পারে। নহিলে আর উপন্যাস কি ? উপন্যাসে কল্পনার লীলা ;—কল্পনার লীলায় সত্যের খেলা। উপন্যাস হইলেই যে তাহা অসত্য হইবে, তাহার কোনও অর্থ নাই। যাহা অস্বাভাবিক, অসঙ্গত এবং "আষাঢ়ে" তাহাই অসত্য ;—যাহা স্বাভাবিক এবং সুসঙ্গত, তাহা অঘটিত হইলেও সত্য অর্থাৎ যাহা স্বভাবে নিত্য, তাহাই সত্য। সাহিত্যে সত্যাসত্যের এই নিয়ম। সৌন্দর্য্যপ্রাণ সাহিত্য কোনও ক্রমেই অসত্যের সেবা করে না ; কারণ সত্য ভিন্ন সৌন্দর্য্য সম্ভবে না।

উপন্যাসের আত্মাধিকার সর্ব্বস্থলে এবং সর্ব্বকালে আছে। অতএব নবেল কাব্যে নানা জাতীয় উপন্যাস জন্মে। গার্হস্থ উপন্যাসের ন্যায় সামাজিক উপন্যাস ; সামাজিক উপন্যাসের ন্যায় পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস নবেল সাহিত্যের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক উপন্যাস

ইতিহাস বা পুরাণ নহে; ইতিহাসের বা পুরাণের ঘটনাবলীর অবিকল আবৃত্তি বা অনুবাদও নহে। পুরাণ বা ইতিহাস হইতে অঙ্কুরমাত্র লইয়া, উপন্যাসের সমস্ত কথাই কবির নিজের উদ্ভাবন, তাঁহার কল্পনার স্বাধীন সংকল্পিত সৃষ্টি। পুরাণ বা ইতিহাস হইতে উপাখ্যানের অঙ্কুরমাত্র গৃহীত হয়। সেই অঙ্কুর হইতে সুবৃহৎ বৃক্ষ উৎপাদন করে কবির সতেজ কল্পনাক্ষেত্র। কবি পুরাণ বা ইতিহাস হইতে সূত্র গ্রহণ করেন আর গ্রহণ করেন তৎ তৎ পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক সময়ের আচার-ব্যবহারাদির সাক্ষ্য প্রত্যক্ষ প্রভা। সে প্রভা কবিকৃত তৎকালিক সৃষ্টিতে প্রতিভাত না হইলে কিছুই হইল না। ঘটনা যে সময় হইতেই গ্রহণ কর অথবা যে সময়ের উপর উপস্থাপিত কর, সেই সময়ের পূর্ণ সত্ত্ব অবলম্বন করিয়া তোমাকে চরিত্র সৃষ্টি ও চিত্র অঙ্কন করিতে হইবে; নতুবা সে চরিত্র এবং চিত্র নিষ্ফল।

অতঃপর এ স্থলে একটী কথা, উল্লেখ করিয়া যাইতে হইতেছে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক বা সাংসারিক কথা লইয়া উপন্যাস-গ্রন্থনে যে কেবল নবেলেরই অধিকার, তাহা নহে। সে অধিকার পূর্ব্বাবধি মহা কাব্যের ও নাট্য কাব্যাদিরও আছে। মহাকাব্য ও দৃশ্য কাব্যাদির ন্যায় নবেল কাব্যও এ অধিকারে বঞ্চিত নহে; ইহাই বলা আমাদের উদ্দেশ্য। পরন্তু নবেল সম্বন্ধে উপস্থিত প্রবন্ধে আমরা যত কথা কহিয়াছি, তাহার প্রায় সমস্তই সাধারণত কাব্যগ্রন্থ-সম্বন্ধীয়। অন্যান্য শ্রেণীর কাব্যের সহিত নবেল কাব্যের পার্থক্য কোথায় এবং কিসে, তাহা এখনও আমরা আলোচনা করি নাই; ক্রমশ করিব।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি ও মধ্যকালে পদ্যময় পৌরাণিক নবেল প্রণীত হইয়াছিল, পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। সেই সকল নবেল আমাদের 'মঙ্গল-কাব্য'-নিচয়। কবিকঙ্কণ কৃত 'চণ্ডী মঙ্গল', কেতকা দাসাদিকৃত 'বেহুলা উপাখ্যান'; ভারতচন্দ্রের 'অন্নদা মঙ্গল' ও বিদ্যাসুন্দর', প্রভৃতি মঙ্গলগীতিসকল পৌরাণিক নবেল। তৎ তৎ কালিক ঐতিহাসিক ও সামাজিক ছায়াও ঐ সকল গ্রন্থে প্রচুর ও বিশিষ্টরূপে নিপতিত। কিন্তু উপাখ্যানের মূল গ্রন্থি-পুরাণ হইতে গৃহীত। কিন্তু তাহার অন্যান্য অবয়ব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শিরা-ধমনী, রক্তমাংস, মেধ-অস্থি যাহা কিছু, সমস্তই মঙ্গল-কবিদিগের নিজের। মঙ্গল-গ্রন্থ দেবদেবী-দিগের মর্ত্তলীলাবিষয়ক মঙ্গলগীতি, অভূতপূর্ব্ব পদ্ধতি-প্রকরণে তাঁহাদের পূজা প্রচার, নবীন বিধানে, উপাদানে মনুষ্য হৃদয়ে ভক্তি-প্রেমের উত্তেজনা;

মঙ্গল-গ্রন্থ দেবকীর্ত্তির অভিনব উপাখ্যান। দেবদেবীবিশেষের বিস্তর লীলা পুরাণে বর্ণিত আছে; কিন্তু মঙ্গল-গ্রন্থে যে যে লীলা প্রচারিত ও যে প্রকার প্রণালীতে বর্ণিত, তাহা ত তদ্রূপ পুরাণে নাই। মঙ্গল-কাব্যের দেবদেবীগণ অবশ্য পৌরাণিক। তাহার মর্ম্ম এই যে, তাহাতে দেবদেবীদিগের অপূর্ব্ব বা নূতন সৃষ্টি করা হয় নাই। তাহা করা সম্ভবেও না, করা সমীচীনও নহে। মনুষ্য কর্ত্তৃক দেবতা-সৃষ্টি, অস্বাভাবিক হইতেও অধিকতর অস্বাভাবিক। মনুষ্য দেবতা সৃষ্টি করে না, দেবতারাই মনুষ্য সৃষ্টি করেন; তবে মনুষ্য দেবস্বরূপের প্রতিষ্ঠা করে বটে। সে প্রতিষ্ঠা—মন্দিরে প্রতিষ্ঠা বা প্রতিমায় প্রতিষ্ঠা। দেবতার নূতন স্বরূপ নির্ম্মিত করিবার শক্তি কাহারও নাই; কিন্তু নূতন মন্দির এবং নূতন প্রতিমা প্রস্তুত করিবার অধিকার অনেকের আছে। এ অধিকারে কবিগণ একটু অধিকতর অধিকারী। কারণ, তাঁহারা কেবল মাত্র ভক্ত এবং উপাসক নহেন, তাঁহারা নিজে কারিকর ও চিত্রকর। অতএব তাঁহাদের কাব্যমন্দিরে দেব-দেবী-প্রতিমার অভিনব মূর্ত্তি, নূতনতর চিত্র সংস্থাপিত ও প্রতিষ্ঠিত করিবেন তাহাতে আর বিচিত্র কি? এবং তাহা সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিকও বটে। তুমি তোমার ইষ্টদেবীকে যে অলঙ্কারে সাজাইয়া সুখী হইয়াছ, যে উপচারে অর্চ্চনা করিয়া তৃপ্ত হইয়াছ, আমিও যে ঠিক সেই অলঙ্কারে, সেই উপচারে পূজা করিয়া পরিতোষ লাভ করিব, এমনটীই ত হইতে পারে না। হইতে পারে, তুমি আমার অপেক্ষা অনেক ধনী এবং জ্ঞানী, দেবীকে তুমি যে অলঙ্কার পরাইয়াছ, যে উপচার উৎসর্গ করিয়াছ, তাহা বহু মূল্যবান, সুচারু শোভনীয় এবং পরম পবিত্র। কিন্তু আমি দীন হীন হইলেও ত আমার একটু ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা আছে, একটু সাধ-সোহাগ আছে। আমি আমার জননীরূপিণী বা কন্যারূপিণী জগ-মাতাকে যেরূপে দেখিলে তুষ্ট হইব, যে সাজে সাজাইয়া সুখী হইব, আমার সেই অভিলষিত রূপ, আমার সেই আকাঙ্ক্ষিত অলঙ্কার হইতে তুমি আমাকে বঞ্চিত করিতে পার না; স্বয়ং জগজ্জননীও বোধ করি পারেন না।

মঙ্গল-কাব্যে দেবদেবীগণ পৌরাণিক। কিন্তু পৌরাণিক প্রতিমাগুলির একটু নূতন সংস্কার মঙ্গল-কবিগণ করিয়াছেন। সে সংস্কার তাঁহাদের স্বপ্ন-প্রতিভা-প্রসূত এবং তৎসাময়িক সমাজ—স্বভাবের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ-সোহাগের গতির উপর লক্ষ্য রাখিয়া সম্পাদিত। আমরা বরং মঙ্গল-কবিদিগের আমলের লোক, কিন্তু পৌরাণিক কালের লোক নহি। পৌরাণিক কবিগণ

আর্য্যসমাজের কবি, মঙ্গল-গ্রন্থকারগণ বঙ্গ-সমাজের কাব। অতএব বলা বাহুল্য, শেষোক্তদিগের কৃত চিত্রসংস্কারগুলি আমাদের চক্ষে অতীব শোভনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি পুরাণকার কবিগণ অপেক্ষা মঙ্গল-গ্রন্থের কবিগণ শ্রেষ্ঠ? না—তাহা নহে; তাহার উত্তর উপরেই দিয়াছি।

মঙ্গল-গ্রন্থগুলিতে দেব-দেবীর প্রতিমার সংস্কার ও অঙ্গরাগ অভিনব: তাহাদের উপাখ্যান অভিনব,—উপাখ্যানগুলির উপকরণ অভিনব,—সমস্তই এক অভূতপূর্ব্ব নূতন সৃষ্টি। এ প্রকৃতির প্রথম পুস্তক যখন প্রকাশিত হইল, তখন তাহার কবিতা ও কাব্যরসও সম্পূর্ণ অভিনব। বঙ্গ-সমাজ অকস্মাৎ এক অভিনব দ্রব্য দেখিয়া আহ্লাদে অবাক্‌ হইল। মঙ্গল-কাব্য বস্তুতই সর্ব্ব প্রকারে এক অভিনব নূতন সামগ্রী; অর্থাৎ কি না 'নবেল'। উপরোক্ত বিবিধ প্রকার অভিনবত্ব প্রযুক্ত এবং উপন্যাসের আকার—অবয়ব ও তাহার কথন—প্রণালীর লক্ষণেও বটে, আমরা মঙ্গলকাব্য যে 'নবেল' বলিতেছিলাম, এবং বোধ করি ঐ সকল কারণে তৎপ্রণেতা কবিগণও তাহাদিগকে "নূতন গান" কহিতেন।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালা ভাষার প্রথম কবি এবং বঙ্গসাহিত্যের প্রথম অবস্থার (কেবল কি প্রথম অবস্থার?) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তৎকৃত চণ্ডীমঙ্গলকে বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মহাকাব্য বলিতে চাও বল; কিন্তু তাহা মহাকাব্যের আকারে বা অনুকরণে প্রণীত নহে। বরং ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর 'ধর্ম্মমঙ্গল' আকার-অবয়বে কতকটা সেই ছাঁচে ঢালা। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম অবস্থায় উদ্যোগ করিয়া কেহ মহাকাব্য-রচনার চেষ্টা করেন নাই;—সে চেষ্টা বরং সাহিত্যের আধুনিক অবস্থায় হইয়াছে। আমাদের আদি কাব্যগুলি প্রকারে যাহাই হউক, আকারে মহাকাব্য নহে, নবেল বা "পাঁচালী"। কিন্তু মহাকাব্য হইতেই "বিবর্ত্তিত"।

তর্ক।

[শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়]

বৃথা তর্ক! বৃথা কেন কর গণ্ডগোল?
সকলেই নিজ নিজ কোলে টানে ঝোল!
তর্কে শুধু বায়ু-বৃদ্ধি আর আস্ফালন,
সত্য যাহা তর্ক-ভয়ে করে পলায়ন।

তত্ত্ব ও লীলা।

[অধ্যাপক কুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায়, এম-এ]

১

যাহা নিত্য বস্তু, যাহার জন্ম নাই, পরিবর্ত্তন নাই, বিনাশ নাই, তাহাকেই জ্ঞানিগণ তত্ত্ব বা সত্য বলিয়াছেন। যাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডে এই বস্তুর অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত আর সমস্ত বিষয়কে তুচ্ছ করিয়া একনিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তাঁহারা বহু ক্লেশের পর এই বস্তুর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ইঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা একবাক্যে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, তত্ত্ববস্তু কেবল একটী মাত্র আছে; তাঁহারা ইহার অনুরূপ আর দ্বিতীয় দেখিতে পান নাই। এই জন্য 'একম্ অদ্বিতীয়ম্' বলিয়াছেন। এই বস্তুর অস্তিত্বের কখনও বিলোপ হয় না, এই জন্য ইনি সৎ; ইনি স্বতঃপ্রকাশ, কাহারও সাহায্যে প্রকাশিত নহেন, এই জন্য ইনি চিৎ বা চৈতন্য; ইঁহার 'বাহির' বলিয়া যখন কোনও সত্তাই নাই, তখন ইঁহার মধ্যে অভাব থাকিতে পারে না, এই জন্য ইনি পূর্ণতৃপ্ত, পূর্ণ শান্ত অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ। এই যে সৎ, চিৎ ও আনন্দ বলা হইল, ইহা তিন বস্তুর সম্বন্ধে নহে, একই বস্তুর সম্বন্ধে। একটী বস্তু পূর্ণতৃপ্তরূপে প্রকাশমান আছেন, ইহাই 'সচ্চিদানন্দ' বস্তুর পরিষ্কার অর্থ। ইহাই বিশ্বসমস্যাগৃহের একমাত্র চাবি; ইঁহার সাহায্যে বিশ্বের নিখিল সমস্যার ব্যাখ্যা করিতে হইবে। এই তত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই কার্য্যকারণবাদের বিচিত্র অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়া যায়। তত্ত্ববস্তুর স্বরূপের স্বভাবের ইনিই কেবল একমাত্র কারণ হইতে পারেন; অন্য কাহাকেও কারণ বলা কথার কথা মাত্র; যাহাকেই কারণ বলা যাইবে, সেই কারণই অন্য কোনও কারণের কার্য্য হইয়া পড়িবে; সুতরাং 'এই তত্ত্ববস্তুটী কোথা হইতে আসিল' এইরূপ প্রশ্নের এখানেই বিশ্রাম হইল। কেবল একমাত্র ইনিই ত আছেন, তবে আবার কাহাকে আশ্রয় করিয়া প্রশ্ন করিবে? তত্ত্ববস্তুর আদিকারণতা যিনিই আভাসে অনুভব করিয়াছেন, তিনিই অবাক্ হইয়াছেন; তিনিই বলিয়াছেন,—"আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্।" সকল দিকের সীমাকে অনুভব হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিলে যাহা থাকে, তাহাই অনন্ত শব্দের ব্যাখ্যা; তত্ত্ববস্তু সেইরূপ দেখায়, এই জন্য তিনি অনন্ত, বৃহত্তম

বা ব্রহ্মনামে অভিহিত হইয়াছেন। এই তত্ত্ববস্তুর সম্বন্ধে আর একটী গভীর আলোচ্য বিষয় এই যে, যাহা এক, তাহাকে কেহ কখনও দুই করিতে পারে না, তাহা দুই হইতেই পারে না। একটী আম্রবৃক্ষকে বহু খণ্ডে বিভক্ত করিতে পারা যায়, কিন্তু আম্রবৃক্ষের একত্বকে আদৌ বিভক্ত করিতে পারা যায় না। যদি একটী আম্রবৃক্ষকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে অবিকল সেইরূপ দুইটী আম্রবৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা হইলে আম্রবৃক্ষের একত্ব দ্বিত্বে পরিণত হইত, কিন্তু তাহা হয় না; এই জন্য আম্রবৃক্ষকে হাজার হাজার খণ্ডে বিভক্ত করিলেও সেই একই আম্রবৃক্ষ থাকে, একত্বস্বরূপের কিছুমাত্র হ্রাস বা বৃদ্ধি হয় না। অতএব একত্বে ভেদ আসা অসম্ভব। সুতরাং কোটি কোটী ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া যাঁহারা মনে করেন, ইহা তত্ত্ববস্তুর ভেদ, তাঁহারা স্থিরচিত্তে অনুধাবন করিলেই কোথায় ভ্রম হইয়াছে বুঝিতে পারিবেন।

জ্ঞান-প্রক্রিয়া।

ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষ ঘটিলে জ্ঞেয় বস্তু সচরাচর কিরূপে অনুভবগোচর হয়, তাহা সাধারণের পরিজ্ঞাতই আছে; সুতরাং আমি তাহা বর্ণনা না করিয়া কেবল দুইটী বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। আমরা যাহা কিছু জানিতেছি, তাহাতে আমাদের নিজেকে অতিক্রম করিয়া বিন্দুমাত্রও অনুভব করিতে পারিতেছি না। যখন সম্মুখে একটী ছবি দেখিতে থাকি, তখন ছবিটী যে প্রকৃত কি, তাহা অণুমাত্র জানিতে পারি না; কেবল আমাদিগের মনে যে ছবির একটী প্রতিকৃতির আবির্ভাব হয়, আমরা তাহাই জানিয়া থাকি, কিন্তু মনে করি ছবিটীর জ্ঞান হইল। যদি সকল প্রকার জ্ঞানলাভের ইহাই একমাত্র অব্যভিচারী পন্থা হয়, তবে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার করিবার কালেও আমি আমাকে অতিক্রম করিয়া কিরূপে সাক্ষাৎকার করিব? সুতরাং তত্ত্বকে জানা এবং আমার মধ্যে তত্ত্বের যাহা আছে তাহাকে জানা একই কথা। অতএব তত্ত্বকে যদি সত্যরূপে জানিতে হয়, তাহা হইলে তত্ত্ববস্তুকে সত্যরূপে ও সম্পূর্ণরূপে আমার মধ্যে থাকিতে হইবে, নতুবা আমার যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। অতএব পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আমরা প্রতিক্ষণে আমাদিগের মধ্যেই 'আমি'কে ও 'আমি'-ভিন্নকে জানিতেছি। যতক্ষণ ছবি দেখিতেছি, ততক্ষণ প্রত্যক্ষ করিতেছি। যখন কোনও ছবি দেখিতেছি না অথচ অনুভব করিতেছি, তখন প্রত্যক্ষ করিতেছি না, কারণ তাহাতে অক্ষ বা

ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইতেছি না। এইরূপ অনুভব প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষও নয়। এই অনুভূতিকেই অপরোক্ষানুভূতি কহে। যখন অনুভব করি 'আমিই আমি', আমি আমা হইতে অপৃথক্, তখন অপরোক্ষ অনুভূতি হইয়া থাকে। যে অনুভূতিতে কিছু ত্যাগ করিবার বা কিছু গ্রহণ করিবার থাকে না, যাহা জ্ঞানোপাদানরহিত, তাহাই অপরোক্ষানুভূতি। এই অনুভূতির বলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ঘটিয়া থাকে। এখানে দ্রষ্টা, দৃশ্য; জ্ঞাতা, জ্ঞেয়; ভোক্তা, ভোগ্য কিছুরই ভান হয় না। কেহ সাক্ষ্য দিবার বা পরিচয় দিবার থাকে না; যিনি আছেন, তিনিই আছেন মাত্র; কিন্তু আছেন বলিয়া বলিবার কেহ দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। আলোকটী নিজেকেই নিজে প্রকাশ করিয়া জ্বলিতেছে, দ্বিতীয় প্রকাশ্য কেহই নাই। যাঁহার এই অপরোক্ষানুভূতি হয় নাই, তাঁহাকে আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিতে হইবে, অথবা নিজেকে ঐরূপ অনুভব করিতে হইবে, তাঁহার পক্ষে আর তৃতীয় প্রমাণ হইতে পারে না।

পুরুষাবতার-লীলা।

আমরা এত ক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখিলাম যে, অপরোক্ষানুভূতি-বলে তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার সম্ভাবিত হয় এবং প্রত্যক্ষানুভূতির বলে জ্ঞাতা জ্ঞেয়, ভোক্তা, ভোগ্য প্রভৃতি লীলার অনুভব হইয়া থাকে। এই তত্ত্ববস্তুকে যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ।" একটী পরাশক্তি এই তত্ত্ববস্তুকে আশ্রয় করিয়া আছে, ঐ শক্তি তত্ত্ববস্তুর স্বভাবগত; ঐ শক্তি হইতে জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার প্রকাশ হইয়া থাকে। আমরা জ্ঞান, বল ও ক্রিয়ার সমষ্টিস্বরূপ যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি, উহা পরাশক্তি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই শক্তিই সর্ব্ববিধ লীলার মূল কারণ। শ্রুতি বলিতেছেন,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে," অতএব তত্ত্ববস্তু নিঃশক্তি নহে, প্রত্যুত নিখিল শক্তির আধার; দুর্ব্বল নহে, প্রত্যুত সর্ব্ববিধ বলের আশ্রয়; নিষ্ক্রিয় নহে, প্রত্যুত অখিল ক্রিয়ার আশ্রয়ভূমি। এইরূপ হইয়াও তত্ত্ববস্তুর স্বরূপের কোনও বৈলক্ষণ্য হয় না; কারণ, ব্রহ্মাণ্ড অসংখ্য হইলেও ব্রহ্মসত্তা বিভক্ত হয় না, উহা অদ্বৈতই থাকে; ব্রহ্মাণ্ডে শত শত অভাব-অভিযোগের উদয় হইলেও পূর্ণ তৃপ্তি বা আনন্দ অণুমাত্রও খণ্ডিত হয় না; উহারও অদ্বৈতস্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে এবং সহস্র সহস্র জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের আবির্ভাব হইলেও চৈতন্যের অণুমাত্রও বিপরিণাম ঘটে না, উহারও অদ্বৈতস্বরূপটী পূর্ণরূপে অবস্থান

করিতে থাকে। বিষয়টী একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করি। শারীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ গবেষণার ফলে অভিমত প্রকাশ করিতেছেন যে, প্রাণিদেহের অতি সূক্ষ্ম উপাদানগুলিও সজীব; প্রাণিদেহের প্রত্যেক অংশ জীবাণুদ্বারা গঠিত। প্রত্যেক জীবাণুর পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিত্ব ও ক্রিয়া রহিয়াছে। যদি এইরূপ অসংখ্য সজীব ব্যক্তি দ্বারা আমার দেহ গঠিত হয়, তাহা হইলে ইহা আমি অসঙ্কোচে বলিতে পারি যে, উহাদিগের বহুত্ব দ্বারা আমার একত্ব বিলুপ্ত হয় নাই; উহাদিগের অভাব-অভিযোগে আমার ব্যক্তিত্বে অণুমাত্র অভাবের উদয় হয় নাই, আমি যে এক জন ব্যক্তিই আছি, তাহাতে কিছুমাত্র ম্লানতা আসিতেছে না। তাহাদিগের মধ্যে শত শত জ্ঞাতা-জ্ঞেয় থাকিলেও, আমি নিজেকে তাহাদের মত বহু জ্ঞাতা-জ্ঞেয় মনে করিতে পারিতেছি না, সুতরাং তাহাদিগের তুলনায় আমার জ্ঞান অদ্বৈতই রহিয়াছে। এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতেছি, তত্ত্ববস্তুর সহিত নিখিলভেদাশ্রয় ব্রহ্মাণ্ড যুগপৎ অবিরোধে বাস করিতেছে। এই যে অভেদের উপর অসংখ্য ভেদ যুগপৎ রহিয়াছে, তাহা আমরা বিচার দ্বারা বুঝিলাম; কিন্তু যে শক্তি বা যোগ্যতার বলে উহা সম্ভব হইতেছে, তাহাকে অণুমাত্র ধরিতে পারিলাম না। যাহা আছে, তাহাই আমরা ব্যাখ্যা করিলাম, কিন্তু কিরূপে এই অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল তাহা বিন্দুমাত্রও বুঝিলাম না। এই যে অভেদ ও ভেদের অবিরুদ্ধ অবস্থান, এই যে এক ও অনেকের অদ্ভুত সমাবেশ, তাহা জীবের চিন্তার ও তর্কের অতীত। এই জন্য ইহা অচিন্ত্য ভেদাভেদ। এই অদ্ভুত রহস্য ভেদ করিতে না পারিয়া মনীষিগণ অবনতমস্তকে বলিয়াছেন, "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।" দেবতার এই মহীয়সী শক্তির কূলকিনারা না পাইয়া জীব স্তম্ভিত হইয়া যায়; "যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ" কেবল এই নমস্কারমাত্রই তাহার আরাধনার একমাত্র অবলম্বন হইয়া পড়ে।

এই অচিন্ত্য ভেদাভেদ ব্যাপারের বলেই তত্ত্ববস্তুর উপরে ব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। তত্ত্ববস্তুর ব্রহ্মস্বরূপ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; এক্ষণে পরমাত্মস্বরূপ কিঞ্চিৎ আলোচিত হইতেছে। সাত্বত-তন্ত্রে আছে,—"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ, প্রথমংমহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতং, তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে।" তানি এখানে তত্ত্ববস্তুকেই বিষ্ণু বলা হইয়াছে। তিনি প্রথমে মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি অর্থাৎ তাঁহার পরাশক্তির বলে একটী অতিস্বচ্ছ প্রকাশবহুল-

উপাদান তত্ত্ব-বস্তু হইতেই আবির্ভূত হয়; এই উপাদানে চাঞ্চল্য ও জড়তা অভিভূত থাকে, কিন্তু প্রকাশস্বভাবের বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। এই জন্য ইহা চৈতন্যকে অল্পমাত্র আবৃত বা অপ্রকাশিত রাখিয়া তাঁহার স্বরূপকে অনেকটা প্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ উপাদানকে সাত্ত্বিক উপাদান বলে। ইহাতে চাঞ্চল্য ও জড়তা গুণ অভিভূত থাকায় রজঃ ও তমঃ অভিভূত আছে, এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে। ইহা ব্রহ্মাণ্ডের কারণদেহ। এই দেহের অন্তর্যামী তত্ত্ববস্তুই প্রথম পুরুষাবতার নারায়ণ বা কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। দেহকে পুর ধরিয়া ইনি তাহাতে শয়ন অর্থাৎ অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন, এই জন্য পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। কারণদেহ-সম্পৃক্ত হইয়া ইনি ঐ দেহে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই হেতু অবতার নামে খ্যাত হইয়াছেন। পরে কারণদেহের প্রকাশাবস্থার ন্যূনতা হইয়া চাঞ্চল্য ও জড়তার উদয় হয়; অর্থাৎ সত্ত্বগুণকে আংশিক অভিভূত করিয়া রজঃ ও তমঃ অপেক্ষাকৃত বাড়িয়া উঠে। ইহাতে পূর্ব্বোক্ত উপাদানটী পরিবর্ত্তিত হইয়া যে অবস্থায় উপনীত হয়, তদবস্থ উপাদানকে সূক্ষ্ম উপাদান কহে। উহাতে যে দেহ নির্ম্মিত হয়, তাহাকে হিরণ্যাণ্ড কহে। উহাই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মদেহ। যিনি কারণদেহের অন্তর্যামী, তিনিই এ দেহেরও অন্তর্যামীরূপে প্রকাশিত হন, কিন্তু এই দেহের অপেক্ষাকৃত স্থূলতা নিবন্ধন চৈতন্যকে পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিকভাবে আবৃত রাখিয়া বহির্ভাগে প্রকাশ করিয়া থাকেন। শাস্ত্র এই অবতারকে দ্বিতীয় পুরুষাবতার বা গর্ভোদশায়ী নারায়ণ কহিয়াছেন। ইনি হিরণ্যগর্ভ নামেও অভিহিত হইয়াছেন। পরে সৃষ্টিক্রমে এই সূক্ষ্মদেহেও পরিণতি উপস্থিত হইয়া প্রকাশ ও চাঞ্চল্যকে অভিভূত করিয়া জড়তা অতীব প্রবল হইয়া পড়ে। তখন এই উপাদানে ব্রহ্মাণ্ডের যে দেহের আবির্ভাব হয়, তাহাকে স্থূলদেহ বা বিরাট্‌দেহ কহে। পূর্ব্বোক্ত পুরুষই এই দেহের অন্তর্যামী হইয়া প্রকাশ পান; এই দেহে চৈতন্য অত্যন্ত আবৃত থাকে। এই অন্তর্যামী পুরুষের নাম তৃতীয় পুরুষাবতার বা ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ। ইনি বিরাট্ পুরুষ নামেও শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত তিনটী দেহ তত্ত্ববস্তুর জ্ঞেয় এবং তিনি উহাদিগের জ্ঞাতা। ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার সৃষ্ট, তিনি উহার স্রষ্টা; ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার প্রতিপাল্য, তিনি উহার প্রতিপালক; ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার উপসংহার্য্য, তিনি উহার উপসংহারক। পুরুষ-বতাররূপে এই সকল ক্রিয়া করিতেছেন বলিয়া তিনি লীলাবিহারী। ইনিই

পরমাত্মা; কারণ, ওতপ্রোতভাবে ব্রহ্মাণ্ড-দেহে অনুস্যূত থাকিয়া ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বকে সম্ভাবিত করিতেছেন। সচরাচর লোকে ইহাকেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান ও সর্ব্বব্যাপিজ্ঞানে আরাধনা করিয়া থাকে।

যুগাবতারলীলা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥" প্রতি যুগেই যখন অধর্ম্মের প্রভাবে ধর্ম্ম ম্লান হইয়া যায়, অসত্যের আবরণে সত্যের মহিমা প্রচ্ছন্ন হইতে থাকে এবং অসাধুর নিকট সাধুর অবমাননা হইতে থাকে, তখন পূর্ব্বোক্ত প্রথম পুরুষাবতার হইতে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি যুগাবতার সকল অবতীর্ণ হইয়া যুগধর্ম্ম-সংস্থাপন করিয়া থাকেন। যাঁহার উপর ব্রহ্মাণ্ডের পালনী বৃত্তি অবস্থান করিতেছে, সেই কারণার্ণবশায়ী নারায়ণই স্বীয় অংশে যুগাবতারসকল প্রেরণ করিয়া ধর্ম্মাবহ ও পাপনুদ নাম ধারণ করিয়া থাকেন। কোনও মনুর অধিকার-কালে বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত যে অবতার আসিয়া থাকেন, তাঁহার নাম মন্বন্তরাবতার। কোনও জীবকে আশ্রয় করিয়া যদি পুরুষের শক্তি জগতের কোনও মঙ্গলকর কার্য্য সম্পাদন করে, তখন সেই জীবকে আবেশাবতার কহে। বেদব্যাস ও মহারাজ পৃথু আবেশাবতার বলিয়া শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছেন।

গুণাবতারলীলা।

যেখানে যে পরিমাণে চাঞ্চল্য, যদি সেই পরিমাণে জড়তা থাকে, তাহা হইলে কোনও ক্রিয়ার প্রকাশ হয় না। যদি চাঞ্চল্যের আধিক্য হয়, তাহা হইলে জড়তার মধ্য হইতে অভিনব ক্রিয়ার আবির্ভাব হয়; কিন্তু জড়তার আধিক্য হইলে ঈষৎ প্রকাশিত ক্রিয়া জড়তায় লীন হইয়া যায়। অতএব কোনও ক্রিয়ার উৎপত্তি করিতে হইলে চাঞ্চল্য ও জড়তার একটী সমীকরণ-শক্তির প্রয়োজন হয়। যদি একটী পুষ্পকে প্রস্ফুটিত হইতে হয়, তাহা হইলে এই সমীকরণ-শক্তির একান্ত প্রয়োজন হইবে। যদি এই শক্তি না থাকে এবং চাঞ্চল্য জড়তা অপেক্ষা অধিক প্রবল হয়, তাহা হইলে পুষ্পের প্রতি অবয়ব ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া অনন্ত ভাগে বিভক্ত হইয়া অনন্ত দিকে উড়িয়া যাইবে; কিন্তু যদি

জড়তা চাঞ্চল্যকে পরাজিত করে, তাহা হইলে পুষ্পটী অনন্ত কালেও ফুটিবে না। এরূপ স্থলে যদি চাঞ্চল্য জড়তা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয় এবং উভয়ের মধ্যে একটী নিয়ামক শক্তি আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে পুষ্পটী ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া প্রকাশিত হইবে। শাস্ত্র চাঞ্চল্যকে রজোগুণের, জড়তাকে তমোগুণের এবং প্রকাশকে সত্ত্বগুণের কার্য্য বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পুষ্পের প্রস্ফুটন-ব্যাপারে প্রমাণিত হইল যে, পুষ্পের আবির্ভাবকে তমোগুণ উপসংহার করিয়া রাখিয়াছিল, রজোগুণ উহাকে স্ফুটনোন্মুখ করিয়াছে, এবং সত্ত্বগুণ উহাকে পালন করিয়া ধীরে ধীরে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপারেও অবিকল এই নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে। এখানে একটী বিষয় স্মরণ থাকা আবশ্যক যে, যে বস্তুর প্রকাশ হইবে, তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতিকে নিয়মিত করিবে কে? গোলাপ ফুলের আকারকে চিরদিন একরূপ করিবে কে এবং গোলাপের গাছে বেলফুলের উৎপত্তি নিবারণ করিবে কে? এই জন্য অন্তর্যামী চৈতন্যের নিয়ন্তৃত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। এইরূপে পরমাত্মাই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তিনি অবশ্য পূর্ব্বোক্ত তিন গুণেরই অন্তর্যামী। ইহাতে তাঁহার তিনটী নাম হইয়াছে। রজোগুণের অন্তর্যামীরূপে তাঁহার নাম ব্রহ্মা, সত্ত্বগুণের অন্তর্যামীরূপে তাঁহার নাম বিষ্ণু এবং তমোগুণের অন্তর্যামীরূপে তাঁহার নাম রুদ্র। ইঁহারা গুণের অন্তর্যামী নিয়ন্তা পুরুষ বলিয়া ইঁহাদিগকে শাস্ত্র গুণাবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অদৃষ্ট-চক্র।

[শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়]

দিন যায়, বর্ষ যায়, যুগ যুগান্তর—
মানব-অদৃষ্ট-চক্র ঘুরে নিরন্তর:
অতীতের দুঃখভোগ সুখের সময়
দুখের স্বপন-সম যেন মনে হয়।

নিস্তা। অমন সব ইংরিজী কথা কেমন জলের মত পড়ে যাচ্চে। , আবার মানে ক'রে আমাকে কেমন বুঝিয়ে দিলে।

মুরলী হাসিয়া বলিত, "তা হ'লে গণেশ একা পণ্ডিত হবে না, তোমাকেও দেখ্‌চি পণ্ডিত করলে। মুখ্যু র'য়ে গেলাম শুধু আমি।"

মুরলী সুর করিয়া গান ধরিল, আমিই শুধু রইনু বাকি।

নিস্তারিণী হাসিয়া উঠিত, বলিত, "তুমিও বাকি থাকবে না গো থাকবে না, তোমাকেও পণ্ডিত ক'রে নেব।"

পতি-পত্নীর কলহাস্য-ধ্বনিতে গৃহ ভরিয়া উঠিত।

তার পর নিস্তারিণী যে দিন একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিল, সেদিন মুরলী ভাবিল, সংসার আর স্বর্গ, এ দু'য়ের মাঝে তফাৎ বোধ হয় বড় বেশী নাই।

গণেশ যখন প্রথম শ্রেণীতে উঠিল, তখন মাতঙ্গিনী ভায়ের জন্য একটী ক'নে ঠিক করিল। তাহারই জায়ের ভাইঝি, মেয়েটী দিব্য সুন্দরী। নিস্তারিণীর অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাতুর সন্তোষের জন্য মুরলী সেই মেয়ের সঙ্গে গণেশের বিবাহ দিল। নিস্তারিণী ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণ হইল এবং মাতঙ্গিনীর উপর একটু চটিয়া গেল।

নিস্তারিণীর স্বভাবটা আর সকল দিকেই ভাল ছিল, কিন্তু তাহার উপর কেহ কথা কহিলে তাহা সহ্য করিতে পারিত না। ভাল হউক মন্দ হউক, আপনার মতটাকে বজায় রাখিবার জন্য তাহার প্রবল আগ্রহ হইত, সে আগ্রহে যে বাধা দিত, সেই তাহার চক্ষুঃশূল হইয়া দাঁড়াইত।

অনেকখানি আশা ও আনন্দ লইয়া নিস্তারিণী ও মুরলী দিন কাটাইতেছিল, কিন্তু গণেশ যে দিন পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইল, সে দিন তাহাদের আনন্দের ভিত্তি যেন একটু শিথিল হইয়া আসিল। তথাপি নিস্তারিণী আশা ছাড়িল না। সংসারে কে তাহা ছাড়িতে পারে?

(ক্রমশঃ)

গণ্ডমূর্খ।

[শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়]

বিদ্যা নাই,—বুদ্ধি যদি নাহি থাকে তার,—
বেঁচে থাকা বিড়ম্বনা—সে তো মৃতপ্রায়!
আছে বিদ্যা, ডিগ্রি আছে, বুদ্ধি নাই বটে,
নহে শুধু মূর্খ সেটা,—গণ্ডমূর্খ বটে।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি।*

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

বাঙ্গালার বিখ্যাত লেখক স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাদের একখানির প্রতিলিপি নিম্নে আমরা ছাপাইয়া দিলাম। বঙ্কিম বাবুর হাতের লেখার নমুনা দেখাইবার জন্য যে ইহা ছাপাইতেছি, শুধু তাহা নহে। তাঁহার এই পত্র-মধ্যে তাঁহার একটি অভিমত জানিতে পারা যায় বলিয়া সাগ্রহে পাঠকবর্গকে ইহা উপহার দিলাম।

কোনও কোনও ব্রাহ্ম-লেখক বঙ্কিম বাবুর সম্বন্ধে তিনটি বিষয় ভ্রমপূর্ণ কথা প্রচার করিয়া থাকেন। সে কথা তিনটি এই ;—(১) বঙ্কিম বাবু বহু বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। (২) বঙ্কিমবাবু বিধবা-বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন। (৩) বঙ্কিম বাবু বাল্য-বিবাহ পছন্দ করিতেন না।

কিন্তু উপরি-উদ্ধৃত মত তিনটি যে একেবারেই বঙ্কিম বাবুর নহে ;—তাঁহার স্কন্ধে যে উহা জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাই আমরা অতি সংক্ষেপে—একে একে প্রমাণ করিয়া দিতেছি।

প্রথম—বহু-বিবাহ। 'বহু-বিবাহ' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' বলিয়াছেন,—"বহুবিবাহ যে সমাজের অনিষ্টকারক, সকলের বর্জ্জনীয় এবং স্বাভাবিক নীতিবিরুদ্ধ, তাহা বোধ হয় এ দেশের জন-সাধারণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। সুশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত, এ দেশে এমত লোক বোধ হয় অল্পই আছে, যে বলিবে, "বহুবিবাহ অতি সুপ্রথা, ইহা ত্যাজ্য নহে।"—বঙ্কিমের এ উক্তি পড়িয়া কি মনে হয়, বঙ্কিম বাবু বহুবিবাহের পক্ষপাতী ?

দ্বিতীয়—বিধবা-বিবাহ। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়া গিয়াছেন,—"হিন্দুসমাজে ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা লোকাচার প্রবল। যাহা লোকাচার-সম্মত, তাহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হইলেও প্রচলিত ; যাহা লোকাচার-বিরুদ্ধ, তাহা শাস্ত্রসম্মত হইলেও প্রচলিত হইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় পূর্ব্বে একবার বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণ করিয়াছেন ; প্রমাণ সম্বন্ধে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন ; অনেকেই তাঁহার মতাবলম্বী ; কিন্তু কয় জন, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা বা অনুষ্ঠেয়তা অনুভূত করিয়া আপন পরিবারস্থা বিধবাগণের পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়াছেন ?"—বঙ্কিম বাবু কোন্ দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছেন, তাহা কি এই কয়-ছত্রের মধ্যে ব্যক্ত হয় নাই ? আরও শুনুন, বঙ্কিমের সূর্য্যমুখী কি বলিতেছেন! সূর্য্যমুখীর পত্রে আছে,——"ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবা-বিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে ?"—এই কয় ছত্রের মধ্যেও পাঠকেরা কি দেখিতেছেন ?—বঙ্কিমের সহানুভূতি বিধবা-বিবাহের দিকে ? না—বিপক্ষে ?

এই বার বাল্যবিবাহের কথা —বঙ্কিম বাবু বাল্যবিবাহ পছন্দ করিতেন কি, না করিতেন তাহা নিম্ন-উদ্ধৃত পত্র-মধ্যে প্রকাশ। পাঠকগণ পত্রখানি পাঠ করিয়া তাহা বুঝুন!—

---

* পত্রখানি স্বর্গীয় ঠাকুরদাস বাবুর কনিষ্ঠ পুত্র, আমাদের পরম সুহৃদ শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। এজন্য তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।—লেখক।

মান্যবর শ্রীযুক্ত নিবেদনমিদং

আপনার পত্র পাইয়া বিশেষ আপ্যা-
য়িত হইলাম। আপনি আমার বিষয়
লিখিয়াছেন এবং আমি আপনার
নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ।

উৎকল বিদ্যোৎসাহীদিগের সম্বন্ধে
উৎকল সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান হইতেছে,
আমি তাহাকে বিশেষ প্রশংসার্হ-
মনে করি। আমি যতদূর জানি,
এ দেশীয় লোকেরা ইহার বহুমূল্য

বিক্রমপুরের একটি জলযুদ্ধ।

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়।]

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ-সময়ে, মোগল এবং পাঠানের, মগ এবং ফিরিঙ্গি-জলদস্যুর অস্ত্র-ঝঞ্ঝনায় সমগ্র বঙ্গভূমি সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকৃতির রম্যনিকেতন, নদীমেখলাভরণা, শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির অধিকার লইয়া হিন্দু হিন্দুকে অস্ত্রাঘাতে জর্জ্জরিত করিতেছিল; মোসলমান মোসলমানের শোণিতপাতে বসুন্ধরা রঞ্জিত করিতেছিল; সুযোগ বুঝিয়া মগ ও পর্ত্তুগীজ-জলদস্যুগণ বাঙ্গালীর সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া, গ্রাম এবং নগর ভস্মসাৎ করিয়া, সোনার বাঙ্গালা শ্মশানে পরিণত করিতেছিল। মোগল-পাঠানের শক্তি-পরীক্ষায়, মগ এবং ফিরিঙ্গির তাণ্ডব-নৃত্যে বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে যে সমুদয় নূতন নূতন অভিনেতার আবির্ভাব হইতেছিল, সেকালের বাঙ্গালী তাহাদিগের অভিনয় নীরবে সন্দর্শন করিয়া তৃপ্তি লাভ করিতে পারে নাই;—নিতান্ত নির্জ্জীবের ন্যায় মদবল-দৃপ্ত অত্যাচারীর অত্যাচার সহ্য করিয়া, শ্যামায়মান পল্লীচ্ছায়ার অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া সময় অতিবাহিত করে নাই। দেশের এই ঘোর দুর্দ্দিনে বাঙ্গালার হিন্দু ভৌমিকগণ বন্দুক-তরবারি ধারণ করিয়া সেই ভীষণ রণক্রীড়ায় জলে স্থলে যেরূপ অদ্ভুত বীরত্ব ও সমর-কৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, বর্ত্তমান বাঙ্গালীর নিকট তাহা স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও, বাঙ্গালীর এই শৌর্য্যবিভ্রমের গৌরবময় কাহিনী সুধীসমাজে ইতিহাসের মর্য্যাদালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। মোসলমান ঐতিহাসিকগণের গ্রন্থে, ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, ইহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বঙ্গভূমি হইতে পাঠান-রাজ-পাট সমূলে উৎপাটিত করিবার উদ্দেশ্যে দিল্লীর মোগল বাদশাহগণের পুনঃ পুনঃ অভিযান-প্রেরণের ফলে, বাঙ্গালী হিন্দু-পাঠান জাতি-ধর্ম্মের পার্থক্য ভুলিয়া স্বার্থ-সমন্বয়ে একত্রিত হইয়াছিল। বহুকাল বাঙ্গালায় বাস করিয়া, বাঙ্গালায় জায়গীর লাভ করিয়া, বঙ্গভূমির সহিত পাঠানের চির-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে, বাঙ্গালী হিন্দু-মোসলমান সমবেত হইয়া বাঙ্গালীমাত্রের জন্মভূমি বঙ্গজননীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিবার জন্য নববল-দৃপ্ত মোগলশক্তির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। হিন্দু-মোসল-

মানের এই স্বার্থসমন্বয়ের ফলেই স্বধর্ম্ম অপেক্ষা স্বদেশ মোসলমানগণের নিকট অধিকতর প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। দেশহিতৈষণার তীব্র-উন্মাদনায় মত্ত হইয়াই বঙ্গভূমির বুকের উপর দাঁড়াইয়া মোসলমান মোসলমানের শোণিত-পাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।

যত দিন বাঙ্গালার ভৌমিকগণ সমুদয় সঙ্কীর্ণতা বিসর্জ্জন দিয়া স্বদেশানুরক্ত একনিষ্ঠ ভক্ত সাধকের ন্যায় দেশমাতৃকার পূজার জন্য একপ্রাণতায় অনু-প্রাণিত ছিলেন, তত দিন দিল্লীশ্বরের বঙ্গবিজয়ের সকল উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছিল। কিন্তু কুক্ষণে ঈশা খাঁর সহিত কেদার রায়ের, প্রতাপাদিত্যের সহিত রামচন্দ্র রায়ের, রামচন্দ্র রায়ের সহিত লক্ষ্মণ মাণিক্যের মনোমালিন্যের সঞ্চার হইয়া বিরোধ উপস্থিত হইল। সুতরাং স্বদেশের উদ্ধারকল্পে বাঙ্গালার দ্বাদশ বীর যে কঠোর ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহার উদ্‌যাপন অসম্ভব হইয়া পড়িল, বাঙ্গালার ভবিষ্যতের আশা ভরসা নির্ম্মূল হইল। ক্ষুদ্র স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া, জিঘাংসার প্রেরণায় উত্তেজিত হইয়া, ভৌমিকগণ যখন একে অপরের উপর প্রাধান্য-সংস্থাপন-মানসে আপনাদের শক্তির অপচয় করিতে লাগিলেন, বঙ্গবিজয় তখন মোগল বাদশাহের করামলকবৎ হইয়া পড়িল। বাঙ্গালার এই দুর্দ্দিনে, বাঙ্গালীর ভাগ্যপরিবর্ত্তনের এই সন্ধিক্ষণে, কুশাগ্রবুদ্ধি যুদ্ধ-বিশারদ রাজা মানসিংহ দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি ও সেনাপতি পদ লাভ করিয়া বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভৌমিকগণের এই আত্মকলহের কথা তাঁহার অবিদিত রহিল না। ফলে তিনি সাম্যনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ঈশা খাঁর সহিত মৈত্রী সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া ভবানন্দের সহায়তায় প্রতাপাদিত্যকে ও শ্রীমন্ত খাঁর সাহায্যে কেদার রায়কে পরাজিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঘর-ভেদী বিভীষণগণকে হস্তগত করিতে না পারিলে, তাহাদিগের মুখে গৃহছিদ্রের কথা অবগত হইতে না পারিলে, মোগল বাদশাহের প্রধান সেনাপতির পক্ষেও বঙ্গবিজয় সম্ভবতঃ সহজসাধ্য হইত না। মানসিংহ যখন কচু রায় এবং ভবানন্দের সহায়তায় প্রতাপাদিত্যের সর্ব্বনাশ-সাধনে তৎপর ছিলেন, সেই সময়েই তাঁহার নৌ-সেনাধ্যক্ষ বাঙ্গালী বীর মন্দারায় জলপথে কেদার রায়ের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন।

মন্দারায়ের সহিত কেদার রায়ের জলযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ আকবর নামায় Purchas Pilgrims চতুর্থ খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে এবং ডুজারিক (Lep Peirre

Du Jarric) প্রণীত Histoire Des Indes Orientales গ্রন্থের ত্রয়োত্রিংশ অধ্যায়ে লিখিত আছে। এই জলযুদ্ধে মোগল সেনাপতি বাঙ্গালী বীর মন্দারায় অসীম বীরত্ব প্রকাশ করিয়া নিহত হন। জলযুদ্ধের স্থান বিক্রমপুর।

সন্দীপের অধিকার লইয়া সেলিম সার সহিত কেদার রায়ের শক্তি-পরীক্ষার শেষ মীমাংসা হইতে না হইতেই আর এক প্রবলতর শত্রু রণভেরী বাজাইয়া বিক্রমপুরে উপস্থিত হইয়াছিল। এই প্রবল শত্রু মোগলের বিজয়-বাহিনীর অধিনায়ক বাঙ্গালী বীর মন্দারায়। তৎকালে মন্দারায়ের অকুতোভয়তা ও রণ-নৈপুণ্যের খ্যাতিতে সমগ্র বঙ্গ মুখরিত। বঙ্গবিজয়ে মন্দারায় রাজা মানসিংহের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। মানসিংহের আদেশক্রমে তিনি একশত কোষা এবং এক দল সাহসী ও নির্ভীক মোগল সৈন্যসহ কেদার রায়ের রাজধানী শ্রীপুরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। মন্দারায়-পরিচালিত মোগলের কামান-সজ্জিত নৌবহর অর্দ্ধচন্দ্র-লাঞ্ছিত-পতাকা উড়াইয়া, পদ্মার উত্তাল-তরঙ্গ-মালা আলোড়িত করিয়া, কালাগঙ্গার সঙ্গমস্থলে উপস্থিত হইল; এবং কামান-ভেরীর প্রলয় গর্জ্জনে কালীগঙ্গার উভয় তীর প্রতিধ্বনিত করিয়া, বীরদর্পে মন্দারায়ের আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করিল। বিক্রমপুরের ভৌমিক-প্রবর কেদার রায় পূর্ব্ব হইতে সতর্ক না থাকিলেও মোগল সেনাপতির বীরোচিত অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিলেন না। এই নবাগত বীর অতিথির সমুচিত সম্বর্দ্ধনার ভার কেদার রায়ের নৌ-বলাধ্যক্ষ পর্ত্তুগীজ-বীর কার্ভালোর হস্তে ন্যস্ত হইল। এই সময়ে কেদার রায়ের শ্রীপুর বন্দরে ত্রিংশৎখানি মাত্র 'জেলিয়া' যুদ্ধার্থ প্রস্তুত ছিল। কার্ভালো এই ত্রিংশৎখানি 'জেলিয়া' দ্বারা মোগলের শতমাত্র কোষা নৌকাকে পরাজিত করিতে না পারা অগৌরবকর বলিয়া মনে করিলেন; কারণ, কিছু পূর্ব্বে তিনি কেবলমাত্র ষষ্টি রণতরীর সাহায্যে এক সহস্র যুদ্ধ জাহাজকে ধ্বংসমুখে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কার্ভালো সেই ত্রিংশৎখানি 'জেলিয়া' সহ, বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গি গোলন্দাজ সৈন্য লইয়া, যেখানে কালাগঙ্গার কৃষ্ণবারিরাশি পদ্মার তুষার-শুভ্র জলতরঙ্গের সঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছিল, সেই পদ্মা কালীগঙ্গার সঙ্গমস্থলে, মন্দারায়ের শত রণতরীর উপর প্রচণ্ডবেগে আপতিত হইল। বাঙ্গালী ও ফিরিঙ্গি সৈন্যগণের সহিত মোগল সৈন্যের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মোগলের দুর্জ্জয় কামান মেঘমন্দ্রে অগ্নিময় গোলক উদ্গীরণ করিতে লাগিল, কিন্তু সুকৌশলী ফিরিঙ্গি-বীর কার্ভালো কিছুতেই বিচলিত হইয়া পড়িল না। তাহার

নৌবহর হইতেও বাঙ্গালী গোলন্দাজগণ শিলাবৃষ্টির ন্যায় অগ্নিময় রক্তিম গোলক নিক্ষেপ করিতে লাগিল। উত্তরাপথ-বিজয়ী মোগল-সৈন্যগণ যেরূপ অদ্ভুত বীরত্ব-সহকারে যুদ্ধ করিতেছিল, বীরমন্ত্রে দীক্ষিত স্বদেশ-প্রাণ বাঙ্গালীরাও তদনুরূপ রণক্রীড়ায় মত্ত হইয়াছিল। নরশোণিতে কালীগঙ্গার সুনীল জলরাশি লোহিত বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিল; বন্দুক-কামানের ধূমে গগনমণ্ডল আবৃত হইয়া গেল, তাহাদের ঘন ঘন তুমুল গর্জ্জনে পদ্মা-কালী-গঙ্গার উর্ম্মিমালা প্রকম্পিত হইতে লাগিল, বাঙ্গালী-ফিরিঙ্গি-মোগল-বাহিনীর বীরদর্পে ও কোলাহলে পদ্মা-কালীগঙ্গার তটদেশবাসী জনগণ চমকিত, বিস্মিত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মন্দারায় অলৌকিক পরাক্রম, অদ্ভুত রণ-কৌশল এবং অসমসাহসিকতা প্রদর্শন করিলেন বটে, কিন্তু কার্ভালোর বীর বিক্রমে, সুশিক্ষিত বাঙ্গালী গোলন্দাজ সৈন্যের ক্ষিপ্রতায় তাঁহার সমুদয় উদ্যম ব্যর্থ হইয়া গেল। বঙ্গবীরগণের কামানের গোলায় মোগলের নৌবহর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, কতকগুলি কালীগঙ্গা ও পদ্মার অতল গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিল, কতকগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। এই ভীষণ যুদ্ধে মন্দারায় সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া সলিলশায়ী হইয়াছিলেন, তাহাতেই এই বাঙ্গালী বীরের মৃত্যু হয়। কার্ভালোও তীরবিদ্ধ হইয়া আহত হইয়াছিল। মন্দারায় নিহত হইলে, মোগল সৈন্যগণ মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা বিক্রমপুর হইতে পলায়ন করিয়া কোনও প্রকারে প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এইরূপে রাজা মানসিংহের বিক্রমপুর-বিজয়ের প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। ম্যারাথন ও থার্ম্মপলি, হলদীঘাট ও দেবীর প্রভৃতি রণক্ষেত্র ঐতিহাসিকগণের অনুগ্রহে স্বদেশ-প্রাণ বীরমণ্ডলীর নিকট পবিত্র তীর্থক্ষেত্রের সম্মান লাভ করিয়াছে, কিন্তু বাঙ্গালার জলে স্থলে কত ম্যারাথন-থার্ম্মপলি-হলদীঘাট-দেবীর যুদ্ধের অভিনয় হইয়া গিয়াছে, আত্ম-বিস্মৃত বাঙ্গালীর তাহার সন্ধান করিতেও উৎসাহ নাই।

প্রায়শ্চিত্ত।

[শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি-এ]

(১)

শিশুর অর্থহীন, ভাবহীন, বিশৃঙ্খল অনুভূতির মধ্যে সহসা এক দিন একটা অনুভূতি প্রবল হইয়া তাহার অপরিণত মস্তিষ্কে আপনার ছাপ অঙ্কিত করিয়া দেয়। মানব-জীবনে স্মরণশক্তির জন্ম সেই মুহূর্ত্ত হইতে। সেই স্মৃতি আবছায়ার মত, সেই ছবি জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত একেবারে বিলুপ্ত হয় না।

অতি শৈশবের এমনই এক অনুভূতি ইন্দুর মনে পড়িত। আকর্ণবিশ্রান্ত-চক্ষু, রত্নখচিতাভরণা, 'সুডোল'দেহা এক গৌরাঙ্গী থাকিয়া থাকিয়া তাহাকে বক্ষের মাঝে চাপিয়া ধরিত, অজস্র চুম্বনে তাহাকে ক্লান্ত করিয়া তুলিত,—সে তার জননী। শ্যামা, নিরাভরণা জননীর অপর এক ছবিও তাহার মনে পড়িত। প্রোজ্জ্বল-আলোকদীপ্ত, নৃত্যগীত-মুখরিত কি যেন স্বপ্নপুরে তাহার জননীর ন্যায় আরও কত রমণী কতবার তাহাকে আদর করিয়া কোলে লইত, সোহাগ করিত; সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় জনসংঘের অবিরাম গতি, তাহাদের গগনভেদী উল্লাসধ্বনি; সহসা ঘোর অন্ধকার, পুনরায় দীপ্তা-লোকচ্ছটা;—সবই তাহার মনে পড়িত। কিন্তু সে সব ছবি বড় অস্পষ্ট।

সে দিন একটা নূতন অপেরার অভিনয়। দাই ইন্দুকে লইয়া 'গ্রীণরূমে'র পাশে বসিয়া ছিল। এমন সময় স্থূলকায় এক ব্যক্তি 'ষ্টেজ ম্যানেজারে'র সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল। ইন্দু তাহার সজারু-লাঞ্ছিত পাটল শ্মশ্রু দেখিয়া আতঙ্কে দাইকে জড়াইয়া ধরিল। ষ্টেজ ম্যানেজার হাসিয়া বলিল—"ভয় কিরে বেটি! কে বল্ দেখি?"

লোকটা কৌতূহলী হইয়া ইন্দুর দিকে চাহিল; বলিল—"যা বলেছিলে ঠিক বটে। কোথায় এই কন্দর্পকলেবর আর কোথায় ঐ গোবরে পদ্মফুল!

"তাকে ডাকব?"

"দোহাই, ঐটি না। আজ তিন বছর তার সঙ্গে দেখা নেই। দেখা হ'লেও সে মুখ ফিরিয়ে নেয়।"

"কেন?"

"তার চাঁদ-চাওয়া আবদার। বলে—আমি বাল-বিধবা, আমার সর্ব্বনাশ

করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত কর। ইংরেজের অনেক আইন আছে—আমায় বিয়ে কর, অন্ততঃ যে নিরপরাধ পৃথিবীতে আস্‌ছে তার মুখ চেয়ে। আরে পাগল খাও দাও নৃত্য কর; অত বাঁধাবাঁধির ভেতর কেন বাবা?" ম্যানেজার হাসিয়া বলিল, "তার পর?"

"তার পর আর কি? এই দারুণ বিচ্ছেদ।" আচ্ছা তা ত' হল, মেয়েটাকে এই গ্রীণরুমে রাখার অর্থ কি? এটা ত কিণ্ডারগার্ডেন নয়।"

"নয় কে বল্‌ল? একটু বড় হলেই হয়ত এতে ঢোকাবে, তাই মতলব।"

"ভাল" বলিয়া লোকটা বিদায় হইল, ইন্দুও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

তার পরের ঘটনা ইন্দুর ঠিক মনে নাই, শুধু মনে পড়ে কি একটা শব্দ, শত শত লোকের আকস্মিক উল্লাসধ্বনি। তাহার আতঙ্কে পলায়ন, রোষ-কষায়িত নেত্রে ম্যানেজারের তৎপ্রতি ধাবন, জননীর সহিত ম্যানেজারের বিষম বিতর্ক, অবশেষে জননীর প্রসারিত বাহুমধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া তাহার আকুল ক্রন্দন। জননীর সেই দৃপ্ত মহিমান্বিত মূর্ত্তি, সেই আকুল মমতার আলিঙ্গন, সেই গভীর স্নেহভরা দৃষ্টি—যখন-তখন তাহার মনে পড়িত।

(২)

তার পর দশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতিদেবী তাহার সর্ব্ব অঙ্গে ধীরে ধীরে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের তুলিকা-সম্পাত করিতেছিলেন। স্বভাবতঃই সে স্বল্পভাষিণী, সঙ্গিনীদের সহিত ক্রীড়া-কৌতুকে সে তেমন মিশিত না, সে বিষয়ে তার তেমন উৎসাহও ছিল না। প্রভাত-ম্লান শেফালিকার ন্যায় সে মুখখানি সঙ্গিনীদের হাস্যকৌতুকে কখনও কখনও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত মাত্র।

সাত বৎসর বোর্ডিংয়ে ক্রমান্বয়ে একই ভাবে অবস্থিতি, তাহার শৈশব-চিত্তের এই অস্বাভাবিক উদ্যমহীনতার অন্যতম কারণ। সে কে, কোথায় তাহার ঘর-দেশ,* কি তাহার বংশ-পরিচয়—কিছুই সে জানিত না। সে এক ধনবতী বিধবা ব্রাহ্মিকার অন্যতমা কন্যা এই মাত্র; ইহার অধিক সম্বাদ কেহ রাখিত না। স্কুলের বন্ধের সময় প্রায় সকল ছাত্রীই দেশে যাইত, তাহাকে কেহ লইতে আসিত না; সে সেই নির্জ্জনপ্রায় বোর্ডিংয়ে কোনও রূপে দিন কাটাইয়া দিত। তবু এই নিতান্ত 'একঘেয়ে' জীবনে মাঝে মাঝে বৈচিত্র্য ছিল। তাহার জননী তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া কখনও এক, কখনও দুই, কখন বা তিন দিন পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিতেন। মাতার সে

গভীর মমতাপূর্ণ দৃষ্টিতে, সে সাগ্রহ আলিঙ্গনে বালিকার সুপ্ত প্রাণ শিহরিয়া উঠিত, তাহার ক্ষুধিত চিত্ত কতকটা শান্ত হইত; বালিকাও সময় সময় আকুল উচ্ছ্বাসে মার বুকে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিত; কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই অন্তরতম অন্তরের সে ক্ষণিক দুর্ব্বলতার কথা স্মরণ করিয়া সে লজ্জিত হইয়া উঠিত।

কি জানি কেন, শিহরিয়া সে সরিয়া যাইত, তাহার চিত্তের সব ক্ষুধা মিটিত না, অন্তরের দৈন্য আরও যেন তাহার বুকে চাপিয়া বসিত। তার পর প্রতিবারই বিদায়ের মুহূর্ত্তে জননীর সেই অত্যধিক স্নেহাভিব্যক্তিতে, সেই অত্যধিক আদর-সোহাগে বালিকা ক্লিষ্ট হইয়া উঠিত এবং জননীর বিদায়-গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই সে সেই বহুমূল্য রাশি রাশি ক্রীড়নক সঙ্গিনীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিত।

সাত বৎসরের পর সেবার ছুটিতে প্রমদা তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিল।

জ্ঞান হইয়া অবধি ইন্দুর কলিকাতায় এই প্রথম আগমন। গঙ্গার ধারে ছবির মত সে বাড়ীখানিতে প্রথম হইতেই তাহার মন টিকিয়া গেল। ত্রিতলের ছাদ হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত উন্মুক্ত গঙ্গাবক্ষ এবং সহরের উত্তরাংশ দেখা যাইত। বালিকা আপন মনে বসিয়া বসিয়া তাহাই দেখিত, কোনও কোনও দিন বা ঘরের গাড়ীতে মার সহিত বেড়াইয়া আসিত। দিনের পর দিন এই ভাবে কাটিতে লাগিল।

এক দিন তন্দ্রাঘোরে কি যেন একটা কলরব, কাহার উচ্চ আহ্বান-ধ্বনি তাহার কাণে গেল। ও কার কণ্ঠস্বর? কি এক অজ্ঞাত কারণে বালিকার মনে বহুদিন পূর্ব্বের একটা ঘটনা মনে পড়িয়া গেল;—সেই সক্রাক্রলাঞ্ছিত পাটল গুম্ফ—সেই কি? তন্দ্রাঘোরে বালিকা শিহরিয়া উঠিল।

"চুপ!" তাহার মা যেন বলিতেছিল, "চুপ! ইন্দু ঘুমুচ্ছে পাশের ঘরে।" তার পরই কে যেন অতি সন্তর্পণে তাহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া পুনরায় নিঃশব্দপাদসঞ্চারে অপসৃত হইল।

"তোমায় আমার কাছে আস্‌তে এত করে নিষেধ করে দিয়েছি—তবু তোমার আসার অর্থ কি"?—তাহার মাতার স্বর মৃদু, কিন্তু কর্কশ, অতি তীক্ষ্ণ।

"ইস্! একেবারে চাঁদবিবি যে!"

"আস্তে!—কি চাও তুমি?"

"মেয়েটা কেমন আছে ?"

"সে খবরে তোমার কোনও প্রয়োজন নেই।"

"নেই, তাই ত !" লোকটার চাপা হাসির শব্দ ইন্দুর কাণে গেল। সেই হাসিতে বহুদিনের বিস্মৃত কি যেন একটা ঘটনা আবার তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে অস্পষ্টভাবে ঘুরিতে লাগিল। লোকটা যেন বলিতেছিল—

"তার ওপর আমার অর্দ্ধেক অধিকার তা জান ত ?"

"কখনই নয়। সে আমার—সম্পূর্ণ আমার—আমারই।"—তার পর থামিয়া,—কি চাও তুমি এখন ?"

"কিছু না, শুধু তোমায় দেখতে এসেছি।—ভাবলাম হয়ত. পুরাণো দিনের কথা ভেবে এই ৭।৮ বছর পরে দেখাসাক্ষাতে তুমি খুসীই হবে।"

"তোমায় দেখে খুসী ? জোচ্চোর, স্বার্থপর, আমার ইহপরকাল খেয়েছ—তোমায় দেখে খুসী !"

"কিন্তু প্রমদা——"

"বাস্—আর একটি কথাও না।"

"দেখ যা হবার তা হয়ে গেছে, এখন"—

"তা জানি—সে আমার কর্ম্মফল। কিন্তু তোমার সঙ্গে আলাপে আমার আর প্রবৃত্তি নেই, বিশেষতঃ তুমি এখন মাতাল—আমার বাড়ী থেকে বিদায় হও।"

"যাচ্ছি, যাবই ত। এত তাড়াতাড়ি কিসের ? আর কেউ বুঝি—"

"নরাধম, সে প্রবৃত্তি আমার নেই। আর হলেই বা, তোর তাতে কি ?" তার পর অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে,—"দেখ, কোনও কালে তোমার আমার সঙ্গে কোনও রকম সম্বন্ধ ছিল সে কথা ভুলে যাও, বাইরে কখনও কোথাও দেখা হলে আমায় চিন্‌তে এসো না, আমিও তোমায় চিন্‌ব না ; আর, এ বাড়ীর চৌকাট কখনও মাড়িও না। বুঝ্‌লে ?—এখন যাও।"

"তা যাচ্ছি,—কিন্তু একটা কথা আজ বল্‌তে এসেছিলাম, শোন। আমি হেনা থিয়েটারের ম্যানেজারের কাছ থেকে আসছি। তারা এক জন ভাল অভিনেত্রী চায়—তুমি যদি সেখানে যাও ত তারা মাসে দু'শ টাকা দিতে পারে।"

"আমি দু'শ'ই পাচ্ছি।"

"আচ্ছা না হয় সওয়া দু'শ। তার পর মেয়েটাকে যদি তুমি নিজে হাতে তৈরী করতে পার, তা হলে কোন্ না আরও গোটা পঞ্চাশ হবে।

"মেয়েটা?" মুহূর্ত্তমাত্র স্তব্ধ থাকিয়া প্রমদা গর্জ্জন করিয়া উঠিল—"না, না। ইন্দুকে এই কাজে? ভগবান না করুন। তার আগে নিজে হাতে তাকে গলা টিপে মার্‌ব। আমি যে এ কাজে আছি তা পর্য্যন্ত তাকে জানতে দিই নি। তাকে এই নরকে? কখনই নয়। মাসে লক্ষ টাকার বিনিময়েও নয়।"

"এটা থিয়েটার নয় প্রমদা, বক্তৃতা মাঠে মারা যাচ্ছে। ভাল, তুমি সে পঞ্চাশ ছাড়তে পার, তোমার পয়সা আছে। কিন্তু আমি গরীব আমি তা পারি না। মেয়েটাতে তোমার যা অধিকার, আমারও ঠিক তত খানি অধিকার—তুমি তাকে না নিয়ে যেতে চাও, আমি যাব।"

"কি? তুমি?' দূর হও আমার বাড়ী থেকে।"

"কখনই না—কোথায় সে আছে, আমি দেখব।"

"এখনই দূর হও—নইলে দরোয়ান ড়াকব।

"তাই নাকি?" তার পর কি যেন একটা অর্দ্ধস্ফুট আর্ত্তনাদ এবং স্থূল দ্রব্যপতনের শব্দ ইন্দুর কাণে গেল; তার পরই সব নিস্তব্ধ!

ইন্দু শশব্যস্তে উঠিয়া বসিল, চারিদিক নির্জ্জন নিস্তব্ধ; ঘড়িটার টিক্ টিক্ শব্দ শুধু কাণে বাজিতেছিল। সহসা তাহার ঘরের দরজা খুলিয়া গেল—কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল, "বেটি, আমি তোর বাপ——লোকে স্বীকার করুক আর নাই করুক। এক দিন আমি আবার আসব, এসে তোকে নিয়ে যাব।" বলিয়া লোকটা যেমন আসিয়াছিল যেমনই চলিয়া গেল।

ভয়ে আতঙ্কে বালিকা মন্ত্রাবিষ্টের ন্যায় পালঙ্কের উপর বসিয়া কাঁপিতে লাগিল। ঈষন্মুক্ত দ্বারপথে জননীর কক্ষের বাতিদানের আলো আসিতেছিল—সেই দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। পিতা? তিনি ত' বহুকাল মৃত—মা'র কাছে সে শুনিয়াছে। তবে এ কে? বুঝি স্বপ্নের কোনও বিভীষিকা! তার পর তন্দ্রাঘোরে, বালিকার মনে হইল সে যেন উঠিয়া উন্মুক্ত দ্বারপথে পার্শ্বের কক্ষে দৃষ্টিপাত করিল। সে দেখিল তাহার মাতার সংজ্ঞাহীন নিস্পন্দ দেহ ভূমিতলে পতিত—মুখে এবং গাত্রবস্ত্রে শোণিতের ধারা! বালিকা চীৎকার করিয়া মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে ইন্দু দার্জ্জিলিংয়ে ফিরিয়া গেল—ডাক্তারের নিষেধে মার সহিত আর সাক্ষাৎ ঘটিল না।—মাসখানেক পর বোর্ডিংয়ে সাক্ষাৎকালে ইন্দু

দেখিল, মার এক চক্ষু কৃত্রিম প্রস্তরময়, কিন্তু অপর চক্ষু দিয়া গভীর মাতৃস্নেহ যেন দ্বিগুণ আবেগে প্রকাশ পাইতেছিল।

(৩)

দূর হইতে সব জিনিসকেই সুন্দর এবং মনোরম বলিয়া মনে হয়। সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, বিশেষতঃ আবাল্য সংসার হইতে দূরে থাকিলে সংসারে প্রবেশ করিবার সময় সংসারটাকে বড় লোভনীয়, বড় রমণীয় বলিয়া মনে হয়। বোর্ডিংয়ের শিক্ষা-সমাপনান্তে ১৯ বৎসর বয়সে ইন্দুও তাহাই ভাবিতেছিল। আজ এই কর্ম্মহীন বৈচিত্রহীন জীবনের পরিসমাপ্তি! কাল হইতে সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ—সংসারের সহিত পরিচয়। এত দিন জড়ত্বের পর কাল হইতে কর্ম্মের চেতনা! সুপ্তির পর জাগরণ, কারার পর মুক্তি!——ইন্দু কল্পনায় কত কথা ভাবিতেছিল; কিন্তু সে সব ভাব অস্পষ্ট, বিক্ষিপ্ত, কোনও একটা সংকল্পকে কেন্দ্র করিয়া স্থির স্পষ্টরূপে কোনও ভাব তাহার চিত্তে জাগরূক ছিল না।

সৌন্দর্য্য, শিক্ষা, শীলতা কিছুরই তাহার অভাব ছিল না—অজ্ঞাত-জন্ম-পরিচয় বালিকা, আপনাকে অপর সঙ্গিনাদের ন্যায় মনে করিত। সমাজের দশ জনের ন্যায় সমাজে তাহারও সমান স্থান, সংসারের সুখস্বাচ্ছন্দ্যে তাহারও সমান অধিকার—তাহাই সে ভাবিত।

তাহাদের ছুটির পূর্ব্বদিন ইন্দু একখানি পত্র পাইল—১৯ বৎসরের মধ্যে এই তাহার নামে প্রথম পত্র। মাতার হস্তাক্ষরের সহিত পরিচয় না থাকিলেও ইন্দু সাগ্রহে খাম খুলিয়া ফেলিল। প্রমদা জানাইয়াছিলেন, তিনি পরদিন কন্যাকে লইয়া যাইবার জন্য নিজে আসিতেছেন।—কিন্তু এ কি পত্র? অতি কষ্টে ধরিয়া ধরিয়া লেখা আঁকা বাঁকা দুইটি মাত্র ছত্র, তাহাতে অসম্ভব বর্ণাশুদ্ধি কালির ছাপ!—ইন্দুর নিজের প্রথম শিক্ষার কথা মনে পড়িল—মাতাকে সে অন্ততঃ নিজের ন্যায় শিক্ষিতা মনে করিত—আজ তাহার সে বিশ্বাস চূর্ণ হইয়া গেল, অন্তরে সে একটা ব্যথা অনুভব করিল।

সাত বৎসর পর ইন্দু পুনরায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। পাঁচ বৎসর মার সহিত তাহার সাক্ষাৎ ঘটে নাই। এই দীর্ঘ ব্যবধানেও মা'র সেই সুগঠিত দেহাবয়বে এবং মুখে কালের কোনও ছায়াপাত সে বুঝিতে পারিল না। কিন্তু বালিকা সেই কৃত্রিম চক্ষু যখনই দেখিত, তখনই কি যেন একটা ঘৃণায়

তাহার চিত্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিত। বাহিরে তাহার প্রকাশ না থাকিলেও অন্তর হইতে সে ভাব সে দূর করিতে পারিত না। তার পর, আবার মাতার আদর। সে স্নেহ ক্রমশঃ উপচিত-রস হইয়া তাহাকে অধিকতর আগ্রহে আপ্লুত করিতে চাহিতেছিল। সে স্নেহের আতিশয্যে বালিকা হাঁফাইয়া উঠিত। তবু মাতার মনঃক্ষুণ্ণতার আশঙ্কায় তাঁহার কাছে আপন মনোভাব কোনও দিন সে প্রকাশ করে নাই। এই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল। তৃষিত-হৃদয়া জননী সর্ব্বদা কন্যাকে চোখে চোখে রাখিতে চাহিতেন। স্নেহের সে অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া কন্যা আবাল্যের গণ্ডী কাটিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল, এত দিনের কর্ম্মহীনতার পর জীবনের কর্ম্ম খুঁজিয়া লইতে চাহিতেছিল। তাহার সমগ্র প্রাণশক্তি এত দিনের মূক চিন্তা লইয়া আজ বিশ্বের সহিত আপনার সংযোগ-লাভের জন্য আকুল হইয়া উঠিয়াছিল।

সে দিন বৈকালে ইন্দু আনমনে পথের দিকে চাহিয়াছিল। একটা লোক রাস্তার অপর পার্শ্বে দেওয়ালে থিয়েটারের একখানা বিজ্ঞাপন আঁটিয়া চলিয়া গেল। ইন্দু পড়িল—

"বিজলি থিয়েটার

অপূর্ব্ব অভিনয়! অদ্ভুত রহস্য!

ভারতে এই নূতন!

বরুণ-কুমারী

নূতন অপেরা! সৌন্দর্য্যললামভূতা নূতন অভিনেত্রী।

এরূপ অভিনয় কখনও হয় নাই; কখনও হইবে না।"

প্রমদা কাছেই বসিয়াছিল। ইন্দু বলিল—"মা, চল না এক দিন কোথাও যাই ?"

"কোথায় যাবে ইন্দু ? কেন, এখানে আমার কাছে কি তোমার মন টিকৃছে না ?"

ইন্দু সে উত্তরে লজ্জিত হইল; বলিল "না তা বল্‌ছিনে। তবে সমস্ত জীবনটা স্কুলেই কাটিয়ে এলাম। কখনও কোথাও যায়নি, কিছুই দেখিনি,—তাই বলছিলাম। এক দিন চল না থিয়েটারে যাই।"

"থিয়েটারে ? না, না, ইন্দু থিয়েটারে নয়। বেড়াবার কত জায়গা আছে, দেখবার কত জিনিষ আছে—মাঝে মাঝে তোমায় নিয়ে যাব এখন। কিন্তু থিয়েটার!"——প্রমদা যেন শিহরিয়া উঠিল। "না মা, তোমার মত মেয়ের

থিয়েটারে যাওয়া উচিত নয়—সে হতেই পারে না" বলিয়া প্রমদা কন্যাকে আপনার বক্ষে টানিয়া লইলেন। ইন্দু দেখিল তাহার মাতার চক্ষু আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে; কারণ কি তাহা বুঝিল না—কিন্তু সে প্রসঙ্গ সে আর উত্থাপন করিল না। প্রমদা কন্যার মুখের দিকে চাহিল—তাহার শিক্ষা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য এতাবৎ কাল সে অর্থব্যয় করিতে কথনও কুণ্ঠিত হয় নাই—তবে তার কিসের অভাব?

কিন্তু যৌবন-জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র চিত্তবৃত্তি যে চরম সার্থকতা লাভ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠে, যে কোনও একটা লক্ষ্যকে অবলম্বন করিয়া কর্ম্মের মধ্য দিয়া চেতনার সাড়া পাইতে চাহে—বিগতপ্রায়-যৌবন প্রমদা সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।—অর্থের প্রাচুর্য্য যে ক্ষুধিত আত্মার সে তৃষা মিটাইতে পারে না, সে কথা সে বুঝিতে পারিতেছিল না।

ইহার কিছু দিন পরে এক দিন সন্ধ্যার পর প্রমদা 'বিশেষ কাজে' একা বাহির হইয়া গিয়া গভীর রাত্রে বাড়ীতে ফিরিল। তার পর প্রতি সপ্তাহেই এরূপ করিতে লাগিল। সঙ্গিহীন ইন্দু নিস্ফল ক্ষোভে ফুলিতে থাকিত।

সেদিন শনিবার, প্রমদা বাড়ীতে নাই। এক জন আগন্তুক তাহার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিল। তাহার সহিত সাক্ষাৎ? ইন্দু বিস্মিত হইয়া নীচে নামিয়া গেল। সে কি মূর্ত্তি! নীচতা, স্বার্থপরতা, ক্রূরতা, যেন সে মুখে জীবন্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছিল। তাহার উপর, তাহার মুখ হইতে কি একটা তীব্র গন্ধ নির্গত হইতেছিল।—বহু দিন পূর্ব্বে তন্দ্রাঘোরে দৃষ্ট এমনই একটা স্বপ্নের কথা ইন্দুর অকস্মাৎ মনে পড়িয়া গেল।

লোকটা অগ্রসর হইয়া বলিল—"আমাকে তুমি চেন?"

স্বপ্নচকিতের ন্যায় ইন্দু স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল—"হাঁ চিনি। আপনি আমার পিতা।"

"ঠিক! এই ত কথা! কিন্তু মাগী তবু আমাকে আমল দেয় না।—যাক্ সে কোথায়? থিয়েটারে বুঝি?"

"থিয়েটারে? কে?—মা?"

"কেন, জান না বুঝি?—তার এখন পোয়া বারো, মাসে চার শ' খানি——আর আমরা বাবা থিয়েটারের ঘুঘু—এক বোতল রমের জন্যে কি না লোকের কাছে হাত পাত্‌তে গিয়ে লালপাগড়ীর গুঁতো খেয়ে মরি?—বরাত বাবা বরাত, নইলেই বা তার সঙ্গে মা চটাচটি ঘটবে কেন?"

ইন্দু স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল। লোকটা জড়িতস্বরে বলিতে লাগিল—"কেন, রাস্তায় রাস্তায় প্লাকার্ড দেখনি? "বরুণকুমারী! জল-কেলি হাঃ হাঃ হাঃ!"

ইন্দু এতক্ষণে বুঝিল তাহার মা—থিয়েটারের প্রতি একান্ত বিরোধী——তাহার মা স্বয়ং একজন অভিনেত্রী!—আর এই নীচ মন্তপ—তাহার পিতা! তাহার সর্ব্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। তাহার আজীবনের বিশ্বাস, শিক্ষা, নীতির বাঁধ—সবই বুঝি নিমেষে চূর্ণ হইয়া যায়!

ধীরে ধীরে কুয়াসাজাল অপসৃত হইতেছিল। অতি শৈশবের শ্রীমন্নমের সে অস্পষ্ট ছবি, পরবর্ত্তী কালের আরও কত ঘটনা, তাহার মাতার মাঝে মাঝে মফঃস্বলে অবস্থিতি, প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় বহির্গমন—আর তাহার সন্দেহ রহিল না। কিন্তু তাই যদি—তাহার কাছে এ সব কথা গোপন রাখার অর্থ কি?

ইন্দু মুখ না তুলিয়াই ধীর স্বরে সুধাইল—"মার পার্ট কি?"

"পার্ট?—তা নইলে আর বলছি কি? পার্টের 'প'ও নেই—শুধু চেহারাখানি, গড়ন-পিটনখানি দেখিয়ে—চার চার শ'খানি!"

ইন্দুর চক্ষু হইতে জগতের সব আলো যেন নিভিয়া গেল। তাহার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে সে আর কোনও জিনিসের ধারণা করিতে পারিতেছিল না। লোকটাকে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া কতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল।

বহুদিন আগে স্কুলে হেমবাবুর একটা কবিতা পড়িয়াছিল, তাহার কয়েক ছত্র কেবলই মনে পড়িতে লাগিল—

"ছিন্ন তুষারের প্রায় বাল্যবাঞ্ছা দূরে যায়
তাপ-দগ্ধ জীবনের ঝঞ্ঝাবায়ু-প্রহারে,
পড়ে থাকে দুরাগত জীর্ণ চীর আশা যত
ছিন্ন পতাকার মত ভগ্ন দুর্গপ্রাকারে।"

তখন এ কবিতার ঠিক অর্থ সে বুঝে নাই, আজ বুঝিতেছিল।

"বরুণকুমারী!" জল-কেলি!"—ইন্দুর সমস্ত চিত্ত বিদ্রোহী উঠিতেছিল। বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, বিস্মিত দ্বারবানকে দিয়া গাড়ী ডাকাইয়া, সে থিয়েটারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন একটা অঙ্ক হইয়া গিয়াছে।—নাচ গান, 'ছেঁদো কথা'র বক্তৃতা, নীচে দর্শকগণের করতালি, মাঝে মাঝে শ্লীলতাবর্জ্জিত মন্তব্য-প্রকাশ—এই থিয়েটার! ইন্দু ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিল। তার পর সে যাহা দেখিল—তাহা তাহার স্বপ্নের, কল্পনারও অতীত!

দৃশ্য—কাঞ্চীর প্রশান্ত সরোবর। স্নানার্থিনী এক তন্বী যুবতী ঘাটে আসিয়া ধীরে ধীরে একে একে বেশ উন্মোচন করিতে লাগিল। সহসা ষ্টেজের সমুদয় আলোক নির্ব্বাপিত হইল, মৃদু রঙ্গীন আলোকে গুণ্ঠনাবৃতা বিগতবসনা নগ্নপ্রায়া নারীর জলকেলি, তাহার অপূর্ব্ব সুঠাম অঙ্গের বিচিত্র সঞ্চালন,—দর্শকবৃন্দ স্তব্ধভাবে দেখিতে লাগিল।—সে অঙ্গের প্রতি সঞ্চালন যে ইন্দুর চির-পরিচিত! ঘৃণার ক্ষোভে লজ্জায় ইন্দুর সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছিল! ভগবানের দান ঐ সুঠাম দেহকে শত সহস্র দর্শকের লালসালোলুপ দৃষ্টির উপভোগের সামগ্রী করিয়া যে রমণী এরূপ নির্লজ্জতার পরিচয় দেয়—সে রমণী—এই বার-নারী—সে কি তাহার জননী?

সহসা একটা বিকট চীৎকারে রঙ্গস্থল কম্পিত হইয়া উঠিল। তার পর ঘন ঘন করতালি, শ্লীলতাবর্জ্জিত মন্তব্য এবং উচ্চ পরিহাসে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। ইন্দু চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল—তাহার মনে হইতেছিল ছুটিয়া গিয়া রমণীর মুখাবরণটা খুলিয়া দিয়া সাধারণের সহিত তাহার নির্লজ্জতার পূর্ণ পরিচয় করিয়া দেয়।

(৪)

ইঞ্জিনের গতি সম্মুখে যেমন, পিছনেও ঠিক সেইরূপ। ইন্দুর অবস্থা তাহাই হইয়াছিল। গর্ভধারিণী জননীর সে নির্লজ্জতার ছবি যে মুহূর্ত্তে তাহার দৃষ্টিপথে পড়িল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার এত দিনের নৈতিক শিক্ষা ফুৎকারে উড়িয়া গেল। এত দিনের চেষ্টায়, প্রযত্নে তিল তিল করিয়া যে সংযম, যে রমণীসুলভ লজ্জা ও শীলতা তাহার চিন্তায় কার্য্যে ব্যবহারে ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছিল, সেগুলি সে আজ মৃৎপিণ্ডময় জননীর চরণে জলাঞ্জলি দিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে আবাল্যের শিক্ষার 'পালিশ' টুকু উঠিয়া গিয়া—নীচের কর্কশতা, পিতলব্ধ পশুত্ব সহসা প্রকাশিত হইয়া পড়িল।—ইঞ্জিন পিছনের দিকে ছুটিতেছিল।

অতঃপর, প্রমদার অনুপস্থিতিকালে, তাহার পিতা প্রায়ই তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়া, প্রতিবারই জড়িত স্বরে অর্থহীন আত্মম্ভরিতা এবং নিজের দৈন্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিত: ইন্দু প্রতিবারই অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় করিত; কিন্তু সংসারকে সে অন্য দিকে দেখিতে শিখিতেছিল।

এক দিন পিতা বলিল—"দেখ, তুমি থিয়েটারে ঢোক না কেন?"

ইন্দুর এমনই একটা কথা কয় দিন হইতে মনে হইতেছিল। কিন্তু কোন্ স্বর্গ হইতে কোন্ নরকে—যা'ক! তা'র আবার স্বর্গ কি? সে ত নরক হইতে উদ্ভূতা।

"আমি পারব কি?"

"কেন পারবে না? ঐ মুখ ঐ কাঠামো—থিয়েটারে আগুণ ছুটে যাবে। বল ত আমি বন্দোবস্ত করে দিই। কিন্তু শেষে এই গরীব বাপকে ভুল না।" ইন্দুর মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। ইন্দু উত্তর দিল না—সে কি ভাবিতেছিল।

ইহার কয়েক দিন পরে এক দিন তাহার পিতা—থিয়েটারের ম্যানেজারকে সঙ্গে লইয়া ইন্দুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথাবার্ত্তা ঠিক করিয়া গেল—বেতন আপাততঃ মাসিক ত্রিশ মুদ্রা।

(৫)

রজনীর অন্ধকারে আনন্দ ও হতাশা, হাসি ও অশ্রু মাঝে শুধু নামমাত্র একটা ব্যবধান লইয়া পাশাপাশি জাগিয়া থাকে। কোথাও ভগবানের অংশস্বরূপ মানব বোতল-বাহিনীর আরাধনা করিয়া 'খানার শায়িত'; কোথাও ভদ্র মজলিসে সঙ্গীতকলার চর্চ্চা; কোথাও বিলাসী ধনী বার-নারীর চরণে অগাধ ঐশ্বর্য্য ঢালিয়া দিতেছে; কোথাও ধর্ম্মভীরু দরিদ্র দম্পতী অনশনে বা অর্দ্ধাশনে সুদীর্ঘ রাত্রি কাটাইতেছে; কোথাও উন্মত্ত-প্রণয়-লীলায় রক্তের নদী প্রবাহিত হইতেছে; কোথাও নবীন দম্পতী সংসারের পুণ্যক্ষেত্রে কত সুখ-আশা কল্পনা করিতেছে। কোথাও শীলতা, শ্লীলতা ও সভ্যতাবর্জ্জিত দানবী-লীলা; কোথাও পুণ্যের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ, মানবে দেবত্বের বিকাশ; কিন্তু দুই-ই পাশাপাশি রহিয়াছে—মাঝে একটা ক্ষীণ প্রাচীরের ব্যবধান মাত্র।

কক্ষের মধ্যে মাতালটা পড়িয়া গোঙাইতেছিল। আর মাঝে মাঝে করধৃত তীক্ষ্ণধার ছোরাখানা লইয়া কাহাকে যেন শাসাইতেছিল। অবশেষে ক্লান্ত হইয়া, ক্রমে ক্রমে গাঢ় তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িল।

দ্বার উন্মুক্ত হইল। অবগুণ্ঠনাবৃতা এক রমণী কক্ষে প্রবেশ করিয়া সভয়ে কয়েক পদ পিছাইয়া গেল।—ও কে?—উত্যক্তা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় প্রমদা লোকটার প্রতি চাহিয়া গর্জ্জিতে লাগিল।—এই পিশাচ তাহার বাড়ীতে কেন? তাহার সমস্ত জীবনে হলাহল ঢালিয়া, নিরপরাধিনী এক বালিকাকে চিরজীবন সমাজ হইতে বঞ্চিতা করিয়া, পিশাচ আজও আনন্দে দিন কাটাইতেছে!

প্রমদার চক্ষে স্ফুলিঙ্গ ছুটিল—ঐ ত ছোরা পাশেই পড়িয়া রহিয়াছে—এক মুহূর্ত্তের কথা মাত্র। তবে আর কেন?

সহসা ইন্দুর কথা মনে পড়িল। লোকটা কি তবে অন্য কোনও উদ্দেশ্যে আসিয়াছে? চকিতা হরিণীর ন্যায় প্রমদা উপরে ছুটিয়া গেল। শূন্য কক্ষ—কোথায় ইন্দু? প্রমদা কাঁপিতে কাঁপিতে অবসন্নভাবে বসিয়া পড়িল। সহসা তাহার শরীরে অমানুষিক শক্তির সঞ্চার হইল। মুহূর্ত্তে ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে লোকটাকে ধরিয়া ঝাঁকুনি দিয়া—তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় সে?—কোথায় সে?" নারীত্বের চিহ্নমাত্র এখন তাহাতে ছিল না; একটা ভীষণ পশু-প্রকৃতি, তীব্র প্রতিহিংসার ভাবে তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।—"কোথায় সে? বল্"—

"আসুক না সে বেটা, খুন করব বাবা—চালাকিটি নয়"—বলিয়া লোকটা পুনরায় তন্দ্রাবিষ্ট হইল।

প্রমদা আর থাকিতে পারিল না। দুই হাতে সজোরে লোকটার গলা চাপিয়া ধরিল; তবু তাহার তন্দ্রা ছুটিল না। "কোথায় সে—বল্, নইলে খুন করব।"

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই যেন প্রমদার প্রশ্নের উত্তরে দ্বার খুলিয়া গেল। ইন্দু প্রথমটা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল, তার পর টলিত-চরণে কক্ষে প্রবেশ করিয়াই উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল—তাহার চক্ষে অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ, কপোলদ্বয় আরক্তিম, মুখে তীব্র গন্ধ।

প্রমদা চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। "কে ইন্দু!—কোথায় গিয়েছিলে মা?"

"তোমার তা'তে প্রয়োজন?" ইন্দু দেওয়াল ধরিয়া আপনাকে সামলাইয়া লইল—"আমি গিয়েছিলাম কাজে—ফুর্ত্তি করতে।"

প্রমদা স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার চক্ষু হইতে সমস্ত আলো নিমেষে সরিয়া গেল; স্নেহ, বিশ্বাস—ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইল। সমস্ত উৎকণ্ঠা-উত্তেজনা একে একে মিলাইয়া গেল। প্রমদা কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া আসিয়া কন্যার দিকে ফিরিয়া ধীর সুরে সুধাইল—"তুমি একা গিয়েছিলে?"

"না। ব—থিয়েটারের ম্যানেজার এসে আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন। কি করব?—কোনও দিন তুমি আমায় কোথাও নিয়ে যাওনি, আমাকে চিরদিন বন্ধ ক'রে, বন্দিনী ক'রে রাখবার মতলব করেছিলে। কিন্তু আমি আজ মুক্তি পেয়েছি,—ইংরেজের আইনে আমার এখন স্বাধীনভাবে কাজ

করবার জায়গা হয়েছে—আর তুমি আমায় আটকে রাখতে পার না।—ম্যানেজার বলেছেন আপাততঃ ত্রিশ পাবে, পরে পাঁচ শ পর্য্যন্ত হতে পারে। "বুঝেছ" বলিয়া ইন্দু হাসিয়া উঠিল।

প্রমদা স্থিরভাবে শুনিল।—তোমার যে তার বা আর কারও সঙ্গে পরিচয় আছে—আমি তা এত দিন জানতাম না।"

"আগে ছিল না। সপ্তাহখানেক আগে বাবা এক দিন তাঁকে এনে পরিচয় করিয়ে দেন। বাবা ত প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই আজকাল আস্‌ছেন—তুমি ভাব চাকর-দারোয়ান রয়েছে, বাড়ীর সব খবরই তুমি রাখ! হাঃ হাঃ—! দেখ একটা কথা আজ তোমায় বল্‌ব—যে যা, সে তাই হবে, তাতে হাজারই পালিশ দাও, হাজারই রং চং লাগাও। অনর্থক এতগুলা টাকা আমার পেছনে কেন খরচ করতে গেলে? আমি 'ভদ্র-মহিলা?' হাঃ হাঃ পিশাচ আর এই বারনারী—এদের মেয়ে,'মহিলা'?—কি ধৃষ্টতা!"

ইন্দু দ্বারপথে অপসৃত হইল। প্রমদা স্থিরনেত্রে একবার লোকটার প্রতি চাহিল, তার পর ছোরাটা তুলিয়া লইয়া আপন অঙ্গুলিতে তাহার ধার পরীক্ষা করিয়া দুই এক পদ অগ্রসর হইল—"না, এই ওর চরম শাস্তি নয়—প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ ক'রে তবে ওকে মর্‌তে হবে।"—

বাহিরের ঘরে কক্ষের বাতিদান থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। নিস্পন্দ নেত্রে প্রমদা তাহার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া কত কথা ভাবিতেছিল।—তাহার জীবনের সমস্ত ঘটনা, সুখ-দুঃখ, কন্যার কথা—তাহার ভবিষ্যতের সুখ-আশা-কল্পনা, একে একে তাহার মনে পড়িতেছিল। কত ক্ষণ—প্রায় এক যুগ—এই ভাবে কাটিল। তার পর দ্বারপ্রান্তে প্রণত হইয়া যোড়করে অর্দ্ধস্ফুট-স্বরে সে বলিল—"ভগবন!—প্রভো পাপ কি পুণ্য জানি না—তুমি তার বিচার ক'রো—কিন্তু এ কাজ তারই মঙ্গলের জন্য, তারই আত্মার কল্যাণ-কামনায়—এতে পাপ হয় সে শাস্তি আমায় দিও।"

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে যখন ফিরিয়া আসিল, তখন তাহার হস্তের ছুরিকা রক্তাক্ত—চক্ষে এক অস্বাভাবিক জ্যোতিঃ। কত ক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া প্রমদা আপনার রক্তমাখা হাতের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল; তার পর ছোরাটা সজোরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কক্ষমূলে লুটাইয়া লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে প্রাঙ্গণে কিসের কলরব—কাহাদের দ্রুতপদধ্বনি শোনা যাইতেছিল।

প্রমদা চকিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। তার পর অর্গল বন্ধ করিয়া রক্তাক্ত ছোরাটা তুলিয়া লইয়া, লোকটার দিকে অগ্রসর হইয়া, অমানুষিক শক্তিতে ছোরাটা আমূল আপনার বক্ষে বিদ্ধ করিয়া, সজোরে টানিয়া লইয়া জীবনের শেষ শক্তির সহিত যুঝিতে যুঝিতে নিদ্রাতুর লোকটার হাতের উপর সে ছোরাটা রাখিয়া চির-নিদ্রায় শয়ান হইল।

বাহির হইতে লোকেরা বহুক্ষণের চেষ্টায় দ্বার ভাঙ্গিয়া যখন কক্ষে প্রবেশ করিল, তখন মাতালের তন্দ্রা ছুটিয়া গিয়াছে। রক্তাক্ত ছোরাটা দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সদ্য-বিগতপ্রাণ নারী-দেহের প্রতি সে ভীতিব্যাকুলনেত্রে চাহিয়া রহিয়াছে।

বৈষ্ণব।

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

হে বৈষ্ণব! কণ্ঠে তব তুলসীর মালা,
অঙ্গবাসে অগুরু-চন্দন,
প্রশস্ত ললাটে আঁকা ধূমকেতু-সম
ঊর্দ্ধ-পুণ্ড্র অতীব মোহন।

হরিনাম ঝুলি করে জপ স্তবমালা,
কক্ষতলে অজিন আসন,
শিরে দোলে বৈজয়ন্তী, বক্ষে হরিনাম,
ধ্যানমগ্ন স্তিমিত নয়ন।

অনাসক্ত জিতেন্দ্রিয় প্রদীপ্তভাস্কর,
স্বার্থ-শূন্য নিষ্কাম জীবন,
বিত্ত তব গঙ্গোদক আর কমণ্ডলু,
বাসস্থান স্নিগ্ধ তপোবন।

রাধাকৃষ্ণ রামনাম জপ অবিরত;
নামাবলী গৈরিক-বসন,
অন্তরে বাহিরে কৃষ্ণ—রাধে রাধে রাধে,
চিত্তপটে নিত্য-বৃন্দাবন!

আলোচনা।

জীবন-সংগ্রামে সাহিত্য।

মানুষের অর্থাগম হয় প্রধানতঃ তিন উপায়ে—শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির দ্বারা। কিন্তু এই তিনটী বিষয়েই এখন আমরা প্রায় পনের আনা পরমুখাপেক্ষী। আমাদের শিল্প-বাণিজ্য ত একরূপ নষ্টই হইয়াছে, কৃষি যাহা আছে তাহাও বিদেশের মুখ চাহিয়া।—বিদেশের কল-কারখানার জন্য যে কাঁচা মাল দরকার হয়, আমাদের কৃষকেরা প্রধানতঃ তাহারই জোগান দেয়।

এই পরমুখাপেক্ষিতার ভাব আমাদের ভিতর হইতে যাহাতে দূর হয়, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। সাহিত্যের মারফতে ইহাই দেশের লোককে জানাইতে হইবে যে, সর্ব্বপ্রকারে আত্মবশ হইতে না পারিলে কল্যাণের আশা নাই। মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের জন্যও যদি সমুদ্র-পারে তাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহা হইলে দেশের শিল্প-বাণিজ্য-কৃষি আর কখনও মাথা তুলিতে পারিবে না।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। কথায় বলে,—এ দেশের জমিতে সোণা ফলে। ইহা অত্যুক্তি নহে। ভাল করিয়া চাষ করিলে আমাদের মোটা ভাত, মোটা কাপড়ের বেশ সংস্থান হয়; অভাবের হাতে পড়িতে হয় না।

যাহাতে আমাদের অভাব ঘুচিবে, এমন ব্যবস্থা সত্বর করা আবশ্যক হইয়াছে। কারণ আমাদের দারিদ্র্য দিন দিন বাড়িতেছে। একে আমরা পরমুখাপেক্ষী, তাহার উপর যদি দারিদ্র্যের পেষণে প্রতিদিন নিষ্পেষিত হইতে থাকি, তাহা হইলে আমাদের আর রক্ষা থাকিবে না।

সেই জন্য স্বাধীনভাবে জীবিকা-অর্জ্জনের পথ যাহাতে উন্মুক্ত হয়, কৃষি-শিল্প প্রভৃতির সাহায্যে দেশে অর্থাগম বৃদ্ধি পায়, তাহার আলোচনা আমরা কর্ত্তব্য মনে করি। মাসিক-সাহিত্যে এখন এ আলোচনা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্য জাতিকে কল্যাণের পথ দেখাইয়া দেয়। দারিদ্র্য ও অভাবই এখন আমাদের উন্নতির পথের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র দেশবাসীর শক্তি যাহাতে এই দুইটীকে বিদূরিত করিবার জন্য নিযুক্ত হয়, সাহিত্যকে সে চেষ্টা করিতে হইবে। জাতির এই জীবন-সংগ্রামে সাহিত্য

ব্যতীত আমাদের অন্য সহায় আর কেহ নাই। তাই সেই সাহিত্যের আশ্রয় লইয়াই আমরা এই সকল কল্যাণকর বিষয়ের আলোচনা করিব।

সর্ব্বমাত্মবশম্ সুখম্।

অপরের অপেক্ষা না রাখিয়া নিজের ক্ষমতায় নিজের অভাব বা প্রয়োজন মিটাইতে পারার নামই সর্ব্বপ্রকারে 'আত্মবশ' হওয়া। এরূপ আত্মবশতা যে নিশ্চয়ই সুখদায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই। একদিন ভারতের দূরদর্শী মনীষীগণ একথাটা বুঝিয়াছিলেন; তাই তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন,—'সর্ব্বমাত্মবশম্ সুখম্'। আজ বর্ত্তমান মহাসমরে অভাবের তাড়নায় ইউরোপের মনীষি ব্যক্তিগণও এই কথার প্রতিধ্বনি করিতেছেন। তাঁহারা এখন ক্রমাগত বলিতেছেন,—তোমরা নিজেদের আহার্য্যের সংস্থান নিজেরাই কর; এ জন্য যাহাতে তোমাদিগকে আর পরের মুখাপেক্ষী হইতে না হয়, সে চেষ্টা এখন হইতেই করিতে থাক। তোমরা সকল রকমে আত্মবশ হও। কৃষিকার্য্যের বিস্তার-সাধন কর। কৃষিকর্ম্মই আত্মবশ হইবার প্রথম ও প্রধান উপায়।

মিষ্টার প্রথেরো ইংলণ্ডের কৃষিবিভাগের বড় কর্ম্মচারী। তিনি সেদিন বার্ম্মিংহাম নগরে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,—

প্রত্যেক গৃহস্থকে যে এক এক টুকরা জমি দিবার কথা উঠিয়াছে, তাহা শীঘ্র কার্য্যে পরিণত করা উচিত। এরূপ হইলে প্রত্যেক গৃহস্থই প্রয়োজনমত তরিতরকারী, শাক-সব্জী যতদূর সম্ভব উৎপন্ন করিতে পারিবে। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও এ ব্যাপারে অনেকটা সাহায্য করিতে পারে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যাহাতে শাক-সব্জী প্রভৃতি উৎপাদন করিবার জন্য বাগানে খাটিতে যায়, শিক্ষকদিগকে তেমন ব্যবস্থা করিতে হইবে।

মিষ্টার প্রথেরোর কথাগুলি এদেশবাসীর অনুধাবনযোগ্য। এদেশের উপকথাগুলিতে পর্য্যন্ত বাড়ীতে তরি-তরকারীর চাষ করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। নিজেদের আহারের ব্যবস্থা যত দূর সাধ্য নিজেদের হাতে রাখিতে পারিলে অন্ততঃ আহার-ব্যাপারে অপরের অধীন হইতে হয় না। আমাদের দেশে এইরূপ ব্যবস্থা করাই সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

কথা নহে—কাজ।

গত মাসে 'বাঙ্গালী' কাগজে এক মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের কৃষি-কর্ম্মের কাহিনী বাহির হইয়াছে। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে,

কৃষিকর্ম্মের দ্বারা আমরা স্বাধীনভাবে সসম্মানে জীবিকা-অর্জ্জন করিতে পারি। আত্মবশ হইয়া অর্থার্জ্জন কৃষিকর্ম্মের সাহায্যে অতি সহজেই হইয়া থাকে।

এই ভদ্রলোকের কাহিনী নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—

শ্রীযুক্ত দেবেশ্বর গোস্বামী—বড়পাথার ইক্ষুক্ষেত্রের স্বত্বাধিকারী। তাঁহার এখন প্রকাণ্ড গুড় ও চিনির কারবার। * * * *

দেবেশ্বর বাবুরও বাল্যকালে চাকুরীর মোহ ছিল। তাঁহার হৃদয়ের বাসনা ছিল, 'ইংরেজী ভাষায় উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চ রাজ কার্য্যে নিযুক্ত হইব'। কিন্তু অর্থাভাবে লেখাপড়া তেমন হইল না। সুতরাং তিনি 'এক সাহেবের চা বাগানে ২০৲ টাকা বেতনে কেরাণী নিযুক্ত লইলেন'। তখন হইতেই তাঁহার ইচ্ছা হইল, 'এই চাকুরী অবলম্বন করিয়াই যে যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিব, তদ্দ্বারা কোনরূপ ব্যবসায় হস্তক্ষেপ করিব।' আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলে উপায়ের অভাব হয় না দেবেশ্বর বাবু 'ইক্ষুচাষ করাই লাভজনক হইবে বলিয়া মনে করিলেন। গৃহে যথাসম্ভব কৃষি-জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া—চাকুরীর মাহিনা হইতে যথাসম্ভব সঞ্চয় করিয়া—এক দিন কুড়ি টাকার আখের ডগা কিনিয়া ফেলিলেন।' এই ঘটনার বিবরণ বড়ই মর্ম্মস্পর্শী ;—অধ্যবসায়ের জ্বলন্ত উদাহরণ। 'কুড়ি টাকার আখের ডগা কিনিয়াছি—একথা শুনিয়া আমার পিতৃদেব ও গাঁয়ের অন্যান্য ভাল লোক আমাকে পাগল বলিয়া নানাপ্রকার ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিন পরের চাকুরি করিয়া রাত্রে ঘরে গিয়াও আমার শ্রান্তি ও শান্তিলাভের উপায় ছিল না। কিন্তু ইহাতেও আমি ভগ্নমনোরথ হই নাই।' তার পর, এই আখের ডগাগুলি, দেবেশ্বর বাবু—দু শ' নয়, পাঁচ শ নয়,—পঞ্চাশ নয়—মাত্র চারি বিঘা জমিতে রোপণ করিলেন। তখন দেবেশ্বর বাবুই তাঁহার ক্ষুদ্র কৃষিক্ষেত্রের একমাত্র পরিদর্শক। 'দিনে ১২টার পর, দুই ঘণ্টার ছুটি পাইলে অন্যান্য বাবুরা বাসায় গিয়া আরাম করিতেন ; আর আমি বিশ্রামের পরিবর্ত্তে নিজের ইক্ষুচাষ-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে গিয়া সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতাম।' সাধনায় সিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। ক্রমশঃ ইক্ষুর চাষ কুড়ি বিঘা জমিতে দাঁড়াইল ও প্রায় ১৫০০৲ টাকা লাভ হইল। এইবার ব্যবসায় বাড়াইবার পালা। অসীম অধ্যবসায়ের সহিত, অদম্য মনের বল লইয়া দেবেশ্বর বাবু সমস্ত টাকাই এই নূতন ব্যবসায়ে লাগাইলেন। এবার তাঁহাকে চাকুরি ছাড়িয়া দিতে হইল। অল্প লাভে সন্তুষ্ট না হইয়া, তিনি ক্রমশঃ নানারূপ নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে

লাগিলেন। বিলাত হইতে কল আনাইয়া, নূতন নূতন চিনি-প্রস্তুত-প্রণালী অবলম্বন করিয়া—এক কথায় 'আপ্‌ টুডেট্‌' বৈজ্ঞানিক প্রথায় তিনি ব্যবসায়-বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। তাহারই ফলে আজ তিনি এক মহা ধনাঢ্য ব্যক্তি।

বাহির হইতে সমস্ত ব্যাপারটিই স্বপ্ন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত সাধনা থাকিলে এরূপ হওয়া কিছুই আশ্চর্য্য নহে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য্য করা সাধারণ চাষার কর্ম্ম নহে। সেই জন্যই দেবেশ্বর বাবু বলিতেছেন, "আমার মনে লয়, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদিগকে উৎসাহ দিলে, এবং জমি-সংগ্রহের সুব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিলে, অত্যল্পকাল মধ্যেই এদেশের কৃষির বিশেষ উন্নতি ঘটিবে।"

আমরা দেবেশ্বর বাবুর এ কথার পূর্ণ সমর্থন করি। আমাদের দেশে মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানগণের অবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় হইয়াছে; অভাব ও দারিদ্র্য তাহাদেরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় হইতেই মানুষ গড়িয়া উঠে। জাতির মধ্যে যদি মানুষ গড়িতে হয়, তাহা হইলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য ও অভাব যাহাতে ঘুচে, জননায়কগণের সে পক্ষে চেষ্টা করা উচিত।

কৃষির উন্নতি সকলের আগে।

সম্প্রতি 'আলগাছি কৃষি-কনফারেন্সে'র সভাপতি ব্যারিষ্টার শ্রীযুত কে, আহ্‌মদ কৃষি-সম্বন্ধে অনেক কাজের কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথার আলোচনার স্থান আমাদের নাই। তবে তিনি এ সম্বন্ধে ইঙ্গিতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমরা দেশবাসীকে শুনাইয়া রাখিতেছি ঃ—

"এদেশে শিল্পপ্রতিষ্ঠার কথায় 'অমৃত-বাজার পত্রিকা' সে দিন বলিয়াছেন—এদেশে লোকের অন্নাভাব হইয়াছে। জন্মের হার কমিতেছে আর মৃত্যুর হার বাড়িতেছে—ইহার কারণ কি? গত বৎসর যত লোক জন্মিয়াছে, তদপেক্ষা অধিক লোক মরিয়াছে; স্বাস্থ্য কমিশনার বলেন, অপর্য্যাপ্ত আহার্য্যজাত দৌর্ব্বল্যই ইহার কারণ। এই অবস্থার প্রতীকার না হইলে ত আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। কৃষিই এদেশের শতকরা ৭৫ জন লোকের অন্নের উপায়। বাঙ্গালায় যে ভাবে জমিতে লোকের সংখ্যা বাড়িতেছে, তাহাতে ২৫ বৎসর পরে আর এক কাঠা জমিও পড়িয়া থাকিবে না। তখন হয় প্রাকৃতিক নিয়মে

কলেরা ও ম্যালেরিয়া জনসংখ্যা কমাইয়া স্থানের অনুপাতোপযোগী করিবে—নহিলে দেশের সমৃদ্ধি-বৃদ্ধির উপায় করিতে হইবে। আমাদিগকে জীবনধারণ করিতে হইলে নূতন বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া কৃষিজ ও শিল্পজ পণ্য বাড়াইতে হইবে। এখন এই ভাবনাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান ভাবনা। এই অবস্থার প্রতীকার জন্য নানা জন নানা মত প্রকাশ করেন—কেহ জাপানের, কেহ আমেরিকার দৃষ্টান্ত দেখান। কিন্তু প্রতীকারের উপায় করিতে হইলে প্রথমে বাঙ্গালীর অবস্থা—বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

আমাদের উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। সার্ জেমস্ মেষ্টন-প্রমুখ রাজকর্ম্মচারীরা যথার্থই বলিয়াছেন, এদেশে কৃষিই লোকের অন্নার্জ্জনের সর্ব্বপ্রধান উপায়—সুতরাং প্রথমে কৃষির উন্নতির ব্যবস্থা করিতে হইবে। কৃষি হইতে দেশে অন্যান্য শিল্পের প্রতিষ্ঠা হইতে পারিবে। আমেরিকা প্রথমে কৃষিতে নির্ভর করিয়া ক্রমে নানা শিল্প-ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছে। সুতরাং এদেশে কৃষির উন্নতি ব্যবস্থা করাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য।"

এ দেশে ক্ষয়রোগ।

এ দেশে ক্ষয়রোগের বিস্তার ঘটিতেছে। আজকাল এই রোগে আমাদের দেশের অনেকেরই জীবন বিপন্ন হইতেছে। ডাক্তার মুথু মাদ্রাজের অধিবাসী। তিনি এখন ইংলণ্ডে থাকেন। ক্ষয়রোগের নিদান ও গতি-প্রকৃতির আলোচনায় তিনি জীবন উৎসৃষ্ট করিয়াছেন। তিনি এদেশে ক্ষয়রোগের বিস্তার-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিয়া আমরা শিহরিয়া উঠিয়াছি। তিনি বলেন:—

"ক্ষয়রোগ এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ভারতবর্ষও তাহার আধিপত্যের বহির্ভূত নহে। ক্ষয়রোগটা আর কিছুই নহে; উহা জঠর-জ্বালার অভিব্যক্তি বা বহির্বিকাশ মাত্র। পেট ভরিয়া খাইতে না পাইলে, খোলা হাওয়া-বাতাস এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হইলে ক্ষয়রোগ দেখা দেয়। যে জাতির মধ্যে দারিদ্র্য ও জঠর-জ্বালা যত অধিক, সেই জাতির মধ্যে এই রোগের প্রাবল্যও তত দূর।

দেশের ধনাগমের উপায়-পদ্ধতির হঠাৎ পরিবর্ত্তনে, সামাজিক রীতি-নীতির

আকস্মিক ওলট-পালটে ক্ষয়রোগের ভিত্তি এদেশে তৈয়ারী হইয়াছে। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য শিল্প-বাণিজ্যের সংঘাত আরম্ভ হয়। সে সংঘাতের ফলে দেশীয় শিল্প বিনষ্ট হইয়া যায়। ফলে পল্লীর শিল্পিকুল জীবিকানির্ব্বাহের অন্য কোনও উপায় না দেখিয়া দলে দলে নগরে ও সহরে আসিতে আরম্ভ করে। সে স্রোত আজও বন্ধ হয় নাই। এই কারণে সহরে জনসংখ্যার অতি-বৃদ্ধি ঘটিয়াছে। কাজেই জীবন-সংগ্রাম ক্রমেই ভীষণ হইয়া উঠিতেছে; খাদ্যদ্রব্যও দুর্ম্মূল্য হইতেছে; বাড়ীভাড়ার বাহুল্য ঘটিতেছে। মানুষ যাহা এখন উপার্জ্জন করে, তাহাতে তাহার সংকুলান হইতেছে না। কাজেই অভাব ও দারিদ্র্যের পেষণে দেহ ও মনের পুষ্টির ব্যাঘাত ঘটিতেছে। ফলে দিনে দিনে জীবনীশক্তি ক্ষীণ হইতেছে এবং দেহ রোগাক্রমণের বিষয়ীভূত হইয়া পড়িতেছে। তাহার উপর ইউরোপীয় হিসাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াও আমাদের শরীর ক্ষয় হইতেছে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শীতপ্রধান দেশের আচার-ব্যবহার অনুসারে আমাদিগকে চলিতে হইতেছে। সকাল-বিকাল কাজের পরিবর্ত্তে এখন আমাদিগকে দু'পুর বেলা কাজ-কর্ম্ম করিতে হয়। তাহার উপর ইউরোপীয় প্রথায় পানাসক্তিও এদেশে অল্পবিস্তর ঘটিয়াছে। এই সকল নানা কারণে দেশে যক্ষ্মা ও ক্ষয়রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে।

পল্লীবাস এক রকম উঠিয়া যাওয়ায় পল্লীগুলির দুর্দ্দশার একশেষ ঘটিয়াছে। পল্লীতে ভাল পানীয় জল মিলে না; জল-নিকাশের সুব্যবস্থা নাই; চারিদিক জঙ্গল ও আগাছায় ভরিয়া গিয়াছে। ইহার ফলে ম্যালেরিয়ার আবির্ভাব হইয়াছে। ম্যালেরিয়ায় এখন লোকের শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হইতেছে; জীবনী-শক্তি ক্ষীণ হইতেছে; রোগ হইতে আত্মরক্ষা করিবার শক্তি-সামর্থ্যও দিন দিন হ্রাস পাইতেছে। কাজেই ক্ষয়রোগ ধীরে ধীরে এদেশে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে।

তাহার উপর ভেজাল ঘৃত তৈল দুগ্ধ আছে; জমাট দুগ্ধ, টিনের কৌটায় আমদানী করা মাখন, পনির প্রভৃতিও আছে। এ সকলের ব্যবহারের ফলে এদেশে ক্ষয়রোগের বিস্তার ঘটিতেছে।

ক্ষয়-রোগের অতি-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মরণের পথে ছুটিতেছি। এ দেশের নারী-সমাজে এ রোগের প্রাদুর্ভাব কিছু বেশী। যুবক-সমাজেও এ রোগের প্রাবল্য বড় অল্প নহে। ইহার প্রতিবিধানের কি কোনও

উপায় নাই? উপায় আছে—ডাক্তার মুখু বলিতেছেন,—"ফিরে চল। তোমরা যেমন ছিলে, তেমনই হও। তোমরা আবার পল্লীবাস করিতে আরম্ভ কর। তোমাদের পল্লীশিল্প আবার জাগাইয়া তুল। পল্লীর স্বাস্থ্যোন্নতি কর। পল্লীতে ভাল পানীয় জলের সুব্যবস্থা কর। গোচরভূমির ব্যবস্থা করিয়া, গোধন-পালনের ভাল বন্দোবস্ত করিয়া, বিশুদ্ধ দুগ্ধ-প্রাপ্তির সংস্থান কর। পাশ্চাত্য আদর্শে দিশেহারা হইও না। ইউরোপ-আমেরিকা যে ভাবে শিল্পোন্নতি করিয়া সমাজে অসামঞ্জস্যের বৃদ্ধি করিয়াছে, তোমরা তাহার অনুকরণ করিও না। তোমরা কৃষিকর্ম্মের ও আপনাদের অভাবপূরণের উপযোগী শিল্পকার্য্যে, আত্মনিয়োগ কর। 'মায়ের দেওয়া' মোটা ভাত-কাপড়ে সন্তুষ্ট হও। ইহাতেই তোমাদের মুক্তি হইবে; অকাল মরণের হাত হইতে, ক্ষয়ের কবল হইতে তোমরা উদ্ধার লাভ করিবে: আবার তোমরা সুখ-শান্তি-সম্পদ ফিরিয়া পাইবে।"

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

মাস দুই হইতে 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন' নামক মাসিক পত্রে মাসিক-সাহিত্য-সমালোচনা আরম্ভ হইয়াছে। এই সমালোচনার ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয় যে, প্রসিদ্ধ সমালোচক শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ রায়কে গালাগালি দেওয়া এবং শ্রীমান্ কালিদাস রায়কে মাচায় তুলিয়া ধরাই ইহার উদ্দেশ্য।

প্রথম মাসের সমালোচনা পড়িয়া মনে করিয়াছিলাম,—কিছু বলিব না; কিন্তু মার পবিত্র মন্দিরে বারংবার মিথ্যার প্রচার দেখিয়া আর নীরব থাকিতে পারিলাম না।—'ক্ষমা হেথা ক্ষীণ দুর্ব্বলতা।'

এই সমালোচক লিখিতেছেন যে, অমর বাবুর "সাহিত্য-প্রসঙ্গে" ঝগড়াঝাঁটি ও গালাগালি পূর্ব্বের মতই চলিতেছে। এই গালাগালির নমুনা-স্বরূপ তিনি বলিয়াছেন যে, বিমলাবাবুকে অমরবাবু পরোক্ষভাবে সামান্য অপরিচিত লেখক, সরস্বতীর কৃত্রিম পোষ্যপুত্র ইত্যাদি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা কি সত্য? অমরবাবুর 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে' দেখিতে পাই যে, তাঁহাকে বিমলবাবুর মোসাহেবেরা বিদ্বেষী বলিয়াছিল ও গালাগালি দিয়াছিল বলিয়া প্রত্যুত্তরে তিনি

লিখিয়াছিলেন—'যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'বঙ্গদর্শনে' লিখিয়াছেন,—কখনও কখনও দেখিয়াছি, কোনও সামান্য অপরিচিত লেখক মনে মনে স্থির করিয়াছেন আমরা ঈর্ষ্যাবশতঃই তাঁহার গ্রন্থের নিন্দা করিতেছি; যে কারণে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় বলিয়াছিলেন,—সত্য কথা বলিতে গেলে সরস্বতীর কৃত্রিম পোষ্যপুত্রেরা ক্রোধের বিষে জর্জ্জরীভূত হইতে থাকেন; সেই কারণে আজ যদি আমাদিগকে গালি খাইতে হয়, বিদ্বেষী হইতে হয়, তবে সেজন্য দুঃখ করিবার বা বিস্মিত হইবার কিছুই নাই।"—এই ত কথা! এই সরল, সোজা কথাটাকে বাঁকাইয়া যে এতটা কুটিল করা যায়, তাহা জানিতাম না। বিমলাবাবুর মোসাহেব-ভাগ্য দেখিয়া সত্যই ঈর্ষ্যা হয়।—কলিকাতা-চুঁচুড়া অতিক্রম করিয়া সে মোসাহেবীর ধাক্কা বুড়ীগঙ্গার তটে গিয়া লাগিয়াছে!—চক্ষু-লজ্জাকে এমন ভাবে অক্কা পাইতে আর কোথাও দেখি নাই। সাহিত্য-সেবা যে এতটা দোকানদারী, এতটা মুদীগিরি, এতটা নরক-বিড়ম্বনায় নামিতে পারে, ধারণা ছিল না।

এদিকে শ্রীমান্ কালিদাস রায়কে 'কবিবর' প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই সমালোচক উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কিন্তু 'নাচের পুতুল হয় কি মানুষ তুল্লে উঁচু করে'!—এ কথা শুনিবে কে? একাধারে বিদ্বেষ ও গোঁড়ামি যেখানে বিদ্যমান, সেখানে কি তাল-জ্ঞান ঠিক থাকে? অমর বাবুকে গালি দিতে হইবে বলিয়া মাঘ মাসের 'ঢাকা রিভিউ'য়ে মাঘের 'ভারতবর্ষে'রই সমালোচনা করা হইয়াছে। যাঁহার এ তাল-কাঁকুড় জ্ঞান নাই, তাঁহার সমালোচনা সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। বিশেষতঃ যিনি আত্মগোপন করিয়া 'শ্রীসমালোচক'-স্বাক্ষরে অপরকে গালি দেন, সেই কাপুরুষ লেখকের লেখার আলোচনা করিলেও ছোটকে বড় করিয়া তোলা হয়।—বুঝি হীনতারও প্রশ্রয় দেওয়া হয়।—অতএব, এই অসার সমালোচনা সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় করিয়া 'অর্ঘ্যে'র স্থান নষ্ট করিতে ইচ্ছা করি না। আমাদের অভিযোগ—'ঢাকা রিভিউ'য়ের সম্পাদকের বিরুদ্ধে। তিনি এই কাণ্ডজ্ঞানহীন লেখকদিগকে প্রশ্রয় দেন কেন? 'ঢাকা রিভিউ'কে আমরা ভালবাসি। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা আছে। তাঁহার কাগজ মেছোহাটা হইতেছে কেন? তিনি একটু সাবধান হউন।—নহিলে পাঠক-সাধারণ এজন্য তাঁহাকেই দায়ী করিবে।

বৈষ্ণব কবির অব্যক্তানুকরণ।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

[শ্রীপ্রিয়নাথ দাস, এম্-এ, বি-এল]

অনুপ্রাসের খাতিরে অনেক কবি অব্যক্ত ধ্বনির অনুকরণ করিয়া থাকেন। এইরূপ শুনা যায় যে, য়ুরোপীয় কোনও কোনও ভাষার কাব্য-সাহিত্যে মিষ্টতা বৃদ্ধির নিমিত্ত আধুনিক যুগে কবিরা অব্যক্তানুকরণের পক্ষপাতী হইয়াছেন। বৈষ্ণব কবির উদ্দেশ্য কিন্তু অন্যরূপ। ভাবপ্রকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া তিনি অব্যক্তানুকরণ করিয়াছেন। সেই কারণে বৈষ্ণব পদাবলীতে অব্যক্ত ধ্বনির স্পষ্ট অভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যের যুগে বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনে প্রেমের স্রোত বহিতেছিল। ভাষার বন্ধনী দৃঢ় না হইলে বৈষ্ণব ধর্ম্ম কাব্যের বিষয়ীভূত হইত না। অনুপ্রাসের প্রাণহীন সঙ্গীত হৃদয়ের অন্তঃপুরে পহুঁছায় না। জাতীয় জীবনে যখন বিলাসের অলসতা দেখা দেয়, তখন কাব্যে অনুপ্রাসের মাত্রা বৃদ্ধি হয় ও শব্দের অবনতি অনিবার্য্য হয়। বাঙ্গালী প্রেমিক তখন গীতি-কবিতার সাহায্যে জাতীয় জীবন গড়িয়া তুলিতেছিল। সঙ্কীর্ত্তনের উদ্দীপনা বৈষ্ণব কবির রচনায় সেই জন্য স্পষ্ট অনুভব করা যায়। পদকর্ত্তা নয়নানন্দ গাইয়াছেন—

জয় রে জয় রে গোরা শ্রী-শচীনন্দন
মঙ্গল নটন সুঠাম রে।
কীর্ত্তন-আনন্দে শ্রীবাস রামানন্দে
মুকুন্দ বাসু গুণ গান রে॥
দাং দ্রিমিকি দ্রিমি মাদল বাজত
মধুর মন্দিরা রসাল রে।
শঙ্খ করতাল ঘণ্টারব ভেল
মিলল পদতলে তাল রে॥

("দাং দ্রিমিকি দ্রিমি" স্থলে "দাং দ্রিমিকি দ্রিমি দ্রিমি," "তা দ্রিমিকি দ্রিমি," "দ্রিমিকি দ্রিমিকি দ্রিমি," "দাং দ্রিমি দ্রিমি" পাঠ আছে)।

পদকর্ত্তা রামানন্দ লিখিয়াছেন—

"ধং ধ্রিমিকি ধ্রিমি ধ্রিমি মাদল বাজত, কতহুঁ তাল সুতালুয়া।
অখিল ভুবনক নাথ নাচত, শ্রীবাস আদি সবে গায়ুয়া॥"

গোবিন্দদাস বলেন, নবদ্বীপে যখন "নাচে গোরা, প্রেমে ভোরা, ঘন ঘন বোলে হরি," তখন "তা তা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজই, ঝন ঝন করতাল"। কবিশেখর শুনিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যের প্রেমের হাটে কত করতাল মৃদঙ্গ ঢোল ও অন্যান্য বাদ্য বাজে। সেখানে "হাট কলরব, নৃত্য গীত সব, ঘন ঘন হরিবোল" শুনা যায়। "তত্তা থৈ থৈ বাওয়ে মৃদঙ্গ।" কবিশেখর কীর্ত্তনের একটী সুন্দর চিত্র রাখিয়া গিয়াছেন—

"তা তা থৈ থৈ, মৃদঙ্গ বাজই, ঝনর ঝনর করতাল।
তন তন তম্বুর, বীণা সুমধুর, বাজত যন্ত্র রসাল॥
ডম্ফ খমক কত, রবাব বাজত, পদতল তাল সুমেলি।
নাচল গৌর, সঙ্গে প্রিয় গদাধর, সোঙরিয়া পূরবক কেলি॥
তীরে তীরে ফুলবন, যেন বৃন্দাবন, জাহ্নবী যমুনা ভাণে।
কীর্ত্তন-মণ্ডল, শোভা অতি ভেল, চৌদিকে ভকত করু গানে"॥

রাধামোহন আমাদিগকে একটী কীর্ত্তনের দৃশ্য দেখিতে অনুরোধ করিয়াছেন—

"দেখ দেখ নবদ্বীপ মাঝ।
বাওত গাওত, মধুর ভকত শত, মাঝহি বর-দ্বিজরাজ।
তা তা ধ্রিমি ধ্রিমি মৃদঙ্গ সুবাজত, রুণু ঝুনু নূপুর রসাল।
রবাব বীণ, আর স্বরমণ্ডল, সুমিলিত কর করতাল।"

বিদ্যাপতির অনুকরণে রাধামোহন শ্রীকৃষ্ণের রাস-লীলায় কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়া মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন—

"চৌদিকে চারু, অঙ্গন বেড়ি, রঙ্গিণী কত গাউনি।
ক্রতা ত্তা থৈয়া থৈয়া থৈয়া বোলনি॥
মাঝে বিরাজে শ্যাম প্রখড় শিরোমণি।
কিঙ্কিণী কিনি, কিনি কিনি কিনি বোলনি।
তাগর নাধোগ্ গা ঘেটিতা ঘেটিতা, ঘেটিতা ঘেনে গাও্।
তিত্তগ্ তিত্ত ঘেনাং, গরণ ঘেনাতি নিতা, থিটিতুং গা তিগরঝাং॥"

পদকর্ত্তা বংশী বলেন, নবদ্বীপে প্রথম মহোৎসবের যেদিন অধিবাস, সে দিন

"গোবিন্দ মৃদঙ্গ লইয়া বায়ে তাতা থৈয়া থৈয়া
করতালে অদ্বৈত চপল।
হরিদাস করে গান শ্রীবাস ধরয়ে তান
নাচে গোরা কীর্ত্তন-মঙ্গল॥"

বৈষ্ণবদ্বেষী সমালোচকের চক্ষে এই কীর্ত্তন-মঙ্গলের মূল্য কিছুই না হইতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণব কবি মৃদঙ্গের অব্যক্ত ধ্বনি অনুকরণ করিয়া যে কয়টি শব্দ পদের সহিত গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে অতীতের প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠে। যে মহাপুরুষের আবির্ভাবে বঙ্গদেশ পবিত্র হইয়াছে, যাঁহার ত্যাগের তুলনা বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে বিরল, তিনি বাঙ্গালী-হৃদয়ের নিদ্রিত প্রেমকে জাগাইবার জন্য মৃদঙ্গে আঘাত করিলেন। মৃদঙ্গের আহ্বানে বাঙ্গালার চতুঃসীমার লোক ছুটিয়া আসিয়াছিল। মৃদঙ্গের সেই অব্যক্ত ধ্বনির অভিব্যক্তি বৈষ্ণব কবির হৃদয়ে প্রেমের স্বর্গীয় সঙ্গীত আনয়ন করিয়াছে। অব্যক্ত ধ্বনি ভাবময় সৌন্দর্য্যময় গীতিমধুর ভাষায় পরিণত হইয়াছে।

বৈষ্ণব কবি কেবল অব্যক্তানুকরণের কবি নহেন। ধ্বনি কাব্যের ভাষায় অনূদিত হইতে পারে, কিন্তু হৃদয়ের অব্যক্ত ভাব সকল সময়ে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বৈষ্ণব কবি তাহাও করিয়াছেন। মানব-হৃদয়ের অব্যক্ত ভাবের অনুরূপ শব্দ নির্ব্বাচন করিয়া তিনি অত্যাশ্চর্য্য উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। শব্দের সাহায্যে মনের অবস্থাবিশেষের বর্ণনে বৈষ্ণব কবি যেরূপ ভাব ও ভাষার সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিক মুগ্ধ হইতে হয়। প্রেমের প্রথম লক্ষণ বর্ণন করিয়া বিদ্যাপতি লিখিয়াছেন—

"নয়ন ঢুলাঢুলি লহু লহু হাস।
অঙ্গ হেলাহেলি গদগদ ভাষ॥"

কবির শিল্পনৈপুণ্যে হৃদয়ের অব্যক্ত ভাব প্রেমিক-প্রেমিকার নয়নে, হাসিতে, অঙ্গভঙ্গীতে ও অর্থশূন্য ভাষায় কেমন ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কবিশেখর একস্থানে বলিয়াছেন,

"সে কাল গেল বৈয়া বঁধু সে কাল গেল বৈয়া।
আঁখি ঠারাঠারি মুচকি হাসি কত না করিতা রৈয়া॥

অন্যত্র,—

"দিন অবসান, জানিয়া পরাণ, কেমন কেমন করে।
দোঁহার বদন নিরখি দু'জন, বচন নাহিক সরে॥"

বলরাম দাসও হৃদয়ের অব্যক্ত ভাব সুন্দর সরল ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন।

"খাইতে সোয়াস্ত নাই, নিদ দূরে গেল গো, হিয়া দহ দহ মন ঝুরে।
উড়ু উড়ু আনচান, ধক ধক করে প্রাণ, কি হইল রহিতে নারি ঘরে॥"

বিদ্যাপতির রাধা ভাবী বিরহে কাতর হইয়া "আহা উহু করি" যাহা কিছু বলিলেন, তাহা বিস্মৃত হওয়া যায় না। এই অবস্থায় কানুর মুখ দেখিয়াই রাধা "ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী।"

"গদ গদ ভাব," "ছল ছল আঁখি," "ঢল ঢল" "ঢর ঢর" ভাব, "প্রেমালসে ঢলু ঢলু অরুণ নয়ান" প্রভৃতি ছোট ছোট কথা হৃদয়ের কতটা অব্যক্ত ভাব প্রকাশ করে, তাহা ভাবুকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। রাধামোহন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন,

"প্রেম-জলে ডুবু ডুবু লোচন-তারা।
প্রলাপ সন্তাপ ভাব আদি ভোরা॥"

মানিনী রাধার উত্তর না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের যে অবস্থা হইয়াছিল প্রেমদাস তাহা বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন,—

"কত পরকারে, মিনতি করু মাধব, তব ধনি উত্তর না দেল।
দর দর হৃদয়, নয়ন-যুগ ছল ছল, মনমসে জর জর ভেল॥"

বাঁশীর সঙ্কেত শুনিয়া রাধার প্রাণের মধ্যে যে অব্যক্ত ভাবের উদয় হয়, চণ্ডীদাস তাহা বর্ণন করিয়াছেন—

"হারে সই শুনি যবে বাঁশীর নিশান।
গৃহকাজ ভুলি প্রাণ করে আনচান॥"

প্রেমের কবি না হইলে কি হৃদয়ের অব্যক্ত মধুর ভাব বর্ণন করিতে পারে? বৈষ্ণব কবির পরিপূর্ণ হৃদয় বিন্দু বিন্দু করিয়া তাঁহার কাব্যের ভিতর দিয়া বাহির হইয়াছে। হৃদয়গত অব্যক্ত ভাবের সহিত ভাষার এমন সামঞ্জস্য আর কোথাও দেখা যায় না। ভাবেও যেমন জটিলতা নাই, ভাষাও তেমনি সরল। খাঁটি বাঙ্গালা ভাষায় এই ভাব অনেক সময়ে ব্যক্ত। আলোকের তেজ, বর্ণের চাকচিক্য, বস্তুবিশেষের অস্থির গতি ও অন্যান্য অনেক ব্যাপার সময়ে সময়ে আমাদের মনে যে স্বগত ব্যঞ্জনার উদ্রেক করে, তাহা আমরা ভাষায় বর্ণন করিতে পারি না। বৈষ্ণব কবি আমাদের মনের এই অনুভাব যে ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও অনেক সময়ে খাঁটি বাঙ্গালা ভাষা। গোবিন্দদাস শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনায় বলিয়াছেন,

"চূড়ায় উড়য়ে মত্ত ময়ূর-শিখণ্ড।
টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড॥"

বিদ্যাপতির পদাবলীতে একস্থানে "ধরণী ডগমগি ডোলে" আছে। জ্ঞান দাস বলেন, "নানা আভরণ অঙ্গে করে ঝলমল," "ঝিকি মিকি করে দুটি শ্রবণ-কুণ্ডল।" রাধামোহন শ্রীরাধার উন্মত্তাবস্থা বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন, "ক্ষণে উচ রোয়ই, ক্ষণে পুন ধাবই, ক্ষণে পুন খল খল হাস।" কবি নিদ্রালু স্ত্রীগণের অবস্থা বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন, "ঢুলি ঢুলি পড়ত খলত অবলাগণ, ঘু-ঘুমে ব-বঠি না পারি।" কেমন ভাবানুযায়ী শব্দ-চিত্র! বৈষ্ণব কবির নিকট বাঙ্গালা ভাষা যে কি পরিমাণে ঋণী, তাহার হিসাব আমরা এ পর্য্যন্ত লইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। প্রাচীন কাব্য-সাহিত্য হইতে খাঁটি বাঙ্গালা শব্দগুলি বাছিয়া বাহির করিলে আমরা বুঝিতে পারিব, বাঙ্গালীর নিজস্ব বলিয়া অহঙ্কার করিবার অনেক সামগ্রী বৈষ্ণব কবির শব্দ-ভাণ্ডারে স্তরে স্তরে সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

বৈষ্ণব কবির আধ্যাত্মিকতা লইয়া তাঁহার রচনা দ্বন্দ্বের বিষয় হইয়াছে, সেই জন্য আমরা তাঁহার শিল্পনৈপুণ্যের দিকে লক্ষ্য করি না। সাহিত্যের উচ্চ-ভূমি হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিলে বৈষ্ণব কবির চারু কৌশল অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার পদাবলীতে ধারাবাহিক ঘটনার মধ্যে যে নাট্যরসের আস্বাদ পাওয়া যায়, তাহা এক্ষণে সকলেই স্বীকার করেন। রাখাল বালকগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠবিহার-বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে মনে হয় যেন আমরা অতীতের মধ্যে চলিয়া গিয়াছি। আমাদের মানসনেত্রে গোপজীবনের কার্য্যসকল উজ্জ্বল বর্ণে প্রকাশিত হয়। বৈষ্ণব কবির গোপ-গাথায় সখ্য-প্রেমের বিকাশ সম্বন্ধে আমরা এস্থলে আলোচনা করিব না। গোপ বালকের ঘটনাশূন্য জীবন-কাহিনীতে অব্যক্তের প্রভাব যে ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহারই উল্লেখ করিব।

বলরাম দাসের পদাবলী পাঠে জানা যায়, যশোদা শ্রীদাম সুদাম দাম বলরাম প্রত্যেককে ডাকিয়া বলিলেন,—গোপালকে যেন দূর বনে লইয়া না যায়, আরও বলিলেন, "নিকটে গোধন রেখো, মা বলে শিঙ্গাতে ডেকো, ঘরে থাকি শুনি যেন রব।" তাহার পর গোষ্ঠযাত্রা বর্ণনা করিয়া প্রেমদাস লিখিয়াছেন, বলাই মল্লবেশে, "বাথানে আসিয়া সুখে, শিঙ্গা দিল চাঁদ মুখে, ডাকে শিঙ্গা ধাও ধাও বলি। শুনিয়া শিঙ্গারব, ধাইল ধবলী সব, মেলি গেল রাখাল মণ্ডলী॥"

চণ্ডীদাস রাখাল বালকের স্ফূর্তি বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন, "লুকিছে পাঁচনি, বাজিছে কিঙ্কিণী, পদ নূপুর ঝুনু রুণু শুনি।" গোবিন্দদাসও দেখিয়াছেন, আগে অগণিত গোধন, পাছে ব্রজবালক হৈ হৈ করিয়া চলিয়াছে। তিনি বলেন, শ্রীকৃষ্ণ যখন গোঠে গোধন দোহন করিতেছেন,—

"ঘন ঘন হাম্বা রব বৎসক রাব।
হুঁ হুঁ গরজে ধেনু সব ধাব॥"

যখন "কুণ্ডক তীরে" রাধা-কৃষ্ণের মিলন হইল, তখন জয় জয় শব্দ, হুলাহুলি ও শঙ্খধ্বনি হইতে লাগিল। বৈকালে শ্রীকৃষ্ণ যখন বাটীতে ফিরিতেছেন,

"গোখুর ধূলি উছলি গুরু অম্বর, ঘন ঘন হাম্বারব হৈ হৈ রাধ।
বেণু বিশাল নিশান সমাকুল সঙ্গে রঙ্গে কত সখাগণ ধাব॥"

কবিশেখরের বর্ণনাও সুন্দর। "শিঙ্গা দিয়া চাঁদ মুখে, বলাই ধবলী ডাকে।"

"শিঙ্গা বেণু একতান, করিয়া দেওল সান,
শুনিল ব্রজের সব লোক।
মাতা পিতা হরষিত, কুলবতী পুলকিত,
ঘুচল সবার দুঃখ শোক॥"

সন্ধ্যাকালে যখন শ্রীকৃষ্ণ গলায় বনফুলের মালা পরিয়া বাটীতে ফিরিলেন, তখন "ঘণ্টা ঝাঁঝরি তাল মৃদঙ্গ বাজত, সখীগণ ঘন ঘন জয় জয়কার।" কবিশেখর বলেন, অতঃপর—

"জলপান করি খান, মুখে দিয়া গুয়া পান,
খিড়িকে চলিলা গোদোহনে।
গাভীগণ স্তনভরে, ঘন হাম্বা রব করে,
কানু পথ নিরখে সঘনে॥"

তার পর,

"সখাগণ সঙ্গে নানা রস রঙ্গে,
খিড়িকে আইলা হরি।
গাভী বৎস সব, করে হাম্বা রব,
দোহয়ে মটকি ভরি॥"

গোবিন্দদাস বলেন, আবার যখন রাত্রে,—

"নগরক লোক সব নিশবদ ভেল।
চরাচর সব যো যাহা চলি গেল॥"

তখন "ময়ুর ময়ূরীগণে ঘন দেই নাদ।"

"কাননে কুসুম ভেল পরকাশ।
শারী শুক পিক মধুরিম ভাষ॥
গুঞ্জত ভ্রমরী ভ্রমর উতরোল।
মধুলোভে মাতি আনন্দে বিভোল॥
তাঁহি সুগমন করু বিদগধ রাজ।
রণ রণ ঝন ঝন নূপুর বাজ॥
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে॥
শেজ বিছায়ল কিশলয়পুঞ্জে॥"

অব্যক্ত জগতের প্রতি বৈষ্ণব কবির নায়কের কেমন একটি প্রাণের টান আছে। শিঙ্গা-বেণুর ধ্বনিতে, হাম্বারবে, ময়ূর-ময়ূরী, শুক শারী, ভ্রমর-ভ্রমরী ও কোকিলের সঙ্গীতে কি যেন এক মোহিনী শক্তি আছে। গোষ্ঠে, নিভৃত নিকুঞ্জে যখনই শ্রীকৃষ্ণ বাহির হইয়া যান, বৃন্দাবনবাসী নর-নারীর মন প্রাণ সেই দিকে ছুটিয়া যায়। প্রকৃতির নির্ব্বাক আহ্বান বৈষ্ণব কবিই শুনিয়াছিলেন। যমুনার তীরে, গোচারণ ভূমিতে, নিভৃত নিকুঞ্জে যে প্রেম, যে শান্তি বিরাজ করে, ভাবুক কবি তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারেন না, তাঁহার সে ক্ষমতাই নাই। চিরবৈচিত্রময় প্রকৃতির লীলা সেই কারণে বৈষ্ণব কবি যেরূপ অনায়াস স্ফূর্ত্তিতে বর্ণন করিয়াছেন, সেরূপ অপর কেহ পারে নাই। অনন্ত দাসের বর্ষা-বর্ণনায় আবার এক নূতনতর ধ্বনি শুনা যায়—

"মেঘ ডুর ডুর দাদুরীর বোল
ঝিঝা ঝিনি ঝিনি বোলে।
ঘোর আন্ধিয়ারে বিজুরী ছটা
হিয়ায় পুতলি দোলে॥"

গোবিন্দ দাসের নায়ক আদরে বাদল সৃজন করিতে পারেন, তাহাতে বাক্য রূপ অমৃত-রসের ধারা বর্ষণ হয়; কিন্তু কবি যখন উপমার রাজ্য হইতে অব্যক্ত ধ্বনির জগতে আসিয়া পড়েন, তখন

"ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরমে জরি যাত॥"

রাধিকার বিরহানলে কবি প্রকৃতির যে অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন, তাহাতে ঝিল্লির সঙ্গীত শুনা যায়—

"ঝর ঝর জলধর ধার। ঝঞ্ঝা পবন বিথার ॥
ঝলকত দামিনী মালা। ঝামরি ভৈ গেল বালা ॥
ঝুট কি কহব কানাই। ঝুরত ভুরা বিন্দু রাই ॥
ঝন্ ঝন্ বজর নিশানে। ঝাপি রহত দুই কাণে ॥
ঝিল্লি ঝঞ্ঝর রাতি। ঝঙ্ক সহগে নাহি যাতি ॥
ঝুমরি দাদুরী বোল। ঝুলত মদন হিল্লোল ॥
ঝট্‌কি চলত ধনি পাশ। ছগভত গোবিন্দ দাস ॥"

"ঝিল্লি ঝঞ্ঝর রাতি" এই কয়টি শব্দে যেন ঐন্দ্রজালিক শক্তি সঞ্চারিত রহিয়াছে। শুধু অব্যক্ত ধ্বনির অনুকরণ নহে, শব্দ শুনিয়া বাস্তবিকই শ্রুতির উদ্দীপন হয়। মনে হয় যেন বর্ষা-প্লাবিত দেশে ঘরের মধ্যে রাত্রে একাকী বসিয়া অবিরাম ঝিল্লিরব শুনিতেছি। শব্দের ভাবানুকারিতা ও ভাবের ব্যাপকতার বিষয় চিন্তা করিলে জয়দেবের কলকোকিল-কূজিত কুঞ্জ-বনের কথা মনে পড়ে। কবিত্ব আর কাহাকে বলে? জ্ঞানদাসের অভিসার-দৃশ্যে, "বাদর দর দর, ডাকে ডাহুকি সব," "বরিখত ঝর ঝর থরতর মেহ," "ঝলকত দামিনী দশদিশ আপি।" বৈষ্ণব কবির কল্পনার উপর বর্ষার প্রভাব নিতান্ত কম নহে। জ্ঞানদাসের রাধা যখন শ্রীকৃষ্ণকে স্বপ্নে দেখেন, তখন প্রকৃতির যে অবস্থা ছিল কবি তাহা সুন্দরভাবে বর্ণন করিয়াছেন—

"রজনী শাঙন ঘন ঘন দেওয়া-গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে।
পালঙ্কে শয়ন রঙ্গে বিগলিত চির অঙ্গে
নিন্দ যাই মনের হরিষে ॥
শিখরে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী-বোল
কোকিল কুহরে কুতূহলে।
ঝিঁঝা ঝিনিকি বাজে ডাহুকী সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে ॥"

রামানন্দও বলেন, "শাঙন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে।" ভাদ্র মাসের ভরা বর্ষায় প্রবাসী কান্তের জন্য রাধার অন্তরে ও বহির্জগতে যে কি হইতেছে, তাহা বিদ্যাপতি বর্ণন করিয়াছেন—

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর ॥

ঝঞ্ঝা ঘন গরজন্তি সন্ততি

ভুবন ভরি রবি খণ্ডিয়া।

কান্ত পাহন কাম দারুণ

সঘনে খর শর হন্তিয়া ॥"

ভাষায় কেমন ভরাট ভাব! গাম্ভীর্য্যের সুন্দর অনুকরণ! চণ্ডীদাসের রাধা মেঘের গর্জ্জন শুনিয়া বলিয়াছিলেন,

"গুরুর গঞ্জন মেঘের গর্জ্জন

কত না সহিব প্রাণে।

ঘর তেয়াগিয়া যাইব চলিয়া

রহিব গহন বনে ॥"

কবিশেখর কেবল বজ্রপাতন-শব্দ শুনিয়াছেন—

"গগনে অব ঘন মেহ দারুণ, সঘনে দামিনী ঝলকই।

কুলিশ-পাতন-শবদ ঝন ঝন, পবন খরতর বলগই ॥"

অন্যত্র—

"ঝলকই দামিনী দহন সমান।

ঝন ঝন শব্দ কুলিশ ঝন ঝান ॥"

সকল বর্ণনাই কেমন স্বাভাবিক! বর্ষায় বাঁশীর স্বর শুনা যায় না। বজ্র ও ঝিঁঝি পোকার শব্দে চতুর্দ্দিক পরিপূর্ণ। বজ্রের ঝন্ ঝন্ শব্দে অভিসারিকার মনে আশঙ্কার উদ্রেক হয় বটে, কিন্তু কবির রচনা এমনই মধুর, শব্দগুলি এতই কোমল যে, পাঠক বুঝিতে পারেন,—বিপদের সম্ভাবনা নাই।

অর্থ ও বিদ্যা।

[শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।]

অর্থ নাই, শুধু বিদ্যা বৃথা অহঙ্কার,
ডিগ্রী-পাশ কণ্ঠফাঁস মেকী অলঙ্কার;
মূর্খ মুচি মুচিরাম রায়-বাহাদুর,
যত অর্থ বিদ্যা তাঁ'র ততই প্রচুর!

পঞ্চাশ হাজার টাকা।

—:•*•:—

(১)

নদের চাঁদ কুণ্ডুর বড় তেজারতির কারবার। তেজারতি করিয়া সে যে কত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। লোকের মুখে শুনা যায়, নদের চাঁদের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ দশ বার লক্ষেরও অধিক। সে অতি-বড় কৃপণ। অনেকে বলিত, উহার নাম মুখে আনিলে, বাড়ী ভাতে ছাই পড়ে, ভাতের হাঁড়ি ফাটিয়া যায়। এ কথা কত দূর সত্য তাহা জানি না, তবে নদের চাঁদের তেজারতির জালে যিনি একবার পা দিতেন, তাঁহার ভাতের হাঁড়ির কি অবস্থা হইত বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার চাউলের হাঁড়ি প্রায়ই 'বাড়ন্ত' হইত।

খড়বাজারের এক বনিয়াদি ভদ্রলোকের ঢাকাপটিতে একখানি বাড়ী ছিল। তিনি কোন্ মান্ধাতার আমলে নদের চাঁদের কাছে পাঁচ হাজার টাকা ধার করিয়াছিলেন, সে টাকা তাঁহারা সুদে আসলে পরিশোধও করিয়া দিয়াছিলেন। অথচ এখনও পর্য্যন্ত তাঁহাদের সেই-ঢাকাপটীর বাড়ীর নীচের তলে রাস্তার ধারে একটী ছোট ঘর নদের চাঁদ বিনা ভাড়ায় দখল করিয়া আছেন। এই ঘরেই তাহার গদী। এইখানেই বসিয়াই সে তেজারতির কারবার করে। ঘরটী ঝুলে ভরা ও খুব স্যাঁতসেঁতে। মেঝের উপর 'দরমা' পাতা; তদুপরি ছিন্ন মাদুর ও সতরঞ্চি। ঘরের এক কোণে একটী সেকেলে লোহার সিন্দুক; তাহার হাঁসকলে একটী আড়াইসেরা তালা লাগান। এই সিন্দুকের পাশে, দীর্ঘে প্রস্থে এক হাত নারিকেল ছোবড়ার ধূলা-ধূসরিত ছিন্ন মলিন গদির উপর নদের চাঁদের আসন। ইহারই উপর বসিয়া নদের চাঁদ লাখ লাখ টাকার তেজারতি করে।

নদের চাঁদের বাম পার্শ্বে তাহার সরকারের আসন। তাহার সম্মুখে একটী ভাঙ্গা কাঠের বাক্স ও আশে পাশে কতকগুলি খাতাপত্র। প্রভুর সকল চাল-চলন, আদব-কায়দা সে জীবনের আদর্শ করিয়া লইয়াছে। লোকে বলিত, নদের চাঁদের সরকার নদের চাঁদের চেয়েও এক কাঠি সরেশ। বাবু নস্য লইতেন বলিয়া সরকার তাঁহাকে প্রায়ই বলিত, "এরূপ অপব্যয় করলে কোন্ দিন আপনার

কারবার ফেল হ'য়ে যাবে।" নদের চাঁদ সেই দিন থেকে নস্ত ছাড়িয়া দিয়াছিল।

(২)

এক দিন আসামের এক জমিদারকে নদের চাঁদ উচ্চ সুদে পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার দিয়া প্রফুল্লমনে ঝিমাইতেছিল, এমন সময়ে ডাক-হরকরা আসিয়া সরকারের হাতে একখানা চিঠি দিয়া গেল। সরকার চিঠিখানা লইয়া প্রভুর হাতে দিল।

নদের চাঁদ চিঠিখানা খুলিল। তাহাতে লেখা ছিল,—"পঞ্চাশ হাজার টাকা।"

তার পর দিন আবার এইরূপ চিঠি। চিঠির ভিতরে সেই কথা—"পঞ্চাশ হাজার টাকা।"

এমনই উপরি উপরি চারি পাঁচ দিন এইরূপ চিঠি আসিতে লাগিল। নদের চাঁদ কেমন যেন শঙ্কিত হইয়া উঠিল। সে তাহার সরকার ভবনাথকে ডাকিয়া বলিল,—"তুমি একবার টিকটিকি পুলিশে যাও। আমার নাম ক'রে বল, বিশেষ জরুরি কাজ; বাবু একজন গোয়েন্দা চেয়েছেন।"

একজন জাঁদরেল গোয়েন্দা আসিল। নদের চাঁদ তাহার হাতে একখানা চিঠি দিয়া বলিল,—"আমার কাছ থেকে একটা লোক 'পঞ্চাশ হাজার টাকা' লুটে নিতে চায়, আপনারা তদন্ত ক'রে তা'কে বার করুন।" তার পর নদের চাঁদ গোয়েন্দার হাতে সমস্ত চিঠিগুলি দিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময়ে নদের চাঁদ সবে মাত্র বাড়ীর চৌকাঠে পা দিয়াছে, এমন সময়ে পিয়ন তাঁহার হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিল। তাড়াতাড়ি সই করিয়া টেলিগ্রাম লইয়া খুলিয়া দেখে,—তাহার ভিতরেও সেই সর্ব্বনেশে কথা—"পঞ্চাশ হাজার টাকা।"

হঠাৎ এইবার নদের চাঁদের মাথা ঘুরিয়া গেল। পড়িতে পড়িতে তাল সামলাইয়া সে রকের উপর বসিয়া পড়িল। তার পর আস্তে আস্তে উপরে উঠিয়া একেবারে নিজের শুইবার ঘরে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। প্রায় বিশ বৎসর হইল, নদের চাঁদ বিপত্নীক হইয়াছে। তাঁহার পুত্র কন্যা ছিল না এবং দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহও সে করে নাই। বাড়ীতে এক বৃদ্ধা দাসী ও বৃদ্ধ পাচক ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর কেহ ছিল না। তবে দরজায় চারি জন ভোজপুরী দরওয়ান ছিল।

সেদিন রাত্রিতে নদের চাঁদ আর কিছু খাইল না। প্রভাতে শয্যাত্যাগের পরে যাহারা তাহাকে দেখিল, তাহারা স্পষ্টই দেখিতে পাইল. একরাত্রির মধ্যে তাহার আকৃতি যেন অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। চোখের কোণে কে যেন মসী ঢালিয়া দিয়াছে। তাহার উপর দুইটি চক্ষুই রক্তবর্ণ। মাথার চুল রুক্ষ; কত কাল যেন তাহাতে তৈল পড়ে নাই। দেহের রংও ফ্যাকাশে হইয়া গিয়াছে। লোকজনেরা বুঝিল,—বাবুর অসুখ হইয়াছে। কিন্তু যাহারা মানুষের অন্তর দেখিতে পাইত তাহারা বেশ বুঝিয়াছিল যে, চিঠিতে লিখিত "পঞ্চাশ হাজার টাকা"র সহিত কুণ্ডু মহাশয়ের একটা কিছু সম্বন্ধ আছে, সে স্মৃতি মনে উদিত হওয়াতেই তাহার এই দশা ঘটিয়াছে।

ক্রমে এমন হইল, নদের চাঁদ আহার-নিদ্রা একরূপ ত্যাগ করিল এবং গদীতে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। শেষে একেবারেই শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিল। ডাক্তার প্রত্যহ আসিয়া চিকিৎসাও করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার আকৃতির কোনও উন্নতি বা পরিবর্ত্তন হইল না। দিন দিন নদের চাঁদ শুকাইতে লাগিল।

এদিকে রোগের যেমন উৎপাত, চিঠির উৎপাত তাহার চেয়েও বেশী। প্রত্যহ দুইখানি করিয়া চিঠি আসিতে লাগিল। সকল চিঠিতে একই কথা— "পঞ্চাশ হাজার টাকা।" হাতের লেখাও সব একরকমের।

একদিন নদের চাঁদ ভবনাথ সরকারকে ডাকাইয়া বলিল,—"দেখ তুমি খুব হুসিয়ার হ'য়ে কাজ কর্ম্ম কর্‌বে। জোর তাগিদ ক'রে মাসে মাসে সুদ আদায় কর্‌তে সুরু কর। আমি কাল থেকে আমার বাগান-বাড়ীতে থাক্‌ব। সেখানকার চোরা কুঠুরিতে আমার অনেক টাকা আছে, তা' বোধ হয় তুমি জান। আমার "স্পেশ্যাল লাইসেন্স" আছে। তুমি এই কাগজখানা দেখিয়ে আমার জন্য একটা রিভলভার ও কিছু টোটা খরিদ করে এনো। এটা আমি বাগান বাড়ীতে নিজের কাছে রাখ্‌ব। কালই চাই—বুঝ্‌লে।"

তার পর দিন বেলা তিনটা সাড়ে তিনটার সময়ে ভবনাথ রিভলভার ও টোটা লইয়া একেবারে বাগান-বাড়ীতে প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইল। প্রভু রিভলভার দেখিয়া বেশ সন্তুষ্ট হইয়া বলিল—"জান তো ভবনাথ বিশ বছর আগে রিভলভারে একটা ভালুক শিকার করেছিলাম। এখনও বোধ হয় পারি। তবে শরীর যে রকম দুর্ব্বল হয়ে আস্‌ছে, তা'তে বেশী দিন আর বাঁচি বলে ত মনে হয় না।"

ভবনাথ বলিল,—"বাঁচ্‌বেন না তো কি ; এই'ত আপনার পঁয়ষট্টি বছর বয়েস। আপনার চেয়ে কত বেশী বয়সের লোক বেঁচে রয়েছে এবং কাজ-কর্ম্ম করে টাকা জমাচ্ছে।"

ভবনাথের কথা শেষ হইয়াছে মাত্র ; এমন সময়ে এক অপরিচিত ব্যক্তি নদের চাঁদের ঘরে প্রবেশ করিল। তাহার মুখ দীর্ঘ শ্মশ্রু-গুম্ফে আবৃত। সে আসিয়াই বলিল,—"নদের চাঁদ বাবু। আমার সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা দিন।" নদের চাঁদ বিরক্তির সহিত তাহার দিকে তাকাইল। তখন আগন্তুক একটু উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিল,—"মনে পড়ে, গঙ্গার মোহনায় সেই ভীষণ ঝড়? সেই ঝড়ের বেগে তৈলঙ্গীদের পালওয়ালা জাহাজ চড়ায় ঠেকে ফেঁসে গেল। যাত্রীদের প্রায় সকলেই ডুবে গেল। কেবল আপনি ও আমি আর কয়জন নর-নারী কোনও ক্রমে সেই ভাঙ্গা জাহাজটাকে ধরিয়া সমুদ্রের বুকে ভাস্‌তে লাগ্‌লাম। শেষে"—নদের চাঁদ বাধা দিয়া বলিল—"কে তুই আমার কাছে টাকা নিতে এসেছিস্‌? আমি তোকে চিনি নে।"

আগন্তুক বলিল,—"ভয় দেখাবেন না, আমি এই দণ্ডে টাকা চাই।"

এই কথা শুনিয়া সেই বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-সঙ্কুল সমুদ্রের ছবি নদের চাঁদের চিত্তপটে উদিত হইল। সে চমকিয়া উঠিল। আগন্তুক সেই সময়ে আবার টাকা চাহিল। তখন নদের চাঁদ বালিসের তলা হইতে নূতন রিভলভারটা বাহির করিয়া তাহার দিকে লক্ষ্য করিল। আগন্তুকও কোমর হইতে রিভলভার বাহির করিয়া প্রস্তুত হইল। তার পর নদের চাঁদ ও আগন্তুক এক সঙ্গে রিভলভারের ঘোড়া টিপিল ; একটা শব্দ হইল।

ভবনাথ সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিল,—নদের চাঁদ সংজ্ঞাহীন হইয়া বিছানার উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। সে তাড়াতাড়ি তাহার প্রভুর নিকটে গিয়া দেখিল,—প্রভুর জীবন শেষ হইয়াছে। পিছনে চাহিয়া দেখিল, আগন্তুক সেখানে নাই।

(৩)

তখনই সোরগোল পড়িয়া গেল। দরওয়ানেরা অসিয়া ভবনাথকে ধরিল। কারণ, তাহারা জানিত ভবনাথ রিভলভার কিনিয়া আনিয়াছে। তাহাদের খুবই ধারণা হইল,—ভবনাথই তাহাদের 'বাবু'কে খুন করিয়াছে।

পুলিশ আসিল। পুলিশের নিকট ভবনাথ নিম্নরূপ জবানবন্দী দিল :—

"গত কল্য আমার প্রভু আমাকে একটা রিভলভার ও কতকগুলা টোটা কিনিতে দিয়াছিলেন। আমি আজ বৈকালে উহা কিনিয়া আনিয়া প্রভুর হাতে দিই। তিনি উহা নিজের বালিসের নীচে রাখেন। তার পর আমার সঙ্গে কাজকর্ম্মের ও অন্যান্য কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময়ে এক জন অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হয়। সে আসিয়াই "পঞ্চাশ হাজার টাকা" চাহে। প্রভু তাহাতে বিরক্ত হন। কিন্তু সেই লোকটা বলে, 'মনে পড়ে গঙ্গার মোহনায় সেই ভীষণ ঝড়। সেই ঝড়ের বেগে তৈলজীদের জাহাজ চড়ায় ঠেকে ফেঁসে গেল। যাত্রীদের প্রায় সকলেই ডুবে গেল। আপনি ও আমি আর কয় জন নর-নারী কোনও ক্রমে সেই ভাঙ্গা জাহাজটাকে ধরে ভাস্‌তে লাগ্‌লাম। কিন্তু তিনি বলিলেন,—'তুই কে তোকে আমি চিনি নে।' তখন আগন্তুক বলিল,—'আমি এই দণ্ডে টাকা চাই।' তার পর আমার প্রভু রিভলভার বাহির করিলেন; আগন্তুকও রিভলভার বাহির করিল। শেষে দুই জনেই ঘোড়া টিপিল। আমার প্রভু আগন্তুকের গুলিতে নিহত হইলেন। ইহার বেশী আমি কিছু জানি না।"

আদালতেও সে এই জবানবন্দীরই পুনরুক্তি করিল।

সরকার-পক্ষ সপ্রমাণ করিল যে, ভবনাথই উহার প্রভুকে হত্যা করিয়াছে। নদের চাঁদ এক উইল করিয়াছিলেন, উহাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উল্লেখ ছিল যে, ভবনাথ বাল্যাবধি বিশ্বস্তভাবে আমার কাজকর্ম্ম করিয়া আসিতেছে; এইজন্য উহাকে আমি এক লক্ষ টাকা প্রদান করিতেছি। আমার মৃত্যুর পরে সে উহা পাইবে।" এই টাকা শীঘ্র হস্তগত করিবার জন্যই ভবনাথ তাহার প্রভুকে হত্যা করিয়াছে। বিশেষতঃ নদের চাঁদের ফুসফুসের ভিতর হইতে যে গুলি বাহির হইয়াছে, তাহা ভবনাথ কর্ত্তৃক ক্রীত রিভল্‌ভারের গুলি। সুতরাং ভবনাথ যে এই রিভলভারের গুলি দ্বারা তাহার প্রভুকে খুন করিয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। তার পর ভবনাথ যে তাহার প্রভুর ঘরে অপর ব্যক্তির উপস্থিতির কথা বলিয়াছে তাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ, হত্যার পরমুহূর্ত্তেই বাড়ীর লোকজনেরা সেই ঘরে আসিয়াছিল; কিন্তু তথায় কোনও লোককে দেখিতে পায় নাই। সুতরাং ভবনাথ যে খুন করিয়াছে তাহা নিশ্চিত।

আদালতও এই অকাট্য প্রমাণ অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ভবনাথের ফাঁসির হুকুম হইল।

(৪)

ব্রজমোহন আজ দুই বৎসর হইল, গোয়েন্দা বিভাগে কার্য্য করিতেছে। ইতিমধ্যেই কর্ত্তৃপক্ষ তাহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়াছেন। দুইটি বড় বড় জটিল খুনের কিনারা করিয়া ব্রজমোহন সরকারী পুরস্কারও লাভ করিয়াছে। সে এই খুনী মামলার বিবরণ সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া একটু চিন্তিত হইল। তাহার কেমন যেন মনে হইল যে, এক জন নিরপরাধ ব্যক্তির ফাঁসি হইতেছে।

ব্রজমোহন এই মামলার বিষয়টী ভাবিতেছে, এমন সময়ে তাহার বন্ধু গণপতি তাহার নিকটে উপস্থিত হইল। সে বলিল, 'কি হে ব্রজমোহন বিকেল বেলা গম্ভীর হ'য়ে ভাবছ কি?'

ব্রজমোহন বলিল,—"নদের চাঁদ কুণ্ডুর হত্যাকারীর কথা ভাবছি।"

গণপতি তখন পকেট হইতে একখানা সংবাদপত্র বাহির করিয়া বলিল,—"এই দেখ—কাগজে খবর বাহির হইয়াছে যে, কে একটী লোক লাট সাহেব ও বড় জজ সাহেবকে চিঠি দিয়া জানাইয়াছে যে ভবনাথ নির্দ্দোষ; সে হত্যাকারী নয়। আমারও কিন্তু তাই মনে হয়। আরও আশ্চর্য্য এই, 'পঞ্চাশ হাজার টাকা' যে হাতের লেখা, চিঠিখানাও সেই হাতের লেখা।"

ব্রজমোহন বলিল, "তুমি কি ভাব যে ভবনাথ হত্যা করে নাই, হত্যা অপরে করেছে?"

গণপতি বলিল,—"হাঁ; তাই ত মনে হয়। কারণ ভবনাথের জবানবন্দীকে যদি সত্যি ব'লে ধরা হয়, তা'হলে নদের চাঁদ যে গুলি ছুঁড়েছে সে গুলি কোথায় গেল? ঘরে সকল জায়গা তন্ন তন্ন করে পুলিশ খুঁজে দেখেছে কিন্তু সেই গুলি পাওয়া যায় নি। আমার মনে হয়, গুলিটা সেই আগন্তুকের দেহেই বিদ্ধ হ'য়েছে। সেই গুলিটা যদি এখনও সেই লোকটার গায়ে থাকে এবং লোকটাকে যদি তোমরা বার কর্‌তে পার, তা' হ'লে আমার বিশ্বাস এক জন নির্দ্দোষীর প্রাণরক্ষা হয়।

ব্রজমোহন বলিল,—"তুমি তো অবাক্ কর্‌লে দেখ্‌ছি।"

গণপতি তখন আরও উৎসাহের সহিত বলিতে লাগিল,—"আরও একটা কথা আছে। বিচারকেরা সে দিকে লক্ষ্য করেন নাই। নদের চাঁদ যে ঘরে খুন হয়, সেই ঘরের দরজার পাশে একটা পর্‌দা টাঙ্গানো ছিল। গুলির আওয়াজের পর যখন নদের চাঁদের লোকজন ঘরে ঢুকে, সেই সময়ে খুনে লোকটা নিশ্চয়ই সেই পর্দ্দার আড়ালে লুকিয়েছিল। তার পর সে সরে পড়ে।"

অতঃপর চা খাইয়া গণপতি চলিয়া গেল। ব্রজমোহন ভাবিতে লাগিল,—তবে কি ভবনাথ নির্দ্দোষ ?

(৫)

ব্রজমোহন এই মামলাটীর সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে বৃদ্ধ ডাক্তার সান্ন্যাল তাহার পুত্রকে দেখিতে আসিলেন। ব্রজমোহন ডাক্তার বাবুকে বলিল,—"আমার ছেলেটা অনেকটা সেরে উঠেছে। এই দেখুন সে আপনার গলার আওয়াজ পেয়ে আপনি এখানে এসেছে।" ডাক্তার সান্ন্যাল একটু মৃদু হাসিয়া ছেলেটীর হাত দেখিলেন। তার পর একটা প্রেস্ক্রিপসন লিখিয়া দিয়া ছেলেটীকে বলিলেন, "এই ওষুধটা দু'বেলা খেও ; আর আমার আসবার দরকার হ'বে না।" ছেলেটী প্রেস্ক্রিপসন লইয়া বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল।

ডাক্তার সান্ন্যাল অতঃপর ব্রজমোহনকে বলিলেন,—"দেখুন, আপনাকে একবার আমার সঙ্গে যেতে হবে। একটা লোক আমাকে একটা ফোড়ার ঘা দেখাতে এসেছিল ; কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্চে—সেটা রিভলভারের গুলির আঘাত থেকেই হয়েছে। আমি অস্ত্র করব, যদি গুলি বেরোয়, তবে তোমার একটা শিকার হতে পারে। আর আমিও নিরাপদ হ'ব।"

ব্রজমোহন উৎসাহের সহিত বলিল,—"বেশ ত, চলুন।" তখনই ডাক্তার সান্ন্যাল তাহাকে নিজের গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া রোগীর বাড়ীর দিকে চলিলেন।

তাঁহারা রোগীর ঘরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে, সে ডাক্তার বাবুকে দেখিয়া আশ্বস্ত হইয়া বলিল, 'মশাই, যা' করবেন ক'রে নিন্, আমি ত আর বাঁচি নে।"

ডাক্তার সান্ন্যাল রোগীর বাম হাতে অস্ত্রোপচার করিলেন। ক্ষত স্থান হইতে একটী গুলি বাহির হইল। তখন ডাক্তার বাবু বলিলেন,—"এ কি এ যে গুলি! তবে কি কেউ তোমাকে গুলি মেরেছিল।"

রোগী নিরুত্তর রহিল।

ডাক্তার সান্ন্যাল বলিলেন,—"এখন দিনকাল বড় খারাপ পড়েছে। এই দেখুন না সে দিন নদের চাঁদ ঘোষকে তার সরকার গুলি ক'রে মেরেছে, তোমারও দেহে দেখ্‌ছি গুলির আঘাত! এ সব ব্যাপার পুলিশকে জানান ভাল।"

ব্রজমোহন বলিল,—"না, এ আর কে টের পাবে? আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে চিকিৎসা করুন।"

ডাক্তার সান্যাল বলিলেন—"বেশ, তাই করব। দেখ নিয়তির হাত এড়ান যায় না। নদের চাঁদ যদি মরত, আজ ২০ বছর আগে সেই জাহাজ-ডুবির সঙ্গে সঙ্গেই তা' ঘটত। কিন্তু তার মৃত্যু হবে—গুলিতে; তাই তখন সে মরেনি।"

ব্রজমোহন লক্ষ্য করিল,—এই কথায় রোগীর মুখ যেন পাংশুবর্ণ হইয়া উঠিল। সে আরও লক্ষ্য করিল, ঘরের দেওয়ালে দুইখানি ফটো টাঙ্গানো; তাহা রোগীর। নদের চাঁদের হত্যাকারীর গোঁফদাড়ী ছিল, রোগীর উহা নাই। তবে কি লোকটা কৃত্রিম গোঁফ-দাড়ী পরিয়া হত্যা করিতে গিয়াছিল? কি জানি কেন, ব্রজমোহনের অন্তরাত্মা বলিয়া দিতেছিল, এই ব্যক্তিই খুনী।

(৬)

ডাক্তার সান্যালের সঙ্গে ব্রজমোহন বাড়ীতে ফিরিল। তার পর তাড়াতাড়ি স্নানাহার করিয়া তাহার বন্ধু বংশীধর বাবুর বাড়ীতে গেল। ইঁহার বাড়ীতে পুরাতন খবরের কাগজের 'ফাইল' আছে। সে খুঁজিতে খুঁজিতে যাহা দেখিল তাহা এই।—২০ বছর আগে গঙ্গার মোহনায় তৈলঙ্গীদের একখানা জাহাজ ঝড়ে চড়ায় ঠেকিয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। কেবল নদের চাঁদ ও আর এক ব্যক্তি বাঁচিয়া ছিল। শেষোক্ত ব্যক্তির নাম—রূপচাঁদ দাস। তখন তাহার বয়স ২৫ বৎসর বলিয়া লিখিত ছিল। ব্রজমোহন অনুমানে বুঝিল, আহত লোকটার বয়সও পঁয়তাল্লিশের বেশী হইবে না। রোগী এক্ষণে সে নাম গোপন করিয়া 'ভবানী" এই কাল্পনিক নাম লইয়াছে।

এই বার ব্রজমোহন রূপচাঁদ ওরফে ভবানীর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। সে বলিল,—"আমি ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে এসেছি। তুমি কেমন আছ।"

রোগী বলিল,—"এ বেলা অনেকটা ভাল; জ্বালা-যন্ত্রণা কমিয়াছে।"

ব্রজমোহন বলিল,—"দেখ ভবানী, তোমার নাম যে ভবানী নয়—রূপচাঁদ দাস, তা' পুলিশ জানতে পেরেছে। তুমি জাহাজ-ডুবির সময় নদের চাঁদ কুণ্ডুর সঙ্গে ছিলে। কেবল তোমরা দু'জনে বেঁচেছিলে। তুমিই তা'কে "পঞ্চাশ হাজার টাকা"র জন্যে চিঠি লিখতে এবং তুমিই ভবনাথকে নির্দ্দোষ বলে জজের কাছে চিঠি লিখেছিলে, ইহাও পুলিশ জেনেছে। পুলিশের ধারণা, তোমার হাত থেকে যে গুলি বেরিয়েছে তা' নদের চাঁদের রিভল-ভারেরই গুলি। তার পর তুমি কৃত্রিম গোঁফদাড়ী পরে নদের চাঁদকে খুন করেছিলে, তাও বুঝতে পারা গেছে। এখন বাকী তোমার সেই ভাঙ্গা

জাহাজে কি ঘটেছিল তা' জানা—সেটা ধর্ম্ম জানিয়ে দেবেন। ঈশ্বর এক জন নির্দ্দোষীকে ফাঁসিকাঠে লট্‌কাবেন না।"

রোগী শিহরিয়া উঠিল। তার পর কি ভাবিয়া বলিল, "দেখুন আপনি যা' বল্‌ছেন, তা আমি অস্বীকার কর্‌ব না। করে'ও আর লাভ নেই। আমি মানুষ; একজন নিরপরাধ লোক যে ফাঁসি-কাঠে ঝুল্‌বে, এ দৃশ্য আমি দেখ্‌তে পারব না। তবে শুনুন,—ঝড়ে সেই জাহাজখানা চড়ায় আট্‌কে ফেঁসে গেল। আমরা ৫।৭ জন কোনও মতে সেই ভাঙ্গা জাহাজটাতে রয়ে গেলাম। তার পর ঢেউয়ের চোটে সকলেই ভেসে গেল। বাকী রইলেম—আমি, নদের চাঁদ ও আর এক ব্যক্তি। আমাদের সঙ্গে যে খাবার ও জল ছিল, তা'তে তিন জন লোকের দেড় দিন কোনও মতে চল্‌তে পারে। নদের চাঁদকে আমি এ কথা জানালেম। বল্‌লেম,—'দেড় দিন' পরে আমাদের শুকিয়ে মর্‌তে হবে।' উঃ কি যন্ত্রণা! নদের চাঁদ তখন চুপ ক'রে রইল। তার পর যখন তৃতীয় ব্যক্তি ঘুমিয়ে পড়্‌ল; তখন নদের চাঁদ আমাকে ডেকে বল্‌লে,—'দেখ ভাই! তুমি আর আমি এই খাবার আর জল খেয়ে তিন দিন বেশ থাকৃতে পার্‌ব; কিন্তু এ লোকটা সঙ্গে থাক্‌লে তা' হ'বে না। তিন দিনে আমরা হয়ত সাহায্য পেতে পারব। আর এক কথা,—আমার অনেক টাকা আছে। আমি গেলে অনেক লোকের সর্ব্বনাশ হবে। তুমি যদি নিজেকে ও আমাকে বাঁচাতে চাও ত এই লোকটাকে সমুদ্রে ফেলে দাও; আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা তোমায় দিব।' আমার ঘাড়ে শয়তান চাপ্‌ল। আমি তুচ্ছ টাকার লোভে নরহত্যা কর্‌লাম। তার পর কল্‌কেতায় এসে নদের চাঁদের কাছে ক্রমাগত তাগাদা করেছি, সে টাকা দেয়নি; পুলিশের ভয় দেখিয়েছে। এর পর আমি প্রায় ২০ বছর বিদেশে কাজকর্ম্ম করে কাটিয়েছি। মাস দুই তিন, হ'ল কল্‌কেতায় এসেছি। আমি টাকার কথা একেবারে ভুলেই গেছলেম। হঠাৎ এক দিন খবরের কাগজে নদের চাঁদের নাম প'ড়ে সেই পুরাণো স্মৃতি আবার জেগে উঠল। তাই চিঠি লিখে, টেলিগ্রাম করে সেই টাকার তাগিদ আরম্ভ কর্‌লেম। কিন্তু নদের চাঁদ তবুও টাকা দিলে না। তাই আমি নিজে তাঁর বাড়ীতে এই ভেবে টাকা আনতে গেছলেম,—আমাকে দেখে যদি টাকা দেয়! বিপদের ভয়ে গুলিভরা রিভলভারও সঙ্গে নিয়েছিলেম। কিন্তু টাকা চাইতেই নদের চাঁদ আমাকে লক্ষ্য করে রিভলভার ছুঁড়ল; তার পর আমিও ছুড়্‌লাম। তাকে হত্যা করবার ইচ্ছে আমার ছিল না, কিন্তু সে আমার গুলিতেই নিপাত হ'ল; আর তার

গুলি আমার বাঁ হাতে বিঁধে গেল। তোমার ডাক্তার বাবু সেই গুলির ঘায়েরই ত চিকিৎসা কর্‌ছেন।"

ব্রজমোহন বলিল,—"তুমি যে কথা আমার কাছে স্বীকার কর্‌লে, সে কথা বিচারকের কাছে স্বীকার কর্‌বে কি ?"

রূপচাদ বলিল—"নিশ্চয়ই কর্‌ব। আমি দু' দুটো নরহত্যা কর্‌লেম, আপনি কি আমাকে আরও একটা করাতে চান ?"

ব্রজমোহন দেখিল ঔষধ ধরিয়াছে। সে তার পর দু'জন অবৈতনিক হাকিম ও বড় সাহেবকে সঙ্গে করিয়া রূপচাঁদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল। রূপচাঁদ পূর্ব্ববৎ স্বীকারোক্তি করিল।

যথাসময়ে উৰ্দ্ধতন রাজপুরুষগণ একথা জানিলেন। ফলে রূপচাঁদ গ্রেপ্তার হইল।

* * * * *

এইবার বিচার। বিচারে ভবনাথ মুক্তি পাইল। রূপচাঁদের উপর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরবাসের আদেশ হইল। তবে প্রভু যে ধর্ম্ম রাখিতে পারে নাই, সেই ধর্ম্ম ভৃত্য ভবনাথ রাখিল। সে নদের চাঁদের উইলের লাখ টাকা পাইয়া তাহা হইতে পঞ্চাশ হাজার টাকা রূপচাঁদের একমাত্র উত্তরাধিকারী—তাহার ভাগিনেয়কে প্রদান করিল।

বাক্য-বাণ।

[শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়]

তরুশাখা ছিন্ন কর কুঠারের ন্যায়,
নবশাখা ধীরে সেথা জন্মে পুনরায়;
বাণে বিদ্ধ দেহ-ক্ষত ক্রমশঃ মিলায়,
বাক্য-বাণ বেঁধে প্রাণ ভুলা নাহি যায়।

তত্ত্ব ও লীলা।

(২)

[অধ্যাপক কুমুদবান্ধব চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ]

জীবলীলা।

"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" ইহা গীতার বাক্য। 'সনাতনঃ' এটী 'অংশ' এই বিশেষ্যের বিশেষণ, অর্থ এই যে আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীব হইয়াছে। সনাতন অর্থ নিত্য। সুতরাং জীব যে নিত্য তাহা গীতা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। এ স্থলে শ্রীভগবান তাঁহার অংশকে সনাতন বলিতেছেন, অর্থাৎ তাঁহার অংশ চিরদিন অংশরূপেই বর্ত্তমান রহিয়াছে ইহাই জানাইতেছেন। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, তিনি চিদবস্তু, তাঁহার আবার অংশাংশিভাব কিরূপ? ইহার সিদ্ধান্ত করিতে হইলে ঋগ্‌বেদের একটী মন্ত্রার্দ্ধ স্মরণ করিতে হইবে; তাহা এই,—"পাদোঽস্য বিশ্বভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি।" অর্থাৎ নিখিল বিশ্ব ইঁহার (তত্ত্ববস্তুর) এক চতুর্থাংশমাত্র, ইঁহার বিনাশরহিত অন্য তিন অংশ দিব অর্থাৎ স্বপ্রকাশস্বরূপে অবস্থান করিতেছে। ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য বলিতেছেন;—"যদ্যপি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মেত্যাম্নানাৎ পরব্রহ্মণ ইয়ত্তাভাবাৎ পাদচতুষ্টয়ং নিরূপয়িতুমশক্যম্ তথাপি জগদিদং ব্রহ্মস্বরূপাপেক্ষয়াল্পমিতি বিবক্ষিতত্বাৎ পাদত্বোপন্যাসঃ।" অর্থাৎ যদিও 'সত্য জ্ঞানও আনন্দব্রহ্ম এইরূপ বেদে আছে বলিয়া পরব্রহ্মের ইয়ত্তার অভাবহেতু চারি অংশ নিরূপণ করা অসম্ভব, তথাপি এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপের সহিত তুলনা করিলে অল্প, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়ে ব্রহ্মের এক পাদের কথা বলা হইয়াছে। 'গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধিমে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ।" অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্ প্রভৃতি অষ্টবিধ আমার অপরা প্রকৃতি, এতদ্ভিন্ন আমার আর একটী পরা প্রকৃতি আছে, উহাই জীবভূতা, ঐ প্রকৃতিই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। এতদ্ দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, ব্রহ্মের দুইটী শক্তি আছে; একটি শক্তি জড়ীয় উপাদানরূপে পরিণত হইয়া জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে এবং আর একটী চৈতন্যময়ী শক্তি জগতের প্রত্যেক ভোগায়তনের জ্ঞাতা হইয়া জীবরূপে

প্রকাশ পাইয়া থাকে। বৈষ্ণব শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত শক্তির নাম বহিরঙ্গা শক্তি ও শেষোক্ত শক্তির নাম তটস্থা শক্তি। অতএব জগতের যে কোনও অংশ বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উহার দেহ ক্ষিতি প্রভৃতি বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা নির্ম্মিত, উহার অধিষ্ঠাতা চেতন পরা প্রকৃতি বা তটস্থা-শক্তি এবং এতদুভয়ের অন্তর্যামী স্বয়ং পুরুষাবতার বা পরমাত্মা। তাঁহারই সত্তাসূত্রে মণিগণের ন্যায় আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে। এ স্থলে বিচার্য্য এই যে, ভগবান্ ক্ষিতি প্রভৃতিকে 'আমি' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, 'আমার প্রকৃতি বা শক্তি' বলিয়াছেন; সেইরূপ জীবকেও 'আমি' বলেন নাই, 'আমার পরা প্রকৃতি বা শক্তি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং ভগবান্ বলিলে যাহা বুঝায়, তাঁহার প্রকৃতি বা শক্তি বলিলে ঠিক তাহা বুঝায় না, তদপেক্ষা ন্যূন বস্তু বুঝায়; কারণ, অনন্তশক্তি ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। অগ্নির দাহিকা শক্তি আছে, কিন্তু দাহিকা শক্তি বলিলেই অগ্নির সমগ্র স্বরূপ বুঝায় না, কারণ অগ্নিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ-শক্তিও বিদ্যমান রহিয়াছে। তিলের তৈলরূপে পরিণত হইবার শক্তি আছে, কিন্তু ঐ পরিণামিনী শক্তির উল্লেখ করিলেই তিলের সমগ্রস্বরূপ বুঝায় না, তদ্‌ভিন্ন কৃষ্ণত্ব স্থানাবরোধকত্ব প্রভৃতি বহু ধর্ম্ম তাহার স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছে। এই নিমিত্ত শক্তি ও শক্তিমান্ এতদুভয়ের মধ্যে ভেদ স্বীকার করিতেই হয়। কিন্তু এই বিষয় উপলব্ধি করিবার আর একটা দিক আছে। আমরা দেখিতেছি, অগ্নি হইতে উহার দাহিকাশক্তিকে বা তিল হইতে উহার পরিণামিনী শক্তিকে একান্ত পৃথক্ করা যায় না; এই জন্য শক্তি ও শক্তিমানকে এক প্রকার অভিন্ন বলা যাইতে পারে। এই অর্থ অবলম্বন করিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যের প্রচার হইয়াছে। জগৎ বলিলে যে ব্রহ্মের সমূহ স্বরূপ বুঝায় না, তাহা পূর্ব্বে শ্রুতিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং জীবাত্মা ও ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ হইলেও যথাক্রমে শক্তি ও শক্তিমান্, সুতরাং জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। জীব ক্ষুদ্র চিৎকণ, ব্রহ্ম ভূমা চিদাধার; জীব যে হেতু তটস্থাশক্তি, এই হেতু মায়ার মধ্যে আসিয়া সংসারী হইতেও পারে, অথবা মায়ার পরপারে থাকিয়া মুক্তরূপে অবস্থান করিতে পারে, কিন্তু ব্রহ্ম চিরদিনই অসংসারী, নিত্যমুক্ত ও বুদ্ধ। এই নিমিত্ত জীব অংশ, ব্রহ্ম অংশী। ব্রহ্ম নিত্য, এই নিমিত্ত তাঁহার শক্তিও নিত্য, সুতরাং জীবও নিত্য। অতএব জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়, এ সিদ্ধান্ত

বেদান্তের অভিপ্রেত নহে। তবে যে "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি" এইরূপ নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার অর্থ এই যে জীবাত্মা যখন জগৎকে বিষয়রূপে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মাকে প্রগাঢ়রূপে উপলব্ধি করিতে থাকে, তখন অন্তঃকরণের নির্বিষয় বৃত্তি উদিত হয়, ইহাকেই ব্রহ্মাকারাকারিত বৃত্তি কহে।

যদি জীবাত্মা ব্রহ্ম হইয়া যায় এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে জীব যে ব্রহ্মের সনাতন অর্থাৎ নিত্য শক্তি এই ভগবদ্‌বাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে, সুতরাং জীব চিরদিনই ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার শক্তিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। কোনও দিনই তাহার ব্রহ্মে একান্তলয় সম্ভব নহে। সিদ্ধান্তটীকে অন্য দিক্ দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। মুক্তির অর্থ দুঃখের চরমধ্বংস ও পরমানন্দপ্রাপ্তি। জীব ব্রহ্ম হইলে দুঃখের চরমধ্বংস হইতে পারে বটে, কিন্তু পরমানন্দপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। জীব যখন বদ্ধাবস্থায় ছিল, ব্রহ্ম তখনও পরমানন্দস্বরূপেই অবস্থান করিতেছিলেন; জীব যখন মুক্ত হইল, ব্রহ্ম তখনও পরমানন্দস্বরূপেই অবস্থান করিতেছেন, কারণ তাঁহার পরমানন্দ-স্বরূপের কখনও হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। সুতরাং জীব মুক্ত হইলে পরমানন্দ পাইলাম বলিয়া কাহার অনুভব হইবে? যদি ব্রহ্মের হয়, তাহা হইলে তাঁহার পরমানন্দের অপ্রাপ্তি ছিল, এক্ষণে প্রাপ্ত হইল এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয়; তাহাতে তাঁহার যে স্বরূপ বেদে নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার অপলাপ হইয়া যায়। সুতরাং জীব বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই তাহার ব্রহ্মানুভূতির প্রারম্ভে পরমানন্দের অনুভব ও ব্যুত্থানকালে পরমানন্দের স্মরণ হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ব্রহ্ম ও জীব উভয়েই সচ্চিদানন্দস্বরূপ; তবে দেহরূপ উপাধিভঙ্গ হইলে ব্রহ্মস্বরূপ হইতে তাহার স্বরূপকে কে পৃথক্ করিয়া রাখিবে? ঘট ভগ্ন হইলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে লীন হইয়া যায়, সেইরূপ দেহ ভগ্ন হইলে জীবাত্মা ব্রহ্মে লীন হইয়া যাইবে। এই সিদ্ধান্তটী পরীক্ষা করিলে প্রতীতি হয় যে, এ স্থলে ঘটাকাশ কল্পিত, উহা সনাতন নহে, ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে উহার অস্তিত্ব ছিল না: কিন্তু জীব সেরূপ কল্পিত বস্তু নহে, উহা ভগবানের সনাতন অংশ, সুতরাং উপাধিভঙ্গ ঘটিলেও উহার অস্তিত্বের বিলোপ হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে যে মুক্ত জীবের অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য একটী জড়ীয় ভেদক পদার্থের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদের বোধ হয়, উহা আমাদের জড়বস্তুর সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ফল।

এই নিমিত্ত দেশ ও কালকে বাদ দিয়া আমরা কোনও বস্তুর অস্তিত্ব কল্পনা করিতে পারি না। কোনও বস্তু আছে বলিলেই কোথায় আছে ও কখন আছে এই প্রশ্ন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে; কিন্তু এই দেশ ও কাল ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, সুতরাং তিনি দেশে ও কালে আবদ্ধ নহেন। এই নিমিত্ত তিনি কোথায় আছেন ও কবে আছেন এই প্রশ্ন সমীচীন নহে। চৈতন্য বস্তু দেশ ও কালে আবদ্ধ না হইয়াও থাকিতে পারে। এই জন্য শত শত মুক্ত জীবাত্মা থাকিলেও তাঁহাদের দেশের বা কালের আদৌ আবশ্যকতা হয় না। ব্রহ্ম হইতে তাঁহাদিগের প্রভেদ এই যে, ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি, তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু জীবাত্মার সে শক্তি বা যোগ্যতা নাই। জীব যতই সমর্থ হউক না, কখনও অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারিবে না। ব্রহ্মের অনন্ত শক্তির সহিত তুলনা করিলে জীবের পরিমিত শক্তি অতীব ক্ষীণ বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। যদি চিদ্বস্তুর সহিত জড়বস্তুর কথঞ্চিৎ তুলনা স্বীকার করা যায়; তাহা হইলে প্রকাণ্ড অগ্নিপিণ্ড ও তাহার স্ফুলিঙ্গের সহিত উপমা দেওয়া যাইতে পারে। যেমন অগ্নিপিণ্ড ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গ স্বরূপতঃ একই বস্তু, উভয়েই অগ্নি, তথাপি ঐ উভয়ের মধ্যে শক্তির তারতম্য আছে। অগ্নিপিণ্ড শীতার্ত্তের শীতনিবারণে সমর্থ, কিন্তু স্ফুলিঙ্গের তাদৃশ সামর্থ্য নাই। পরিমাণের তারতম্য ছাড়িয়া দিলেও, শক্তির তারতম্যেই উভয়ের পার্থক্য বজায় থাকিবে। অতএব শক্তির তারতম্যই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, বেদে আত্মার একত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, উপাধি বহু হইলেও আত্মা এক—ইহাই বেদের সিদ্ধান্ত, সুতরাং বহু আত্মার অস্তিত্ব সম্ভব হইলে উহার অপ্রতিষ্ঠা হইয়া যায়, অতএব পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমীচীনতা কোথায়? সঙ্গতি আছে, দেখাইতেছি। পূর্ব্বে তত্ত্ববস্তুর আলোচনায় দেখিয়াছি, অবয়বের বহুত্ব দ্বারা অবয়বীর একত্ব খণ্ডিত হয় না, অংশের বহুত্ব হইলেও অংশীর একত্বের, অদ্বৈতভাবের অপলাপ হয় না। পরা বা অপরা প্রকৃতি হইতে যাহা কিছু প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্মসত্তার উপরেই হইয়াছে, তাঁহার সত্তার বাহিরে কোনও বস্তুরই প্রকাশ হইতে পারে না, কারণ, তিনি ছাড়া আর দ্বিতীয় সত্তাশ্রয় বস্তুই নাই; সুতরাং এই যে অসংখ্য জীবাত্মা ব্রহ্মের সত্তায় প্রকাশ পাইতেছে, তাহাতে ব্রহ্মের অদ্বৈত-স্বরূপের হানি হইতেছে না; তিনি 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'ই আছেন। বহুত্ব

দেখিতেছেন জীবাত্মা, একত্ব দেখিতেছেন ব্রহ্ম। সুতরাং নিখিল আত্মার আত্মপ্রদ, আশ্রয় ও নিত্য উপজীব্য ব্রহ্মের একত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই যে তিনি নিজের সত্তায় যুগপৎ ভেদ ও অভেদের প্রতিষ্ঠা করিয়া অচিন্ত্য, অপ্রতর্ক্য লীলা নিত্যকাল প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা অচিন্ত্য ভেদাভেদ; ইহা তাঁহার পরম বিচিত্র পরমাদ্ভুত জীবলীলা।

নিত্যলীলা।

আমরা এতক্ষণ তত্ত্ববস্তুর ব্রহ্মপ্রকাশ ও পরমাত্মপ্রকাশ আলোচনা করিলাম; এক্ষণে তাঁহার ভগবৎপ্রকাশ কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। স্মরণ রাখিতে হইবে এই ত্রিবিধ প্রকাশই সত্য, ইহার কোনওটীই মায়িক নহে। তত্ত্ববস্তুই অচিন্ত্য শক্তিবলে জ্ঞানীর সমাধিপথে ব্রহ্মস্বরূপে, যোগীর যোগ-মার্গে পরমাত্মরূপে ও ভক্তের ভক্তিনেত্রে ভগবদ্রূপে চিরাদনই প্রকাশিত রহিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি, ব্রহ্ম বা পরমাত্মপ্রকাশে দেশ ও কালের আবশ্যকতা নাই; কিন্তু ভগবৎপ্রকাশে তাহা নহে। এই প্রকাশে তত্ত্ববস্তু দেহধারিরূপে প্রকাশিত হন। তাঁহার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একটী ধামের ও বহুপরিকরের প্রকাশ হইয়া থাকে। ভগবানের এই দেহ, ধাম ও পরিকর সকলই চিন্ময় অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বে নির্ম্মিত। ব্রহ্মাণ্ডের উপাদানে যে সত্ত্বগুণ আছে, উহা রজস্তমোমিশ্রিত, বিশুদ্ধ সত্ত্ব নহে। এ বিষয়ে শ্রীমদ্ বোপদেব স্বকৃত মুক্তাফলটীকায় অতি প্রাঞ্জলরূপে বলিয়াছেন; যথা,—"সঃ (বিষ্ণুঃ) দ্বেধা, নিরাকারঃ সাকারশ্চ। অনবচ্ছিন্নং চৈতন্যং নিরাকারঃ, সত্তাবচ্ছিন্নং চৈতন্যং সাকারঃ। সঃ (সাকারঃ) চতুর্দ্ধা—রজস্তমোভ্যাং যুক্তে সত্ত্বে পুরুষঃ, রজসা ব্রহ্মা, তমসা রুদ্রঃ শুদ্ধে বিষ্ণুরেবঃ। "অর্থাৎ উপাধি যদি রজঃ ও তমোগুণ-মিশ্রিত সত্ত্ব হয়, তাহা হইলে তদন্তর্যামীকে পুরুষ কহে; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড দেহের অন্তর্যামী আত্মা পুরুষ এবং জীবদেহের অন্তর্যামী আত্মাও পুরুষ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহা আত্মার এক প্রকার সাকার মূর্ত্তি। যদি আত্মা কেবল রজোগুণকে দেহরূপে গ্রহণ করেন, অর্থাৎ অবিমিশ্র রজোগুণে তাঁহার দেহের উপাদান হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম ব্রহ্মা। যদি অবিমিশ্র তমোগুণে তাঁহার দেহ গঠিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম হয় রুদ্র; আর যদি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ তাঁহার দেহের উপাদান হয়, তাহা হইলে তিনি বিষ্ণুনাম ধারণ করেন। শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুর দেহের উপাদান বলিতে গিয়া বলিয়াছেন, "রজস্তম অসংভিন্নং

বিশুদ্ধসত্ত্বোজ্জ্বলম্" অর্থাৎ ভগবানের দেহ রজোগুণ ও তমোগুণের সহিত অমিশ্র কেবল সত্ত্বগুণে নির্ম্মিত হওয়ায় উহা উজ্জ্বল। সত্ত্বগুণে চাঞ্চল্য ও জড়তার লেশমাত্র নাই, কেবল প্রকাশ-স্বভাবতা আছে মাত্রে। সুতরাং উহা চৈতন্যকে আদৌ আবরণ করে না, এই হেতু ভগবান্ দেহী হইয়াও অনাবৃতচৈতন্য। ঈদৃশ সত্ত্বকে ভগবানের স্বরূপশক্তি বলা হইয়াছে; তিনি এই শক্তির বলে চিরকাল স্বপ্রকাশ হইয়া আছেন, ইহার পরিবর্ত্তন নাই, ব্যত্যয় নাই। ইহার উপর অনন্ত বৈচিত্র ক্রীড়া করিলেও এই উপাদানের পরিবর্ত্তন অর্থাৎ প্রকাশ-স্বভাবতার অণুমাত্র হানি হয় না। এই নিমিত্ত ইহা স্বরূপশক্তি, নিত্যশক্তি; ইহাকে বাদ দিয়া কি ব্রহ্ম, কি পরমাত্মা, কি ভগবান, কাহাকেও উপলব্ধি করিবার উপায় নাই। শ্রীভগবানের দেহ, তদীয় নিত্য ধাম ও তদীয় পরিকরসকলের মূর্ত্তি এই বিশুদ্ধ সত্ত্বোপাদানে গঠিত।

যে শক্তির বলে তত্ত্ববস্তু স্বপ্রকাশ, যাহা চৈতন্য বস্তুর নিত্য সঙ্গী, তাহারই নাম বিশুদ্ধসত্ত্ব। যখন কোনও বিশেষ মূর্ত্তি উপলব্ধ হয় না, কেবল চৈতন্যের প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহাকেই ব্রহ্ম বা পরমাত্মপ্রকাশ কহে। উহাকেই জ্ঞানী ও যোগিগণ নিরাকার বলিয়া থাকেন, কিন্তু উহা শূন্য নহে, এই অর্থ বুঝাইবার জন্য তাঁহারা "স্বরূপ" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। 'স্বরূপ' শব্দের অর্থ নিজের রূপ; অতএব ব্রহ্মানুভূতিতেও রূপ রহিয়াছে, উহা সামান্যতঃ প্রকাশরূপ, ঐ প্রকাশোপাদানে কোনও বিশেষ নরাকারাদি মূর্ত্তি উপলব্ধ হয় না বলিয়া উহার নিরাকার সংজ্ঞা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যদি ঘটাদি বিশেষ রচিত মূর্ত্তিকেই আকার বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে সামান্যতঃ মৃত্তিকাকে নিরাকার বলা যাইতে পারে। সেইরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বোপহিত চৈতন্যকেও নিরাকার বলা যায়। সর্ব্বসংবাদিনীতে শ্রীমজ্জীবগোস্বামী বলিয়াছেন,—"অথ যৎ পৃষ্টং নিষিদ্ধ নীলপীতাদ্যাকারস্য তস্য জ্ঞানমাত্রস্য বস্তুনঃ কথং তত্তৎবর্ণত্বং, কথং বা পরিচ্ছেদরহিতস্য চতুর্ভুজাদ্যাকারত্বেন পরিচ্ছিন্নত্বম্, কথং বা বৈকুণ্ঠাদীনামপি তদ্রূপত্বমিতি। তত্রৈশ্বর্য্যাদিবৎস্বপ্রকাশত্বেন বিভুত্বেন তত্ত্বেন চ তত্তদুপাধিরহিতস্বরূপমাত্রত্বম্॥" "যৎ তস্য শ্রীবিগ্রহস্য পরিচ্ছিন্নত্বেঽপ্যপরিচ্ছিন্নত্বং শ্রূয়তে তচ্চ যুক্তমচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ সর্ব্বৈষাং বিভুত্বাদিপরমশক্তিনামেকাশ্রয়ত্বাচ্চ।" অর্থাৎ জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, জ্ঞানমাত্র বস্তুর নীলপীতাদি আকার নিষিদ্ধ, তবে কিরূপে ভগবানের নীলপীতাদি আকার হইল? জ্ঞানমাত্র বস্তু পরিচ্ছেদরহিত হইয়াও কিরূপে চতুর্ভুজাদি আকারে

পরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন, কিরূপেই বা বৈকুণ্ঠাদি ধাম জ্ঞানমাত্রবস্তুতে রচিত হইতে পারে? উত্তর এই যে, মায়িক উপাধিতে উপহিত জ্ঞানবস্তুর যে স্বরূপ বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা কোথাও ঐশ্বর্য্যাদিযুক্ত স্বপ্রকাশ, কোথাও বিভু এবং কোথাও বা চৈতন্যমাত্র লক্ষিত হইয়াছে, ঐ ঐ স্থলে কেবল মায়িক উপাধিটী বাদ দেওয়া হইয়াছে। অন্য একটী প্রশ্ন এই যে, শ্রুতিতে দেখা যায়, ভগবদ্‌বিগ্রহ পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন, ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? উত্তর এই যে, তত্ত্ববস্তু অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত এবং সেই একমাত্র আধারকে আশ্রয় করিয়া বিভুত্ব প্রভৃতি পরমশক্তিসকল অবস্থান করিতেছে, এই নিমিত্ত সকলই তাঁহাতে সম্ভব।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদের অভিপ্রায় এই যে, স্বরূপ বলিতে স্বপ্রকাশ চৈতন্য বুঝায়; এই স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া ঐশ্বর্য্যরূপ ভগবত্তা, পরমাত্মার বিভুত্ব ও ব্রহ্মের চিন্মাত্রত্ব সকলই একাধারে বাস করিতেছে। কেমন করিয়া বাস করিতেছে ইহা বলিবার কাহারও সাধ্য নাই, এই নিমিত্ত উহা অচিন্ত্য। বস্তুতঃ জীব যদি ভগবানের সমস্ত শক্তিই বুঝিয়া লইতে পারে, তাহা হইলে ভগবান্ আর ভগবান্ থাকেন না, তিনি জীবের আয়ত্ত হইয়া পড়েন; অতএব ভগবান্‌কে ভগবান্ থাকিতে হইলে তাহার শক্তি জীবের অচিন্ত্য বলিতেই হইবে। শ্রীভগবান্ এই অচিন্ত্য শক্তির বলে শুদ্ধসত্ত্ব উপাদানে বৈকুণ্ঠাদি অপ্রাকৃত লোককে নিত্যকালই প্রকাশ করিয়া তাহাতে বিবিধমূর্ত্তিতে সত্ত্বোজ্জ্বল-মূর্ত্তি পরিকরগণের সহিত অনন্ত কাল ক্রীড়া করিতেছে। শাস্ত্রে এই সকল অভিপ্রায় ব্যক্ত রহিয়াছে। বেদ বলিতেছেন, "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" অর্থাৎ তাঁহার হস্ত, পদ নাই, অথচ গ্রহণ ও গমন করিয়া থাকেন। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনূং স্বাম্" অর্থাৎ এই আত্মা যে জীবকে স্বয়ং বরণ করেন তিনিই ইঁহাকে লাভ করেন; ইনি সেই জীবকে স্বকীয় মূর্ত্তি দান করেন, অর্থাৎ তাহার নিকট স্বকীয় মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন।

গীতা বলিতেছেন,—"যৎ প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্‌ধাম পরমং মম" অর্থাৎ যাহা প্রাপ্ত হইলে জীব সংসারে পুনরাবৃত্ত হয় না, তাহাই আমার পরম ধাম। ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন,—

"চিন্তামণি প্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ—
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তন্।

লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"

অর্থাৎ, যিনি লক্ষ লক্ষ কল্পতরুবেষ্টিত ও স্পর্শমণিরচিত স্থানে কামধেনুসকল পালন করিতেছেন, যাঁহাকে শতসহস্র লক্ষ্মীগণ সম্ভ্রমে সেবা করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা) ভজনা করি।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—"সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ। অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্।" অর্থাৎ, (ব্রহ্মা কৃষ্ণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বলিতেছেন) এই সকল মূর্ত্তি কেবল সত্য, জ্ঞান, অনন্ত, আনন্দ ও একরস; যাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহারাও এই সকল ভূরি মাহাত্ম্য স্পর্শ অর্থাৎ অনুভব করেন নাই।

বেদের ও গীতার উদ্ধৃত অংশসকল জ্ঞানমার্গিগণ কিরূপ ব্যাখ্যা করেন, তাহা আমি অবগত আছি। তাঁহারা সর্ব্বত্রই 'স্বরূপ' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সমাধিযোগে তত্ত্ববস্তুর স্বপ্রকাশ অবস্থা মাত্র তাঁহাদের সামান্যতঃ প্রতীতিগোচর হইয়া থাকে, সুতরাং তাঁহারা এই সকল নিত্যধামাদির সন্ধান পান না। তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত যে একদেশদর্শী, ইহাই দেখাইবার জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতাকার পূর্ব্বোক্ত শ্লোক বলিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রসমূহের প্রমাণে ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, তত্ত্ববস্তু স্বীয় শুদ্ধতত্ত্ব অর্থাৎ স্বরূপশক্তিভূত প্রকাশ-উপাদানে নির্ম্মিত এক অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকাল লীলা করিতেছেন। তাঁহার দেহ, তদীয় পরিকরের দেহ ও তদীয় ধাম সকলই প্রকাশোপাদানে রচিত। এই অচিন্ত্য নিত্যনূতন পরমাদ্ভুত অনন্ত্যবৈচিত্রের লীলাভূমি আলোকের রাজ্য যে প্রেমিক ভক্ত ভগবৎকৃপায় একবার দর্শন করিয়াছেন, তিনি জীয়ন্তে মরিয়াছেন, প্রকৃত জগতের মোহন মূর্ত্তি চিরদিনের জন্য তাঁহার নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। তিনি

"হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।"

অর্থাৎ কখন হাস্য করেন, কখন রোদন করেন, কখন চীৎকার করেন, কখন গান করেন, কখন বা উন্মত্তবৎ নৃত্য করিয়া থাকেন; তাঁহার আচরণ সাধারণের বোধের অবিষয়ীভূত হইয়া যায়।

এই যে চিদ্ধামে ভগবানের লীলা ইহাই নিত্যলীলা। কল্পে কল্পে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইতেছে, কিন্তু এই অপ্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয় নাই, উহা নিত্যকাল স্থিতি করিতেছে। উহা মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের আদর্শ

বা ছাঁচ। মায়িক ব্রহ্মাণ্ড অনুক্ষণ ঐ ছাঁচের অনুকরণ করিতেছে; কিন্তু উপাদান মলিন হওয়ায় বিপরীত ফল উৎপন্ন করিয়া ফেলিতেছে। ফলতঃ দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ডের যাহা কিছু দেখিতেছেন, সকলই নিত্য ব্রহ্মাণ্ডের অনুকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই নিত্যধামের অস্তিত্ব বিষয়ে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। জ্ঞানী ও যোগী ইহা অস্বীকার করিতে পারেন না; কারণ, ব্রহ্ম বা পরমাত্মার সম্বন্ধে তাঁহারা যে শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ করেন, তাহারও সারবত্তা অবিকল এইরূপ। যিনি ব্রহ্ম বা পরমাত্মার উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহার পক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণের যেরূপ মূল্য, যিনি নিত্যধামে শ্রীভগবন্মূর্ত্তির সাক্ষাৎকার করেন নাই, তাঁহার পক্ষেও শাস্ত্রীয় প্রমাণের সেইরূপই মূল্য। সুতরাং দুই একটী যুক্তির অবতারণা একান্ত আবশ্যক বোধ হইতেছে। জ্ঞানী ও যোগী মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের সপ্তলোকবিভাগ স্বীকার করেন। এই সপ্তলোকের নাম ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য। যিনি স্থূলদর্শী, তিনি কেবল স্থূল জগৎই অনুভব করেন, পরবর্ত্তী সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর লোকসকল অনুভব করিতে পারেন না। তাঁহার স্থূলদৃষ্টি স্থূল ভূতকে ভেদ করিয়া সূক্ষ্ম উপাদানকে প্রত্যয়গোচর করিতে একান্ত অসমর্থ; কিন্তু যাঁহার সে দৃষ্টি আছে, তাঁহার নিকট স্থূলজগৎ যেরূপ জ্ঞানগোচর, সূক্ষ্মজগৎও সেইরূপ জ্ঞানগোচর। এইরূপে প্রতীতি হইবে যে, যাঁহার দৃষ্টি জগতের যতটা ভেদ করিতে পারে, তিনি ততটার সংবাদ দিতে পারেন, তাহার অতিরিক্ত জগৎ তাঁহার নিকট লুক্কায়িত থাকিয়া যায়। এইরূপে যাঁহার দৃষ্টি মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের চরমসীমা সত্যলোকে আবদ্ধ হইয়া যায়, তিনি মনে করেন প্রকৃতি ব্রহ্মে লীন হইল। সত্যলোকের পর আর তিনি কোনও লোক উপলব্ধি করিতে পারেন না। কেবল স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপে চিত্তের লয় হওয়ায় ব্রহ্মাকারাকারিত বৃত্তি লাভ করিয়া থাকেন; পরে ব্যুত্থান হইলে সত্যলোকের পর প্রকৃতির লয় হয়, এইরূপ সংবাদ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু অমায়িক উপাদানে যে অনন্ত অমায়িক ব্রহ্মাণ্ড বিরাজ করিতেছে, তাহা তাঁহার নিকট লুক্কায়িত থাকিয়া যায়। আর এক দিক্ দিয়া দেখিলেও নিত্য লীলার আভাস পাওয়া যাইবে। যিনি যাহা কিছু রচনা করেন, রচনার পূর্ব্বে তাহার ছাঁচ তাঁহার মনোমধ্যে বিদ্যমান থাকে। ঘট গড়িবার পূর্ব্বে ঘটের ছাঁচ কুম্ভকারের মনোমধ্যে বিদ্যমান থাকে, আবার ঘট ভাঙ্গিয়া গেলেও উহা মনোমধ্যে বিলুপ্ত হয় না, থাকিয়াই যায়। যিনি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন,

সৃষ্টির পূর্ব্বে ইহার ছাঁচ তাঁহার মধ্যে অবশ্যই বিদ্যমান থাকে; সৃষ্টিকর্ত্তা নিত্য বলিয়া ঐ ছাঁচ নিত্যকালই তাঁহার মধ্যে অবস্থান করে, সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডের লয় হইলেও উহার লয় হইবার সম্ভাবনা নাই। সচ্চিদানন্দস্বরূপ তত্ত্বস্তুর মধ্যে যখন ঐ ছাঁচ অবস্থান করে, তখন স্বরূপের মধ্যে যাহা আছে, তাহাই উহার উপাদান, সন্দেহ নাই। কুম্ভকারের মনোময় ছাঁচে যেমন ঘটের উৎপত্তি, সেইরূপ ব্রহ্মের বিশুদ্ধসত্ত্বময় ছাঁচে মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি মনে করিতে হইবে। এই ছাঁচ, এই আদর্শই নিত্যধাম এবং উক্ত ধামে যে সকল লীলা নিত্যকাল হইতেছে তাহাই নিত্যলীলা।

রস-রচনা।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়]

রসিক লোক এবং সুরসিক লেখক এখন আর তেমন দেখা যায় না। তা দেশেই বলুন আর বিদেশেই বলুন। আগেকার বিলাতী লেখক ও কথক যেমনতর সুরসিক, এখনকার বিলাতী-বক্তা ও গ্রন্থকার তেমনতর নন্; ঠিক তাহার বিপরীত। রস, রূপক, লালিত্য, মাধুর্য্য এখনকার বিলাতী লেখকদের বড় একটা লক্ষ্যও নয়; আর সে সব দ্রব্য উৎপাদন-উদ্দীপনে বড় একটা শক্তিও তাঁহাদের নাই বলিয়া যেন বোধ হয়। বিলাতী সাহিত্যে রস-রসিকতা-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য দেখিতে চাহিলে পূর্ব্ববর্ত্তী সাবেক আমলের বিলাতী গ্রন্থ খুলিতে হয়। বিদেশ—বিলাতে যেমনতর, স্বদেশ—বাঙ্গালায়ও সেইরূপ। রসিক লোক এখন এবং সুরসিক লেখক বড় একটা পাওয়া যায় না। এটা যেন কেমন সামাজিক শুষ্কতার যুগ, সহৃদয়তাহীন সাহিত্যের সময়। এখনকার বাক্যালাপ তেমন মিষ্ট হৃদয়-ব্যঞ্জক নয়, চিঠিপত্রে তেমন বিনয়, নম্রতা, শীলতা নাই, শিষ্টাচার-ব্যঞ্জক ভাব নাই; রচনা বর্ণনা তেমন রসিকতা, লালিত্য ও কবিত্বের পরিচায়ক নয়; এখনকার মনুষ্য নেহাত গদ্যময়, আর সে গদ্য অতিশয় শুষ্ক, বেজায় কড়া। তখন একটা মন্দ কথা বলিলেও মিঠা করিয়া বলা হইত, এখন একটা ভাল কথা বলিতে গেলেও সেটা কর্কশ করিয়া বলা হয়। মধুরতা, মিষ্টতা, কারুণ্য, কোমলতা যেন দেশ ছাড়িয়া বা ছুনিয়া ছাড়িয়া পলাইয়াছে। চারি দিকেই যেন এখন কেমন একটা কাটখোট্টা ভাব;

সবই যেন "শুষ্ককাষ্ঠন্তিষ্ঠত্যগ্রে"। এখনকার হাস্য-পরিহাস, রস-রসিকতা, রং-তামাসাতেও "শুষ্ককাষ্ঠন্তিষ্ঠত্যগ্রে।" দাতা ভোক্তার ন্যায় প্রেমিক রসিকতা দিন দিন বাঙ্গালা মুল্লুক ছেড়ে পলাইতেছে। সাবেক আমলের সেই হৃদয়-ভরা রস, প্রাণভরা ভালবাসা, উঠোন-জোড়া আপ্যায়িত, চণ্ডীমণ্ডপজোড়া আহ্বান এ আমলে আর কৈ? সেকালের সে বিষহীন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কাঁটাহীন হাস্যকৌতুক একালে আর কৈ?

এখনকার দিনে বাঙ্গালা-সাহিত্যের ভাষা, সাধারণতঃ আর শুদ্ধচারিণী নহেন। এখন তিনি অনেক স্থলেই বে-আড়া বিলাসিনী। বড়ই ক্ষোভের বিষয়। বিলাসিনী অথচ বে-রসিকা, ইহা আরও ক্ষোভের বিষয়। শুদ্ধচারিণীও নহেন, আবার সুরসিকাও নহেন; এটা কিন্তু নেহাত অসহ্য। অশুদ্ধচারিণী একটু সুরসিকা হইলে তবুও পদে থাকেন, কিন্তু ভাষাটীর এখন এও নয়, তাও নয়। মাঝখান থেকে কেমন একটা বিসদৃশ বিদ্ঘুটেভাব তাঁহার শরীরে নামিয়া জুটিতেছে। ঠাকুরাণীটীর বিলাস বাড়িতেছে বিলক্ষণ, কিন্তু লীলা-লাবণ্য একটুও নাই। এ ভাবটা আদৌ ভাল নয়। তবে এ কালধর্ম্মের পরিচায়ক বটে।

রস-রসিকতার বাজার সাধারণতঃ খুব মন্দা বটে। তবে তাহার বিশেষ বাজার আছে। ইংরেজের আমল, সব কাজেই সুশৃঙ্খলা, বিশেষ বিশেষ বাজারে বিশেষ বাণিজ্য; বে-বন্দোবস্তের যোটি নাই। রস-রসিকতার বিশেষ বাজার আছে, সে বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা আছে; মালপত্রও না আছে, এমন নয়। তা বেশ আছে। রসিকতার পেশাদারী সাজসরঞ্জাম, আয়োজন-আড়ম্বর বিলক্ষণ আছে। তবে দুঃখ এই যে, রসিকতায় রস নাই। এখনকার তামাসায় যদি বা কখনও একটু তরল পদার্থ থাকে, তাহা টাটকা নয়, টোকো অথচ পচা, কেমন শুষ্ক শুষ্ক, আবার বিষাক্ত; কর্কশ ও আঁশযুক্ত, মিষ্ট মোটেই নাই। তখন ভাঁড়েরা ভাঁড়ামী করিত, এখন ভদ্রলোকেও ভাঁড়ামী করে। তখন ভাঁড়েরা ছিল পেশাদার রসিক, এখন ভদ্র লোক হইয়াছে পেয়াদার ভাঁড়। ভাঁড়ের ভাড়ামীতে তখন একটা না একটা রস থাকিতই। ভদ্র লোকের ভাঁড়ামীতে এখন বড় একটা রস থাকে না, রসের পরিবর্ত্তে একটা না একটা 'কষ' থাকে। একটা কিছু ত থাকা চাই। তাই এখন রসের বদলে 'কষ', পরন্তু সে 'কষ' বিশুদ্ধও নয় নির্দ্দোষও নয়; নীরস আবার নোংরা। যেমনতর 'মাছ-শুঁট্‌কী'। কিন্তু সেকালের সেই গোপাল ভাঁড়ের পরিহাস দু চারিটা মনে কর দেখি। তাহা তত বিশুদ্ধ ও সুরুচি-সঙ্গত না হইলেও,

সম্পূর্ণরূপে নিরীহ; আর তাহাতে কেমন হাসির ফোয়ারা উঠায়। তার পর ঈশ্বর গুপ্তের পরিহাস-রসিকতা স্থূল ধরণের ছিল বটে, কিন্তু তাহাও নিরীহ। আবার সে স্থূল দ্রব্যের বেশ একটা হুলও ছিল, হুলটা মধু-মাখা ছিল না বটে, কিন্তু ঝোলা গুড়মাখা ছিল, বিষাক্ত ছিল না। হুলটা টেরা-বাঁকা হইয়া যদি কোনও খানে একটু জেয়াদা ফুটিত, তৎক্ষণাৎ সটান হাসির-হিল্লোলে সে স্থান শীতল করিত, অথচ একটি দাগও রাখিয়া যাইত;—সে কথাটা—যেন মনে থাকে।

অতীতের ন্যায় বর্ত্তমানের পক্ষেও পক্ষপাতশূন্য বিচার নেহাত আবশ্যক। সাধারণভাবে সে বিচার আমরা করিয়াছি। বিশেষ স্থলে কিন্তু বিশেষ ফয়সলা দেওয়া উচিত। কাজটা শক্ত বটে; তা চারা কি?

এখন বিলাতে আছেন "পাঞ্চ"; কাজেই বাঙ্গালায় হইয়াছেন "পঞ্চানন্দ"। "পাঞ্চ"-"পঞ্চানন্দের" পিছু পিছু অনেক গোবিন্দ নিরানন্দ আছেন, সে কথায় এখন কাজ নাই। বিলাতী পাঞ্চের বিলাতী রসিকতা আমাদের বড় ভাল লাগে না, ফল কথা, আমরা তাহা ভাল বুঝিতেই পারি না। স্বদেশীয় "পঞ্চানন্দের" বাঙ্গালা রসিকতাও যে আমরা ভাল করে বুঝি, তাহাও বলিতে সাহস হয় না; কারণ পঞ্চানন্দ নিজেই বলেন যে, তাঁহার রঙ্গরস হাসপরিহাস তাঁহার দেশের লোক বুঝিতে বড় সক্ষম নয়। দেশের লোক যা'তে অক্ষম, আমরা তা'তে সক্ষম, একথা কেমনে বলিতে পারি? পঞ্চানন্দকেও আমরা 'বড় বুঝি না' তবে যতটুকু বুঝি তাতে "পঞ্চানন্দের" পিতৃপুরুষ ইন্দ্রনাথ বাবুর উপর আমরা যে নেহাত নারাজ তাও নয়। তবে ইন্দ্র বাবু যে নিজের ইন্দ্রিয়-চালনার অপব্যয় করেন, ইহা আমাদের কতকটা ধারণা। ইন্দ্র বাবুর বিদ্রূপে প্রায় বিষ থাকে বটে, কিন্তু সে বিষ অব্যবহার্য্য, কারণ তাহা আদৌ অশোধিত, কাজেই মানুষের উপকারে আসে না, বরং স্থলবিশেষ অপকার করে। উক্ত বাবুর রসিকতা স্থূল এবং ইতর, অথচ অনেক স্থলেই উজ্জ্বল নয়; মিষ্টও নয়; যেন পিত্তশ্লেষ্মজ। ইন্দ্র বাবুর রসিকতা সাধারণতঃ এইরূপ, তবে লগ্নবিশেষে তাঁহার বিলক্ষণ এক আধ আখর মুন্সিয়ানা দেখা গিয়া থাকে। ইনি নাকি এখনকার নাম-লেখান আসর-আগলান রসিক, তাই অবশ্য এত কথা। দীনবন্ধু বাবুর রসিকতাও স্থূল এবং অনেকাংশে ইতর শ্রেণীর ছিল বটে, কিন্তু তাহা নীরস ছিল না, তাহা রসাল, রসে ডবডবে, আর সে রস সুমিষ্টও বটে। বঙ্কিম বাবুর দু চারি বুঁদ রসিকতা অতুলনীয়। অক্ষয় বাবুর এক আধ কণিকা উন্নত শ্রেণীর। ঠাকুর পাড়ার ওদিকে দ্বিজেন্দ্র রবীন্দ্র বাবু সরু রকম এক আধ

ই বেশ কাটেন। আমাদের ইংরেজী-লিখিয়ে মহলে শম্ভু বাবুর লেখায় লালিত্য ও রকমারী বুনানী প্রায়ই থাকে। তাঁহার রসিকতাও আছে, তবে সেটা যেন অম্ল-পিত্তজ বলিয়া ঠেকে। বাঙ্গালার ইংরেজী বক্তাদের ভিতর প্রতাপ বাবুর দুই এক "তুক্কো" মন্দ নয়।

আবার তাও বলি; এখনকার দিনে 'সমজদার', অনুভব ও উপভোগক্ষম লোকও খুব কম। রস অনেকেই বুঝে না, সম্ভোগ করিতেও জানে না। কেহ চটে, কেহ ফাটে, কেহ বা গোলে হরিবোল দিয়া হো-হো হাসে, পাছে কেহ মনে করে যে, সে বুঝে নাই। অনেক দিন হইল, একবার "অমৃত বাজার পত্রিকা"র কেশব বাবুকে কি একটা পরিহাস করা হইয়াছিল। একখানি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী সাপ্তাহিক, "অমৃতে"র সেই "ফষ্টিনষ্টি" নিজে উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য লিখিয়াছিলেন যে, "পত্রিকা"র উক্ত পরিহাস, সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কেশব বাবু নিজেই সম্ভোগ করিবেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গেও কেশবের মত লোক কয়টা বলুন?

অতঃপর বৈজ্ঞানিক না হউক, অন্ততঃ একটু দার্শনিক আলোচনা করিয়া তবে বিদায়। নহিলে এ বেলায় এ বাজারে এ বকাবকি বিকাইবে না। রসিকতাটা হওয়া চাই কেমনতর তা জান, খরও নয়, মাটও নয়, বেশ মধ্যম পাকের; টাটকা টলটলে, কিন্তু গলগলে ভড়ভোড়ে নয়। রসিকতা হইবে ঘনও নও পাতলাও নয়, বেশ আঁটো আঁটো তাজা গরম গরম, অথচ স্নিগ্ধ নরম নরম; মিষ্ট কিন্তু ম্যাড়মেড়ে নয়। তেজাল অথচ স্নিগ্ধ রসিকতা, সূক্ষ্ম, সুপিরিয়র ক্লাস; লাঠি অপেক্ষা এখন ল্যান্সেটই ভাল। তবে লাঠিই হউক আর ল্যান্সেটই হউক, চালাইবার করতপেই হয় কাজ। অস্ত্রে ক্ষত স্থান পরিষ্কার হইবে, অথচ অঙ্গে এক বিন্দুও আঘাত লাগিবে না; প্রত্যুত অস্ত্র-স্পর্শে অঙ্গ শীতল হইবে, সর্ব্ব শরীর জুড়াইবে। নহিলে আর রসের অস্ত্র কি? রসের অস্ত্র ও লোহার অস্ত্র দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অস্ত্র, এটা বিলক্ষণ মনে থাকা চাই। এক কথায়, রসিকতা সর্ব্বতোভাবে সহৃদয়তা-মূলক হওয়া উচিত। নহিলে রসিকতা করা হইবে না, গালি-গালাজ দেওয়া হইবে। রসিকতা রসিকতাই, গালি-গালাজ নয়, এটা সর্ব্বদা মনে রাখিবে। রাগ করিয়া রসিকতা চালাইবে না, বিদ্বেষ করিয়া ব্যঙ্গ করিবে না। তাহা হইলে রস আদবে হইবে না, রস মাটী হইবে। ইহা রস-শাস্ত্রের মূল নিয়ম। এ নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া রসভঙ্গ করিও না। রসভঙ্গে মহাপাপ।

সংগ্রহ।

১। কমলাকান্তের কথা।

ঢুলির বাক্স।

নসীরাম বাবুর একটি দৌহিত্র হইয়াছে। আমি সকাল বেলা উঠিয়াই যথারীতি কিঞ্চিৎ অহিফেন গলসাৎ করিয়া জন্মমৃত্যুরহস্যের চিন্তায় বিভোর হইয়া আছি। এমন সময়ে এক দল ঢুলি আসিয়া উপস্থিত হইল। আসিয়াই কোনও রূপ বাক্যব্যয় বা জিজ্ঞাসা-পত্র না করিয়াই কোমর দুলাইয়া নাচিতে আরম্ভ করিয়া দিল—

"আয় গো আয় দেখ্‌তে যাবি সকলে"

ভোর হইতে না হইতেই এ কি জ্বালাতন! নসীরাম বাবু তাড়াতাড়ি কাছা গুঁজিতে গুঁজিতে উপর হইতে নামিয়া আসিয়াই মহাক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—"এখানে কি? এখানে কি? এখানে কিছু হবে টবে না।" ঢুলিরা নির্ব্বিকার! তাহারা অত বড় যে নসীরাম বাবু তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া চেঁচাইতে সুরু করিয়া দিল—"দিদিমা কোথায় গো? সোনার চাঁদ নাতি হয়েছে—এক এক রূপোর চাঁদ দিয়ে বিদায় কর্‌তে হবে।" এই বলিয়াই পূর্ব্ববৎ তারস্বরে—

"আয় গো আয় দেখ্‌তে যাবি সকলে—
আজি যশোদারি কোলে যেন চাঁদের উদয় হয়েছে।"

আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। নসীরাম বাবুর কন্যা শ্রীমতী * * র এক পুত্র সন্তান হইয়াছে; ইহাতে ইহাদের এত আনন্দ কিসের? এরূপ দাবী-[illegible] বা করে কোন্ হিসাবে? ভাবিয়া দেখিলাম, আমাদের সমাজের প্রত্যেক ক্রিয়া-কর্ম্মেই এই রীতি। নিজের মনের আনন্দ পরের মুখে ফুটিতে না দেখিলে আমাদের তৃপ্তি হয় না। বাড়ীতে সামান্য একটা ব্রতপার্ব্বণ হইলেও দশ পাঁচ জনকে খাওয়াইয়া তবে তাহার সার্থকত্ব উপলব্ধি করি। দেখিয়াছি, নিমন্ত্রণকারীর দল সমস্ত দিন খাটিয়া, লুচির ঝুড়ি বহিয়া ও যথাসম্ভব সুখাদ্য [illegible]

"বাঙ্গালী"।

দ্রব্য-রাজি তৈয়ার করিয়া নিমন্ত্রিতবর্গকে আহার করাইয়াই তৃপ্ত হইয়াছেন; নিজেদের ভাগ্যে শেষ রাত্রে একটু কাঁচা জল ভিন্ন আর কিছুই জুটে নাই। গুটীকতক বাছাই বন্ধু ডাকিয়া, হোটেল হইতে খাবার আনাইয়া ও টেবিলের উপর পা তুলিয়া দিয়া গোগ্রাসে সেই সমস্ত গলাধঃকরণ করা—এদেশের আনন্দ-প্রকাশের রীতি নহে। এখানে কাহারও কোনও শুভ ঘটনা ঘটিলে আর দশ জন কুটোটা আস্‌টা আশা করিয়া থাকে। আত্মীয়-স্বজন, গরীব-ভদ্র, সকলের তুষ্টি সাধনেই আমাদের আত্মতুষ্টি! তোমার হিসাবী অর্থনীতিজ্ঞ বলিবেন,—এ কেবল বাজে খরচ। দেখিতেও পাইতেছি, অনেক বাবু খাবার কিনিয়া রাস্তায় গলির কোণে দাঁড়াইয়াই উদরসাৎ করেন; তাহা বাড়ী লইয়া যান না, পাছে আর পাঁচজনকে ভাগ দিতে হয়! বাড়ীতে কাজকর্ম্ম হইলে গরীব-দুঃখীদের বাদ দিয়া নিমন্ত্রণ করেন; অর্থাৎ যাহারা নিমন্ত্রণ পাইলে সকলের চেয়ে খুসী হয়—তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে বাদ পড়ে। সেই পূর্ব্বেকার আনন্দই বা কোথায়? শিশুর জন্ম হইতে—ষষ্ঠীপূজা, আটকৌড়ে প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া উপনয়ন, বিবাহ, এমন কি মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত তাহার জীবনের সহিত বাহিরের পাঁচ জনের যে আনন্দ-সংযোগ—সেই সংযোগই আর দেখিতে পাই না। আর, সকলের চেয়ে আনন্দের বিষয় যে ছেলে হওয়া,—অর্থশাস্ত্রের মতে যাহা সুমঙ্গল প্রজাবৃদ্ধি—ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে যাহা মৃত্যুর পর সুখের নিধান—গৃহস্থ-জীবনে যাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আনন্দ—সেই সন্তান জন্মিলে এখন পরিবারের মধ্যে বিভীষিকার সঞ্চার দেখি! যে দেশে সন্তান-সম্ভাবনার সংবাদ শুনিলে গ্রামশুদ্ধ লোক উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদারা নাতির মুখ না দেখিয়া মরিলে মরিয়া তৃপ্তি পাইতেন না, দেশের অলিতে গলিতে ষষ্ঠীতলাগুলি পুত্রার্থী সেবক-সেবিকায় ভরপুর হইয়া থাকিত, যেখানে দান পাইলে ভিক্ষুক আশীর্ব্বাদ করিত যেন ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হয়, সেখানে এখন ছেলে পুলের নামে লোকে শঙ্কিত হইয়া উঠে! শুনিতে পাই, ছেলে-পুলে হইবার ভয়ে অনেকে পুত্রকন্যার বিবাহ দিতে চান না—মা ষষ্ঠীর আসন দেখিলে দশ হাত দূরে সরিয়া দাঁড়ান! অথচ প্রায়ই শুনিতে পাইতেছি—বাঙ্গালী ধ্বংসোন্মুখ জাতি—বাঙ্গালীর সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া যাইতেছে। কেন এমন হইতেছে—বলিয়া দিতে হইবে কি? কচি ছেলের দুধ যোগাইতে পারি না; এক দিকে দুরন্ত ম্যালেরিয়া; তাহার উপর ছেলের পড়ার খরচ, মেয়ের বিয়া; গায়ে দু'খানা অলঙ্কার দিতে পারি না; পরণে

এক টুক্‌রা কাপড় দিতে পারি না; অর্দ্ধাশনে থাকি; আর পাঁচটা পেট পূরাইব কি করিয়া? তা নহিলে আর—ছি ছি যে একটী বংশের দুলালের জন্য কত সমৃদ্ধ জাতি মাথা খুঁড়িয়া মরিতেছে—তাহার পুণ্য-আবির্ভাবে প্রমাদ গণিয়া থাকি?

ঢুলিদের তরল বাদ্যে চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। ঠমকি ঠমকি ঢোলের আওয়াজ বাজিয়া উঠিতেছে; আর সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন মাথা নাড়িয়া ও সমস্ত অঙ্গটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ঢুলি নাচিয়া নাচিয়া গাইতেছে—

"হাতে গদা, পায়ে পদ্ম, যশোদারি কোলেতে
আজি নীলকান্ত মণির উদয় যশোদারি কোলেতে।"

শুনিয়া হাসি আসিল। কোথায় সেই যশোমতীর ভুবনবিমোহন—দশ-দিক্ আলো-করা পুত্ররত্ন—আর কোথায় এই সব খেঁদী, পেঁচী বামীর অপোগণ্ড সন্তান! কিন্তু হাসিবার তো কথা নহে। এই যে সদ্যঃজাত শিশুর দল—ইহারাই জাতির ভবিষ্যৎ প্রতিনিধি। বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব গড়িয়া তুলিবার, বাঙ্গালীর মানমর্য্যাদা বজায় রাখিবার, বাঙ্গালীর জাতীয়ত্ব প্রচার করিবার ইহারাই একমাত্র অধিকারী। কে জানে, ইহাদের মধ্যে রামমোহন-রামকৃষ্ণ, বঙ্কিম-বিবেকানন্দের বিপুল শক্তি নিহিত আছে কি না। এই যে মানবজন্ম—ইহার চেয়ে মহত্তর, পবিত্রতর ও আশ্চর্য্যতর এ বিশ্বে আর কি আছে? তোমার তাজমহল, তোমার কুতব মিনার, তোমার অজন্তা-অবন্তী চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দাও: এই নবজাগ্রত নব উদ্বোধিত জাতি নূতন করিয়া তাহা গড়িয়া তুলিবে। মানবাত্মার কাছে ঐ সব কি ছার—তৃণাদপি তুচ্ছ! তাই বলি সন্তানজনম হাসিবার বিষয় নহে; ঐশী শক্তি এইখানেই পূর্ণ বিকশিত। তাই বুঝিয়াছি প্রত্যেক প্রসূতীই যশোদা, আর প্রত্যেক নবজাত শিশুই নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ।

ঢুলি বুঝি তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া গাইয়া উঠিল—

"হোক যশোদার কালো ছেলে—
"নে গো নে কোলে তুলে"—

আনন্দে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।' ভাবিলাম, কোন্ পুণ্য-ফলে এই সোণার দেশে জন্মিয়াছি, যেখানে জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক ক্রিয়াকর্ম্মই ধর্ম্মের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত। মনে করিয়া দেখিলাম, সেই সে দিনের কথা,—নন্দালয়ে উৎসবের অন্ত নাই, ঘরে ঘরে আনন্দের প্রবাহ ছুটিতেছে; মর্ত্ত্যে গোপ-গোপী ও স্বর্গে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র সকলে বাহ

তুলিয়া নৃত্য করিতেছে! সে জন্মকথা তো ভুলিবার নহে—তাই সেই পুণ্য-স্মৃতি আজ প্রত্যেক পুত্রকন্যার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জাগিয়া উঠিতেছে। এমন করিয়া গায়ে পড়িয়া আনন্দ-প্রকাশ আর কোন দেশে আছে? এই অবিচ্ছিন্ন আনন্দের ধারা যে দেশে যুগযুগান্ত ধরিয়া প্রবাহিত হইতেছে,—সে দেশের কি মরণ আছে? দেখিয়াছি বটে, সে প্রবাহে চড়া পড়িয়াছে; কিন্তু আর কাঁদিব না। এই যে নববলদৃপ্ত বালকেশরী নূতন দলের উন্মেষ দেখিতেছি,—ইহাতেই আমার প্রাণভরা আনন্দের উৎস সঞ্চিত রহিয়াছে। তবে বাজা রে বাজা—প্রাণ খুলিয়া উৎসব কর। ঘরে ঘরে নন্দকুল-চন্দ্রমার ন্যায় বাঙ্গালী-কুলতিলক জন্মগ্রহণ করুক—প্রত্যেক সন্তানের জনমের সহিত বাঙ্গালী মায়ের বেদনাবিধুর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইয়া উঠুক—আমিও দুই হস্ত তুলিয়া তোমাদের সহিত নৃত্য করি।

"ওকি কমলাকান্ত"—নসীরাম বাবুর কর্কশ কণ্ঠে চমক ভাঙ্গিয়া গেল। "হাত তুলিতেছ কেন? নাচিবে নাকি?"

আমি বলিলাম, "না নাচিয়া আর করি কি? যে গান ঢুলিরা গাইতেছে, তাহাতে প্রাণ মজিয়া গিয়াছে।"

নসীরাম বাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। হাসিয়া বলিলেন,—'তোমার মাথা আর মুণ্ড—সে ঢুলির দল তো অনেক ক্ষণ বিদায় হইয়া গিয়াছে।'

২। ভূদেব ও জাতীয় ভাব।

জ্যৈষ্ঠ মাসের আজ প্রথম দিন; এ দিন বাঙ্গালী সহজে ভুলিতে পারিবে না।—এই দিনে জাতীয় জীবনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কর্ম্মবীর ভূদেব বঙ্গমাতার ক্রোড় হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিয়াছেন! যে স্বর্গীয় জ্যোতিষ্ক পঞ্চাশ বৎসরের উপর অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন বঙ্গদেশে মনুষ্যত্বের আলোক বিকীর্ণ করিয়াছিল, তাহা আজি প্রায় চব্বিশ বৎসর হইল, জ্যৈষ্ঠ মাসের এই তারিখে অস্তমিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পঞ্জিকায় ইহা একটা স্মরণীয় দিন।

স্মরণীয় দিন বটে, তবে তাঁহার স্মৃতির সম্মানার্থ এ দিনে আমরা বিশেষ কিছুই করি না। এই কলিকাতা সহরে সপ্তাহে সপ্তাহে কত সভা, কত সমিতি হইয়া থাকে, কত রকমের কত বৈঠক বসিয়া থাকে, কিন্তু

ভূদেবের মৃত্যুদিনে ভূদেবের একটা স্মৃতি-সভাও হইতে দেখি না! বৎসরে বৎসরে এক আধবার তাঁহার জীবন-কথা—তাঁহার চিন্তারাশি আধুনিক বাঙ্গালীর চক্ষুর সম্মুখে ধরিতে পারিলে লাভ আছে—উপকার হয়। কিন্তু সেটুকু কর্ত্তব্য-জ্ঞান আমাদের নাই।

ভূদেবের জীবন—আদর্শ-জীবন। বাক্যে ও কার্য্যে এমন সামঞ্জস্য সচরাচর দেখা যায় না। তিনি কখনও কোনও বিষয়ে আজ 'হাঁ' বলিয়া কাল আবার 'না' বলিতেন না। 'ভাবের ঘরে চুরি করিতে' তিনি আদৌ জানিতেন না। আন্তরিকতা তাঁহাতে বড় প্রবল, বড় প্রভাবপূর্ণ ছিল। তাঁহার রচিত গ্রন্থ-সকল সেই আন্তরিকতারই ফল। তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, আচার প্রবন্ধ, পুষ্পাঞ্জলি প্রভৃতি পাঠ করিলে মনে হয়, এই সকল গ্রন্থে, তিনি যেন নিজের হৃদয়ের চিত্রই অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন।

তিনি বিলাতী শিক্ষায় পরম পারদর্শী হইয়াও, কখনও আত্মবিসর্জ্জন করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুসরণ করেন নাই। কেশবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সকলেই বিলাতী শিক্ষার সমুজ্জ্বল চাকচিক্যে একবার না একবার অল্প-বিস্তর মুগ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু বিচার-কুশল ভূদেব চিরদিনই স্বদেশের শাস্ত্রে, স্বদেশের ধর্ম্মে, স্বদেশের সমাজে ও স্বদেশের সাহিত্যে শ্রদ্ধা-ভক্তি রাখিয়া একভাবেই জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালীকে আচারে ব্যবহারে, পোষাকে পরিচ্ছদে সাহেব সাজিতে দেখিলেই তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। তিনি এজন্য বাঙ্গালীকে নানাভাবে সাবধান করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, আমরা যতই কেন সাহেব সাজি না, ইংরাজ কিন্তু নানা ইসারা-ইঙ্গিতে প্রায় আমাদের জানাইয়া থাকে,—"তুমি ইংরাজ নও। তুমি আমার ধর্ম্ম, আমার আচার, আমার ব্যবহার, আমার ভাষা, আমার পরিচ্ছদাদির অনুকরণ করিতে চাও কর, কিন্তু কখনই আমার সমান হইতে পারিবে না। কারণ, আমিই ইংরাজ, তুমি ইংরাজ নহ।"—এই উপদেশই আমাদের জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা।—ইহাতে চেতনা পাইয়া আজ অনেকেই আমরা ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিতে উদ্যত হইয়াছি।

ভূদেব স্বদেশ ও স্বজাতিকে প্রাণাপেক্ষা ভালবাসিতেন বলিয়া গোঁড়ামী যে তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছিল, এমন কেহ মনে করিবেন না। পরের

গুণটুকু আত্মস্থাৎ করিতেও তিনি সদাই উপদেশ দিতেন। তিনি বলিতেন, "জাতীয় ভাব সাধন জন্য হিন্দুসমাজকে আত্ম-প্রকৃতি বুঝিয়া চলিতে হইবে। ভারতবর্ষের একতাসাধন ইংরাজের অধীনতাতেই সম্ভব; অতএব ইংরাজের প্রতি সম্যক্ বন্ধুবুদ্ধি ও রাজভক্তি দেখাইতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে ইংরাজের অন্ধ অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইংরাজের প্রকৃতির সহিত হিন্দুর প্রকৃতির একতা নাই। ইংরাজ কার্য্যকুশল, অহঙ্কারী, ও লোভী। হিন্দু শ্রমশীল, সুবোধ, নম্র-স্বভাব ও সন্তুষ্টচিত্ত। ইংরাজের নিকট হিন্দুকে কেবল কার্য্যকুশলতা শিখিতে হয়। আর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না"—এই ধরণের খাঁটি কথা তিনি অনেক বলিয়া গিয়াছেন। ইংরাজের নিকট যাহা কিছু শিখিলে আমাদের জাতীয় জীবনের সঞ্জীবনী শক্তির বৃদ্ধি পাইতে পারে, তিনি স্বদেশীয়দিগকে তাহাই শিখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। শুধু উপদেশ নহে। নিজের জীবনে তাহা ফুটাইতেও তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে তিনি ধরিয়াছিলেন, তাহা উন্নতি-পথের পথ-প্রদর্শক। ভক্তিভরে তাহা স্মরণ করিলে জীবন স্বতঃই মহত্ত্বের পথে আকৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, ভূদেব বাবু স্বদেশী ভাবের একজন আদি-নেতা। যখন আমরা সহসা বিদেশীয় সভ্যতার আবর্ত্তে পড়িয়া স্বদেশকে ভুলিতে বসিয়াছিলাম, সেই সময় যাঁহারা আমাদের জ্ঞান-চক্ষু খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভূদেব তাঁহাদেরই অন্যতম। তাঁহাদেরই সদুপদেশে আকৃষ্ট হইয়া আমরা আজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মাতৃ-পূজায় উদ্যত হইয়াছি। এই মাতৃপূজাই আমাদের বর্ত্তমান যুগধর্ম্ম।

অতএব ভূদেবকে ভুলিলে চলিবে না। যুগধর্ম্মের যিনি অন্যতম প্রবর্ত্তক, মাতৃপূজার যিনি অন্যতম পুরোহিত, তাঁহার তিরোধানের দিনে তাঁহার স্মৃতি-পূজা করা বাঙ্গালীর সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। তাই আজ বাঙ্গালীকে ভূদেবের মৃত্যু-দিনে তাঁহারই ভাষায় এই প্রার্থনা-মন্ত্র উচ্চারণ করিতে আহ্বান করিতেছি,—"ভারতবাসীকে সর্ব্বতোভাবে স্বজাতি-বিদ্বেষরূপ মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। স্বজাতীয় সহানুভূতিকেই পরম ধন জ্ঞান করিতে হইবে।"

চীন ও জাপান।

'ঘর সামলাও'।

চীন ও জাপানে শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থ লইয়া ঠোকাঠুকি আরম্ভ হইয়াছে। শিল্পব্যাপারে দুই জনে সংঘাত চলিতেছে। জাপান আধুনিক ইউরোপীয় রীতি-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া শিল্পব্যাপারে চীনের উপর টেক্কা দিতেছে বটে, কিন্তু চীনও নিশ্চেষ্ট নহে। তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়াছে: স্বদেশের শিল্প সংস্কারের ভার সে স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। চীন শিল্প-ব্যাপারে আর পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চাহিতেছে না।

জাপান ইউরোপীয় কায়দায় শিল্পব্যাপারে এসিয়ার একাধিপত্য করিতেছে। তাহার শিল্পজাত চীনের বাজারে অনেক দিন হইতেই বিক্রয় হইতেছে। জাপানী পণ্যে চীনের বাজার খুবই পূর্ণ ছিল। জর্ম্মণীর আদর্শে জাপান সস্তায় পণ্য জোগাইয়া চীনের শিল্পকে নষ্ট করিবার উপক্রম করিয়াছিল।

নব-জাগরিত চীন চক্ষু মেলিয়াই ইহা দেখিতে পাইল। সে বুঝিল,—এ ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চীনের সর্ব্বনাশ হইবে। চীনের শিল্প ও শিল্পী সকলই রসাতলে যাইবে। তাই চীন গবমেণ্ট নিয়ম করিলেন,—অতঃপর জাপান হইতে যে সকল পণ্য চীনে আসিবে, তাহার উপর পূর্ব্বাপেক্ষা বেশী হারে শুল্ক লওয়া হইবে। বিশেষতঃ জাপানী বস্ত্র ও সূতার উপর চীন গবমেণ্ট অতিরিক্ত হারে শুল্ক চাপাইয়াছেন।

ইহার ফল ফলিয়াছে। জাপান আর সস্তায় চীনের বাজারে কাপড় ও সূতা বিক্রয় করিতে পারিতেছে না। অপর দিকে চীন জাতি আত্মশক্তির উপাসক হইয়াছে। তাহারা তাহাদের পুরাতন-পদ্ধতির একটু সংস্কার করিয়া হস্তচালিত যন্ত্র-যোগেই সূতা ও কাপড় তৈয়ারী করিতেছে। চীনের লোকসংখ্যা কম নহে এবং শিল্পীদের যোগ্যতাও আছে। তাহারা হস্তচালিত যন্ত্রকে আধুনিক ধরণে একটু উন্নত করিয়া লইয়াছে। ইহাতে মাল অনেক বেশীই তৈয়ারী হইতেছে। চীনের ঘরে ঘরে এখন তাঁত-চরকা চলিতেছে। মোটা সূতা ও মোটা কাপড় খুবই তাহারা তৈয়ারী করিতেছে। বাজারে এই মোটা কাপড় দরে সস্তায় বিক্রয় হইতেছে। কাজেই লোকে খুব কিনিতেছে।

চীন বলিতেছে,—আমরা এখন এই মোটা সূতা ও মোটা কাপড়ই তৈয়ারী করিতে থাকি। চীনের সকল পরিবারের অন্ততঃ একজন লোক এই কার্য্যে

ব্রতী হউক। তাহা হইলে ইউরোপের বর্ত্তমান দরিদ্র-সমস্যা, শ্রমজীবি-সমস্যা, চীনকে বিপন্ন করিতে পারিবে না।

মোট কথা এখন চীনে জাগরণের যুগ। সেখানে আত্মশক্তি ও আত্ম-প্রচেষ্টার সাধনা চলিতেছে।

বাঙ্গালী চীনের আদর্শ গ্রহণ কর। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে বয়ন-শিল্পের পত্তন কর। বয়ন-শিল্প এককালে বাঙ্গালীর জাতীয় শিল্প ছিল। বাঙ্গালায় শ্রমের মূল্য কম; শিল্পীদের অভাবও অল্প। সেকালে চরকা ও তাঁত যে রীতিতে চলিত, সেই রীতি-পদ্ধতির সংস্কার কর। যাহাতে মাল বেশী জন্মে, তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া হস্তচালিত তাঁত-চরকার উন্নতি কর। বাঙ্গালায় শিল্পীর সংখ্যাও ত কম নহে। সকলে উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে বাঙ্গালা দেশ মোটা সূতা ও মোটা কাপড় খুবই তৈয়ারী করিতে পারিবে।

কিন্তু এ পক্ষে গবর্মেণ্টকে একটু সাহায্য করিতে হইবে। তাঁহারা বিদেশ-জাত সূতা ও কাপড়ের উপর শুল্কের হার এমন ভাবে বাড়াইয়া দিন, যাহাতে উহারা এদেশের কাপড় ও সূতার সহিত কোনও মতে প্রতিযোগিতা করিতে না পারে।

এ ব্যাপারে সাফল্য লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে গবর্মেণ্টের সাহায্য ব্যতীত আরও উদ্যোগ-আয়োজন করিতে হইবে। বাঙ্গালা দেশে তুলার চাষের বিস্তৃত ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা ব্যতীত ঘরে ঘরে তুলার গাছ রোপণ করা চাই।

তুলার জোগান রীতিমত না হইলে আমাদের বয়ন-শিল্প মাথা তুলিতে পারিবে না।

তার পর, সকলকার চেয়ে বড় কথা—আত্মশক্তি ও আত্মপ্রচেষ্টার সাধনা। এ সাধনা কায়-মনোবাক্যে করিতে না পারিলে বাঙ্গালী শিল্প-ব্যাপারে কোনও কালে আত্মনির্ভর এবং স্বাবলম্বী হইতে পারিবে না। এরূপ হইতে না পারিলেও আমাদের শিল্পের বন্ধনদশা ঘুচিবে না।

অর্থ ও বন্ধু।

[শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়।]

শতগ্রন্থি বাসে যার লজ্জা-নিবারণ,
বন্ধুরূপে কেবা তা'রে করিবে বরণ?—
মিত্রতার মরণ সম্বল!
বিত্তের-অভাব যেই জানে না কেমন,
অভাব নাহিক তার বন্ধুর বেষ্টন;
অর্থবলে বন্ধুত্ব কেবল।

পরাজয়।

(৪)

এক সপ্তাহ পরে গণেশ শ্বশুর-বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিল। নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিল, "তোর শাশুড়ী কেমন আছে রে গণেশ?"

গণেশ উত্তর করিল, "ভাল আছে।"

নিস্তা। তোর এত দেরী হ'ল কেন?

গণেশ। আসতে দেয় না।

নিস্তা। ছোট বৌকে আস্‌বার কথা ব'লেছিলি?

গণেশ। না।

নিস্তা। তোকে যে যাবার সময় ব'লে দিলাম।

গণেশ চুপ করিয়া রহিল। নিস্তারিণী বলিল, "ছোট বৌ কত বড়টী হ'য়েছেরে? একটু মোটাসোটা হয়েছে?"

গণেশ মুখ নীচু করিয়া বলিল, "জানি না।"

নিস্তারিণী হাসিয়া বলিল, "তোর সঙ্গে কি দেখা হয়নি?"

গণেশ। হ'য়েছে।

নিস্তা। তবে?

গণেশ কোন উত্তর দিল না; দাঁড়াইয়া পায়ের বুড়া আঙ্গুলটা মাটিতে ঘষিতে লাগিল।

"ছোট বৌ কি বল্‌লে?"

গণেশ একটু লজ্জার হাসি হাসিল। নিস্তারিণী বলিল, "দূর দূর এত বড় ছোকরা হ'লি, এখনও সংসারের কিছুই শিখলি না। দেখলে ঠাকুরঝি, যাবার সময় এত ক'রে ছোট বৌকে আনবার কথা ব'লে দিলাম, কিন্তু ও তাদের কিছুই বলেনি।"

রন্ধনশালা হইতে মাতঙ্গিনী বলিল; "তা ও কি আর বলতে পারে বৌ, না তোমরা থাকতে ওর বলা উচিত?"

নিস্তারিণী রাগত ভাবে বলিল, "অনুচিতটাই বা কিসে? থাকলেই বা আমরা? ওর পরিবার, তাকে আনবার কথা বল্‌লেও দোষ হয়?"

মাতঙ্গিনী বড় বৌকে চিনিত, সুতরাং সে আর তাহার রাগের বৃদ্ধি না

করিয়া বলিল, "দোষ হোক না হোক, ছেলে মানুষ, লজ্জায় বল্‌তে পারেনি।"

নিস্তারিণী একটু উগ্রস্বরে বলিল, "হাঁ, ছেলে মানুষ, কচি খোঁকাটী, কিছুই জানে না। দেখ ঠাকুরঝি, তুমি তোমার ভাইটীকে যতটা খোঁকা দেখ, সত্যি সত্যি ও ততটা খোকা নয়।"

মাতঙ্গিনী চুপ করিয়া রহিল। নিস্তারিণী গণেশের দিকে চাহিয়া বলিল, "খুব কাজের লোক তুই। যাক্‌, বাড়ীতে আসুক, কালই চিঠি লিখে একটা লোক পাঠিয়ে দিক্‌। নইলে সামনে চোত মাস।"

গণেশ এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল; এখন সে মুখ তুলিয়া একবার নিস্তারিণীর দিকে চাহিয়া দৃষ্টি নত করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "না বৌদি।"

নিস্তারিণী বলিল, "না আবার কি?"

গণেশ। এখন থাক্‌।

নিস্তা। কি থাকবে, ছোট বৌকে নিয়ে আসা?

গণেশ। হাঁ।

নিস্তা। কেন?

গণেশ কোনও উত্তর করিল না। নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিয়া, "কেন, তারা কিছু বলেছে?"

গণেশ নীরব। নিস্তারিণী বলিল, "শত্তুর মুখে ছাই দিয়ে চোদ্দয় পড়েছে, আর কি না আনলে চলে?"

গণেশ বলিল, "বেশ চল্‌বে বৌদি।"

নিস্তা। বেশ চলবে তো তাকে আনতে হবে না নাকি?

গণেশ। নাই বা হ'লো।

নিস্তা। কোথায় থাক্‌বে?

গণেশ। যেখানে আছে।

নিস্তা। সেখানেই যদি বারো মাস থাকবে, তবে বিয়ে ক'রেছিলি কেন?

গণেশ। তোমরা দিয়েছিলে কেন?

নিস্তারিণী ননদকে ডাকিয়া বলিল, "শোন ঠাকুরঝি, তোমার খোঁকা ভায়ের কথা শোন। আমরা জোর ক'রে ওর বিয়ে দিয়েছি।"

মাতঙ্গিনী রান্নাঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিল, "তা তোমরা দাওনি তো কি ও নিজে ক'রেছিল?"

নিস্তারিণী রাগে পঞ্চমে চড়িয়া বলিল, "না গো না, আমরা জোর ক'রে ওর হাত পা বেঁধে ওর গলায় গেঁথে দিয়েছিলাম। ঘোর কলি কি না।"

বেগতিক দেখিয়া গণেশ আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িল। মাতঙ্গিনী বলিল, "তা কলিই হোক আর দ্বাপরই হোক, তুমি এত রাগচো কেন বৌ? রাগের কথাটা কি হয়েছে?"

নিস্তারিণী বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "কিছুই হয় নি গো কিছুই হয় নি। তোমাদের কথায় কি দোষ আছে? যত দোষ আমার কথায়। আসুক সে ঘরে, কেন ভেয়ের বিয়ে দিয়েছিল দেখে নেব।"

উঠান হইতে কলসীটা তুলিয়া লইয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে নিস্তারিণী পুকুর-ঘাটে চলিয়া গেল।

ঘাটে নেত্যর মা ছিল; সে নিস্তারিণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে গা বৌ?"

নিস্তারিণী বলিল, "হবে আর কি মা, কালের গতিক দেখ্‌ছি। যার যত ভাল করবে, সে তত মন্দ ঠাওরাবে।"

নেত্যর মা মুখ রগড়ান বন্ধ করিয়া গামছাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া বলিল, "সে কথা আর বল্‌তে, ঘোর কলি মা, ঘোর কলি। কেন বাড়ীতে কিছু হ'য়েছে না কি?"

নিস্তারিণী কলসীটা ঘাটের পৈঠার উপর রাখিয়া বালী দিয়া রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল, "না, হয়নি এমন কিছু, তবে দেখে শুনে ভয় হয়।"

নেত্যর মা মুরলীর বাড়ীর একটা নূতনতর ঝগড়া শুনিবার আশায় সাগ্রহে নিস্তারিণীর দিকে চাহিয়াছিল, কিন্তু নিস্তারিণীর কথায় সে আশায় নিরাশ হইয়া ক্ষুণ্ণভাবে বলিল, "তা ভয় হয় বৈকি মা।"

একটু থামিয়া বলিল, "তোর দেওর ফিরে এসেছে, না?"

নিস্তারিণী বলিল, "হাঁ, এসেছে।"

নেত্যর মা। কৈ, ছোট বৌ এলো না?

নিস্তার। আসবে বৈ কি, আমরা নিতে গেলেই আসবে।

নেত্যর মা। আমি বলি, ঐ বা সঙ্গে করে আন্‌বে।

কলসীটা ধুইয়া জলে ভাসাইয়া দিয়া নিস্তারিণী জলে নামিল; এবং গামছাখানা কাচিতে কাচিতে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "তাও কি হয় মা, ও কি সঙ্গে ক'রে আন্‌তে পারে? আর তারাই বা শুধু ওর কথায় পাঠাবে কেন?"

নেত্যর মা বলিল, "তা তো বটেই, মাথার ওপর বড় ভাই রয়েচে, ভাজ রয়েচে।"

রাত্রিতে মুরলী বাড়ীতে আসিলে নিস্তারিণী বলিল, "দেখ, তুমি ছোট বোয়ের একটা ব্যবস্থা কর।"

মুরলী বলিল, "তুমি থাকতে আমি অনধিকার-চর্চ্চা করতে যাব কেন ?"

নিস্তারিণী বলিল, "বটে ! বিয়ে দিলে তুমি, আর ব্যবস্থা করব আমি ?"

মুরলী হাত পা গুলাকে বিছানার উপর বেশ সোজা ভাবে ছড়াইয়া দিয়া বলিল, "চেষ্টা দেখে বিয়ে দেওয়া পুরুষের কাজ, তার পরের ব্যবস্থা যা তা বাড়ীর গিন্নীর কাজ।"

স্বামীর উপর হাস্যপূর্ণ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া, কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া নিস্তারিণী বলিল, "ইস্, আমি তো ভারী গিন্নী ; ঝাঁটা-খেকো গিন্নী।"

মুরলী সহাস্যে বলিল, 'ঝাঁটাই খাও, আর ভাত-মুড়ীই খাও, গিন্নী তো বটে।'

নিস্তারিণী বলিল, "বেশ, আমি তবে গিন্নীর মতই ব্যবস্থা কচ্চি। তুমি ছোট বৌকে এনে দাও।"

মুর। এ কথা একশো বার বলতে পার।

নিস্তা। কেবল বলা নয়, এই মাসের মধ্যে এনে দাও।

মুর। এত তাড়াতাড়ি কেন ?

নিস্তারিণী হাসি চাপিয়া বলিল, "সে কথা জিজ্ঞাসা করবার তুমি কে ? তুমি শুধু গিন্নীর হুকুম তামিল করবে।"

মুরলী বলিল, "যে আজ্ঞে। কিন্তু তারা যদি না পাঠায় ?"

নিস্তা। তা আমি জানি না, তোমাকে এনে দিতে হবে।

মুর। তাই হবে।

নিস্তা। দেখো ?

মুর। নিশ্চয়।

নিস্তারিণী হাসিয়া বলিল, "বেশ, এখন এক ছিলিম তামাক বকশিব পেতে পার।"

(৫)

নিস্তারিণীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে মুরলী ছোট বৌকে লইয়া আসিল। ছোট বৌকে আনিতে তাহাকে বেশ একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল। প্রথমে পত্র লিখিয়া লোক পাঠাইয়াছিল। কিন্তু ছোট বোয়ের বাপ শ্রীনাথ পাল

মেয়েকে পাঠাইতে চাহিলেন না। বলিলেন, "সতাতো ভাই ভাজের ঘর; মেয়ে একটু বড় হোক, চালাক চতুর হোক, আপনার সংসার চিনতে শিখুক। এখন পরের সংসারে, পরের কাছে গিয়ে কি করবে ইত্যাদি।"

কথাগুলা শুনিয়া মুরলীর রাগ হইল, কিন্তু রাগ হজম করিবার শক্তি তাহার যথেষ্ট ছিল। সুতরাং সে নিজেই গেল, নিস্তারিণীকে কথাগুলা শুনাইল না; যে লোক কথাগুলা বহিয়া আনিয়াছিল, তাহাকেও বলিতে বারণ করিয়া দিল।

শ্রীনাথ পাল মুরলীর অনুরোধ-রক্ষায়ও অসম্মত হইলেন। কিন্তু মেয়ের মা স্বামীর কথা শুনিলেন না, তিনি মেয়ের ভাসুরের অপমান না করিয়া মেয়ে পাঠাইয়া দিলেন। মুরলী ফিরিবার সময় তাঁহাকে একটা গড় করিয়া আসিল।

ছোট বৌ মহামায়াকে পাইয়া নিস্তারিণীর খুব আহ্লাদ হইল। মহামায়া দেখিতেও মন্দ ছিল না। গায়ের রং খুব ফরসা না হইলেও কালো ছিল না, গৃহস্থ ঘরের চলনসই। গড়ন-পিটনও ভাল, হাত-পা গোলগাল, মুখখানি পানের মত, চোখ দুটি ভাসা ভাসা, মাথার চুলগুলি যেমন মিশমিশে কালো, তেমনই লম্বা। বড় বোয়ের চুলের সাধ, কিন্তু তাহার নিজের তেমন চুল ছিল না, সুতরাং ছোট বোয়ের এক মাথা চুল পাইয়া সে দিনকতক সেই চুলের পরিচর্য্যাতেই মগ্ন হইয়া রহিল। মহামায়া প্রত্যহ স্নান করিত না; কিন্তু নিস্তারিণী রোজ বৈকালে তাহার বাঁধা মাথা খুলিয়া, আবার ভাল করিয়া বাঁধিয়া দিত। মাথা বাঁধিতে তাহার একটা ঘণ্টা যাইত। মাথা বাঁধিয়া, মুখ মুছাইয়া, সিঁথায় সিন্দূর এবং কপালে খয়েরের একটী ছোট টিপ পরাইয়া দিত। তার পর বাঁ হাত দিয়া তাহার চিবুক এবং ডান হাতে কপালটী ধরিয়া কিছু ক্ষণ নির্নিমেষদৃষ্টিতে মুখখানির দিকে চাহিয়া থাকিত, অবশেষে ননদকে ডাকিয়া বলিত, "দেখ ঠাকুরঝি, দেখ।"

মাতঙ্গিনী বলিত, "তুমি দেখ বৌ, আমি ছেলেবেলা হ'তে দেখে আসছি।"

নিস্তারিণী ইহাতে যেন একটু রাগিয়া বলিত, "তুমি ঠাকুরঝি, রক্তমাংসের মানুষ নও, পাথরের।"

মাতঙ্গিনী উত্তর করিত, "পাথরের না হ'লে সংসারের আছাড়ে টেঁকবে কেন বৌ?"

নিস্তা। ধন্যি তোমাকে! তোমার মনে একটু সাধ-আহ্লাদও নাই।

মাত। নাই তার আর কি ক'রব বল। হরি করুক, তোমাদের এই রকম সাধ-আহ্লাদ, তোমাদের মুখের হাসি দেখ্‌তে দেখ্‌তেই যেন যেতে পারি।

নিস্তারিণী বলিত, "ঠাকুরঝি যেন কি !"

মাতঙ্গিনীরও যে সাধ-আহ্লাদ ছিল না এমন নহে, কিন্তু নিস্তারিণীর মত তাহার প্রকৃতিটা তরল ছিল না, সে সকল বিষয়ই একটু গভীর ভাবে লক্ষ্য করিত। সে-ই চেষ্টা করিয়া মহামায়ার সহিত গণেশের বিবাহ দিয়াছিল। কিন্তু মহামায়া তখন বালিকা ছিল। সেও বেশী দিনের কথা নয়, প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বের কথা। এই দেড় বৎসরের মধ্যেই মহামায়ার মুখে মাতঙ্গিনী যেন একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল। দেড় বৎসর আগে তাহার মুখে যে সারল্যটুকু দেখিয়া সে মুগ্ধ হইয়াছিল, এখন যেন সেটুকুর অভাব হইয়াছে; তাহার স্থলে এমন একটা গাম্ভীর্য্যের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে যে, সেই সুন্দর মুখখানি—নিস্তারিণী যাহার দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত, তাহাকে কিছুতেই সুন্দর বলিয়া মনে আনিতে পারিত না। সংসারে পোড় না খাইলে মানুষ চেনা যায় না। মাতঙ্গিনী পোড় খাইয়াছিল, সুতরাং নিস্তারিণীর অপেক্ষা তাহার মানুষ চিনিবার ক্ষমতা খুব বেশী ছিল।

মাতঙ্গিনী লক্ষ্য করিয়া দেখিত, নিস্তারিণীর প্রাণঢালা ভালবাসাটা মহামায়া যেন বেশ প্রসন্নভাবে গ্রহণ করিতেছে না। বড় বোয়ের কৃত্রিমতা-শূন্য আদর-যত্নে যেন তাহার মুখে তৃপ্তির পূর্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে না, যেন তাহা ফুটিতে ফুটিতে কোথায় আসিয়া বাধা পাইয়া একটু কুঞ্চিত হইয়া পড়িতেছে। মাতঙ্গিনী ইহা দেখিল, দেখিয়া ভীত হইল।

এক দিন সে মহামায়াকে অন্তরালে ডাকিয়া বলিল, "দেখ ছোট বৌ, বড় বৌ তোমাকে পেটের মেয়ের মত যত্নআত্তি করে, কিন্তু তুমি—"

মহামায়া ব্যস্তভাবে বলিল, "কেন ঠাকুরঝি, আমি কি করি? দিদি কিছু বলেছে না কি?"

মাতঙ্গিনী বলিল, "না, সে কিছু বলেনি, বলবার মেয়েও সে নয়। তবে তুমিও বেশ বুঝে চলবে।"

মহামায়া উদ্বিগ্নস্বরে বলিল, "আমি তো খুব সাবধানে চলি ঠাকুরঝি। তোমরা আমার কোন চালচলনে দোষ দেখতে পাও?"

মাতঙ্গিনী দেখিল, তাহার ভয়টা মিথ্যা নয়। সে ঠাকুরের দুয়ারে মাথা কুটিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে হরি, হে রঘুনাথ, সংসারটা বজায় রেখো।"

নিস্তারিণী কিন্তু এত খোঁজ-খবর রাখিল না। ছোট বৌকে লইয়া আমোদে আহ্লাদে দিন কাটাইতে লাগিল এবং ছোট বোয়ের কোন্ অঙ্গে কোন্ গহনা দিলে বেশ সাজে, স্বামীর সহিত তাহারই পরামর্শ করিতে থাকিল।

ছোট বোয়ের এমন চুল, এমন সুন্দর খোঁপা, কিন্তু খোঁপায় গহনা কিছুই ছিল না। নিস্তারিণী ছুইটা সোণার ফুলের জন্য স্বামীকে ধরিয়া বসিল। কিন্তু মুরলী বলিল, "আমার সময় তো দেখচো, কোন রকমে সংসারটা চলচে। এসময় গয়না গাঁটি দিতে কোথায় পাব বল।"

নিস্তারিণী বলিল, "কিন্তু ফুল ছুটী না দিলে খোঁপা মানায় না।"

মুরলী বলিল, "আমার এখন দেবার শক্তি নাই, তুমি পার দাও।"

নিস্তারিণী বলিল, "বেশ আমিই দেব,' কিন্তু তুমি কিছু বলবে না?"

মুরলী বলিল, "কিছুই বলব না, যদি ধার না কর।"

কয়েক দিন পরে নিস্তারিণী ছুইটা সোণার ফুল লইয়া স্বামীকে দেখাইল।

মুরলী বলিল, "বেশ হ'য়েছে। কিন্তু কোথা হ'তে হ'ল?"

ঠোঁট চাপিয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে নিস্তারিণী বলিল, "বল দেখি।"

মুর। তোমার বালা ভেঙ্গে।

নিস্তা। উহুঁ:।

মুর। তবে মাকড়ী—না, সে তো বাঁধা।

নিস্তা। খোকার হাঁসুলী ভেঙ্গে।

মুরলী বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া নিস্তারিণীর মুখের দিকে চাহিল। ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে ডাকিল, "বড় বৌ!"

নিস্তারিণী একটু ভয় পাইয়া মুখ নামাইল; উত্তর দিল, "কি?"

মুরলী কিন্তু কিছুই বলিল না। নিস্তারিণী মুখ তুলিয়া ভীতভাবে বলিল, "আমার কি অন্যায় হ'য়েছে।"

"না" বলিয়া মুরলী মৃদু হাসিল। স্বামীর মুখে হাসি দেখিয়া বড় বোয়ের যেন ধড়ে প্রাণ আসিল। সহাস্যে বলিল, "সর্ব্বরক্ষে, আমি বলি তুমি রেগে উঠেছ?"

"না" বলিয়া মুরলী চুপ করিয়া রহিল। নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবচো?"

মুরলী বলিল, "ভাবচি, না, কিছুই না।

স্বামীর হাত ধরিয়া চোখে চোখ রাখিয়া নিস্তারিণী বলিল, "আমায় বলবে না ?"

সহাস্যে বলিল, "ভাবচি, সংসারের সব লোকগুলা যদি তোমার মত হ'তো ?"

নিস্তা। তা হ'লে কি হ'তো ?

মুর। তা হ'লে—তা হ'লে সংসারটা পাগলাগারদ—না, এই রকমই একটু কিছু হ'তো।

"দূর্" বলিয়া স্বামীর হাত হইতে ফুল দুইটা লইয়া নিস্তারিণী চলিয়া গেল। মুরলী প্রফুল্ল দৃষ্টিতে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিল।

(৬)

গণেশ পুনরায় পড়িতে লাগিল। পর বৎসরে সে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। মুরলী সমারোহ করিয়া গ্রাম্যদেবতা বিশালাক্ষীর পূজা দিল। পাঁচজন আত্মীয়কুটুম্বকেও খাওয়াইল। অতঃপর গণেশ কি করিবে তাহাই সকলের চিন্তার ও আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। একবার কথা উঠিল, গণেশকে কলিকাতায় রাখিয়া কলেজে পড়ান হউক। কিন্তু সে অনেক টাকার কাজ। মুরলী তত টাকা কোথায় পাইবে ? গণেশের শ্বশুর আসিয়া প্রস্তাব করিল, গণেশ মোক্তারী পড়ুক, আজকাল মোক্তারীতে বেশ দু'পয়সা আছে।

মুরলী বলিল, "এত প'ড়ে শুনে শেষটা মিথ্যা কথার ব্যবসা শিখ্‌বে ?"

শ্বশুর বলিল, "সংসারে দু'পয়সা আন্‌তে গেলে মিথ্যা ছাড়া উপায় নাই। তুমি এই যে বাপু দোকানদারী কর, তাতে কি মিথ্যা কথা বলতে হয় না ?"

মুরলী নিরুত্তর হইল। নিস্তারিণী শুনিয়া বলিল, "বেশ কথা, তাই করুক। দু'পয়সা এনে খেতে পারবে।"

মুরলী বলিল, "কিন্তু পড়্‌তে গেলে আপাততঃ যে দু'পয়সা চাই। তা আসবে কোথা হ'তে ?"

নিস্তারিণী বলিল, "সে আমি গয়নাগাঁটী ঘটীবাটী বেচেও দেব।"

গণেশ কিন্তু ইহাতে রাজী হইল না। নিস্তারিণী অনেক অনুরোধ করিল, মুরলীও দুই এক কথায় উপদেশ দিল, গণেশ কিন্তু কাহারও কথা রাখিল না। অথচ তাহার অসম্মতির কারণ যে কি তাহাও খুলিয়া বলিল না।

নিস্তারিণী গণেশের উপর ভয়ানক রাগিয়া উঠিল, গণেশও ভয়ে কয়দিন তাহার সম্মুখে আসিল না। শেষে মুরলী মাঝে পড়িয়া নিষ্পত্তি করিয়া দিল।

মহামায়া একদিন গণেশকে ধরিয়া বলিল, "তুমি মোক্তারী পড়লে না কেন?"

গণেশ বলিল, "পড়বার টাকা কোথায়?"

মহা। টাকা তো দিদি দেবে বলেছিল।

গণেশ। গায়ের গয়না, ঘরের ঘটীবাটী বেচে তো?

মহা। কি বেচে কি রেখে, তোমার সে খোঁজে দরকার কি?

গণেশ। দরকার আছে বৈকি, আমার বৌদি যে।

ঠোঁট ফুলাইয়া মহামায়া বলিল, "ইস্!"

গণেশ মুখ ফিরাইয়া রহিল। ঈষৎ হাসিয়া মহামায়া বলিল, "তাই না তুমি মিথ্যা বল না?"

গণেশ বলিল, "কোন্‌টা আবার মিথ্যা বল্‌লাম?"

মহা। এই যা বল্‌লে, দিদির জিনিষ বেচবার ভয়ে পড়লে না।

গণেশ তীব্রদৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিল। মহামায়া বলিল, "কেমন, ঠিক কি না?"

গণেশ নীরব। মহামায়া বলিল, "এবার সত্যি কথাটা কি বল্‌ব?"

একটু কৌতূহলের সহিত গণেশ বলিল, "আচ্ছা, বল।"

মহামায়া বলিল, "আসল কথা, বাবা এই কথাটা তুলেছে ব'লেই—"

গণেশ বসিয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া পত্নীর মুখ চাপিয়া ধরিল। মহামায়া স্বামীর হাত ছাড়াইয়া একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। সে তীব্র শ্লেষের হাসি। গণেশ ফিরিয়া আসিয়া বিছানার উপর বসিল। মহামায়া বলিল, "তুমি না কর তো বাবার সবটাই ক্ষতি। কিন্তু বাবা কি তোমায় মন্দ যুক্তি দিয়েছিলেন?"

গণেশ মুখ তুলিয়া বলিল, "ভাল মন্দ, তুমি ছেলে মানুষ কি বুঝবে?"

মহা। আমি ছেলে মানুষ, কিছু না বটে; কিন্তু তুমি বুড়ো মানুষ, এবার কি করবে?

গণে। যা পারব।

মহা। পারবে আর কি, ব'সে ব'সে ভায়ের অন্ন ধ্বংস করবে।

গণে। ভায়ের ভাতে থাকা দোষের কথা নয়।

মহা। খুব বাহাদুরী!

গণে। এইটুকু বয়সে তোমার জিভে এত ঝাল কেন?

মহা। সত্যি কথা কখনো মিষ্টি হয় না।

গণে। তুমি তোমার সত্যি কথা নিয়ে থাক, আমি উঠি।

গণেশ উঠিল; মহামায়া আসিয়া হাত ধরিল। গণেশ তীব্রস্বরে বলিল "ছেড়ে দাও।"

মৃদু হাসিয়া মহামায়া বলিল, "যদি না ছাড়ি?"

গণেশ বলিল, "জোর করে ছাড়িয়ে নেব।"

মহা। আর আমি দিদিকে ব'লে দেব।

গণে। আমি তোর দিদিকে ভয় করি না।

মহা। একটুও না, শুধু জুজুর মত দেখ।

মহামায়ার ঠোঁটে আবার সেই শ্লেষের তীব্র হাসি। গণেশের আর সহ্য হইল না, হেঁচকাইয়া হাত ছাড়াইয়া লইল। মহামায়া সে টানের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া টলিয়া পড়িল, তাহার কপালটা দরজায় ঠুকিয়া গেল। মহামায়া কপাল টিপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। গণেশ কিন্তু সেদিকে ফিরিয়া চাহিল না।

স্বামী স্ত্রীর কথোপকথনটা নিস্তারিণীর কর্ণগোচর না হইলেও মহামায়ার কপালের আঘাতটা দিদির অগোচর রহিল না। মহামায়া নানা ছলে সেটা দিদির কাণে তুলিল। শুনিয়া নিস্তারিণী রাগে জ্বলিয়া উঠিল। গণেশকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া, "হাঁরে ছোট বৌকে মেরেছিস্!"

গণেশ বলিল, "না।"

নিস্তা। তবে ওর কপালটা ফুলেছে কেন?

গণে। বোধ হয় প'ড়ে গেছে।

নিস্তা। আপনি প'ড়ে গেছে না তুই ফেলে দিয়েছিস্?

গণেশ দেখিল, একটু দূরে দাঁড়াইয়া মহামায়া টিপি টিপি হাসিতেছে।

গণেশ বলিল, "হাঁ, আমিই ফেলে দিয়েছি।"

নিস্তা। কেন ফেলে দিলি?

গণে। আমার খুসী।

নিস্তারিণী গর্জ্জন করিয়া বলিল, "কি বল্‌লি?"

গণেশ দেখিল, মহামায়ার রাঙা ঠোঁটের মৃদু হাসিটুকুর মধ্যে তীব্র অগ্নিশিখা

জ্বলিয়া উঠিয়াছে। নিস্তারিণীর ন্যায় সেও চড়া গলায় বলিয়া উঠিল, 'আমার খুসী।"

নিস্তারিণী রাগে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "গণশা!"

গণেশ তীব্রকণ্ঠে বলিল, "দেখ বৌদি, তোমাকে বারণ ক'রে দিচ্চি, তুমি এসব কথায় থেকো না,"

গণেশ আর দাঁড়াইল না, দ্রুতপদে চলিয়া গেল। নিস্তারিণী রুদ্ধশ্বাসে স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

ভারতী—বৈশাখ।

'ভারতী'র ছবির পরিচয় আর নূতন করিয়া কি দিব? বাঙ্গালার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যাহা দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করে, তাহাকেই 'আর্টে'র চরম বলিয়া পরিচয় দিবার চেষ্টা 'ভারতী' ও 'প্রবাসী' সর্ব্বদাই করিয়া থাকে। এবারকার 'ভারতী'তে 'পূজারিণী' নাম দিয়া প্রথমেই যে ছবিখানি বাহির হইয়াছে, তাহাতেও ঐ চেষ্টার ব্যতিক্রম হয় নাই। যেন পেশাদার যাত্রাদলের কোনও কোকেন-খোর ছোকরাকে ধরিয়া, মেয়েলী ঢংয়ে তাহার গায়ে রাঙ্গা কাপড় জড়াইয়া তাহার হাতে একখানি 'রেকাব' দিয়া 'পূজারিণী' আঁকা হইয়াছে। অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতীয় চিত্রকলাপদ্ধতি'র যাহারা কোনও খবর রাখে না, তাহারা এ ছবিকে সংয়ের ছবি ছাড়া আর কিছুই মনে করিতে পারিবে না। অপর দেশের লোকও ছবি দেখিলে হাসিয়া বাঁচিবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, বাঙ্গালা দেশের লোক 'প্রবাসী' ও 'ভারতী'র এই অত্যাচার নীরবে হজম করিতেছে!

* * *

দেখিয়া বিস্মিত হইলাম,—পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কেও 'বী'তে পাইয়াছে! তবে এই 'বী' দ্বিজেন্দ্র বাবুর লেখনী-সৃষ্ট, কি সম্পাদক যুগলের কলমের কারদানী-প্রসূত, সে বিষয়ে আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ আছে।

কারণ, দ্বিজেন্দ্রবাবুকে আমার যথেচ্ছাচারের পক্ষপাতী হইতে কখনও দেখি নাই। যদি আমাদের সন্দেহ সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে,—সম্পাদক-যুগলের কলম স্পর্দ্ধার পরিচারক বটে!

* * *

এবারকার 'ভারতী'তে 'আলেয়ার আলো' জ্বলিয়াছে। 'আলেয়ার আলো' কোথায় জ্বলে, অনেকেরই তাহা জানা আছে। মাঠের যেখানটা 'ভাগাড়, সেখান হইতে একপ্রকার দূষিত বাষ্প নির্গত হয়। সেই বাষ্প বাতাসের অম্লজানের সহিত মিশিলেই তাহা জ্বলিয়া উঠে। ইহাই 'আলেয়ার আলো'। সাধারণ লোকে মনে করে, এ আলোর সঙ্গে ভূত-প্রেতের সম্পর্ক আছে।

সাহিত্য-ক্ষেত্রের অংশবিশেষে যে পগার-ভাগাড় নাই' এমন কথা বলিতে পারি না। নহিলে 'ভারতী'র বুকে 'আলেয়ার আলো' জ্বলিবে কেন?

পূতিগন্ধই 'আলেয়ার আলোর প্রাণ। 'ভারতী'র এ 'আলেয়ার আলো'তেও তাহা বিদ্যমান। সাহিত্যের পূতিগন্ধ কি?—উহা কুরুচির পরাকাষ্ঠা। যে সকল কথা ভদ্রসমাজে বলা চলে না, সেই সকল ইতর শ্রেণীর কথাবার্ত্তাগুলি 'ভারতী'র 'আলেয়ার আলো'তে পুরাদস্তুর চালান হইয়াছে। নমুনা দেখুন:—

(১) একটীমাত্র রসগোল্লা দুটী বালকের হাতে দিলে কাড়াকাড়ি হয়; একটীমাত্র রমণীও দুটী যুবকের ভাগে পড়লে কাড়াকাড়ি, আড়াআড়ি এবং ছাড়াছাড়ি অনিবার্য্য।

(২) বয়স যখন চব্বিশ, প্রাণ তখন শুকনো খড়ের গাদার মতন। কাছে আগুন আনলে আর কি বাঁচোয়া আছে!

তার পর নাটকীয় উচ্ছ্বাস আছে; হিন্দু-সমাজের উপর 'বক্তিমে' আছে; 'সঞ্জীবনী'র পড়া বুলির কপচানি আছে; আর আছে—সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ভ্যাংচাইবার চেষ্টা। শক্তিহীনের অনুকরণ সচরাচর যেমন প্রহসনে পরিণত হয়, এই 'অপিন্যাসে'র সূচনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

* * *

বীরভূম-বিবরণ।—প্রথম খণ্ড। মহারাজকুমার শ্রীযুত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত। 'বীরভূম-অনুসন্ধান-সমিতি' হইতে শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদনে আছে,—'বীরভূমের লোকপরম্পরা-প্রচলিত প্রবাদ, প্রবচন ও গীতি-গাথা আদির মধ্যে বহু ঐতিহাসিক উপকরণ নিহিত রহিয়াছে।' 'বীরভূম-বিবরণে' এই সমস্ত যত দূর সম্ভব সংগৃহীত হইয়াছে। প্রকাশক লিখিয়াছেন,—'বলিয়া রাখা ভাল ইহা খাঁটি ইতিহাস নহে। বীরভূমের কয়েকটী পল্লী ও তীর্থক্ষেত্রের কাহিনী মাত্র।' ইতিহাস নহে সত্য, কিন্তু যিনি ভবিষ্যতে বীরভূমের ইতিহাস রচনা করিবেন, তিনি এই পুস্তক হইতে অনেক মাল-মসলা পাইবেন। পুস্তকখানি বীরভূমের ইতিহাস-রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিবে, এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা বলিব,—দেশের সুদিন আসিয়াছে। লক্ষ্মীর বরপুত্রগণও দেশের অতীত-গৌরবের পুনরুদ্ধারে ব্রতী হইয়াছেন। এই হিসাবে হেতমপুরের মহারাজকুমার শ্রীযুত মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্ত্তী দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

'বীরভূম বিবরণ' আমরা আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছি। ইতিহাসের হিসাবে আমরা ইহা পাঠ করি নাই; পাঠ করিয়াছি—দেশের প্রাচীন কিম্বদন্তী ও কাহিনীগুলির পরিচয় ইহাতে আছে বলিয়া। সেগুলির ভিতর বাঙ্গালীর প্রাণের, বাঙ্গালীর সুখ-দুঃখের অনেক কথাই জানিতে পারা যায়। সেগুলি পড়িলে মনে কেমন একটা জাত্যাত্মবোধ ফুটিয়া উঠে, অতীতের শ্লাঘা আসিয়া হৃদয়টাকে কেমন বড় করিয়া তুলে। আমি বাঙ্গালী, আমার অতীত আছে, আমার জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে। একদিন ছিল,—যখন আমার সাহস-বীর্য্য-শৌর্য্য ছিল; আমার রাজ্য ছিল, বাণিজ্য ছিল, দেশব্যাপী শিল্প ছিল। এই অতীত-গৌরব-বোধই এই সকল কাহিনী পড়িলে হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। সুতরাং বলিব,—এ হিসাবে 'বীরভূম-বিবরণ' সার্থক হইয়াছে। আত্মবিস্মৃতকে তাহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়ার মত বড় কাজ পৃথিবীতে বড় অল্পই আছে। 'বীরভূম-বিবরণ' সে সুমহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছে। ইহাই ইহার প্রতিষ্ঠা, ইহাই ইহার প্রশংসা।

পুস্তকখানির আকার সুবৃহৎ। অনেকগুলি হাফ্‌টোন ছবিও আছে। ছাপা, বাঁধাই ভাল। এরূপ গ্রন্থের দুই টাকা মূল্য খুবই সস্তা বলিতে হইবে।

নানা কথা।

তিনটি আশ্চর্য্য ঘটনা।

১। আশ্চর্য্য বৃক্ষ।

ফরিদপুর জিলায় একটি অত্যাশ্চর্য্য নারিকেল গাছ আছে। প্রত্যুষে বৃক্ষটি পত্রবিস্তার পূর্ব্বক সরলভাবে দণ্ডায়মান থাকে, সন্ধ্যাসমাগমে ইহার মস্তক অবনত হইয়া ভূমিস্পর্শ করে। এই নৈসর্গিক ব্যাপার প্রত্যহ ঘটে। ইহাকে দৈব-ব্যাপার মনে করিয়া জনসাধারণ বৃক্ষমূলে পূজা দিতেছে এবং বৃক্ষের মালিক ইহাতে বেশ দু'পয়সা উপায় করিতেছে। এই অসামান্য ব্যাপারের কারণ-নির্ণয়ার্থ আচার্য্য স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় যন্ত্রপাতিসহ দুইবার লোক পাঠাইয়াছেন। পরীক্ষার দ্বারা অতি চমৎকার ফললাভ করা গিয়াছে। উদ্ভিদ-তত্ত্ব-সম্বন্ধে বসু মহাশয় যাহা আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহার দ্বারা তাহাই প্রতিপন্ন হইবে। বসু ইনিষ্টিটিউট হইতে প্রকাশিত পত্রে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বাহির হইবে।

২। সাপের কচ্ছপে রূপান্তর।

শুঁয়া পোকা প্রজাপতিতে রূপান্তরিত হয়, এ কথা সকলেই জানেন ; কিন্তু ঢোঁড়া সাপের শরীর যে কচ্ছপের আকার ধারণ করে, তাহা বোধ করি কেহই শুনেন নাই। সম্প্রতি 'ত্রিপুরা গেজেট' লিখিয়াছেন,—

একটি প্রকাণ্ড ঢোঁড়া সাপ এক নির্জ্জন স্থানে আসিয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া গোলাকৃতি হইল, ক্রমে সর্পের শরীর হইতে ফেন বাহির হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ফেনপুঞ্জে সাপটী একেবারে আবৃত হইয়া গেল এবং সর্পশরীর অতি অল্প সময় মধ্যেই গোলাকার ফেনময় কচ্ছপাকৃতি ধারণ করিল। কিছুক্ষণ মধ্যেই দেখা গেল, সর্পটির অস্তিত্ব একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে এবং ঐ ফেনরাশি দ্বারা একটী "সুন্দি" জাতীয় কচ্ছপের সৃষ্টি হইয়াছে। তখন কচ্ছপটীর বহিরাবরণ অতি কোমল, ঠিক সদ্যোজাত শিশুর তালুদেশের ন্যায় তকতকে নরম। ক্রমে উহা দৃঢ় হইয়া উঠিল। এইরূপে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাণ্ড ঢোঁড়া সাপটী 'সুন্দি' কচ্ছপের আকার ধারণ করিল। "সুন্দি" বা "কেরি" নামে যে এক শ্রেণীর কচ্ছপ আছে, তাহা বর্ষার প্রাক্কালে এদেশে মাঠে মাটীর নীচে প্রচুর পাওয়া যায়। উহাদের বহিরাবরণে ঠিক ঢোঁড়া সাপের চিত্রের ন্যায় বড় বড়

দাগ আছে। তবে কি এই শ্রেণীর কচ্ছপগুলি সর্পেরই রূপান্তর? প্রাণিতত্ত্ব-বিৎগণের আলোচনার বিষয় বটে।

৩। কলির ধ্রুব।

'নায়ক' লিখিয়াছেন,—নৈহাটী হইতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেন লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,—"২৪ পরগণায় নৈহাটী গ্রামের নিকটবর্ত্তী গরিফা গ্রামের শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষের প্রজা—এক বাগ্দীর ঘরে এক অদ্ভুত সন্তান জন্মিয়াছে। তাহার বয়স অন্যূন চারি বৎসর। সে কথা কহিতে শিখিয়া পর্য্যন্ত "রাধাগোবিন্দ" বুলি ভিন্ন আর কিছুই বলে না; সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পায়, তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করে, "রাধাগোবিন্দ পাব কোথায়?" তুলসীমঞ্চ দেখিলে আগ্রহের সহিত জড়াইয়া ধরে, এবং তুলসীপত্র ভক্ষণ করে। কেহ উহার হাতে মিষ্টান্ন বা পয়সা দিলে সে তাহা দূরে নিক্ষেপ করে। যদি কেহ এই অসাধারণ বালককে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে গরিফায় আসিলেই দেখিতে পাইবেন। আপাততঃ এই হরিভক্ত শিশুকে—কলির ধ্রুবকে কলিকাতায় আনিয়া অবিশ্বাসীদের সংশয়-ভঞ্জন করিবার ব্যবস্থা করিলে হয় না?

*　*　*　*　*

একটী প্রস্তাব।

দেশের দুর্দ্দিন—অর্থের অভাব—দারিদ্র্যের কুটিল ভ্রূকুটী অদূর ভবিষ্যতের জন্য সকলের অন্তরে ভীতি জন্মাইতেছে। এ সময়ে সকল দিকেই একটু সংযতব্যয়ী হইতে হইবে। এ অবস্থায় নিঃস্ব বাঙ্গালা দেশে অকিঞ্চিৎকর, আপাতসুন্দর সিল্‌ক প্রভৃতি দ্বারা বাঁধাইয়া অযথা পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দেশের অর্থ নানা-ভাবে অপব্যয়িত হইতেছে। এ বিষয়ে পুস্তক-প্রকাশকগণ একটু বিবেচনা করিবেন কি? এইরূপ বাঁধান পুস্তক স্থায়ী না হইয়া আয় ও ব্যয়বৃদ্ধির কারণ হইয়াছে। সমস্ত পুস্তকই এই ভাবে বাঁধান হওয়ায় কেহই অল্প মূল্যের পুস্তক পাইতে পারে না। বিশেষ সাধারণ পুস্তকালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ বাঁধান পুস্তক কিনিয়া অযথা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েন। কারণ এই বাঁধান নানা হাতে পড়িয়া অল্প সময়েই নষ্ট হয়। আজকাল যে Feather-weight নামক এক প্রকার কাগজে পুস্তক মুদ্রিত হয় তাহা ভাল করিয়া বাঁধান যায় না; অল্পেই ছিঁড়িয়া যায়। অসার পুস্তক তাহাতে মুদ্রিত হইলে ক্ষতি নাই; কিন্তু সারবান পুস্তকও যে ঐ ভাবে মুদ্রিত হইয়া আমাদিগকে অযথা ক্ষতিগ্রস্ত করিতেছে, তাহা ভাবিবার সময় হইয়াছে।

চাতক।

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

হৃদয়-চাতক মোর আকুল তৃষায়
ডাকে—'জল জল'
যাতনা-নিদাঘে তার তাপিত পরাণ,
দহে অবিরল।

কোন সিন্ধু-নীলিমার কোন পরপারে
কোথা আছে সুধা,
বারিদ-বরণ নাথ! দূর কর তার
ভব-তৃষ্ণা-ক্ষুধা।

এক বিন্দু বারি বিনে দহিছে জীবন
দাও তারে জল,
এক বিন্দু কৃপা সে যে—এক বিন্দু সুধা
স্বচ্ছ সুনির্ম্মল!

অনন্ত রেখেছ কত বসুধার বুকে
সিন্ধু-নদ-নদী,
তবু নাহি মেটে তার এতটুকু তৃষা—
ডাকে নিরবধি।

হে মহান্ কল্পতরু! দাও তারে দাও
এক বিন্দু জল,
এক বিন্দু কৃপা সে যে—এক বিন্দু সুধা
চির-সুশীতল!

———

বৈষ্ণব কবির অব্যক্তানুকরণ।

[শেষ প্রস্তাব]

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম্-এ, বি-এল্]

বৈষ্ণব গীতি-কবিতার ন্যায় সরস-কোমল কবিতা বাঙ্গালা ভাষায় কেন, অন্য কোনও ভাষায় আছে কি না সন্দেহ হয়। বঙ্গীয় কাব্য সাহিত্যের উষাকালে বৈষ্ণব কবি পক্ষিগণের যে অব্যক্ত অপরিস্ফুট অর্দ্ধপরিস্ফুট কাকলী শুনিয়াছিলেন তাহার স্পষ্ট অভিব্যক্তি তাঁহার কবিতার ছত্রে ছত্রে অনুভূত হয়। অব্যক্ত ধ্বনির অনুকরণে রচিত প্রত্যেক শব্দ হইতে যেন মধু ক্ষরিত হইতেছে। বৈষ্ণব কবির লেখনীপ্রসূত রচনা পাঠ করিলে সঙ্গীতের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে হৃদয়-মন প্লাবিত হইয়া যায়। বৈষ্ণব কবির রচনার বিশেষত্ব এই যে, প্রত্যেক শব্দ যেন গানের সুরের সহিত মিলাইয়া লইয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলী বাস্তবিক এক একখানি গানের রেকর্ড। যমুনার জলরাশি কৃষ্ণ-প্রেমের তরঙ্গ লইয়া যেদিন গঙ্গা-বক্ষে আশ্রয় লইয়াছিল, সেই শুভদিনের কথা কেহ জানে না; কিন্তু আজ কয়েক শতাব্দী যাবৎ বৈষ্ণব কবির গানে গঙ্গা-প্রবাহে উজান বহিতেছে। বৈষ্ণব পদাবলী প্রেমিক বাঙ্গালীকে বৃন্দাবনের দৃশ্যাবলীর মধ্যে লইয়া যায়। কত সপ্তকোটী বাঙ্গালী নর-নারী যে বৈষ্ণব কবির কৃপায় হৃদয়-বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-লীলার অভিনয় দেখিয়াছে তাহার সংখ্যা হয় না। কবিত্ব-হিসাবে বৈষ্ণব কবির গীতি-কবিতা সেই জন্য অননুকরণীয়। চিত্রাঙ্কণশক্তির সাহায্যে কিন্তু বৈষ্ণব কবি পাঠকের কল্পনাকে সচেতন করিয়া দেন না। বৈষ্ণব কবির শিল্পনৈপুণ্যে তুলিকা ও বর্ণের প্রভাব খুব বেশী নয়। চিত্রে জীবন্ত ভাব ফুটাইবার জন্য তিনি আশ্চর্য্য শিল্পকৌশলে প্রকৃতির জীবন্ত ভাবের অনুরূপ ভাষা সৃষ্টি করিয়া তাহাতে কবিতা রচনা করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবির শিল্পসৌন্দর্য্য শব্দের আভাসে। শব্দ শুনিয়া পারিপার্শ্বিক ঘটনা চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া

উঠে। বর্ণের আভাস সকল কবি দিয়াছেন; কিন্তু এমন শব্দের আভাস বৈষ্ণব কবি ছাড়া আর কোনও কবি দেন নাই। আমরা সেই জন্য বৈষ্ণব পদাবলীতে বার বার মুরলীর গান শুনিতে পাই। কবির চিত্রপটে ছায়া-আলোকের রহস্য বিশেষভাবে স্থান পায় নাই, তাহার কারণ তিনি বহির্জগতের কবি নহেন। বৈষ্ণব কবি অন্তর্জগতের কবি, তাঁহার কাব্যের সৌন্দর্য্য দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার বহু পূর্ব্বে শ্রুতির উদ্দীপন করে। কাণের ভিতর দিয়া সেই সৌন্দর্য্য হৃদয় স্পর্শ করে। মুরলীর সঙ্গীতে হৃদয়ে তরঙ্গ উঠে, চিত্র-দর্শনে সেরূপ হয় না। সুন্দর-চিত্রদর্শনে মানুষ মুগ্ধ হইয়া সেইখানেই বসিয়া থাকে, সঙ্গীত শুনিয়া সে ছুটিয়া ঘরের বাহিরে আসে। প্রেমের ক্ষমতা আকর্ষণী শক্তিতে। বৈষ্ণব কবি প্রকৃতির হৃদয়ের ভাষা বুঝিয়াছিলেন। অব্যক্ত ধ্বনির মধ্যে যে অনন্ত ভাব-লীলা আবদ্ধ রহিয়াছে, তাহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। প্রেমের কবি চণ্ডীদাসের রাধা সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণকে দেখিবার পূর্ব্বে তাঁহার অপরূপ বংশীধ্বনি শুনিয়াছিলেন। এই শব্দ কদম্ব-বন হইতে আচম্বিতে আসিয়া তাঁহার কর্ণে পশিয়াছিল। এই অব্যক্ত বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধার মনে অব্যক্ত ভাবের সঞ্চার হয়।

"কদম্বের বন হইতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিয়া পশিল মোর কাণে।
অমৃত নিছিয়া ফেলি কি মাধুর্য্য পদাবলী
কি জানি কেমন করে প্রাণে॥"

চণ্ডীদাস বলেন, প্রেমের আনন্দে "গন্ধ পন্থ হয়ে বেগেতে ধাইয়া যায়।", বৈষ্ণব কবির হৃদয়ের প্রেমানন্দে যে অব্যক্ত পরিস্ফুট হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি? বৈষ্ণব কবি কেবল অব্যক্ত ধ্বনি ভাষায় প্রকাশ করেন নাই, তিনি শব্দ-রহস্য অভিব্যক্ত করিয়াছেন। শব্দ ব্রহ্ম, শব্দ শ্রুতি। ধর্ম্ম-বিশেষে সৃষ্টির আদিতে শব্দই কল্পিত হইয়াছে। জগতে শব্দের ক্রমবিকাশের সহিত ভাষা সাহিত্য ধর্ম্ম বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। হিন্দুরা বৈদিক যুগে শব্দের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছিলেন। হিন্দুর বেদে, হিন্দুর সাহিত্যে ধ্বনি শব্দাকারে, সঙ্গীতাকারে অভিব্যক্ত। সংস্কৃত ভাষায় উৎকৃষ্টকাব্যের নাম "ধ্বনিকাব্য"। সংস্কৃতের মত বাঙ্গালা ভাষাও ধ্বনির ইতিহাস। বেদের পূর্ব্বে আর্য্যদিগের কি ভাষা, কি সাহিত্য ছিল, ইহা যেমন কেহ জানে না, বৈষ্ণবপদাবলীর পূর্ব্বে বাঙ্গালীর কি ভাষা, কি সাহিত্য ছিল তাহাও কেহ জানে না।

আর্য্য ঋষি ব্রহ্মার মুখে অব্যক্তের ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে আর্য্যগণ প্রকৃতির ভাষার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারেন নাই। বৈষ্ণব কবিও শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর গানে নূতন ধর্ম্মের বার্ত্তা শুনিয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালী প্রেমের আহ্বান শুনে নাই। বৈষ্ণব কবি প্রকৃতির সঙ্গীতে প্রেমের সঙ্কেত পাইয়াছিলেন। সে সঙ্গীত কদম্ববন হইতে উত্থিত হইয়াছিল, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বাঁশীর স্বরে সেই সঙ্গীত শুনাইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর "নিশানে" কেবল রাধার প্রাণ আকুল হয় নাই, সমগ্র বঙ্গদেশ আকুল হইয়াছিল। বৈচিত্রময় ধ্বনির মধ্যে যে গভীর প্রেমভাব রহিয়াছে, বৈষ্ণব কবি তাহারই অভিব্যক্তি কাব্যের ভিতর দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। প্রেম-ধর্ম্মের বেদব্যাস—বাঙ্গালী কবি চণ্ডীদাস বাঁশীর স্বরের গূঢ়ার্থ ব্যাখ্যা করিয়া গাইয়াছেন—

"মধুর মুরলী পূরে বনমালী
রাধা রাধা বলি গান।
একাকী গভীর বনের ভিতর
বাজায় কতেক তান॥
অমিয়া নিছনি বাজিছে সঘন
মধুর মুরলী-গীত।
অবিচল কুল রমণী সকল
শুনিয়া হরল চিত॥
শ্রবণে যাইয়া রহল পশিয়া
বেকতে বাজিছে বাঁশী।
আইস আইস বলি ডাকয়ে মুরলী
যেন ভেল সুখরাশি॥"

গন্ধময় অব্যক্ত ধ্বনি কবির হৃদয়ের অন্তঃপুরে পশিয়া পদ্যময় ভাষায় "আইস আইস" বলিয়া তাঁহাকে আহ্বান করিল। চণ্ডীদাসের কবি-হৃদয় প্রেমময়ের আহ্বানে ছুটিয়া বাহিরে আসিল। কবি বহির্জগতে প্রত্যেক অব্যক্ত ধ্বনিতে কেবল সেই এক প্রেমের আহ্বান ছাড়া আর কিছু শুনিতে পাইলেন না। কদম্ববনে, যমুনাতীরে, গোচারণভূমিতে, নিভৃত-নিকুঞ্জে সেই আবাহন-সঙ্গীত ছাড়া আর কিছুই তাঁহার কর্ণগোচর হইল না। আনন্দ-কল্লোলে সমস্ত জগৎ যেন সশব্দে জাগিয়া উঠিল। পদকর্ত্তা উদ্ধবদাস

ও যতুনন্দন চণ্ডীদাসের মত কদম্ব-কানন হইতে প্রেমের সঙ্গীত উত্থিত হইতে শুনিয়াছিলেন। সকল বৈষ্ণব কবির হৃদয়ে অব্যক্ত ধ্বনি সঙ্গীতাকারে অভিব্যক্ত। বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যে সেই কারণে অব্যক্ত ধ্বনির এত প্রভাব। চন্দ্রশেখর বলেন, শ্রীকৃষ্ণ কোকিলের কুহু-রবে নিজের আগমনবার্ত্তা রাধিকাকে জ্ঞাপন করেন।

"কোকিল কুহু রবে, সঙ্কেত করি নিজ, আগতি জানায়ত কান।
অঙ্গনে কংস-বিপক্ষ উপস্থিত, রাই নিজ অন্তরে জান॥"

জ্ঞানদাস বলেন, "অবিরত মুরলী মধুর গায় গীত।" প্রেমিক না হইলে বাঁশীর সঙ্কেত কেহ বুঝিতে পারে না। চণ্ডীদাস বলেন, সুবল জানিত বাঁশী "রাই" এই "দুই আখরে"র গান গায়ে।

"সুবল সঙ্গেতে তার কান্দে হাতে
আরপি৽নাগর রায়।
হাসিতে হাসিতে সঙ্কেত বাঁশীতে
এ দুই আখর গায়॥
এ কথা আনেতে না পারে বুঝিতে
সুবল কিছু সে জানে।
হই হই বলি রাজপথে চলি
গমন করিছে বনে॥"

আমরা জীবনের পথে 'হই হই' করিয়া চলিয়াছি, সেই কারণে বাঁশীর সঙ্কেত বুঝিতে পারি না। অর্থহীন অব্যক্ত ধ্বনি ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যাই। কবিশেখরও বাঁশীর সঙ্কেতের কথা বলিয়াছেন—

"আপনার ধেনু সব সঙ্গিগণে দিয়া।
রাধা বলি বাজায় বাঁশী ত্রিভঙ্গ হইয়া॥"

প্রেম এমন জিনিষ যে যাহার হৃদয়ে ইহা জাগিয়াছে, সে অপরকে বিতরণ না করিয়া থাকিতে পারে না। বৈষ্ণব কবি অকাতরে জগতকে প্রেম বিলাইয়াছেন। কি উপায়ে প্রেম বিলাইতে হয়। চণ্ডীদাস তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। রাই রাখাল বেশ করিয়া সখীগণকে বলিলেন—

"পর পীত ধড়া মাথে বান্ধ চূড়া
বেণু লও কেহ করে।
হারে রে রে বোল কর উচ্চ রোল
যাইব যমুনাতীরে।"

রাধা-বিনোদিনী রাখালবেশে সাজিলেন বটে, কিন্তু "বলরামের শিঙ্গা বলে রাম কানু. মুরলী নহিলে কে ফিরাইবে ধেনু?" রাধিকা পত্রদ্বারা মুরলী গড়িলেন। শিঙ্গা ও বেণুর রব শুনিয়া চৌদিকে ধেনুর পাল হাম্বা হাম্বা করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দেখিয়া দেবতারাও আনন্দিত হইলেন।

"বৃষভ বাহনে শিব বলে ভালি ভালি।
মুখবাদ্য করে নাচে দিয়া করতালি॥"

সরল-হৃদয় রাখাল-বালকের মত আপনার সীমাবদ্ধ জীবনের বাহিরে আসিয়া ভ্রান্ত পথিককে প্রেমের সঙ্গীত শুনাইয়া ফিরাইতে হয়। কৃষ্ণের বাঁশীর উদ্দেশ্য স্মরণ করিয়া সকল জীবকে প্রেম দান করিতে হয়। মুরলী মানুষকে বিশ্ব-প্রেমিক করিতে চাহে। মুরলী আমাদিগকে সঙ্কীর্ণতা শিক্ষা দেয় না। প্রেমদাসের ন্যায় বলরামদাসও করুণ-রাগিণীতে গাইয়াছেন—

"চাঁদ মুখে বেণু দিয়া, সব ধেনু নাম লইয়া,
ডাকিতে লাগিলা উচ্চস্বরে।
শুনিয়া কানাইর বেণু, ঊর্দ্ধ মুখে ধায় ধেনু,
পুচ্ছ ফেলি পিঠের উপরে॥"

শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর শিক্ষা আমরা বুঝিতে পারি না, সেই জন্য বৈষ্ণব কবির নিন্দা করি, অব্যক্ত ধ্বনিতে অশ্লীলতার কল্পনা করিয়া থাকি। উদ্ধবদাস বলেন, রাধিকা এক দিন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর গানের অর্থ ভাল বুঝিতে না পারিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, তিনি চন্দ্রাবলীর নাম মুরলীতে গান করিতেছেন।

"শুনি ধনি রাই রোখে ভেল গর গর
থর থর কম্পিত অঙ্গ।
চন্দ্রাবলি বলি বংশী বাজাওত
বিলসয়ে তাকর সঙ্গ॥"

চণ্ডীদাসের রাধা শ্রীকৃষ্ণের নিকট মুরলী শিক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের মত প্রেমের এমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ আর কোন্ কবি করিয়াছেন? "মুরলী শিক্ষা" নামক গীতি-কবিতায় তিনি অব্যক্ত ধ্বনির মধ্যে যে গূঢ় শব্দতত্ত্ব নিহিত আছে তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন। মুরলীর রন্ধ্রগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার ধ্বনি আছে। দুইটি রন্ধ্রে কেবল অনুপম মধুর সুললিত বংশীধ্বনি শুনা যায়। একটি রন্ধ্রে কেবল রাধা নাম বাহিরায়; একটি রন্ধ্রে কেকারব আর একটিতে কোকিলের পঞ্চম স্বর শুনা যায়। একটি রন্ধ্রের ধ্বনিতে

পারিজাত, অপর একটির ধ্বনিতে কদম্ব প্রস্ফুটিত হয় এবং অন্য একটির ধ্বনিতে নিধুবন ফুল ও ফলে পরিশোভিত হয়। একটি রন্ধ্রের ধ্বনিতে ষড়ঋতু এককালে আইসে। চণ্ডীদাসের আর একটি পদে জানা যায় যে, বিভিন্ন প্রকার গীত ও তান ভিন্ন ভিন্ন রন্ধ্রে নির্গত হয়। একটি রন্ধ্রের ধ্বনিতে যমুনা উজান বহে। একটি রন্ধ্রের গানে রাধার চিত্ত হরণ করে; অপর একটিতে রাধার হৃদয়ের প্রেম টানিয়া বাহির করে। বৈষ্ণব কবির গীতেও প্রকৃতির প্রফুল্লতা গাছের ডালে, আকাশের গায়ে ফুটিয়া উঠে। বসন্তোৎসবে সেই জন্য বৈষ্ণব কবি প্রেমিক-প্রেমিকাকে যোগদান করিতে আহ্বান করিয়াছেন। প্রেমের এমন মিলনক্ষেত্র আর কোনও কবি কল্পনা করেন নাই। গোবিন্দদাসের বাসন্তী লীলার বর্ণনা কেমন মনোহর! যখন,—

"শিশিরক অন্তরে অন্তরে বসন্ত।
ফুয়ল কুসুম সব কানন অন্ত॥"

তখন, "কেহ লেই মুরলী, কেহ লেই মৃদলি, দূরেহি দূরে গেও গাওত হোরি।"
"ডমরু রবাব, উপাঙ্গ পাখোয়াজ, কতরল তাল সুমেলি করি।"

"ঘন করতালি ভালি ভালি বোল।
হো হো হরি তুমুল উতরোল॥"

সকল তরুতে নব কিশলয় শোভা পাইতেছে, কুসুমভরে অবনত কত শাখা দেখা যাইতেছে,—

"তঁহি শুক সারিণী কোকিল বোল।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ ভ্রমর করুরোল॥
অপরূপ শ্রীবৃন্দাবন মাঝ।
ষড় ঋতু সঙ্গে বসন্ত ঋতুরাজ॥
বিকশিত কুবলয় কমল কদম্ব।
মাধবী মালতী মিলি তরু লম্ব॥
কাঁহা কাঁহা সারস হংসী নিশান।
কাঁহা কাঁহা দাদুরি উনমত গান॥
কাঁহা কাঁহা চাতক পিউ পিউ কুয়।
কাঁহা কাঁহা উনমত নাচয়ে চকোর॥"

বসন্তকালে কোকিলের গানের সঙ্গে দাদুরীর চীৎকার শুনিয়া যাহারা

বলেন, বৈষ্ণব কবির রচনা অসঙ্গতিদোষে দুষ্ট তাঁহাদের মধুসূদন দত্তের কথা স্মরণ রাখা উচিত।

"মানসে মা যথা ফলে,
মধুময় তামরাস—কি বসন্তে, কি শারদে!"

কবির হৃদয়ের উপর যখন প্রকৃতির প্রভাব জাঁকিয়া বসে, তখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে যত সুর, যত গান, যত ধ্বনি আছে সকলেরই প্রতিধ্বনি কবির অন্তরে যুগপৎ জাগিয়া উঠে। এ যে শ্রীকৃষ্ণের মুরলীর সেই রন্ধ্রের ধ্বনি, তাহাতে "ষড়ঋতু একবালে আইসে!" বসন্তোৎসবের পরিপূর্ণ আনন্দের মধ্যে অব্যক্ত, মূক, উপেক্ষিতের অস্তিত্ব কল্পনা করিতে বৈষ্ণব কবির সাধ্য নাই। বৈষ্ণব কবি মুরলীর প্রভাব তাঁহার কাব্যের সকল স্থানে ছড়াইয়া দিয়াছেন। প্রেমের জগতে কোথাও তিনি মানব-হৃদয়ের মর্ম্মভেদী যাতনার নিঃশ্বাস ফেলেন নাই। অব্যক্ত ধ্বনির আনন্দে কি বিরাম আছে? প্রকৃতির আনন্দস্রোত কখনও মন্দীভূত হয় না। বিদ্যাপতি বলেন, শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধিকার হৃদয় যখন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, তখনও প্রেমের জগতে আনন্দধ্বনির বিরাম নাই।

"কুলিশ শত শত পাত-মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকী
ফাতি যাওত ছাতিয়া।"

অন্যত্র,

"সজনি! আজু শমন-দিন হোয়।
নব জলধর চৌদিকে ঝাঁপল
হেরি জিউ নকসয়ে মোর॥
ঘন ঘন গরজিত শুনি জিউ চমকিত
কম্পিত অন্তর মোর।
পাপিহা দারুণ পিউ পিউ সোঙরণ
ভ্রমি ভ্রমি দেই তুচ্ছ কোর।"

বর্ষা-সমাগমে যেমন, বসন্তেও সেই ভাব।—

"পথ নিরখিতে চিত উচাটন
ফুটল মাধবী লতা।

কুহু কুহু করি কোকিল কুহরই
গুঞ্জরে ভ্রমর যতা ॥"

"ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওই রে।
মলয়ানিল হিম শিখরে সিধায়ল
পিয়া নিজ দেশ না পাওই রে॥

চণ্ডীদাসের রাধাও বিরহে গাইয়াছেন—

"সখিরে, বরষ বহিয়া গেল, বসন্ত আওল ফুটল মাধবীলতা।
কুহু কুহু করি, কোকিল কুহরে, গুঞ্জরে ভ্রমরী যতা।"

গোবিন্দদাস বলেন, পাপিয়ার পিউ পিউ রবে পিয়া শব্দ শ্রবণ করিয়া রাধিকা বিরহাবস্থায় তাহার দিকে তাকাইলেন না। রাধিকা যখন উৎকণ্ঠিতা, তখনও কবি শুনিয়াছেন, "ওহি ওহি পিক বোল।" গোবিন্দদাস মধুকরের আনন্দ বর্ণন করিয়া গাইয়াছেন—

"অবনি বিলম্বিত বনি বনমাল।
মধুকর ঝঙ্কারু ততহি রসাল॥"

কবি বলেন, শ্রীকৃষ্ণ যখনই গলায় ফুলের মালা পরেন, কোথা হইতে ভ্রমর আসিয়া, উড়িয়া পড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আনন্দে মাতিয়া গান গাইতে থাকে।

"মালতী ফুলের মালাটি গলে
হিয়ার মাঝারে দোলে।
উড়িয়া পড়িয়া মাতল ভ্রমরা
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বুলে॥"

অন্যত্র,

"অভিনব নীল— জলদতনু ঢল-ঢল
পিঞ্ছ মুকুট শিরে সাজনি রে।
কাঞ্চন-বসন রতনময় অভরণ
নূপুর রণরণি বাজনি রে॥
ইন্দীবর যুগ— সুভগ বিলোচন
চঞ্চল অঞ্চল কুসুম-শরে।
অবিচল কুল— রমণীগণ মানস
জর-জর অন্তর মদন-জরে॥

বনি বনমাল অজানু-বিলম্বিত
পরিমলে অলিকুল মাতি রহু।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
গায়ত গোবিন্দদাস পহুঁ ॥"

শশিশেখরও ভ্রমরের "মন্দ মন্দ মধুর গুঞ্জ" শুনিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি কোকিলের গানে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, শুক-শারী-কপোত-ময়ূরের স্বরে যেরূপ অব্যক্তের আনন্দ উপভোগ করিয়াছেন, সেরূপ আর কোনও কবি করেন নাই। বৈষ্ণব কবি অব্যক্তের অনুকরণ করিয়া তাঁহার কাব্যে সেই আনন্দধারা বর্ষণ করিয়াছেন। তিনি কাব্যে সঙ্গীত বর্ণন করেন নাই, কাব্যের ভাষায় সঙ্গীত শুনাইয়া অব্যক্ত আনন্দের অভিব্যক্তি পরিস্ফুট করিয়াছেন। গোবিন্দদাসের নিকট শুনা যায়, "নব নব কোকিল পঞ্চম গায়।" বৈষ্ণব কবি কাব্য-কুঞ্জের "অভিনব কোকিল." তাঁহার পঞ্চম স্বরে কুঞ্জকুটীর মুখরিত। জ্ঞানদাস শুনিয়াছেন,—

"কোকিল কুহরত, ভ্রমর ঝঙ্কার।
সারী শুক কত কপোত ফুকার ॥"

দাস্য ভাবের কবি নরোত্তম দাসের কবিতায় সেবার পারিপাট্য আছে; তথাপি তিনিও শুনিয়াছেন, "কোকিল কোকিলা ডাকে মাতি।" বলরামদাস বলেন, "ভ্রমরা ভ্রমরী করত রাব, পিক কুহু কুহু করত গাব।" কবিশেখরেরও ঐ কথা। "মত্ত কোকিল গায়ে মধুর, অলিকুল তাঁহ অতি সুন্দর, মুরলী ধ্বনি ঘন গরজনি, নাচত ময়ূর মাতিয়া।" চম্পতি কবি বলেন, কোকিলের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রভৃতি নানা দোষ থাকিলেও তাহার মধুর স্বরে সকল দোষ ঢাকিয়া গিয়াছে।

"পরসুত হীত যতন নাহি নিজ সুতে
কাক-উচ্ছিষ্ট রস পানি।
সো সব অবগুণ সগুণ এক পিক
বোলত মধুরিম বাণী ॥"

বৈষ্ণব কবির শত দোষ থাকিলেও তাঁহার মধুর গানে সকল দোষ ঢাকিয়া গিয়াছে। তাঁহার দোষ আছে এ কথা আমরা বলিতেছি না। তাঁহার দোষ কোথায়? তিনি অব্যক্তানুকরণের কবি। স্বভাবের উপর তিনি

নিজের গুণপনা প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন নাই। তিনি প্রকৃতির অব্যক্ত ধ্বনি যথাযথ অনুকরণ করিয়া কাব্যে স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়াছেন।

বৈষ্ণব কবি যখন চিত্র রচনা করিয়াছেন, তখন তাঁহার কবিতায় প্রকৃতির সঙ্গীত আসিয়া গিয়াছে। যেখানে সঙ্গীতের শেষ সেইখানে বর্ণনায় আরম্ভ। কবিশেখর পক্ষীপল্লীর এক খানি অতুলনীয় সৌন্দর্য্যময় চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। চিত্রখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কিন্তু বর্ণনায় শব্দের আভাস কাণের ভিতর দিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করে না।

"দশ দিশ নিরমল ভেল পরকাশ।
সখীগণ মনে ঘন উঠয়ে তরাস॥
আম্রে কোকিল ডাকে কদম্বে ময়ূর।
দাড়িম্বে বসিয়া কীর বলয়ে মধুর॥
দ্রাক্ষা-ডালে বসি ডাকে কপোত কপোতী।
তারাগণ সনে লুকায়ল তারাপতি॥
কুমুদিনী বদন তেজল মধুকর।
কমল নিয়ড়ে আসি মিলল সত্বর॥
শারী কহে রাই জাগ চল নিজ ঘর।
জাগল সকল লোক নাহি মনে ডর॥
শেখর শেখরে কহে হাসিয়া হাসিয়া।
চোর হইয়া সাধু পারা রহিলা শুতিয়া॥"

রাধিকাকে জাগাইবার জন্য বৈষ্ণব কবিরা নানা প্রকার কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। আর একটী পদে কবিশেখরের কৌশলের কথা শুনিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না।

"নিশাকর ঘরে গেল, অরুণ উদয় ভেল,
তারাপতি কাঁতি মলিন।
কুমুদ মুদিত ভেল, পদুম প্রকাশল,
পরবশ পড়ল কঠিন॥
দেখিয়া দোঁহার রীতে, বৃন্দা বিকল-চিতে,
আদেশিলা কোকিল কোকিলী।
তারা সবে গান করে, ভ্রমর ঝঙ্কার পুরে,
কেকা কেকা ময়ূর বিকলি॥

চাক্‌থটী উঠায় তান, কি করহ রাধা কান,
তুরিতহি করহ পয়ান।
রাইরে না দেখি ঘরে, জটিলা লগুড় করে,
বনে আসি করয়ে সন্ধান॥
চাক্‌থটী কপট কথা, শুনি বৃকভানুসুতা,
তরাসে তরল ভেল মন।
রাধা কানু সখী সাথে, চলিলা গোপত পথে,
তুরিতে তেজল সেই বন॥”

কর্ম্মময় জীবনের কর্ত্তব্যের কথা বৈষ্ণব কবি আমাদিগকে মাঝে মাঝে পাখীর মুখে শুনাইয়া থাকেন, কিন্তু এই উপদেশ-বাণীতে আমাদের মনে নীরস ভাবেরই উদয় হয়। বক্তৃতার ভাষা ভিতরে প্রবেশ করে না। গোবিন্দদাসের রাধিকাকে জাগাইবার জন্য শারী শুক পিক ময়ূর প্রভৃতি সকল পক্ষিগণ, এমন কি “বানরী রব দেই, চাক্‌থটি নাদ” করে। বিদ্যাপতির নামে প্রচলিত বিখ্যাত নিদ্রাভঙ্গের পদটিও পদ্যময় উপদেশ।

“রাই জাগ রাই জাগ শুকশারী বলে।
কত নিদ্রা যাও কাল-মাণিকের কোলে॥
রজনী প্রভাত হইল বলি যে তোমারে।
অরুণ কিরণ হেরি প্রাণ কাঁপে ডরে॥
শারী বলে শুন শুক গগনে উড়িয়া ডাক।
নব জলধরে ডাকি অরুণেরে ঢাক॥
শুক বলে শুন শারী আমরা পশু পাখী।
জাগাইলে না জাগে রাই ধরম কর সাখী॥”

চণ্ডীদাস বলেন,

“পদউষ কাক কোকিলের ডাক
জানাইল রজনী শেষ।
তুরিতে নাগরী গেলা নিজ ঘরে
বাঁধিতে বাঁধিতে কেশ॥”

রাধিকার প্রতি শুক-শারীর সহানুভূতির কথা বৈষ্ণব কবি অনেক স্থানে বলিয়াছেন। উদ্ধবদাস বলেন, পদ্মা সখীর কুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ যখন গমন করেন, শুক সে কথা বৃক্ষের উপরে বসিয়া ফুকারিয়া রাধিকাকে বলিয়া দিয়াছিল। উদ্ধৃত

নিদ্রাভঙ্গের পদগুলিতে কাক কোকিল ময়ূর প্রভৃতি পক্ষিগণের "ডাক" মাত্র শুনা যায়। প্রভাত-সঙ্গীতের মধুর ধ্বনি আমাদের কর্ণকুহরে সুধা বর্ষণ করে না। মানবের নিদ্রিত আত্মাকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য প্রকৃতি দেবী "রাই জাগ" শব্দে ডাকাডাকি হাঁকা-হাঁকি করেন না।

বৈষ্ণব কবি অব্যক্ত ধ্বনির অনুকরণ করিয়া স্বভাবের সহিত গীতি-কবিতার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন। ধ্বনির মধ্যে যে সত্য অব্যক্ত ভাবে ছিল, বৈষ্ণব কবির প্রতিভা তাহা আবিষ্কার করিয়া শব্দাকারে পরিস্ফুট করিয়াছেন। রাস অর্থাৎ শব্দরসবর্ণনে সেইজন্য তিনি কৃতিত্ব লাভ করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি কৃত্রিমতা অবলম্বন করিয়া কল্পিত ভাষার পরিচ্ছদে আদর্শকে ঢাকা দিবার চেষ্টা করেন নাই। সেই কারণে বৈষ্ণব পদাবলী পাঠ করিতে করিতে সকল নর্ত্তনশীল সঙ্গীতমুখর সজীব চিত্র শব্দাভাসে আমাদের মানসনেত্রে ভাসিয়া উঠে। বিদ্যাপতি বলিয়াছেন, "সকল কণ্ঠে নাহি কোয়িল-বাণী।" বৈষ্ণব কবি প্রকৃতির বরপুত্র, তাঁহার কণ্ঠনিঃসৃত "কোয়িল-বাণী" বঙ্গদেশে কৃষ্ণ-প্রেমরূপ "অমিয়ার তরঙ্গিণী" প্রবাহিত করিয়াছে।

সেবিকা

[শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি-এ]

আমি যে জেনেছি তারে সে কথা ত বলিনে,
আমি যে লভেছি তারে সে গরব রাখিনে ;
আমি যে দিবস-রেতে রাখি তারে হৃদয়েতে,
পূজিতেছি—এত বড় কথা কভু কহিনে।
দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ঘুচায়েছে, সুখ-দুঃখ চলে গেছে,
—সে তত্ত্ব জীবনে আজো বুঝিতে যে পারিনে !
আনি ফুল ভরি ডালা, গাঁথিতে পারিনে মালা,
সে ফুল তুলিবে গলে সে সাহস করিনে ;
শুধু আশা—যদি ভুলে চাহিয়া চরণমূলে
একবার দেখে তারে কখনো কোন দিনে !

আমাদের আটচালা।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়]

সহরের ছোকরা ইয়ারেরা আমাদের আটচালায় আসিয়া অভদ্রতা করেন কেন? কলিকাতার ককৃনি-কবিরা কবিকঙ্কণের কক্ষে যাইয়া জটলা করেন কেন? তাঁরা বারেন্দা-বিলাসী বাবু, বলরুম-বিনোদী বুলবুল,—বৈভবের বৈঠকখানার শোভাবর্দ্ধন করুন; তাঁরা গ্রাম্য গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপে যাইয়া চপলতা করেন কেন? সেস্থান তাঁদের যোগ্য নয়,—তাঁরাও সেস্থানের যোগ্য নন। চণ্ডীমণ্ডপ ত তাঁদের চোরা বর্ণ চিনিবে না; তাঁদের বর্ণচোরা বাহারও বুঝিবে না; বরং তাঁদের গায়ের "গশনেল"-গন্ধ গোময় দ্বারা নিবারণ করিবে। পক্ষান্তরে তাঁরা শত জন্ম চিন্তা করিয়াও চণ্ডীমণ্ডপের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে পারিবেন না; চণ্ডীমণ্ডপের উপর একেই চটা; আরও চটিবেন: চটিয়া চণ্ডীমণ্ডপের চৌকাট ধরিয়া টানিবেন; চালের খড় ছিঁড়িবার চেষ্টা করিবেন; চণ্ডীমণ্ডপস্থ মঙ্গলবটে বুট ছুঁড়িয়া মারিবেন! চটুল, চেঙ্গড়া বাবুরা চটিয়া কি না করিতে পারেন? কিই বা না করিয়াছেন! কিন্তু বাবুদের,—এই বিলাতি বেল-বকুলের বুল-বুল বাবুদের এ বিড়ম্বনা কেন? ব্রাহ্মণবাড়ীর বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া এ 'বেয়াদপি' কেন? গরিব গ্রাম্য গৃহস্থের আটচালায় উঠিয়া এত অট্টহাস্য কেন, এত উপহাস কেন? তাঁরা সীমন্তিনীদের মত সিঁথী কেটে, সৌখীন সুগন্ধি আরকের শিশি সুঁকে, পিয়ানো বাজিয়ে, পাউডার মেখে, পায়সান্ন খেয়ে, জীবন কাটাইতে জন্মিয়াছেন; জন্ম জন্ম "জন্মোয়াস্ত্রী" হয়ে তাহাই করুন। কাঙ্গালের প্রতি পরিহাস করেন কেন? বিলাস-কলুষিত হস্তে কাঙ্গালের কুটীর স্পর্শ করিয়া তাহার পবিত্র গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট করেন কেন? ইয়ারকীর ত অনেক স্থান আছে, "পিকনিক" পার্টি, পারিবারিক রঙ্গালয়, কলিকাতার "ককৃনি" ক্লব, কামিনীকুঞ্জ—কত স্থান আছে, প্রাণ খুলিয়া ইয়ারকি দিউন; অস্থানে অনাহুত ইয়ারকি দিয়া দুঃখীর দরিদ্র্য-মন্দির ইতরীকৃত করেন কেন? তাঁরা পিতৃ-পিতামহ-বর্ম্মার্জ্জিত রজত চামচ চঞ্চুপুটে ধারণ করিয়া জন্মিয়াছেন, আজীবন সেই চামচই চাটুন; আর চামচের চমৎকারিত্বে চিত্ত বিনোদন করুন; তাঁরা দরিদ্রের কে, কবিকঙ্কণের কে, দুঃখী কৃষাণের কে? বাঙ্গালী জাতির কে,

গ্রাম্য গৃহস্থ-জীবনের কে? তাঁরা এ সকলের কেহই নহেন; তবে কেমন করিয়া বুঝিবেন, কি করিয়া চিনিবেন, কেমন করিয়া এ সকলের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতি হইবে? একে সৌখীন, তায় সংকীর্ণচেতা, সৌখীনতার সীমার উপরে যাহা দেখেন, বাবু তাহাই বলেন অস্বাভাবিক আর কুৎসিত!

আজ তিন শত বৎসর হইল, দামুন্যার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আরড়ায় যাইয়া এক "আটচালা" (?) নির্ম্মাণ করেন! হাঁ "চণ্ডীমঙ্গল," চণ্ডীমণ্ডপই বটে; কত কত তথা-অভিহিত প্রাসাদ, উচ্চ অট্টালিকা এই কালের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়া ভূপতিত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু আরড়া-প্রবাসী সেই অনভিমানী আটচালাখানি আজও অটুট, বহু শতাব্দের বড় বড় ঝড়, তুফান, বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত সহ্য করিয়া টিঁকিয়া আছে; একটুও টলে নাই। অতীতের ন্যায় বর্ত্তমানেও সেই আটচালার উপর দিয়া অনেক তুফান চলিয়া যাইতেছে; তাহার "আসে পাশে" কত "ইন্‌জিনিয়ারী" অট্টালিকার ভিত্তি খোদিত হইতেছে, কত বাবুর বিলাস-বৈঠকখানার,—বনিয়াদ-পত্তনেরও প্রয়োজন হইতেছে না, বারেন্দার বন্দোবস্ত আগেভাগেই হইতেছে; পাছে শূন্যমার্গে ঝোলান সখের বাতায়ন আটচালার 'আওতায়' অবরুদ্ধ হয়, অনবরত এই মহাআশঙ্কা; তাই নাকি গো আটচালার উপর উপর্য্যুপরি আঘাত? তাই নাকি এত উদ্যোগ, এত আশা? যেরূপেই হউক, আঁচড়াইয়া মোচড়াইয়া একখানা চালের একটা খড়ও "উছাঁইতে" পারিলে, ক্রমে সব খড় বাঁশ-বাখারী খসিয়া আসিবে। বহু কালের বন্ধন, আর "বেতির" বন্ধন বই ত নয়; বাঁশ খড় বাখারি বই ত নয়; দুদশখানা শাল আর বাবুদের খাম্বা বই ত নয়, বিলাতি-"স্লেজ হ্যামারের" আঘাতে তাহা আর কত কালই টিকিবে? বারেক হেলাইতে পারিলেই বস্! আটচালা আপনা হইতেই ভূমিসাৎ হইবে। হিন্দুধর্ম্মের এত বড় দুর্গ দু'কথায় ফতে হইয়া গিয়াছিল। এই "একুড়ে" আটচালাখানা আর পতিত হইবে না।"

না, বাবু না, সেটী হোচ্ছে না। তোমরা ও তোমাদের ত্রিষষ্টি সহস্র পুরুষ বার বংশ কোটী যুগ মাথা কুটিয়া ও "হামার" পিটিয়া এ আটচালার কিছু করিতে পারিবে না। এ যেমন অটুট "আঁটোশাঁটো" আছে, তেমনিই থাকিবে। কালবশে কত "কক্‌নি" কোকিল কপচাইবে, উড়িবে, পড়িবে, ডানা ছিঁড়িবে, পক্ষীলীলা সম্বরণ করিবে, মুহূর্ত্তের জীব মুহূর্ত্তে বিলীন হইয়া যাইবে; কিন্তু দরিদ্র মুকুন্দরামের এ আটচালা অটল; কবিকঙ্কণ

কালকে ডরান না; "ককৃনি" কোকিলেরা ত কীটস্য কীট; অল্পায়ু, অল্প-প্রাণ পতঙ্গ।

আমরা এই বয়সেই ত আটচালার কাছ ঘেঁসিয়া কত "ককৃনি" বাবুর, কত বিলাতী বাবুর, কত কামিনীকুন্তলের কিঙ্কনী বাবুর কবিত্ব-সৌধ "কোপি কল" দিয়া উঠাইতে দেখিলাম। কিন্তু কৈ? হায় কৈ তাহারা? "তেরাত্রি" না যাইতেই যে অদৃশ্য, অন্তর্দ্ধান হইয়া গেল। কচিৎ কোথায়ও কাহার অভ্রভেদী উচ্চচূড় অট্টালিকার একখানা লোণাধরা ইষ্টকার্দ্ধের ভগ্নাংশ পতিত আছে, কোথায়ও বা তাহাও নাই। আবার এক একটা আনকোরা টাটকা-গাঁথুনী ইমারৎ মাথা না তুলিতেই এমন 'মচকান মচকাইতেছে' যে, শত গণ্ডা সমালোচনা-"পেলা" পাইয়াও খাড়া রহিতেছে না। মরি কি অনুপম দৃশ্য, আমাদের "লিলিপট"-প্রসূত কবিদের কাব্যলীলা! তা কবিকঙ্কণের অভিশপ্ত আটচালাখানাতেই যেন সর্ব্বনাশ করিয়াছে; সেটাকে উজাড় করিতে পারিলেই যেন "ককৃনি" কবিদের কাব্যি-গুলা বিকায়!

কিন্তু দেখ বাবু, এ আটচালা আমাদের খাঁটি, নিরেট, নিজস্ব ধন। ইহা বাঙ্গালীর বুক-চেরা বস্তু। এ আটচালার প্রত্যেক তৃণটীতে আমাদের প্রীতি, ভক্তি, স্মৃতি; আমাদের কামনা; কল্পনা, আমাদের ঘর-গৃহস্থালী; আমাদের সাধ-সোহাগ সব বিদ্যমান—সব একত্রে কেন্দ্রীভূত। আমরা ক্ষুদ্র জাতি, আমাদের ক্ষুদ্র ইতিহাস, তুচ্ছ অভাব, আলোচনা, আমাদের সামান্য সুখদুঃখ ঐ আটচালার মধ্যে। আর ঐ আটচালার মধ্যে আমাদের ইষ্টদেবী। দোহাই তোমাদের তরুণ তেলেঙ্গা বাবুগণ! তোমাদের বিফ্‌ষ্টিক ও বিশকুটাসক্ত হস্তে স্পর্শ করিয়া আমাদের এ আটচালা অপবিত্র করিও না। আর, কেনই বা তোমাদের এ কর্ম্মভোগ! আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের চত্বরে চামেলিয়ার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে না; বেলা, গুলাবিয়াকেও এখানে পাইবে না; স্বাধীনপ্রাণ স্থিরযৌবনা, যূথিয়া, রাবিনিয়াও এখানে নাই। আমাদের এ 'ভারণাকুলার' বাঙ্গালী চণ্ডীমণ্ডপী মহলে অধীনতারই একাধিপত্য; এখানে সবই আবৃত; এটা অ-যৌবন বিবাহ ও ঘোমটার রাজ্য। তবে কেন এখানে তোমাদের কর্ম্মভোগ, বুল-বুলগণ! ইয়ারকির কিছুমাত্র অবসর এখানে নাই। ইহা আমাদের আটচালা, কোকিল-কবিদের কুঞ্জ-কুটীর নয়। তা সেক্সপীয়র, শেলি, সুইনবরণের সৃষ্টিতে ষোলআনা সোহাগ মিটাইবার

শক্তি ও সুযোগ একান্তই যদি না থাকে, তবে এই দরিদ্র বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে বৈষ্ণবীরাও ত আছেন, "ব্রজবাসিনী" বৃন্দাবন-বিলাসিনীদের বৈঠকও ত তথায় আছে; "নেড়া নেড়ী" ঠাকুর-ঠাকুরাণীদেরও ত তথায় "ঠাসবুনানি" মানব-হৃদয়ের সহিত স্বাধীনা; প্রকৃতির "উত্তম এবং উপযুক্ত *মিলন-ময়দান*" ত সেগুলা। অতএব *বুলবুল!* তথায় যাও। বাঙ্গালী গৃহস্থের চণ্ডীমণ্ডপের চালে বসিয়া চাপল্য কর কেন?

হাঁ, আমাদের এ বিজ্ঞের চণ্ডী-মণ্ডপ বটে,—বাচালের নহে, ইয়ারেরও নহে। আমরা এ চণ্ডীমণ্ডপ আজ বহু শত বৎসর হইতে ষোড়শোপচারে পূজা করিয়া আসিতেছি। আমরা বাঙ্গালী জাতি যত কাল ব্রহ্মাণ্ডের উপর থাকিব, তত কাল উহার পূজা করিব। সময়ের গুণে ষোড়শোপচারে না পারি, পঞ্চ উপচারেও মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিব। আমরা আমাদের আটচালার "দাওয়ায়" বসিয়া তাম্রকূট সেবন করিব, দুঃখ-দারিদ্র্যের আলোচনা করিব, অতিথি-অভ্যাগতের আদর-আহ্বান করিব। আমাদের আটচালায় ইয়ারকির "আড়ানি" কেহ টানাইতে পারিবেন না; বেহায়াপনার বিলিয়ার্ড খেলিতে কেহ পাইবেন না; "বসন্ত বাতাস" ও বিধুমুখী-খোর বুলবুলগণ বিলাস-পসরা খুলিয়া চণ্ডী-মণ্ডপে বসিতে পাইবেন না; যদি তাহা করিতে কেহ চেষ্টা করেন, উপযুক্ত অর্দ্ধচন্দ্র প্রদানপূর্ব্বক তাঁহাকে আমরা আমাদের ভদ্রাসনের বাহির করিয়া দিব।*

ব্যক্তিপূজা।

বড় বড় সাধুপুরুষেরা আদর্শ তত্ত্বের (Principle) দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, কিন্তু শিষ্যেরা ব্যক্তিকেই আদর্শ বা তত্ত্ব করে তোলে, আর ব্যক্তিকে নাড়াচাড়া কর্‌তে কর্‌তে তত্ত্বটা ভুলে যায়।——বিবেকানন্দ।

---

* এই রচনাটী ইতিপূর্ব্বে কোনও মাসিকে প্রকাশিত হয় নাই। তবে শুনিয়াছি, ইহা কোনও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'অর্ঘ্য'-সম্পাদক।

কবির বিক্রম।

[শ্রীফণীন্দ্রনাথ রায়]

১

সেক্সপিয়ার পেয়েছে পার শতেক কামের বর্ণনায় ;
মিল্টন কবি লম্পট-ছবি আঁকিল কত না রিরংসায় !
আর্য্যাবর্ত্তে কবি কালিদাস চুম্বনে দিল হরির লুট,
ছোট্ট চুমু লিখেছি বলিয়ে আমার রেশাই ছুট্-বেছুট্ !

২

তারাও মানুষ আমিও মানুষ, তারাও কবি আমি কি নয় ?
তারাও লিখেছে, যা খুসি ভেবেছে,—আমার লিখিতে কিসের ভয় !
ভাগ্যধর সেক্সপিয়ার, কি কপাল তব হে কালিদাস !
তোমাদের কালে "আলোচনা" ব'লে মাসিকপত্রে ছিল না চাষ !

৩

তাই অত বাড় বেড়েছ তোমরা. আওতা-হীনতা কারণ তার,
আওতা ঘুচাব করিলাম পণ, বুঝেছি এবার বুঝেছি সার !
কাব্য নাটক লিখেছে তাহারা, সেটা তো মোটেই শক্ত নয়,
হাজার দিস্তে লেখা আর ছাপা—এটা যে সহজ সবাই কয় !

৪

ছোট্ট গল্প তারি মাঝে রবে নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত,
ছোট্ট গল্পে সে আঘাতে হ'বে নায়িকার ভীম গর্ভপাত !
ছোট্ট গল্পে আরো মজা আছে, লুটা'তে পা'রে সে প্রতিভায়
বেশ্যারে টানি ধর্ম্মের গ্লানি—প্রতিভার এটা এলাকায় !

৫

গল্পে নাটকে নায়ক-নায়িকা আমারি মত স্বাধীন তারা ;
পুলিশ দেখিলে ভয়ে জড়সড় হুকুমে তাদের—আত্মহারা !
ও কথায় ভাই কাজ কি ও ছাই, আছে যে বিষম রুলের গুঁতো,
কাণ টান মলা সে তো ছেলে খেলা, পীঠেটা যে ফাটে পড়িলে জুতো !

৬

আমার গল্পে নায়ক-নায়িকা আমারি বিশ্বে জাহির করে,
রাজ-দরবারে এই কথা নাকি! কেমনে বল না কলম সরে!
তাই—দেখে শুনে ভাবিয়াছি মনে রাজনীতি-কথা মোটেই নয়,
নায়কের ব'লে ও কথা চালালে কবির বিষম বিপদ-ভয়।

৭

শুধু এক পথ অতি নিরাপদ—হিন্দুধর্ম্মে কলমচোট্,
গল্পের মাঝে সীতা সতী ল'য়ে নায়ক পাকাবে বিষম ঘোঁট!
আমি দূরে বসি, কব হাসি হাসি, ছুই জোড়া গোঁফ ফুলা'য়ে,
আমি শুধু কবি, যা খুসি তা' ভাবি নায়ক লয়েছে তা' কুড়ায়ে!

নেপথ্যে।

[নিমচাঁদ শর্ম্মা]

মানব-হৃদয়ের ভাবসকল যখন নেপথ্যে সাজসজ্জা করিতে থাকে, তখন বাহিরে দর্শক ও শ্রোতারা আমাদের মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষা করে। প্রকাশ্য অভিনয়ের পূর্ব্বে মনের নিভৃত কক্ষে একবার রীতিমত আখড়াই না দিয়া আমরা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করি না। আমাদের প্রত্যেক উক্তি-প্রত্যুক্তি মানসিক ক্রিয়া দ্বারা শাসিত। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্যের অনুরোধে আমাদিগকে প্রস্তুত থাকিতে হয়; কিন্তু যিনি তাড়াতাড়ি কাজ সারিতে চান, ভাল-মন্দ বিবেচনা না করিয়া একেবারে আসরে নামিয়া পড়েন, তিনি হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন। উপস্থিত বুদ্ধি যাহাদের একটু বেশী মাত্রায় আছে, তাহারা হয় ত অনেক সময়ে সামলাইয়া লয়; কিন্তু আমার মত যাহারা চিরকাল হাই তুলিয়া, চোখ রগড়াইয়া, চারিদিকের লোকের ভাবগতিক অনুমান করিয়া তবে কথার উত্তরে হাঁ হুঁ বলে, তাহারা চিন্তায় কার্য্যেও বুনিয়াদি চাল ছাড়িতে পারে না।

মানবজীবন ত একটী শতাঙ্ক নাটক। এমন সুদীর্ঘ নাটকে অবান্তরের দখল কত বেশী হওয়া উচিত! বাস্তবিক, আমাদের হৃদয়ের প্রতি পৃষ্ঠায় বন্ধনী-চিহ্ন-বেষ্টিত অবান্তরের আয়তন এত দীর্ঘ যে, তাহার তুলনায় নাটকীয় ঘটনার আকার নগণ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আমরা একটী ক্ষুদ্র চিন্তা লইয়া যে অঙ্ক আরম্ভ করি, তাহার উপর পটক্ষেপণ হইবার পূর্ব্বে অনেকবার জনান্তিকে অভিনয় করিয়া থাকি। অবিরাম মানসিক উত্তেজনার ভিতর হইতে কয়েকটী মাত্র চিন্তা-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া আসে, আর তাহারই কার্য্য জগতের লোক দেখিতে পায়।

বড় দিনের ছুটিতে ঘাটশীলায় যাইবার জন্য বাটী হইতে একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে রওনা হইলাম। হাবড়া ষ্টেশনে গাড়োয়ানকে ভাড়া চুকাইয়া রেলের মুটের জিম্মায় ট্রাঙ্ক ও বিছানা দিলাম। টিকিট ঘরের দিকে যাইব, এমন সময় সেই গাড়ীর পনর কি ষোল বছর বয়সের সহিশ সেলাম করিয়া বলিল, "বাবু, বকশিশ্।" এইখানে অবান্তরের পূর্ব্বার্দ্ধ-চিহ্ন পড়িল, নেপথ্যের ব্যাপার আরম্ভ হইল।

[ছেলেটার গায়ে মিউনিসিপ্যাল আইনের ছাপ-মারা পোষাক নাই। সহিশ নয় অথচ সহিশের কাজ করে। বোধ হয় কোন দুঃখিনী বিধবার বাছা, উদরান্নের জন্য ঠিকা কাজ করিতেছে। সমস্ত দিন খাটিয়া আট দশ পয়সা রোজগার করিবে। হয়ত কোনও নিঃস্ব ভদ্র গৃহস্থের ছেলে, অসৎ সঙ্গে পড়িয়া সহিশী করিতেছে। ঠিক এই রকম ছেলে কলিকাতা পুলিশ কোর্টে মাঝে মাঝে কোকেনের মকদ্দমায় আসামী হইয়া আসে, জেলে যায়, আবার কোকেন-সমেত ধরা পড়িয়া বেশীদিনের জন্য সশ্রম কারাবাসের শাস্তি ভোগ করে। না, ইহাকে বখশিশ্ দেওয়া হইবে না।]

এই খানে হঠাৎ চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়িল। অনিচ্ছায় অবান্তরের পরার্দ্ধ-চিহ্ন দিতে বাধ্য হইলাম। তাহার কারণ, বালক কাতরকণ্ঠে হাত জোড় করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া আমার নিকট বখশিশ ভিক্ষা করিল। স্রোত তখন বাধাকে অতিক্রম করিয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিল। আমি তাড়াতাড়ি পূর্ব্বের মত মানস-পত্রে প্যারেনথিসিস্ বসাইয়া দিলাম।

[যদি সে ঘৃণ্য কোকেনের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহা হইলেও বালকের দোষ কোথায়? যে দেশে দুধের ছেলেকে রাক্ষসীর গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে পারে এমন সমাজ-সংস্কারক নাই, সে দেশ রসাতলে যাক!—

("এইখানে মানস-গঙ্গা উত্তরবাহিনী হইয়া মানচিত্রে একটু ছোট রকমের ঊর্দ্ধমুখীন রেখাপাত করিল। গর্ভাঙ্কের এই ক্ষুদ্র দৃশ্য নেপথ্যে নূতন বেষ্টনীর মধ্যে মুদ্রিত হইয়া গেল। আমি একেবারে পৌরাণিক জগতে চলিয়া গেলাম। ভীমের বক-রাক্ষস বধ, কুন্তীর স্বদেশহিতৈষিতা প্রভৃতি কয়েকখানি চিত্র বিদ্যুৎবেগে মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হইল)—না, দুই চারিটা পয়সা দিলে ছেলেটা তেলেভাজা কিছু খাইয়া বাঁচিবে। রোদে উহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে।]

এইবার স্রোত থামিয়া গেল, তরল চিন্তা কঠিন তাম্রখণ্ডে পরিণত হইল। মুটে ডাকিয়া বলিল, "বাবু, বি-এন্-আর্, না ই-আই-আর্?" দ্রুতপদে বেঙ্গল নাগপুর রেলের টিকিট ঘরের জানালায় গেলাম। টিকিট বাবুর নিকট টিকিট চাহিলাম। তিনি ঘরের ভিতর জনকয়েক মাড়োয়ারির সহিত কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত ছিলেন। তিন চারিবার "মশাই" "ও মশাই" করিয়া করিয়া ডাকাডাকির পর আমার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "দাঁড়ান, আস্‌ছি।" যত ক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল, তাহার মধ্যে নানা বিষয় ছোট ছোট অবান্তর বিভাগের মধ্যে স্থান পাইতেছিল। চারিদিকের গোলমালে চিন্তায় ধারাবাহিকতা ছিল না। চিন্তাকণিকাগুলি খামখেয়ালি-ভাবে এদিকে ওদিকে ভাসিয়া যাইতেছিল। এমন অসংখ্য বুদ্‌বুদ মানস-সরোবরে প্রতিদিন উঠিয়াই মিলাইয়া যায়, অথচ ক্ষণেকের তরে নেপথ্যে আকস্মিক ক্ষণস্থায়ী বিপ্লবের সূচনা করে।

শেষ মুহূর্ত্তে টিকিট মিলিল। দৌড়াইয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর দরজায় গিয়া দেখিলাম, একজন হোমরা-চোমরা বাবু ঘাঁটি আগলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ভাগ্যক্রমে আমার সহযাত্রী বন্ধুরা সেই গাড়ীতে ছিলেন। তাঁহারা আমাকে ও আমার মালগুলিকে কোনও রকমে তুলিয়া লইলেন ও পরক্ষণেই ট্রেণ চলিতে আরম্ভ করিল। গাড়ীর অন্য এক দল যাত্রীর ভিতর হইতে একটা বিকট রকমের হাসির হর্‌রা উঠিল। এবার ছুটির আমোদ-আহ্লাদের খাতিরে দিনকতক মনের মন্দিরে চাবি বন্ধ করিব স্থির করিলাম; কিন্তু তালা চাবি খুঁজিতে গিয়া ভিতরে একটু বিলম্ব হইল আর সেই অবকাশে অতি দ্রুত কয়েকটা চিন্তা নোট বুকে মুদ্রিত হইয়া যাইতে লাগিল—

[লোকগুলি যে রকম বেদম উচ্চ হাস্য করিতেছে, তাহাতে বোধ হয়

উহারা পুরাণে বর্ণিত হাহাহুহুদিগের দেশের লোক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই প্রকার চিন্তাশূন্য বাঙ্গালীকে দেখিয়া ত লেখেন নাই—"জীবনটা কিছুই না, কেবল একটা উঃ আর একটা আঃ!" ইহারা ত দেখিতেছি জীবনটাকে মনে করিতেছে একখানা শতবর্ষব্যাপী হাসির রেকর্ড।]

হাঃ হাঃ, হুঃ হুঃ, হিঃ হিঃ, হোঃ হোঃ—হাসির তরঙ্গে নিভৃত সমালোচনা কোথায় ভাসিয়া গেল! অন্য মনে গাড়ীর বাহিরে তাকাইলাম। সেখানে সমুদয় বহির্জগৎ যেন আমাকে আহ্বান করিতেছে বলিয়া মনে হইল। একি? আবার সেই হাসি!

[দ্বিজেন্দ্র বাবু যাহাদিগকে দেখিয়া ঐ দুইটি অব্যক্ত ভাবানুযায়ী শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহারা যে সেই সেখানে মাঠে কাজ করিতেছে। এই দারুণ পৌষ মাসের শীতে অনাবৃতদেহ—তাই ত! আবার এক হাঁটু জলে দাঁড়াইয়া মাছ ধরিতেছে না কি করিতেছে!]

একবার নিজের দিকে, বন্ধুদের দিকে, হাহাহুহুদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিলাম, অমনি—

[আমরা ন্যাকড়ার মানুষ—সভ্য। চাষাদের নগ্নদেহ—অসভ্য। কি মুস্কিল! উহারাও বাঙ্গালী, আমরাও বাঙ্গালী। বিদেশী কেহ এখানে থাকিলে নিঃশব্দে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিয়া আমাদের সভ্যতাভিমান ঘুচাইয়া দিত। কেহ নাই—সৌভাগ্য!]

অনেক সময়ে এমন হয় যে, চক্ষের নিমেষ পড়িতে না পড়িতে ছবির পর ছবি শিলাবৃষ্টির মত ঘটনা-বিতাড়িত চিন্তার বেগে শুষ্ক হৃদয়ের চত্বরে বিছাইয়া যায়। অল্পভাষী চিন্তাশীল ব্যক্তি মনের অন্তঃপুরে থাকিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া যাহা কিছু দেখিতে পায়, তাহাতেই তাহার দীর্ঘ সমালোচনার খোরাক সংগ্রহ হয়। যে বিরহী, সে আশার প্রদীপ হাতে লইয়া হৃদয়ের নিভৃত নিকুঞ্জে যে কত সুখের বাসর-সজ্জা রচনা করে, তাহা কেহ জানে না। মানুষ নিদ্রাবস্থায় কয়টা স্বপ্ন দেখে? জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা জাগিয়া স্বপ্ন রচনা করিতেছি। আকাঙ্ক্ষার হাওয়া-গাড়ী আমাদিগকে যে সকল স্থানে লইয়া যায়, তাহার কথা ইঙ্গিতেও প্রকাশ করিতে আমাদের সাহস হয় না। আরব্য উপন্যাস মিথ্যা নহে, আমাদের অন্তর-রাজ্যে উহার জীবন্ত ঘটনাসকল উজ্জ্বলবর্ণে রেখায় রেখায় প্রকাশ পায়। রোগী ভোগী প্রতারক উচ্চাকাঙ্ক্ষ সকলেরই এক একটী মন্ত্রণাগৃহ

আছে। জীবনের অনেকটা সময় তাহারা সেইখানে কাটায়। মনের অগোচর যদিও পাপ নাই, কিন্তু রুশোর মত কয় জন সাহসী লেখক পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? অন্তরের কথা অনেক সময়ে আমরা সাধ্যমত চাপা দিবার চেষ্টা করি।

জাতীয় জীবনের নেপথ্যে আবার যে সকল ঘটনা সাধারণের চক্ষের অন্তরালে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে থাকে, তাহার ইতিহাস অনেক দিন পরে লেখা হয়। ফ্রান্সে সমাজ-বিপ্লবের কিছু পূর্ব্বে একজন ইংরাজ পরিব্রাজক ফরাসী মহিলাগণকে রন্ধনাদি গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত ও সন্তানগণকে স্তন্যপান করাইতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি তখন বিলাসপ্রিয় ফরাসী জাতির মধ্যে এই সামাজিক পরিবর্ত্তনের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে যে সকল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে তাহা হয়ত আমরা লক্ষ্য করিতেছি না, কিম্বা তদ্বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ অমনোযোগী। বিবাহোৎসবের ঢক্কা-নিনাদে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার ক্রন্দনধ্বনি নেপথ্যেই মিলাইয়া যাইতেছে। বঙ্গরমণীর আত্মহত্যায় সমাজে ত এখনও পর্য্যন্ত আত্মগ্লানির চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। বাঙ্গালী স্ত্রীলোক যে অগ্নির দাহিকা শক্তিকে উপেক্ষা করিতে শিখিয়াছে, ইহার অর্থ কি? বাঙ্গালীর হৃদয় যে দিন দিন মায়ামমতাশূন্য হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাঙ্গালী বাবুর মোটর গাড়ীর চাকায় কত গরীব লোক যে কলিকাতায় প্রতি বৎসর জীবন বিসর্জ্জন করিতেছে তাহার হিসাব কেহ রাখে কি? রোজগারী মৃতের আত্মীয়কে বরং সাহেবেরা অর্থ দান করিয়া থাকেন; কিন্তু বাঙ্গালী বাবু অনেক সময়ে সহানুভূতি দেখাইতেও কুণ্ঠিত হন। কলিকাতার একজন অনারারী প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এক বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার বাবুর ব্যবহারে দুঃখিত হইয়া রায়ে লিখিয়াছেন—"The complainant is a poor man and having lost his son deserves consideration at the hands of the owner of the car." অর্থাৎ বাদী গরীব লোক। তাহার পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে সে গাড়ীর মালিকের অনুগ্রহ পাইবার যোগ্য। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের নেপথ্যে আপাততঃ একদিকে যেমন হৃদয়হীনতার দৃশ্য দেখা যায়, অপরদিকে তেমনি সেবাধর্ম্মের আড়ম্বরশূন্য কার্য্যও লক্ষিত হয়। পরস্পর-বিরোধী এই দুইটী আদর্শের মধ্যে এক সময়ে না এক সময়ে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। নেপথ্যে সাজসজ্জা অভিনয় শেষ হইলে দশ বিশ বা

পঞ্চাশ বৎসরে বঙ্গদেশে সমাজবিপ্লব অনিবার্য্য। সমাজের যাঁহারা নেতা তাঁহাদের এখন হইতেই সাবধান হওয়া উচিত। রাজনীতিক মোড়লী ছাড়িয়া তাঁহাদের ঘরের ভিতরের খবর রাখা কর্ত্তব্য। নেপথ্যের দিকে নজর না রাখিলে তাঁহারা পাতপের ভাগী হইবেন।

বাঙ্গালী সৈনিক।

[শ্রীবিজয়মাধব মুখোপাধ্যায়]

উঠে যথা দিনমণি নাশিয়া নিশির
তমোময় আবরণ ভাস্বর কিরণে,
শুকাইয়া থরকরে প্রভাত-শিশির
ফুটাইয়া হাসিরাশি প্রসূন-আননে,—
ভেদি তথা যুগান্তের নিবিড় তিমির
উঠিতেছে ভারতের গৌরব-গগনে
অভিরাম শাস্ত্রোজ্জ্বল নবীন মিহির
আরোহি পশ্চিম-পথে রক্তিম-স্যন্দনে।
নিশা-অন্তে প্রাণকান্তে নেহারি যেমন
খোলে কমলিনী সরে মুদিত নয়ন,
মুকুলিত কত আজি হৃদয় তেমন
উদয় অচলে হেরি' বাঞ্ছিত রতন।
এস দেব! এস হরি' গভীর বেদন,
আঁখি-জলে হাসি মাখি' করি আবাহন!

হিন্দুদের প্রতি।

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

'প্রবাসী' 'নির্জ্জলা একাদশী'র ছবি দিয়া হিন্দুদের গালি দিয়াছে বলিয়া তোমাদের রাগ হইয়াছে লিখিয়াছ!—কিন্তু সে কথা আমার আদৌ বিশ্বাস হয় না। ও দ্বিতীয় রিপুটা যে তোমাদের মধ্যে কিছু আছে, এমন আমি মনেই করি না!

আর, 'প্রবাসী' হিন্দুদের হৃদয়হীন বলিয়াছে বলিয়া রাগ করিবার কি আছে, বুঝি না। 'প্রবাসী' ঠিকই লিখিয়াছে। সে তাহার অভিজ্ঞতার কথাই বলিয়াছে। সে দেখিয়াছে যে, হিন্দুর দেব-দেবীকে গালি দিলে হিন্দু মুখ বুজিয়া তাহা হজম করে;—হিন্দুর আচার-পদ্ধতির গ্লানি করিলে হিন্দু দাঁত বাহির করিয়া হাসে; তখন সে হিন্দুকে 'হৃদয়হীন' কেন বলিবে না? হিন্দু হৃদয়হীন ত বটেই। তাহার উপর আরও যদি কিছু গালি দিবার থাকে, তবে তাহাও দেওয়া উচিত!

হিন্দুরাই গ্রাহক, তাই 'প্রবাসী' চলিতেছে। হিন্দুরাই বিজ্ঞাপন দেয়, তাই 'প্রবাসীর' আর্থিক অবস্থা ভাল। আজ যদি এই বিজ্ঞাপন দাতারা ও গ্রাহকেরা একসঙ্গে বলে—তোমাদের কাগজ তোমরা চালাও, আমরা আর তোমাদের ছায়া মাড়াইব না; তাহা হইলে চক্ষের নিমেষে 'প্রবাসী'কে একেবারে নিশ্চল হইয়া পড়িতে হয়। কিন্তু সে হৃদয় তোমাদের কৈ? গালি খাইতে তোমরা ভালবাস, কেন তাহারা গালি দিবে না! পয়সা খরচ করিয়া যাহারা নিজেদের ধর্ম্মের—নিজেদের সমাজের নিন্দা শুনিতে চায়, তাহারা ত গালি খাইবারই যোগ্য!—'প্রবাসী' গালি দিয়াছে—বেশ করিয়াছে!—দুঃখ করিতে লজ্জা বোধ হয় না?

রাগ তোমাদের আছে না কি! কৈ! ক্রোধের লক্ষণ ত কিছু দেখিতে পাই না। 'প্রবাসী' যাহা লিখিয়াছে, তাহাতে রাগ হইবারই কথা বটে! কিন্তু রাগের পরিচয় ত আজ পর্য্যন্ত কিছু পাইলাম না। 'প্রবাসী' লিখিয়াছে,—"মুখপাতের 'নির্জ্জলা একাদশী' ছবিখানি শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের আঁকা। এই ছবিতে চিত্রকর আমাদের হিন্দুদের হৃদয়হীনতার ছবি আশ্চর্য্য রকম জোরালো ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাড়ীর কর্ত্তা গুরুভোজনে ভুঁড়ি

ফুলিয়ে কাছা সামলাতে সামলাতে আর দাঁত খুঁটতে খুঁটতে আঁচাতে চলেছেন; বাড়ীর সধবা গিন্নিটী কর্ত্তার প্রসাদী দুধের বাটিটিতে দিবি চুমুক মারচেন; বিড়াল কাক পিঁপড়ে মাছি পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সবাই আহারে লেগে গেছে; কেবল বাড়ীর বিধবাটি জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ের দীর্ঘ দিবসের প্রচণ্ড গ্রীষ্মের তাপে ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হয়ে পাষাণ-দেবতার দ্বারে ধন্না দিয়ে পড়ে ধুঁকছে। সকল বিধবার অশ্রু জল নির্জ্জলা একাদশীর দিনে পাষাণের উপর ঝরে পড়ছে! আর বিশ্বের বিস্মিত চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে বাড়ীর অপর লোকদের ব্যবহার দেখছে। এই ছবির প্রত্যেক রেখার বক্রতায় এই কঠোরতার ভাবটি স্পষ্ট ফুটে ফুটে উঠেছে।"—এত বড় জলজ্যান্ত মিথ্যা কথা ছাপার অক্ষরে কখনও বাহির হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। যিনি ইহা লিখিয়াছেন, তাঁহার নাম নীচে লেখা আছে, "চারু"।—শুনিলাম, ইনি নাকি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। হিন্দুই বটে!

মনে পড়ে হরি বিশ্বাসের গল্প। পূর্ব্বে চুঁচুড়ার মিশনারীদের কাছে হরি বিশ্বাস নামে একটী লোক কাজ করিত। সে দেশে দেশে হিন্দুধর্ম্মকে গালি দিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্ম প্রচার করিয়া বেড়াইত। লোকে বলিত, এ বাঙ্গালী পাদ্রীর চেয়ে ইংরাজ পাদ্রীরা অনেক ভাল;—তাহারা হিন্দুকে এতটা গালি দেয় না। কিছুদিন পরে দেখা গেল, সেই হরি বিশ্বাস খ্রীষ্টানধর্ম্মকে গালি দিয়া হিন্দুধর্ম্মের গুণ ব্যাখ্যা করিতেছে। ইহা দেখিয়া লোকে অবাক্। কেহ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে হরি বিশ্বাস বলিত,—"সে কি আমি গালি দিতাম—না, ৩০৲ টাকা গালি দিত? মিশনারীরা হিন্দুকে গালি দিবার জন্য আমায় ৩০৲ টাকা করিয়া মাহিনা দিত, তাই হিঁদুর ছেলে হ'য়েও আমি গালি দিতাম।" 'প্রবাসী'র 'চারু'ও বোধ করি, আমাদের সেই হরি বিশ্বাস। টাকার জন্য তিনিও হরি বিশ্বাসের মতন অবিশ্বাসের কাজ করিতেছেন!

এখন কথা এই যে, হিন্দুরা কি নীরব ঘৃণার ভাণ করিয়া এই কুৎসা-কারীদের প্রশ্রয় দিবে;—না, প্রবাসীকে পেটে মারিয়া ইহার প্রতিশোধ তুলিবে? যাঁহারা বলেন, নিন্দুকদিগের প্রতি নীরব ঘৃণাই, তন্নিক্ষিপ্ত নিন্দার ও কুৎসার উপযুক্ত প্রতিবাদ, আমাদের মতে তাঁহারা ভুল বলেন। যে কাগজের একটু নাম-ডাক আছে, তাহাকে ক্ষমা করিলে—"ক্ষমা হেথা হীন দুর্ব্বলতা" হইবে।

পরাজয়।

[শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

(১)

হরিশ হালদার মুরলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে মুরলি, গণেশের নাকি চাকরী হ'য়েছে?"

সহাস্যমুখে মুরলী বলিল, "হ্যাঁ খুড়ো ঠাকুর, গাংপুরের ইস্কুলে ম্যাষ্টারী কর্‌ছে।"

হরিশ। মাইনে হ'ল কত?

মুরলী। আপনার আশীর্ব্বাদে বাইশ টাকা ক'রে পাচ্চে।

বিশাল উদরে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে হালদার মহাশয় বলিলেন, "বেশ বেশ, তা মাইনের টাকা এনে তোমার হাতেই দেয় তো?"

মুরলী অবাক্ হইয়া হালদার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল। বলিল, "আমার হাতে দেবে না তো আর কার হাতে দেবে খুড়োঠাকুর?

দোকানের সম্মুখে পতিত দেবদারু কাঠের বাক্সটার উপর আসন গ্রহণ করিয়া হালদার মহাশয় গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "দেবার অনেক লোক আছে হে, অনেক লোক আছে। তুমি নেহাৎ সরল প্রকৃতির লোক কি না, একালের ভাবগতিক কিছু বোঝ না। এ যে ঘোর কলি, একালে এক মায়ের পেটের ভাই আপন হয় না।"

মুরলী সে কথায় ততটা কাণ না দিয়া তামাক সাজিতে বসিল। হালদার মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "এই দেখ না, আমাদের গিরে। খাইয়ে পরিয়ে মানুষ-মুনুষ করলাম, তারপর যাই হাত পা হ'লো, অমনি আপনার পথ দেখলে। এখন আর দাদা ব'লে একবার ফিরেও চায় না। দিব্যি আনচে নিচ্চে খাচ্চে, দাদা ম'লো কি রইল একবার উঁকি দিয়েও দেখে না। যাই দেখুক, সুখী হোক, আমাকে কাঁদিয়ে সুখে থাক্। আমারই কি আর আটকে আছে? সুখে রাম দুখে রাম চলে যাচ্চে। যাক্, তারা শিবসুন্দরী মা!"

হালদার মহাশয়ের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া মুরলী একটুও দুঃখ প্রকাশ করিল না, বরং মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল। কেন না সে জানিত, হালদার মহাশয় ভ্রাতার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করিতেছেন, প্রকৃত

ঘটনা তাহার ঠিক বিপরীত, কথাগুলা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ছোট ভাই গিরিশ তাঁহাকে ফাঁকি দেয় নাই, তিনিই বরং ছোট ভাইকে সম্পূর্ণ ফাঁকি দিয়াছেন। এ কথা কেবল মুরলী কেন, গ্রামের অনেকেই জানে। তবে শাপ-সম্পাতের ভয়ে সে কথাটা কেহ কখনও স্পষ্ট করিয়া হালদার মহাশয়ের মুখের উপর বলিতে পারে নাই; তাঁহার অসাক্ষাতে ইহা লইয়া অনেকে আলোচনা করিত।

বাপ তারিণী হালদার যখন মারা যায়, তখন গিরিশ নাবালক। কলিকাতায় মেসোর কাছে থাকিয়া পড়াশুনা করিত। গ্রামের সকলেই জানিত, বুড়া তারিণী হালদারের হাতে কিছু আছে; গহনাপত্র বন্ধক রাখিয়া লোককে টাকাকড়ি দেওয়াও ছিল। কিন্তু তারিণী হালদার মারা গেলে বড় ছেলে হরিশ যখন তাঁহার দাহকার্য্যের জন্য লোকের কাছে হাত পাতিলেন, তখন সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। দাহান্তে হরিশ পিতার সিন্দুক খুলিয়া প্রতিবাসীদিগকে দেখাইয়া দিলেন, সিন্দুকে দশ দিন হবিষ্য করিবার মত পয়সাও নাই; কেবল কতকগুলা বাজে কাগজের ভিতর নেকড়ায় বাঁধা একটী আধুলি আর আড়াইটী পয়সা রহিয়াছে। প্রতিবাসীরা বিস্মিতভাবে পরস্পর চোখ-ঠারাঠারি করিল।

গ্রামে যজমান শিষ্য অনেক ছিল। তাহাদের সহায়তায় শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। তথাপি কিছু দেনা হইল। হরিশ বহু কষ্টে সে দেনা শোধ করিলেন।

তারপর গিরিশ যে বৎসর এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, সেই বৎসর হরিশ ছোটভায়ের আপত্তি সত্বেও পরীক্ষার তিন মাস পূর্ব্বে তাহার বিবাহ দিলেন। বিবাহে যে টাকা পাইল, তদ্দ্বারা নিজে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইলেন। সুতরাং ছোট বৌ পিতৃপ্রদত্ত মল বালা ছাড়া আর একখানিও গহনা পাইল না। কিছুদিন পরে বালাযোড়াটীও গেল। হরিশ সেই বালা বেচিয়া কন্যার পুনর্ব্বিবাহে মেয়েকে চিক্ গড়াইয়া দিয়া কুটুম্বের নিকট মানরক্ষা করিলেন, এবং ছোট বৌকে কাচের চুড়ী কিনিয়া দিলেন।

নিজের বিবাহে ও ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহে প্রায় দেড়মাস গোলমালে কাটিয়া গেল। সুতরাং পরীক্ষা দিলেও গিরিশ সে বৎসর উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। সে পুনরায় পড়িবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু হরিশ তাহার উপার্জ্জিত অর্থের আশায় এত দূর প্রলুব্ধ হইলেন এবং তাহাকে এরূপ তাড়া দিতে

লাগিলেন যে, বাধ্য হইয়া গিরিশকে পড়া ছাড়িয়া সওদাগরী আপিসে পনেরো টাকা মাহিনায় একটী চাকরী যোগাড় করিতে হইল।

পনেরটী টাকায় দুইটা পেটই চলা দায়; ইহার উপর গিরিশের যখন আর একটী পোষ্য বাড়িল, তখন হরিশ ছোট ভাইকে ডাকিয়া স্পষ্ট ও মিষ্ট কথায় বলিলেন, "ভাই, এত কাল আমি সংসার টেনে আসছি, আমার আর আমার দেহ চলে না। এখন যে যার দেখে শুনে নাও। আমার বয়স বাড়ছে বৈ তো কম্‌ছে না।"

অগত্যা গিরিশকে পৃথক্ হইতে হইল। লোকে বলিল, "দেখলে, ছোঁড়া যেমন দু'পয়সা আনতে শিখলে, অমনি বড় ভাইকে আলাদা ক'রে দিলে। এটা কি ওর ধর্ম্ম হ'লো?" গিরিশ অধর্ম্ম করিলেও হরিশ কিন্তু অধর্ম্ম করিলেন না, তিনি ঘর দ্বার, ঘটী, বাটী সব চুল চিরিয়া ভাগ করিয়া দিলেন। তারপর যজমানের কথা উঠিলে কাঁদ কাঁদ মুখে ছোট ভাইকে বলিলেন, "ভাই, তোমার তবু একটা চাকরী আছে, কিন্তু আমার কাল কি খাব তার সংস্থান নাই। যজমানগুলাও যদি ভাগ ক'রে নাও, তা হ'লে আমাকে এই বয়সে উপোস দিয়ে মরতে হবে।"

জ্যেষ্ঠের কাতরোক্তিতে কনিষ্ঠের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল; সে যজমানের দাবী ছাড়িয়া দিল। ছোট বৌ স্বামীকে বলিল, "পৈতৃক যজমান ছেড়ে দিলে?"

গিরিশ বলিল, "আমি কোন্ দিক্ সামলাব? যজমান রাখতে গেলে চাকরী থাকে না।"

আর হরিশ লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "ও ক্রিয়াকর্ম্মের কি জানে যে যজমান রাখ্‌বে! আচমন করতেই জানে না। হতভাগাকে আমি কতবার বলেছি, ওরে, আমার কাছে ব'সে পূজো অর্চ্চনাগুলো শিখে রাখ্। তা ও কি মানুষ? না ঐ ছোট লোকের মেয়েটা ওকে মানুষ রেখেছে?"

চার পাঁচ বৎসরে গিরিশের পনেরো টাকা বেতন কুড়ি টাকায় উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তখন তাহার পোষ্যসংখ্যাও দুই তিনটী বাড়িয়া গিয়াছিল। সুতরাং দিন যত কষ্টে চলিতে হয়, তত কষ্টেই চলিতেছিল। তাহার কষ্ট দেখিয়া যজমানেরা যদি বলিত, "গিরিশ ঠাকুর, শুধু চাকরীর উপর নির্ভর করলে কি চলে? যজমানগুলো রাখ।" তাহা হইলে গিরিশ বলিত, "আমার ও সকল কিছুই জানা নাই।"

যজমানেরা বলিত, "জানা নাই, জান্‌তেই বা কি লাগে? তুমি বামুনের ছেলে একটা ফুল ফেলে দিয়ে গেলেই যথেষ্ট।"

গিরিশ মাথা নাড়িয়া উত্তর করিত, "ও সকল কাজ আমার দ্বারা হবে না।"

যজমানদের মুখে গিরিশের এই উত্তর শুনিয়া হরিশ বলিতেন, "তোমরাও যেমন, ওর অভাব কি, মাস গেলে মুঠোমুঠো টাকা আনে। কিন্তু বলতে কি, দাদা ব'লে কখন একটা পয়সা হাতে তুলে দিলে না। বরং খাবার সময় ছেলেগুলোকে ঠেকিয়ে দেয়। জালাতন ক'রেছে গো, আমাকে জালাতন ক'রেছে। তা করুক; আমাকে জালিয়ে সুখী হয় হোক। আমার ভগবান্ আছেন।"

অঞ্জলিবদ্ধ দুই হাত উপর দিকে তুলিয়া হরিশ আপনার গভীর মনোবেদনা ভগবানের চরণে নিবেদন করিতেন। ভগবান্ তাঁহার এই সকরুণ নিবেদনে কর্ণপাত করিতেন কি না বলা যায় না, তবে তাঁহার উদরের পরিধি এবং এবং গৃহিণীর অলঙ্কারের সংখ্যা দিন দিন যেরূপে বর্দ্ধিত হইতেছিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে গিরিশের উদর নামক অঙ্গটা যেরূপ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে বোধ হয়, তাঁহার প্রার্থনা বিফল হইত না।

মুরলী, হালদার মহাশয়ের সবিশেষ বিবরণ অবগত ছিল, সুতরাং সে তাঁহার আক্ষেপবাক্যে মনোযোগ না দিয়া তামাক সাজিতে লাগিল। শ্রোতার অভিনিবেশের অভাব দেখিয়া হালদার মহাশয় স্বীয় দুঃখকাহিনী-বর্ণনে বিরত হইলেন। মুরলী তামাক সাজিয়া পেরেকে ঝুলান কড়ি-বাঁধা থেলো হুঁকাটীর ধূলা ঝাড়িয়া হালদার মহাশয়ের হাতে দিল। হালদার মহাশয় তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, "ওহে মুরলি, সাবধানে থেকো, আপন গণ্ডাটী ছেড়ো না। বরং পরকে বিশ্বাস করবে, তবু ভাইকে বিশ্বাস করবে না।"

মুরলী একটু বিরক্তভাবে বলিল, "গণেশ তেমন নয় খুড়োঠাকুর।"

এক মুখ ধোঁয়া ছাড়িয়া, একবার কাসিয়া হালদার মহাশয় ঈষৎ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বেশ বেশ, ভাল হ'লেই ভাল। তবে এর পর দেখে নিও, এই গরীব বামুনের কথাটা ঠিক কি না। যাক্, তারা শিবসুন্দরী, মা, তোমারই ইচ্ছা। এখন সওদাগুলো দাও।"

এক সের ডাল, পাঁচ পোয়া নুন, আড়াই পোয়া তেল, ইত্যাদি প্রায় এক

টাকার উপর সওদা লইয়া হালদার মহাশয় উঠিয়া দাঁড়াইলেন ; বলিলেন, "জিনিষগুলো খাতায় টুকে নাও। দেখো, ভুল ক'রো না। মোট সাত দফা জিনিষ।"

মুরলী তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তা টুকে রাখছি, কিন্তু সাবেক বাকীটা না দিলে চলছে না খুড়োঠাকুর।"

বিরক্তির সহিত হালদার মহাশয় বলিলেন, "সাবেক বাকী কত ?"

মুরলী খাতা খুলিয়া বলিল, "প্রায় দশ টাকা। আমি আজ সন্ধ্যার সময় যাচ্চি, সাবেকটা মিটিয়ে দিতে হবে।"

রাগতভাবে হালদার মহাশয় বলিলেন, "দিতে হবে, কেন, আমি কি তোমাকে দেব না ব'লেছি ?"

মুরলী। দেব না বলবেন কেন ? তবে আমরা সামান্য দোকানদার, আমাদের কি এক জায়গায় এত টাকা ফেলে রাখলে চলে ?

হালদার মহাশয় রাগে ক্ষিপ্রহস্তে সওদাগুলি তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "বেশ, আমি ঘরের ঘটীবাটী বেচেও তোমার টাকা ফেলে দেব। তোমার আজকাল দেখছি, বড় লম্বা লম্বা কথা হ'য়েছে। ভাই চাকরী কচ্চে কি না। বেশ, আগে তোমার টাকা ফেলে দি, তার পর অন্য কথা।"

হালদার মহাশয় ক্রোধভরে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন। মুরলী বসিয়া খাতায় সওদাগুলা টুকিতে লাগিল।

(৮)

"গিন্নি, ও গিন্নি, বলি শুন্‌তে পাচ্চো ?"

ঘরের ভিতর হইতে তীব্রকণ্ঠের ঝঙ্কার উঠিল, "পাচ্চি গো পাচ্চি, আমার কাণ আছে ; তোমার মত এখনো কাণের মাথা খাইনি।"

দোকানের সওদাগুলাকে দাবার উপর সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে হালদার মহাশয় বলিলেন, "একবার বাইরে এসো না, ঘরের ভিতর হচ্চে কি ?"

পূর্ব্ববৎ তীব্র ঝঙ্কারের সহিত গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "ফলার হচ্চে, ঘুমুচ্চি, ব'সে আছি।"

মৃদু হাসিয়া হালদার মহাশয় বলিলেন, "তিনটে কাজ এক সঙ্গেই করছ নাকি ?"

কাঁধের কাপড়টা মাথার উপর তুলিতে তুলিতে গৃহিণী ঘরের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "না, কাজ কি আমি করি, দিন-রাত ব'সে ব'সে খাই।

এমনি কপাল ক'রেই এসেছি বটে। দিনে রেতে একটু নিঃশ্বাস ফেলবার যো নাই।"

গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে হালদার মহাশয় বলিলেন "তা এ জন্মে শিবপূজা, তপ, জপ খুব ক'রছ, আসছে জন্মে দিনরাত ব'সে ব'সে নিঃশ্বাস ফেলবে।"

"কথার ছিরি দেখ" বলিয়া গৃহিণী সবেগে মুখটা ফিরাইয়া লইয়া জিনিষগুলা গুছাইতে লাগিলেন। হালদার মহাশয় বলিলেন, "সাড়ে সতরো আনার জিনিষ এসেছে। বেশ সরে সম্বরে চালাবে।"

মুখ ঘুরাইয়া সরোষে গৃহিণী বলিলেন, "না, আমি সব ফেলে দেব, বিলিয়ে দেব। ভারী তো জিনিষ এসেছেন! এই এক ছটাক তেল, এক ঝিনুক নুন, এক মুঠো ডাল, এতে কি হবে?"

একটু রাগতভাবে হালদার মহাশয় বলিলেন, "আমার শ্রাদ্ধ হবে।"

মুখখানাকে বিকৃত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "আহা হা, কথা দেখ, শ্রাদ্ধ হবে, শ্রাদ্ধ হবার সব রেখে যাচ্চ কি না।"

হাল। যা রেখে যাচ্চি, তাতে আমি ছাড়া তোমার, চাই কি তোমার বাবার পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধ হ'তে পারবে।

ঠোঁট ফুলাইয়া ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে গৃহিণী বলিলেন, "আ, মরি মরি! কি রসিকতাই শিখেছ? যত বয়স হচ্চে, তত যেন রসিকতার ভাঁড় উপছে পড়ছে।"

হাসিতে হাসিতে হালদার মহাশয় বলিলেন, "তোমাকে দেখলেই রসিকতা যে আপনা হ'তে বেরিয়ে আসে গিন্নি।"

গামছাখানা কাঁধে ফেলিয়া হালদার মহাশয় বাহির হইবার উদ্যোগ করিলেন। ঘরের ভিতর ছোট ছেলেটা ঘুমাইতেছিল, এই সময় সে জাগিয়া কাঁদিয়া উঠিল। গৃহিণী পশ্চাৎ হইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আবার চল্‌লে কোথায়?"

হাল। চুলোয়।

গৃহিণী। সেখানে তো দিনরাত যাচ্চ। এখন ছেলেটা একবার ধর।

হাল। ছেলে ধরা কাজ আমার দ্বারা হবে না।

গৃহিণী। তা হবে কেন? বেশ, আমিও পিণ্ডী চট্‌কাব এখন।

হাল। আমার জন্য না চটকাতে পার; কিন্তু নিজের তো বন্ধ হবে না!

হাতের ঝাল-মসলাগুলা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া গৃহিণী গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "কি, আমি নিজের পিণ্ডী চটকাই? আচ্ছা, আজ হ'তে যদি তোমার ঘরে আমি জলগ্রহণ করি, তবে আমি বামুনের মেয়েই নই, হাড়ীর মেয়ে।"

কথা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে গৃহিণী পা দুইটা ছড়াইয়া চাপিয়া বসিয়া পড়িলেন, এবং ক্রন্দনজড়িত নাকি সুরে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এমন বরাত নিয়েও এসেছি, এক দিনের তরেও সুখের মুখ দেখতে পেলুম না। ও মাগো, তুমি কোথায় গো, তোমার কত সাধের আহ্লাদীর আজ কি খোয়ার দেখে যাও গো।"

বীররসের স্থলে সহসা করুণ রসের আবির্ভাব দেখিয়া হালদার মহাশয় আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ওদিকে চীৎকার করিয়া করিয়া ছেলেটার দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইতেছিল। কিন্তু ছেলের মা তখন স্বর্গীয়া মাতার উদ্দেশে আপনার দুঃখকাহিনী নিবেদন করিতে ব্যস্ত। অগত্যা হালদার মহাশয় ঘরে ঢুকিয়া ছেলেটাকে তুলিয়া আনিলেন, এবং উঠানে ঘুরিতে ঘুরিতে চাঁদ ডাকিয়া, পাখী দেখাইয়া তাহাকে ভুলাইতে লাগিলেন।

একটী বছর দশেকের মেয়ে বাড়ী ঢুকিয়া ডাকিল, "জেঠা মশাই!"

হালদার মহাশয় ফিরিয়া বালিকার মুখের দিকে চাহিলেন, গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "কি?"

বালিকা মুখ নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আপনি কি সিদু মোড়লের কাছ থেকে খাজনার টাকাটা এনেছেন?"

রুক্ষস্বরে হালদার মহাশয় বলিলেন, "হাঁ এনেছি, তার কি হ'য়েছে?"

বালিকা। মা ব'লে দিলেন—

হাল। কি ব'লে দিলেন? টাকাটা এখুনি দিতে হবে।

বালিকা। আমাদের ঘরে আজ চাল নাই।

হাল। কোন্ কালে থাকে যে আজ থাকবে? জন্ম জন্ম হাহাকার ক'রে বেড়াতে হবে, এখন হ'য়েছে কি?

বালিকা ছল ছল চোখে একবার জেঠামহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়াই দৃষ্টি নত করিল। হালদার মহাশয় বলিলেন, "আজ হবে না, আজ আমার হাতে নাই"।

বালিকা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া নখ দিয়া হাতের চুড়ী খুঁটিতে লাগিল। হালদার মহাশয় উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "আজ হবে না, আজ যা, দিন সাতেক পরে আসিস্।"

বালিকা অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিল, "নিদেন আনা চার—"

চীৎকার করিয়া হালদার মহাশয় বলিলেন, "এক পয়সাও না। এখনও সাতদিন হয় নি. টাকাটা আদায় ক'রে এনেছি, এরি মধ্যে তাগাদা দেখ না, যেন আমি পালিয়ে যাব। গেল বছর বীরে গয়লার কাছে তিন আনা সেধে নিয়ে তোর বাবা যে এক মাস পরে দিয়েছিল। আমিও তিন মাস পরে দেব।"

বালিকা হাতের উল্‌টা পিট দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে ক্রন্দন-জড়িত স্বরে বলিল, "আজ আমাদের খাওয়া হবে না জ্যেঠা মশায় ?"

রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে হালদার মহাশয় বলিলেন, "তোদের খাওয়া হবে না তো আমার কি ? আমি একদিন খেতে না পেলে তোরা দিবি ? হতভাগার হতভাগা ছেলে মেয়ে, মায়া কান্না কাঁদতে এসেছে। যা যা, এখন হবে না।"

কাঁদিতে কাঁদিতে বালিকা চলিয়া গেল। বালিকার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিণীর উচ্ছ্বসিত মাতৃশোকের নিবৃত্তি হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি ভাল হইয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং স্বামীর কোল হইতে ছেলেকে লইতে লইতে বলিলেন, "মা গো মা, লোকের জ্বালায় তিষ্ঠবার যো নাই। আজ খেতে পাই না, কাল দিন চলে না। আমাকে যেন রাজা রাজড়া পেয়েছে। হরি করুক, তাই হোক, দেখে শত্রুর বুক ফেটে যাক্।"

হালদার মহাশয় নীরবে গম্ভীরভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। গৃহিণী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মেয়েটার চেহারা কি হ'য়েছে দেখেছ ? মাগো, যারা লক্ষ্মীছাড়া হয়, তাদের সবই কি লক্ষ্মীছাড়ার মত হ'তে হয়।"

হালদার মহাশয় বলিলেন, "আর ছোঁড়াটারই বা কি মূর্ত্তি হ'য়েছে। আর সে নধর কার্ত্তিকটী নাই, শুকিয়ে পাকিয়ে উঠেছে। গাল তুবড়ে গেছে, চোখ কোটরে সেঁধিয়েছে, কণ্ঠার হাড় উঠে পড়েছে। যেন আমার পিতামহ হয়ে উঠেছে। সাধে কি এমন, শুধু হিংসায়! যাদের মনের ভিতর হিংসা থাকে, পাক থাকে, তাদের কি কখন ভাল হয় ?"

গৃহিণী। ছোঁড়ারও যেমনি, ছুঁড়ীরও তেমনি চেহারা। ছেলেগুলিও ঠিক তাই হয়ে পড়েছে। লক্ষ্মীছাড়া, লক্ষ্মীছাড়া! সাধে কি ওদিককার জানালাটা বন্ধ ক'রে দিয়েছি, ওদের মুখ দেখাও পাপ, বাতাস গায়ে লাগলে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।"

ঈষৎ হাসিয়া হালদার মহাশয় বলিলেন, "বন্ধ ক'রেছ বেশ ক'রেছ। যাক্, আজ বাদলায় খিঁচুড়ীর বন্দোবস্ত কর। আলো চাল আছে, ডাল এনেছি। আমি মাছের চেষ্টা দেখ্‌ছি। ঘরে আলু কুমড়ো আছে তো?"

গৃহিণী প্রফুল্লকণ্ঠে বলিলেন, "তা আছে। তুমি মাছের চেষ্টা দেখ। মাছ ভাজা না হ'লে খিঁচুড়ী ভাল লাগে না।"

হালদার মহাশয় মৎস্যের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন; গৃহিণী উঠিয়া ছেলেকে শোয়াইয়া মহোৎসাহে রন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন প্রাচীরের অপর পার্শ্বের ঘরে গিরিশের স্ত্রী মাটীর উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া আকুলকণ্ঠে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতে বলিতেছিল, "ভগবান্, আমি উপোস দিয়ে দিন কাটিয়েছি, রাতও কাট্‌বে, কিন্তু বাছাদের মুখে আমি কি দেব?"

হাসিকান্নাই সংসারের রীতি। পৃথিবীর এক পাশে যখন আলোক-সমুজ্জ্বল দিবা, অপর পাশে তখন ঘনান্ধকারময়ী রজনী।

(৯)

হালদার মহাশয় চলিয়া গেলে মুরলী দোকানের চৌকীতে বসিয়া খুঁটী ঠেস দিয়া ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে মনটা যেন কেমন ভারী হইয়া আসিল। কেন যে মন এমন হইল তাহা মুরলী বুঝিতে পারিল না, অথচ মনের অপ্রসন্নতাও কিছুতেই দূর হইল না। আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যা বিষাদের একটা গুরুভার লইয়া ঘনাইয়া আসিতে লাগিল; মুরলীর মনের উপরেও যেন তাহার ম্লান ছায়া জমাট বাঁধিতে থাকিল। তাহার কিছু ভাল লাগিল না; সন্ধ্যার পরই দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী ফিরিল।

নিস্তারিণী তখন সন্ধ্যা দিয়া ছেলে ঘুম পাড়াইতেছিল। স্বামীকে দেখিয়া সহাস্য মুখে বলিল, "আজ এত সকাল যে?"

মুরলী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "আসতে কি নাই?"

নিস্তারিণী বলিল, "কোন দিনই তো তা থাকে না, তাই বলছি।"

মুরলী বলিল, "শরীরটা বড় ভাল নয় ।"

নিস্তারিণী তাড়াতাড়ি আসিয়া স্বামীর কপালে বুকে হাত দিয়া দেখিতে লাগিল। ঈষৎ হাসিয়া মুরলী বলিল, "ও সব কিছু নয় গো মনটা একটু খারাপ ।"

নিস্তারিণী কতকটা আশ্বস্ত হইল। মুরলী পা ধুইয়া, একটু জল খাইয়া শুইয়া পড়িল ; নিস্তারিণী তামাক সাজিয়া দিয়া স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল। হাত বুলাইতে বুলাইতে মৃদু স্বরে ডাকিল, "হাঁ গা !"

মুরলী কি ভাবিতেছিল ; একটু চমকিত হইয়া উত্তর দিল, "কি ?"

নিস্তা। কি হয়েছে ?

মুর। কিসের কি হবে ?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাবচো ?"

উদাস ভাবে মুরলী বলিল, "কিছুই না ।"

নিস্তারিণী নীরবে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে মুরলী বলিল, "দেখ বড় বৌ !"

নিস্তারিণী সাগ্রহে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। মুরলী বলিল, "আজ হালদার মশায় দোকানে এসেছিল ।"

নিস্তারিণী উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি হ'য়েছে নাকি ?"

মুরলী বলিল, "না না, আমার সঙ্গে আর ঝগড়া বিবাদ কি ? তবে বামুনটা কি মিথ্যুক, আর কি জোচ্চোর ! ছোট ভাইটার সর্ব্বস্ব ফাঁকি দিয়ে নিলে ।"

ব্যস্তভাবে নিস্তারিণী বলিল, "তা নেয় নিক, ও সব বামুনের কথায় থেকে কাজ নাই ।"

মুরলী একটু থামিয়া বলিল, "আজ বামুনের কাছে তাগাদায় যাবার কথা ছিল ।"

নিস্তারিণী বলিল, "আজ আর যায় না, কাল তখন যাবে ।"

মুরলী চোখ বুজিয়া পড়িয়া রহিল ; নিস্তারিণী তাহার পা দুইটা আস্তে আস্তে টিপিয়া দিতে লাগিল।

সহসা মুরলী ডাকিল, "বড় বৌ !"

নিস্তারিণী মুখ তুলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। সহাস্যে মুরলী বলিল, "আচ্ছা বড় বৌ, গণশাকে যদি পৃথক্ ক'রে দিই ?"

নিস্তারিণী মৃদু হাসিয়া, স্বামীর চোখের উপর চোখ রাখিয়া বলিল, "বেশ হয়, আমি একলা ঘরের একা গিন্নী হই। আমি রাঁধি, তুমি খাও।"

মুর। আর তুমি?

নিস্তা। আমিও খাই।

মুর। খেতে পারবে?

নিস্তা। কেন পারব না? খুব—খুব পারব।

মুর। আচ্ছা, মনে কর পৃথক্ হয়েছ, তুমি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছ। কিন্তু তোমার চোখের সামনে গণশা খেতে পাচ্চে না, ছোট বৌমা উপোস দিচ্চে—

নিস্তারিণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া স্বামীর মুখ চাপিয়া ধরিল; ব্যস্ত ভাবে বলিল, "কি যে সব অলুক্ষুণে কথা বল।"

মুরলী হাসিয়া উঠিল। মাতঙ্গিনী ডাকিল, "বৌ, ও বড় বৌ!"

তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া নিস্তারিণী উত্তর দিল, "কি ঠাকুরঝি?"

মাতঙ্গিনী উচ্চকণ্ঠে বলিল, "আর কি! এই দেখ কি হ'লো?"

নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'লো?"

মাতঙ্গিনী বলিল, "যা হবার তাই হ'লো। এক কড়া দুধ সব উনান-সই।"

"কে ফেল্লে?"

"আবার কে ফেলবে? তোমার আদরের ছোট বৌ।"

"সব?"

"সব।"

"হাত ফস্কে প'ড়ে গেছে বুঝি?"

"হাত ফস্কে পড়বে কেন? চোখে একটু ধোঁয়া লেগেছে, তাই রাগ ক'রে কড়াটাকে এমন নামালে যে—"

ঈষৎ হাসিয়া নিস্তারিণী বলিল, "হ্যাঁ লা ছোট বৌ?"

ছোট বৌ কোনও উত্তর দিল না, যেমন খুঁটী ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। মাতঙ্গিনী বলিল, "ধন্যি মেয়ে যা হোক, এমন মেয়ে বাপের জন্মে দেখিনি। এ সব মেয়ের কি গরীব গেরস্ত ঘরে পোষায়? রাজা-রাজড়ার ঘরে যাওয়া উচিত ছিল।"

নিস্তারিণী বলিল, "তুমি থাম ঠাকুরঝি।"

মাতঙ্গিনী সরোষে বলিল, "আমি তো থেমেই আছি। এখন ছেলে কি খাবে তার যোগাড় দেখ।"

"তা হচ্চে" বলিয়া নিস্তারিণী ঘরে ঢুকিল। মুরলী জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে ?"

নিস্তারিণী বলিল, "অপর কিছু নয়, দুধটা সব প'ড়ে গেছে। তা গয়লা-ঘরে কি এখন দুধ পাওয়া যাবে ?"

"যেতে প্যারে" বলিয়া মুরলী উঠিয়া বসিল, এবং কাপড়টা ভাল করিয়া পরিয়া বলিল, 'লণ্ঠন আর একটা ঘটী দাও।"

নিস্তারিণী বলিল, "তোমার আর গিয়ে কাজ কি, ঠাকুরপোকে ডাকি।"

ঈষৎ রুষ্টভাবে মুরলী বলিল, "হাঁ, সে দেড় ক্রোশ পথ ভেঙ্গে খেটে খুটে এসে একটু জিরুচ্চে, তাকে পাঠিয়ে দাও। কেন, আমি এত বাবু নাকি ?"

নিস্তারিণী আর কিছু না বলিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া দিল; মুরলী লণ্ঠন ও ঘটী লইয়া দুধ আনিতে গেল। মাতঙ্গিনী রন্ধনশালায় বসিয়া গজ গজ করিতে লাগিল।

গণেশ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা এমন সময় কোথায় গেল, বৌদি ?"

নিস্তারিণী বলিল, "গয়লা বাড়ী, দুধ আনতে।"

গণেশ। এখন সময় দুধ আনতে ?

নিস্তা। দুধটা উনান হ'তে নামাতে গিয়ে ছোট বৌ ফেলে দিয়েছে।

গণেশ। দুধের কড়াটুকু নামাবারও ক্ষমতা নাই ?

তিরস্কারের স্বরে নিস্তারিণী বলিল, "না, ক্ষমতা নাই! দৈবাৎ প'ড়ে গেছে তার কি হবে ?"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া গণেশ বলিল, "তা দাদা গেল কেন ? আমাকে পাঠালেই তো হ'তো।"

মৃদু হাসিয়া নিস্তারিণী বলিল, "এমনি দাদাই বটে, তোমাকে পাঠিয়ে নিজে ব'সে থাকবে।"

গণেশের মুখটা যেন গর্ব্বে একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। সে সহাস্যে বলিল, "তা শুধু দাদাকেই দোষ দাও কেন বৌদি, তুমিই বা কোন্ কম ?"

"বটে" বলিয়া নিস্তারিণী একটু হাসিল। গণেশ বলিল, "কিন্তু বৌদি, দোহাই তোমার, তোমার আদরের মাত্রাটা একটু কম কর।"

গণেশ তখন অতিরিক্ত আদর দেওয়ার কুফল কিরূপ হইতে পারে, পরিমিত আদরের সহিত পরিমিত শাসন কত যে হিতকর, তাহা উদাহরণ-

সহকারে বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিল। নিস্তারিণী হাসি চাপিয়া তাহা শুনিতে লাগিল। তার পর গণেশের বক্তৃতা শেষ হইলে সে হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে বলিল, "হাঁ ঠাকুরপো, তুমি বুঝি ইস্কুলে এই রকম সব বক্তিমে দাও?"

বিরক্তভাবে গণেশ বলিল, "বক্তিমে নয় বৌদি, যা বললাম তা ভালোর জন্যই।"

নিস্তারিণী রাগিয়া বলিল, "দেখ্ গণশা, সে দিনকার ছেলে তুই, এখনো গলা টিপলে দুধ বেরোয়, তুই দু'পাত কিচিরমিচির প'ড়ে আমাকে বোঝাতে এসেছিস্?"

মাতঙ্গিনীর আর সহ্য হইল না; সে রন্ধনশালা হইতে বাহির হইয়া চড়া গলায় বলিল, "দেখ বৌ, তোমার সবটাই বাড়াবাড়ি। কেন, ও কি মন্দ কথা বলছে? কিছুরই বেশী ভাল নয়।"

গণেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "তা তুমি যাই বল বৌদি, তোমার এতটা আদর দেওয়া ভাল হচ্চে না। এতে শুধু ওর পরকাল নষ্ট হচ্চে না, এর পর আমাকে কষ্ট পেতে হবে।"

গর্জ্জন করিয়া নিস্তারিণী বলিল, "বটে!" তার পর মহামায়ার দিকে চাহিয়া কর্কশ কণ্ঠে ডাকিল, "ছোট বৌ!"

ছোট বৌ মুখ তুলিয়া চাহিল। নিস্তারিণী ডাকিল, "এ দিকে আয়।"

ছোট বৌ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। নিস্তারিণী বলিল, "কেন দুধ ফেলেছিস্।"

নিস্তারিণীর রাগে ছোট বৌ যেন একটুও ভীত হয় নাই এমনই ভাব দেখাইয়া বলিল, "প'ড়ে গেল তা আমি কি করব?"

চীৎকার করিয়া নিস্তারিণী বলিল, "কেন, তুমি কি খেতে পাও না?"

গম্ভীর স্বরে ছোট বৌ উত্তর দিল, "না।"

রাগে নিস্তারিণীর মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। সে ছোট বোয়ের গালে ঠাস্ করিয়া চড় বসাইয়া দিল; ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "বটে, আচ্ছা দেখি, এবার কোথা হ'তে খেতে পাও।"

ছোট বৌ একটা জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিস্তারিণীর সম্মুখ হইতে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। নিস্তারিণী তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া সরোষে বলিল, "যাস্ কোথায়? আজ তোরই একদিন কি আমারই একদিন।"

নিস্তারিণীর রাগ দেখিয়া গণেশ ও মাতঙ্গিনী স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু ছোট বৌ একটুও ভয় পাইল না। সে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নিস্তারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, "ছেড়ে দাও।"

নিস্তারিণী তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "বটে, এক রত্তি মেয়ে তুই, তোর এত তেজ! আচ্ছা, তোর তেজ আমি ভাঙ্গচি। আজ যে তোকে খেতে দেবে সে আমার মাথা খাবে।"

নিস্তারিণী রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। গণেশ আপনার ঘরে চলিয়া গেল। মাতঙ্গিনী রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল।

মুরলী ও গণেশের আহার শেষ হইলে মাতঙ্গিনী খাইবার জন্য নিস্তারিণীকে ডাকিল। নিস্তারিণী উঠিয়া রান্নাঘরে গেল, এবং ভাতের থালার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ছোট বোয়ের ভাত কোথায়?"

মাতঙ্গিণী কোন উত্তর দিল না। নিস্তারিণী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "ছোট বোয়ের ভাত দাও নাই?"

মাতঙ্গিনী গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "না"।

নিস্তা। কেন?

মাত। আমি দিতে পারব না।

নিস্তা। পারবে না?

মাতঙ্গিনী মুখ তুলিয়া জোর গলায় বলিল, "না, আমি দেব না। আমি অনেক খেয়েছি বৌ, তোমাদের মাথাগুলো আর খেতে পারব না।"

মাতঙ্গিনীর স্বরটা জড়াইয়া আসিল। নিস্তারিণী বুঝিতে পারিল, সে মাথার দিব্য দিয়াছে বলিয়াই ঠাকুরঝি ভাত বাড়ে নাই। বুঝিয়া নিস্তারিণী একটু হাসিল; বলিল, "রাগের মাথায় একটা কথা ব'লে ফেলেছি, তাই ব'লে কি মেয়েটা উপোস থাকবে ঠাকুরঝি।"

মাতঙ্গিনী বলিল, "উপোসই থাক আর যাই হোক, আমি প্রাণ গেলেও ভাত দেব না।"

নিস্তারিণী বলিল, "আচ্ছা আমিই দিচ্চি। ভাত আছে?"

"আছে" বলিয়া মাতঙ্গিনী বাহিরে চলিয়া গেল। নিস্তারিণী তখন ছোট বোয়ের ভাত বাড়িয়া রাখিয়া ছোট বৌকে ডাকিতে গেল।

গণেশের ঘরের দরজায় গিয়া নিস্তারিণী ডাকিল, "ছোট বৌ, ও ছোট বৌ।"

অনেক ডাকাডাকির পর কোনও সাড়া না পাইয়া নিস্তারিণী জানালার কাছে আসিল, এবং জানালায় ধাক্কা দিয়া ডাকিল, "ঠাকুরপো, ও ঠাকুরপো, ওরে গণশা!"

গণেশ বিরক্তভাবে উত্তর দিল, "কেন?"

নিস্তারিণী বলিল, "ছোট বৌকে ডেকে দে।"

গণেশ বলিল, "আমি পারব না।"

নিস্তারিণী বলিল, "লক্ষ্মী দাদা আমার, ডেকে দাও, মেয়েটা না খেয়ে প'ড়ে থাকবে?"

গণেশ উত্তর করিল, "থাক্।"

নিস্তারিণী বলিল, "তাও কি হয়? তুই ডেকে দে, ভাত বাড়া প'ড়ে আছে।"

গণে। তুমি খাওগে।

নিস্তা। ও উপোস প'ড়ে থাকবে আর আমি খাব? তাও কি হয়, ছিঃ!

ক্রুদ্ধস্বরে গণেশ বলিল, "খুব হয়। রক্ষে কর বৌদি, আর তোমার আদর দেখাতে হবে না।"

নিস্তারিণী যেন কাঠ হইয়া জানালার গরাদে ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গণেশ ছোট বোয়ের উপর রাগিয়াই কথাটা বলিয়াছিল, কিন্তু নিস্তারিণী ভাবিল, রাগটা তাহারই উপর। সে-ই ছোট বৌকে মারিয়াছে, তাহাকে খাইতে দিবে না বলিয়া দিব্য দিয়াছে। নিস্তারিণী ধীরে ধীরে গিয়া আপনার ঘরে শুইয়া পড়িল; বাড়া ভাত অস্পৃষ্ট অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

সাহিত্যের আসরে দুই দল লোককে অভিনয় করিতে দেখা যায়, একদল লেখক, অপর দল সমালোচক। পাঠকেরা দর্শকমাত্র। তাঁহারা এই দুই দলের অভিনয় দেখিয়া কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন উল্লাসে করতালি দিয়া সাহিত্যক্ষেত্র প্রতিধ্বনিত করিতে থাকেন। আবার সময়ে সময়ে বিসদৃশ অভিনয়-দর্শনে ঘৃণায় নাসা কুঞ্চিত করিতে বাধ্য হন।

এখন কথা হইতেছে, এই দুই দল অভিনেতার মধ্যে কৃতিত্ব কাহার

অধিক? কেহ কেহ লেখক অপেক্ষা সমালোচককেই শ্রেষ্ঠ বলেন, কেহ বা লেখককেই প্রাধান্য দিয়া থাকেন। কেহ বলেন, লেখা সহজ, কিন্তু তাহার দোষগুণের বিচার করা কঠিন কার্য্য; ইহাতে যথেষ্ট শক্তি, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। আবার কেহ বলেন, একটা তৈয়ারী জিনিষ হাতে পাইলে বসিয়া বসিয়া তাহার খুঁটীনাটী ধরিয়া তাহার নিন্দা বা প্রশংসা সহজেই করা যায়, তাহাতে কৃতিত্ব কিছুই নাই; কৃতিত্ব মূল জিনিসটা তৈয়ারী করায়। এই শেষোক্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেকেই মধ্যে মধ্যে সমালোচকের ভূমিকা লইয়া সাহিত্যের আসরে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন এবং সূক্ষ্মদর্শিতার অভাবে শুধু নিন্দা বা প্রশংসা দ্বারাই আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ করেন। কিন্তু নিন্দা বা প্রশংসা ছাড়া যে সমালোচনার অন্য সুমহৎ উদ্দেশ্য আছে তাহা ইঁহাদের ধারণার বহির্ভূত। আজকাল এই শ্রেণীর অনেক সমালোচক সাহিত্যক্ষেত্রের জঞ্জাল দূর করিতে গিয়া আপনারাই নূতন জঞ্জালের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইঁহাদের অনভিজ্ঞতাপ্রসূত সমালোচনার জঞ্জালে সাহিত্য-ক্ষেত্র কলুষিত হয়, পাঠকেরা উত্যক্ত হইয়া উঠে।

সম্প্রতি 'মানসী'র পৃষ্ঠায় এই শ্রেণীর এক সমালোচকের হস্তকণ্ডূতি প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহারই গভীর জ্ঞান ও অসাধারণ বিশ্লেষণশক্তির পরিচয় দিবার জন্য এতটা গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা।

গত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'তে 'ব্রজরাজ' নাম-স্বাক্ষরিত জনৈক সমালোচক 'বাসি ফুল' নামক গল্প-গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছেন, এবং এই সমালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি গল্পলেখক নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—

১৩২৩ সালের মাঘের 'ভারতবর্ষে' একটা গল্প পড়িয়াছিলাম 'আকালের মা'—লেখক শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। 'বাসি ফুলে'র 'সাঁজের বাতি' ও 'স্বপ্নভঙ্গ' পড়িবার সময় মনে হইল, এইরূপ গল্প যেন কোথায় পড়িয়াছি। মিলাইয়া দেখি, এই দুই গল্পের সংমিশ্রণে 'আকালের মা'র উৎপত্তি। হায় রে গল্পলেখক!"

এক্ষণে 'বাসি-ফুলে'র গল্প দুইটীর সংমিশ্রণে 'আকালের মা'র উৎপত্তি কি না বুঝিতে হইলে তিনটী গল্পেরই স্থূল আখ্যানভাগ জানা আবশ্যক। 'আকালের মা'র স্থূল আখ্যানভাগ এইরূপঃ—

আকাল চাষার ছেলে। একটু বেশী বয়সের একমাত্র ছেলে বলিয়া

আকাল বাপ মার একটু আদরের। বাপের ইচ্ছা ছিল, ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতে, নিদারুণ ক্লেশকর কৃষিকর্ম্মের কষ্ট ভোগ করিতে দিবে না। কিন্তু আকালের বয়স যখন চারি বৎসর, তখন বাপ মারা গেল। মা স্বামীর আশা পূর্ণ করিবার জন্য ধান ভানিয়া, গোবর কুড়াইয়া, নিজে না খাইয়া বহুকষ্টে ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইতে লাগিল। গ্রামের স্কুলে পড়িয়া আকাল প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল। অতঃপর আর ছেলেকে পড়াইবার সামর্থ্য রহিল না। এই সময় একটা সুযোগ মিলিল। নিজ গ্রামের জনৈক ধনবান্ স্বজাতি আকালকে ঘরজামাই করিবার প্রস্তাব করিল। ছেলের কলেজে পড়া চলিবে ও ভবিষ্যতে সুখী হইবে এই আশায় আকালের অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিধবা রাজী হইল; পুত্রের হিতার্থ মাতা আত্মহৃদয় বলি দিলেন।

বিবাহের পর আকাল একবার মাত্র মায়ের সঙ্গে দেখা করিতে আসিল। তার পর সেই যে গেল আর আসিল না। বিধবা এক বৎসরেরও অধিককাল প্রতীক্ষা করিয়াও যখন পুত্রের দেখা পাইল না, তখন সে মানসম্ভ্রম সব ত্যাগ করিয়া ছেলেকে দেখিবার জন্য তাহার শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইল। এবং সেখানে গিয়া আপনাকে আকালের মা বলিয়া পরিচয় দিল। কিন্তু সেই দীনবেশা রমণীকে জামাই বাবুর মা বলিয়া যখন কেহ বিশ্বাস করিতে পারিল না, এবং আকাল দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল, তখন বিধবা আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিল। সে এরূপ দীনবেশে কুটুম্ব-বাড়ীতে আসিয়া যে পুত্রের লজ্জার কারণ হইয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তৎক্ষণাৎ ভ্রম সংশোধন করিয়া লইল, এবং আপনাকে আকালের মার পেরিত বলিয়া পরিচয় দিল। তবে সত্যের অনুরোধে এটুকুও বলিল যে, সেও এক রকমে আকালের মা, কেন না আকাল তাহারই কোলে পিঠে মানুষ হইয়াছে। মাতার এই মিথ্যা উক্তিটী বজায় রাখিবার জন্য আকালও মায়ের অসাক্ষাতে বাড়ীর জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট কথাটা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। পরদিন প্রভাতে বিধবা ফিরিবার সময় বাগানে ছেলের দেখা পাইল। দেখা পাইয়াও সে আত্মহারা হইল না, শুধু বাহিরের লোকের মত স্নেহভরা আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল। আকালের তখন মায়ের পায়ে লুটাইয়া পড়িবার ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু পাছে কেহ দেখিতে পায় এই আশঙ্কায় চুপ করিয়া রহিল। তার পর মা চলিয়া গেলে আকালের নিদারুণ

মর্ম্ম যাতনা উপস্থিত হইল। কয় দিন এই মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আকাশ আর থাকিতে পারিল না, কাহাকেও কিছু না বলিয়া একবস্ত্রে মায়ের কাছে ছুটিল। কিন্তু বাড়ীতে গিয়া মাকে দেখিতে পাইল না; শুনিল, মা গ্রামে তাহার অজস্র সুখ্যাতি করিয়া, ঘর ভিটা বেচিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছে।

'সাঁজের বাতি'র সংক্ষিপ্ত আখ্যানভাগ এইরূপ;—

করুণা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর পিতৃহীন হইয়া চাকরীর চেষ্টায় জমিদারবাড়ীতে গেল। জমিদার চাকরীর পরিবর্ত্তে তাহাকে জামাতা-পদে বরণ করিতে চাহিলেন, এবং করুণার হস্তে কন্যা কিশোরীকে সম্প্রদান করিলেন। অতঃপর শ্বশুরের অর্থসাহায্যে করুণা এম-এ পাশ করিল। শ্বশুর এই উপলক্ষে প্রীতিভোজ দিয়া জামাতাকে স্বগৃহে আনিলেন, এবং তাহাকে ঘরজামাই হইয়া থাকিতে বলিলেন। করুণা রাজি হইল না। শ্বশুর জামাতায় একটা অস্বাভাবিক বিরোধ হইয়া গেল। করুণা শ্বশুরগৃহ ও স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, তার পর মাতাকে লইয়া বেহার প্রদেশে গিয়া শিক্ষকতা কার্য্য করিতে লাগিল। মাতা বধূকে আনিতে চাহিলেন, কিন্তু করুণা তাহাতে রাজি হইল না, দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে চাহিল। অতঃপর কিশোরী বেহারে আসিয়া ছোকরা সাজিয়া স্বামীর সহিত পুনর্ম্মিলিত হইল।

'স্বপ্নভঙ্গের' আখ্যানভাগ এইরূপ;—

বিমলা পিতৃহীন যুবক, মাতা বর্ত্তমান। বিমলা যখন কলিকাতায় পড়িতে গেল, তখন সে বিবাহিত। কিন্তু সে আপনাকে অবিবাহিত বলিয়া পরিচয় দিয়া 'ব্যাচিলার' মেসে আশ্রয় লইল। বন্ধু নলিনীর সাহায্যে তাহার র‍্যামস্‌ডেন বা রামসদন ভাদুড়ীর সহিত তাহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইল, এবং ভাদুড়ীর সহিত তাহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইল, ভাদুড়ীর কন্যা রমার সহিত প্রণয় জন্মিল। রামসদন ও মেসের ছাত্রেরা জানিত যে, বিমলার আত্মীয়স্বজন কেহ নাই। বিমলাও কথায় ও কার্য্যে তাহারই সমর্থন করিত। রামসদন তাহাকে জামাতা মনোনীত করিলেন। বিমলার বাড়ী-যাতায়াত বন্ধ হইল। মাতা চিন্তিত হইলেন, স্ত্রী সুষমা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইল। মাতা বিমলাকে বাড়ী ফিরিবার জন্য পত্র লিখিতে লাগিলেন, কিন্তু বিমলা তখন রমার প্রণয়ে উন্মত্ত। শেষে মা গুরুদেবকে

সঙ্গে লইয়া মেসে উপস্থিত হইলেন, এবং পুত্রকে গৃহে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বিমলা তাঁহাকে মাতা বলিয়া অস্বীকার করিল, এবং সর্ব্বসমক্ষে তাঁহাকে "চিনি না" বলিয়া প্রত্যাখান করিল। মা ফিরিয়া গেলেন। তার পর স্ত্রী সুষমা মারা গেল। বিমলা রমাকে বিবাহ করিয়া বিলাত যাত্রা করিল এবং সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে ফিরিল; ম্যাজিষ্ট্রেট হইল। কিছু দিন পরে সুষমার জন্য অনুতাপ হইল, মাতার জন্য অনুতাপ হইল। শেষে মৃত্যু-শয্যায় মাতার সাক্ষাৎ ও তাঁহার ক্ষমা পাইল।

এক্ষণে দেখা যাউক. এই দুইটী গল্পের সহিত 'আকালের মা'র কতটুকু সাদৃশ্য আছে। 'সাঁজের বাতি'র করুণা পিতৃহীন, আকালও পিতৃহীন; করুণার বিধবা মাতা বর্ত্তমান, আকালেরও তাহাই; করুণার ধনিগৃহে বিবাহ হইল, আকালেরও তাহাই হইল। এই পর্য্যন্ত সাদৃশ্য। কিন্তু এই সাদৃশ্যের মধ্যেও বৈসাদৃশ্য কতটুকু তাহাও দেখা আবশ্যক। করুণা প্রবেশিকা পরীক্ষার পর পিতৃহীন. আর আকাল চারি বৎসর বয়সে পিতৃহীন। করুণার মাতাকে পাঁচ হাজার টাকা লইয়া ছেলের বিবাহ দেওয়া ছাড়া এখানে আর কোনও কাজ করিতে দেখা যায় না (তাঁহার আর যাহা কিছু কাজ আছে সে পরে, সে অংশের সহিত এই গল্পের কোনও সৌসাদৃশ্য নাই), কিন্তু আকালের মা প্রাণান্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া, লোকের উপহাস-টিটকারীতে কাণ না দিয়া ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইল, শেষে আকালের শিক্ষার সুবিধার ও উন্নতির আশায় আপনার হৃদয় বলি দিয়া তাহাকে পরের হাতে তুলিয়া দিল। আকাল ধনীর ঘরজামাই হইল। আর করুণা পাঁচ হাজার টাকা লইয়া বিবাহ করিয়া, শ্বশুরের পয়সায় এম্-এ পাশ করিয়া, তার পর যখন ঘরজামাই থাকিবার প্রস্তাব হইল, তখন বিবাদ করিয়া, স্ত্রী ছাড়িয়া চলিয়া আসিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গল্পের নায়কের পিতৃহীনতা, মাতার বিদ্যমানতা এক ধনিগৃহে বিবাহ এই সাদৃশ্যটুকু দেখিয়াই সমালোচক স্থির করিয়াছেন, দুইটী গল্পই এক, কিন্তু ইহার মধ্যে বৈসাদৃশ্য কতটুকু আছে তাহা দেখিবার বা বুঝিবার অবসর তাঁহার হয় নাই।

তার পর 'স্বপ্নভঙ্গে'র সহিত সাদৃশ্যের কথা। স্বপ্নভঙ্গের নায়ক বিমলা আপনার প্রবঞ্চনা ধরা পড়িবার ভয়ে এবং পাছে রমার সহিত বিবাহ না হয় এই আশঙ্কায় সর্ব্বসমক্ষে মাতাকে "চিনি না" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল। মা কাঁদিলেন, গুরুদেব তিরস্কার করিলেন, কিন্তু বিমলা তাহাতে একটুও বিচলিত

হইল না। মেসের ছাত্রেরা জুয়াচোর বলিয়া মাকে ও গুরুকে উপহাস করিতে লাগিল, বিমলা তাহা অম্লানবদনে সহ্য করিল। আর আকাল শুধু লজ্জার খাতিরেই মায়ের সঙ্গে কথা কহিতে পারিল না, মাকে দেখিয়াই দূর হইতে মুখ ফিরাইয়া পলাইয়া গেল। তাহার মাতাই ছেলের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া আপন পরিচয় গোপন করিলেন; হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি তামাসা ক'রে বলেছিলাম যে আমি আকালের মা; আকালের মা ছেলেকে দেখতে আমায় পাঠিয়েছে। তা আমিও ধরতে গেলে ওর মা; ওতো আমারই কোলে পিঠে মানুষ।" মাতার এই মিথ্যা পরিচয় ধরা পড়িবার ভয়েই আকাল তাঁহার অসাক্ষাতে ইহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কোথায় রোরুদ্যমানা মাতার মুখের উপর তাঁহাকে 'চিনি না' বলিয়া প্রত্যাখ্যান, আর কোথায় পুত্রের সম্মানরক্ষার জন্য মাতার এই আত্মগোপন! দুইটী ঘটনাই ঠিক সমান হইল না কি? তার পর মেসের ছেলেরা যখন, মাতাকে উপহাস করিতে লাগিল, বিমলা তাহা চুপ করিয়া শুনিল; কিন্তু আকালের স্ত্রী যখন ঘরের ভিতর স্বামীর সম্মুখে তাহার মাতাকে 'মাগী' বলিল, তখন আকাল স্ত্রীর উপর এমন কঠোর দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল যে, স্ত্রী ভয়ে আর কথা কহিতে পারিল না। উভয়ের মধ্যে কি চমৎকার সাদৃশ্য!

অতঃপর গল্পগুলির প্রতিপাদ্য কি তাহাই দেখা যাউক। 'আকালের মা'র প্রতিপাদ্য মাতৃ-হৃদয়ের অভিব্যক্তি; সন্তানের জন্য মাতা কত দূর ত্যাগ স্বীকার করিতে পারেন, তাহাই ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর 'সাঁজের বাতি' ও 'স্বপ্নভঙ্গে'র প্রতিপাদ্য অনেকটা পুত্রহৃদয়ের অভিব্যক্তি; মাতার প্রতি পুত্রের কর্ত্তব্য ও ভক্তির নিদর্শন। এখানেও কি অদ্ভুত সাদৃশ্য!

এক্ষণে এই দুই গল্পের সংমিশ্রণে আকালের মা'র উৎপত্তি কি না, পাঠকেরাই তাহার বিচার করুন।

ব্রজরাজ "হায় রে গল্পলেখক" বলিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠকেরা কিন্তু "হায় রে সমালোচক" বলিয়া হাস্যসংবরণ করিতে পারিবেন না। এক্ষণে যদি কেহ "ব্রজরাজ"কে এই অস্বাভাবিক সমালোচনাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া ব্রজরাজের ব্রজধামে আচরিত বাল্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে উপদেশ দেন, তাহা হইলে আমাদের বলিবার কিছু থাকিবে না।

ঠাকুর রামকৃষ্ণের গল্প।

এক গ্রামে একটী বালক ছিল। তাহার নাম পদ্মলোচন। গ্রামের লোকেরা পদ্মলোচনকে পোদো পোদো বলিয়া ডাকিত।

এই গ্রামে একটী পুরাতন জীর্ণ পোড়ো মন্দির ছিল। উহার ভিতরে কোনও দেব-বিগ্রহ নাই। মন্দিরের গা ফাটিয়া গিয়াছে। সেই ফাটলে অশ্বত্থ, বট প্রভৃতি গাছ জন্মিয়াছে। মন্দিরের ভিতরে চামচিকার দল বাসা করিয়াছে। মেঝে ধূলায় ভরা এবং সেই ধূলার সঙ্গে চামচিকার বিষ্ঠা। তাহার উপর আবার চারিকোণে মাকড়সার জাল।

মন্দিরের এই অবস্থা দেখিয়া গ্রামের লোকজন আর এদিকে আসিত না।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময়ে গ্রামের লোকেরা শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইল। তাহারা ভাল করিয়া শুনিল,—মন্দিরের দিক হইতেই শাঁখের আওয়াজ আসিতেছে। তখন তাহারা ভাবিল, হয়ত কেহ মন্দিরে আবার ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে; তাই বোধ হয় সন্ধ্যার সময়ে ঠাকুরের আরতি হইতেছে। এই ভাবিয়া গ্রামের ছেলে, বুড়া, পুরুষ, রমণী সকলেই মন্দিরের দিকে ছুটিল। ক্রমে তাহারা মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

কিন্তু কোথায় বা ঠাকুর, আর কোথায়ই বা আরতি! চারিদিকে অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। না জ্বলিতেছে একটা আলো, না আছে একটা মানুষ! অথচ শঙ্খধ্বনির বিরাম নাই। মন্দিরের ভিতর হইতে ভোঁ ভোঁ করিয়া শাঁখ বাজিতেছে। মন্দিরের দরজা বন্ধ।

দলের মধ্যে একজন সাহসী লোক ছিল। সে সাহস করিয়া আগুয়ান হইল এবং দরজা ঠেলিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিল। দেখিল,—পদ্মলোচন এককোণে দাঁড়াইয়া শাঁখ বাজাইতেছে। যেমন ধূলা তেমনই রহিয়াছে; যেমন চামচিকার বিষ্ঠা পূর্ব্বে ছিল, এখনও তেমনই আছে। মন্দির একটুও পরিষ্কৃত বা মার্জ্জিত হয় নাই।

তখন সেই ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিল—

ওরে পোদো—

মন্দিরে তোর নাইক মাধব!

শাঁখ ফুঁকে তুই বাধালি গোল!

পরমহংসদেব এই গল্পটী বলিয়া নিম্নলিখিত উপদেশটী তাঁহার ভক্তগণকে দিয়াছিলেন :—

যদি হৃদয়-মন্দিরে মাধব-প্রতিষ্ঠা করতে চাও, তা'হ'লে শুধু ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ ফুঁকলে কি হবে? আগে মন শুদ্ধ কর। মন শুদ্ধ হ'লে সেই পবিত্র আসনে ভগবানের অধিষ্ঠান হ'বে। যতদিন চামচিকের বিষ্ঠা থাকবে, ততদিন মাধবকে আনতে পারবে না।

[চামচিকা হইতেছে ইন্দ্রিয়। এগার জন চামচিকা অর্থাৎ একাদশ-ইন্দ্রিয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন—ইহাদের সমাহারকে একাদশ-ইন্দ্রিয় বলা হয়।]

পুস্তক-পরিচয়।

লক্ষ্যহীন।—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

এখানি উপন্যাস। গ্রন্থকার 'নিবেদনে' লিখিতেছেন—"এই পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিয়া আমি যথাসাধ্য প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিয়াছি। পারতপক্ষে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করি নাই।" কিন্তু তিনি অতিরঞ্জন করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারেন নাই। কারণ তিনি আবার বলিতেছেন,—"উপন্যাসের অঙ্গ ঠিক রাখিতে চেষ্টা করিয়া ললিতমোহনের চরিত্র অনেকটা অতিরঞ্জিত করিতে হইয়াছে। * * * * সুবোধ ও ললিতা অনেক অংশে অতিরঞ্জিত।" সুতরাং বলিতে হইবে, আলোচ্য গ্রন্থখানিতে গ্রন্থকার বাস্তব ও কল্পনার রং ফলাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানিতে লিখিবার ও চরিত্র-বিশ্লেষণের নৈপুণ্য বা বিশেষত্ব তেমন কিছু না থাকিলেও মোটামুটি হিসাবে ইহা সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে, এমন কথা আমরা বলিতে পারি। ভাষা জটিল নহে; তবে মাঝে মাঝে শব্দের আড়ম্বরের দিকে লেখক অল্পবিস্তর ঝুঁকিয়াছেন। পুস্তকখানির ছাপা, কাগজ ও বাঁধাই ভাল।

সপ্তস্বর [সচিত্র]—শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ৬১ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন হইতে শ্রীঅশ্বিনীকুমার নিয়োগী কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

প্রথমেই বলিব,—একশত আট পৃষ্ঠার পুস্তকে সর্ব্বশুদ্ধ তেইশখানি রঞ্জিত চিত্রের সমাবেশ—সুতরাং ইহার 'সচিত্র' আখ্যা সার্থক হইয়াছে।

ছবিগুলি ভাল। কবিতাগুলির সম্বন্ধেও আমাদের এই কথা। কোথাও ভাবের জটিলতা নাই; অর্থবোধে বিভ্রাট নাই। ছন্দগুলির গতি অবাধ। স্যর রবীন্দ্রনাথ নায়কের মুখে সীতার সতীত্বে সন্দেহ করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারই পরিবারের শ্রীযুত ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর আলোচ্য গ্রন্থখানির 'সতী-শীর্ষক' কবিতায় লিখিয়াছেন—

ভারতের সাধ্বী সতী চির পতিরতা—
স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে যাঁহাদের কথা;
সে কি সতীত্বের তেজ, সে কি মহাশক্তি!
শত তপস্যার পুণ্য এক পতিভক্তি।
যবে হতে স্বামী সাথে হ'ল পরিণীতা
আদর্শ সেদিন হ'তে রাম আর সীতা।

'সপ্তস্বরের অধিকাংশ কবিতাই আমাদের ভাল লাগিয়াছে। 'সপ্তস্বরে'র সপ্তস্বর, কণ্বমুনির আশ্রম, কণ্বের কুটীর, গার্গী, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি কবিতাগুলি উচ্চভাবপূর্ণ। 'ভক্ত' কবিতাটী অতি সুন্দর। বাঙ্গালী পাঠক 'সপ্তস্বর' পাঠ করিয়া প্রীতিলাভ করিবেন, এমন আশা আমাদের আছে।

পত্রাবলী (তৃতীয় ভাগ)।—প্রাপ্তিস্থান, উদ্বোধন কার্য্যালয়, ১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার, কলিকাতা। মূল্য ।৵০ আনা।

পুস্তকখানিতে স্বামী বিবেকানন্দের ৬৭খানি পত্র ছাপা হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের এই পত্রগুলিতে ভাবিবার, বুঝিবার ও শিখিবার বিষয় যে যথেষ্টই আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে স্বামীজি আমেরিকায় গিয়াছিলেন। তখন সেখানে তাঁহাকে কেহ চিনিত না জানিত না। তাঁহার নাম যশ সহায় সম্পদ কিছুই ছিল না। এমন অবস্থায় যাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন, ৩৯ সংখ্যক পত্রের একাংশে তিনি তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বামীজি লিখিতেছেন—'গত বৎসর গ্রীষ্মকালে আমি এক বহু দূরদেশ হইতে আগত, নাম-যশ-ধন-বিদ্যাহীন, বন্ধুহীন, সহায়হীন, প্রায় কপর্দ্দকশূন্য, পরিব্রাজক প্রচারকরূপে এদেশে আসি। সেই সময়ে আমেরিকার নারীগণ আমাকে সাহায্য করেন, আহার ও আশ্রয় দেন, তাঁহাদের গৃহে লইয়া যান, এবং আমাকে তাঁহাদের পুত্ররূপে সহোদররূপে যত্ন করেন। যখন তাঁহাদের নিজেদের যাজককুল এই "বিপন্নকে বিধর্ম্মী"কে ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহাদিগকে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টা

করিতেছিলেন, যখন তাঁহাদের সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধুগণ এই অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশীর ('হীনত বা বিপজ্জনক চরিত্রের)" সঙ্গত্যাগ করিতে উপদেশ দিতেছিলেন, তখনও তাঁহারা আমার বন্ধুরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু এই মহামনা, নিঃস্বার্থ, পবিত্র রমণীগণই চরিত্র ও অন্তঃকরণ সম্বন্ধে বিচার করিতে দক্ষতরা,—কারণ, নির্ম্মল দর্পণেই প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে।"

আশা করি, তৃতীয় খণ্ড 'পত্রাবলী'ও পাঠক-সমাজে আদৃত হইবে।

শান্তি। [গার্হস্থ্য উপন্যাস]—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅনিলেন্দ্রনাথ সিংহ, ২৩নং কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা। মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

'শান্তি' পড়িয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। নবকৃষ্ণবাবু সুলেখক; পুস্তকখানি তাঁহার লেখনীর যোগ্য হইয়াছে। 'শান্তি'র ভাষা ভাল, রুচি মার্জ্জিত এবং অসঙ্কোচে সকলের হাতে পড়িতে দেওয়া যায়। ছাপা, কাগজ এবং বাঁধাই ভাল। আমরা উপন্যাসপ্রিয় বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

লিখন।—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার। মূল্য ।৷৹ আনা। প্রকাশক—ষ্টুডেণ্টস লাইব্রেরী, ৬৭নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এখানি ছোট গল্পের বই। সর্ব্বশুদ্ধ নয়টী গল্প এই বইখানিতে আছে। পুস্তকের প্রথম গল্পটীর নাম—'লিখন'। মুখপাতের এই গল্পটীর নামেই এই পুস্তকের নামকরণ হইয়াছে। 'লিখন' গল্পটী সুন্দর। এই গল্পে গ্রন্থকার রাজপুতনার এক দরিদ্র ক্ষত্রিয় পরিবারের দারিদ্র্যের ছবি আঁকিয়াছেন। অঙ্কনে মুন্সিয়ানা ত আছেই, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পীর সহৃদয়তা ও সহানুভূতির পরিচয়ও পাওয়া যায়। এক দিকে এই দারিদ্র্যের চিত্র ও জীবিকার্জ্জনের জন্য দারুণ জীবন-সংগ্রাম, অপর দিকে রাজপুত নরপতির মহত্ত্ব ও করুণা। সে মহত্ত্ব পদগৌরবকে তুচ্ছ করিয়া, ধনের গর্ব্বকে পদদলিত করিয়া দরিদ্রের পরিচয় লইতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। দরিদ্রের পার্শ্বে সহৃদয় নরপতির এই চিত্র অঙ্কনেও লেখক কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। অপর কয়টী গল্পও আমাদের ভাল লাগিয়াছে; বিশেষ 'নতুন মা' নামক গল্পটী। ছোট গল্পরচনায় সুবোধ বাবুর বেশ হাত আছে। তাঁহার 'লিখন' পাঠক-সমাজে আদৃত হইবে, এমন ভরসা আমাদের আছে।

নূরজহান্‌।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৷৶৹ বার আনা। প্রাপ্তিস্থান, মিত্র এণ্ড কোম্পানী, কর্ণওয়ালিশ বিলডিংস্‌, কলিকাতা।

ঐতিহাসিক শ্রীযুত নিখিলনাথ রায় পুস্তকখানির 'ভূমিকা' লিখিয়া দিয়াছেন। 'ভূমিকা'-লেখক বলিতেছেন,—'মোগল-মহিষী অলোকসামান্যা নূরজহানের অপূর্ব্ব অভিনয়ের কথা ইতিহাস স্থানে স্থানে যাহা বলিয়াছে, তাহার একটা সম্পূর্ণ চিত্র ফুটাইয়া তুলিতে পারিলে যে মনোরম হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। ব্রজেন্দ্রনাথ তাহারই চেষ্টা করিয়াছেন।' সুখের বিষয়, ব্রজেন্দ্রনাথের এ চেষ্টা সফল হইয়াছে। 'নূরজহানে'র জীবন-চরিত তিনি ইতিহাস-সম্মত করিয়াই রচনা করিয়াছেন। এ ব্যাপারে তিনি অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন, সত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতেও প্রয়াসী হইয়াছেন। আমরা 'নূরজহান' পাঠ করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি। ব্রজেন্দ্রনাথের সাধনা আছে; 'নূরজহানে' তাহার পরিচয় পরিস্ফুট। পুস্তকখানির ভাষা প্রাঞ্জল, লিখনভঙ্গী ভাল, ছাপা-কাগজও প্রশংসনীয়। আশা করি, শীঘ্রই আমরা 'নূরজহানে'র দ্বিতীয় সংস্করণ দেখিতে পাইব।

সাহিত্য সমালোচনার বৈজ্ঞানিক ভূমি।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়]

প্রশ্ন এই যে, সাহিত্য-সমালোচনা বৈজ্ঞানিক ভূমিতে অবস্থিত কি না, অবস্থিতি করিতে পারে কি না? সমালোচনা সাধারণকল্পে জ্ঞান-বিজ্ঞান-মাত্রেরই মূল; যাহা জ্ঞান-বিজ্ঞানমাত্রেরই মূল অর্থাৎ যদ্দ্বারা জ্ঞান বিকাশ-প্রাপ্ত হয় এবং শৃঙ্খলা-শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বিজ্ঞাননামে অভিহিত হয়, তাহা সেই মূল পদার্থ এবং সম্যকরূপে 'বিজ্ঞান' পদবী লাভের উপযুক্ত, এ কথা বলাই বাহুল্য। বিজ্ঞানের জনয়িতা যদি বিজ্ঞান নয়, তবে কি? আর বিজ্ঞানই বা কি? বিজ্ঞান কি তবে অবিজ্ঞানমূলক? যদ্দ্বারা নিয়মমাত্রই নিয়মিত ও উৎপাদিত তাহা অনিয়ম দ্বারা চালিত, এ কথা বাতুলের ভিন্ন আর কাহার? অতএব সমালোচনাকে সাধারণতঃ বিজ্ঞান কেন, বিজ্ঞানের বিজ্ঞান বলা যাইতে পারে।

পরন্তু সাহিত্য-সমালোচনা প্রামাণিক অবস্থা হইতে বৈজ্ঞানিক ভূমি

অবলম্বন পূর্ব্বক বহুকালাবধি চলিয়া আসিতেছে, ভাষা ও সাহিত্যকে পরিপক্ক ও পূর্ণ করিয়াছে। ভাষা ও সাহিত্য-সমালোচনার সেই দৃঢ় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর অদ্যাবধি অচল অটলভাবে দণ্ডায়মান আছে ; সম্ভবতঃ চিরকালই থাকিবে। অতএব সাহিত্য-সমালোচনা সম্যক্‌রূপে বৈজ্ঞানিক বা বিজ্ঞানমূলক ইহাও আর বাহুল্যরূপে বলিতে হইবে না।

তবে কথাটা হইতেছে কেবল ইদানীন্তন কালের শিল্পসাহিত্যাদি সমালোচনা-সম্বন্ধে। প্রশ্ন এই যে, আধুনিক কালের উক্তবিধ সাহিত্য-শিল্পাদি-সমালোচনা বিজ্ঞানভিত্তিমূলক কি না এবং হইতে পারে কি না ?

এই প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি এবং সে আপত্তির যুক্তিতর্কনিচয় উপস্থিত করিয়া তবে তাহার বিচার করা প্রয়োজন। অগ্রে তাহাই করা যাউক।

পূর্ব্বপক্ষের কথার সারমর্ম্ম সংক্ষেপতঃ এই যে, সমালোচনা বিজ্ঞান নহে, উহা শিল্প। উহা বিজ্ঞান নয় কেন সে বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষের প্রথম তর্ক এই যে, আধুনিক সমালোচনা সম্পাদনার্থে কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী প্রস্তুত করা যাইতে পারে না। প্রস্তুত করিলেও তাহা খাটে না, টিকে না। টিকিবে যে তাহা সম্ভাবিত নয়। সপ্তদশ শতাব্দীর নিয়ম অষ্টাদশে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর নিয়ম উনবিংশ শতাব্দীতে নাই। রুচি-পরিবর্ত্তনের প্রত্যেক বায়ুর প্রবাহে সমালোচনার আদর্শ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। সে নিয়ম ক্রমাগত এমন পরিবর্ত্তনশীল ও এত অচিরস্থায়ী তাহাকে বৈজ্ঞানিক নিয়ম বলিতে পারি না এবং একই নিয়মে যাহা নিয়মিত ও পরিচালিত না হয়, তাহা বিজ্ঞান-পদের বাচ্য হইতে পারে না।

দ্বিতীয় তর্ক, ইহা প্রথমেরই অন্যতম অংশ ; তাহা এই যে কাব্যশাস্ত্র আর আর শিল্প-বিদ্যার ন্যায় কল্পনা-কল্পিত, কল্পনা দ্বারা সৃষ্ট ও পরিপুষ্ট। উহা দৃশ্যের বা চিন্তার বা ভাবের কাল্পনিক চিত্র—হৃদয়ের আবেগ ও উচ্ছ্বাসের আলেখ্য। অতএব কোনও নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলী দ্বারা উহা পরিমিত বা সমালোচিত হইতে পারে না। নিয়ম মাত্রই উহার অত্যন্ত অনুপযুক্ত পরিমাপক, কেন না কল্পনা কোনও নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলে না, অতএব সমালোচনার কোনও প্রণালীতে বিজ্ঞানে বাঁধা নিয়ম করা স্বভাবতঃই চলে না। করিলে তাহা অস্বাভাবিক হয়। সমালোচনাকে এত কাল নির্দ্দিষ্ট নিয়ম-নিবদ্ধ

করিয়া অস্বাভাবিক এবং অত্যন্ত বিদ্রূপকর বিজ্ঞান-পদবীতে রাখিবার চেষ্টা করিয়া বড়ই ভ্রম করা হইয়াছে।

তৃতীয় তর্কের সার সংগ্রহ এই যে, সমালোচনায় বিজ্ঞানবাদী বলেন যে, শিল্পের যদিও বিবিধ প্রণালী আছে, তথাচ সূক্ষ্ম শিল্পমাত্রেরই একই বিশ্বব্যাপক উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্য এক কথায় সুখ বা আনন্দ। বিজ্ঞানবাদীর মতে-সমালোচকের কর্ত্তব্য এই সুখের, তাহার ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক গতি প্রকৃতির বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা। পরীক্ষা দ্বারা মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্যের পরিমাণ করিয়া গ্রন্থের গুণাগুণ বিচার করা। যে সমালোচনা বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন না করে, তাহা প্রকৃত সমালোচনই নহে। শিল্পবাদীর মতে বিজ্ঞানবাদীর প্রাগুক্ত যুক্তি অত্যন্ত হাস্যজনক। সূক্ষ্ম শিল্পমাত্রেরই উদ্দেশ্য মানসিক সুখ, এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। সত্য বলিয়াই সমালোচনা বৈজ্ঞানিক সূত্রবদ্ধ হইতে পারে না। বিজ্ঞান কেবল সেই পদার্থে প্রযোজ্য যাহা অনতিপরিবর্ত্তনশীল বা অপরিবর্ত্তনীয়, যাহা নির্দ্দিষ্ট, পরিমাপ্য ও স্থির। পদার্থের এই সকল স্বরূপের, সম্বন্ধের বৈজ্ঞানিক নিয়ম একবার আবিষ্কৃত হইলে তাহার আর পরিবর্ত্তন হয় না, তাহা প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই সমভাবে সর্ব্বত্র প্রয়োগ করিতে পারে। কিন্তু এই যে মানসিক সুখের বা আনন্দের কথা বলিতেছি. ইহা অপরিবর্ত্তনীয়ও নয়, নির্দ্দিষ্টও নয়, অপরিমাপ্যও নয়; আবার অপর পক্ষে উহা অনির্দ্দিষ্ট, অপরিমাপ্য ও অত্যন্ত চঞ্চল। উহার আকার নাই, নাম নাই। মনোবিজ্ঞান বহু পরিশ্রমে উহাকে আধ্যাত্মিক সূত্রে আবদ্ধ করিলেও উহার প্রত্যেক অনুভূতি প্রতি আবেগই অনির্ব্বচনীয়, যাহা কেবল ইঙ্গিতেই প্রকাশিত হইতে পারে, কোনও ক্রমে সংজ্ঞায় বা সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু উহা স্বপ্নবৎ মরীচিকাবৎ বিদ্যুৎবৎ। দ্রুতগণনা করিয়া হিসাব-নিকাসের অঙ্কের দ্বারা উহাকে ধৃত করা যায় না। কালিদাসের কবিতা পড়িয়া, কুমুদিনীর কোমল কণ্ঠ শুনিয়া, রাফেলের চিত্র দেখিয়া মনে যে আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহার হিসাব দিয়া কে উঠিতে পারেন? পক্ষান্তরে হরিদ্রা ও চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিলে রক্তবর্ণ হয়, তাহার বৈজ্ঞানিক বিবরণ বালকেও বিবৃত করিতে পারে। সমালোচনা যদি বিজ্ঞান হইত ও বিজ্ঞানবৎ শিক্ষণীয় হইত, তাহা হইলে রসায়নাদি শাস্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞান-বিদ্যালয়ে বক্তৃতা শুনিয়া বা শিক্ষানবিশী করিয়া লোকে সমালোচক হইয়া উঠিতে পারিত।

বঙ্কিম বাবুর কবিতাময় গদ্য, মধুসূদনের স-সার কবিতা, হেমচন্দ্রের গগনভেদী

ঝঙ্কার, রবীন্দ্রনাথের সরবৎ-সঙ্গীত কিরূপে অনুভবনীয়, তাহা কি সূত্র করিয়া-মন্ত্র পড়াইয়া কাহাকেও শিখাইয়া দেওয়া যায়? ইহা ত আর স্কুলপাঠ্যের সাদৃশ্য পার্থক্য নয় যে, শিক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে? ভাবস্রোতের মৃদু-চঞ্চল স্ফুট-অর্দ্ধস্ফুট লীলালহরী আবেগ-আকাঙ্ক্ষার অস্পষ্ট-প্রচ্ছন্ন অসংখ্য ক্ষুদ্র-বৃহৎ শ্বাসপ্রশ্বাস যাহা সিন্ধু-সৈকতে বালুকণার ন্যায় সুকুমার সাহিত্যে নিক্ষিপ্ত, তাহা কি বিজ্ঞানসূত্রে সমালোচনা করা যায়? পরন্তু বৈজ্ঞানিক, প্রণালী-শ্রেণী নির্ব্বাচন করেন। এখন বল দেখি, শিল্পসম্ভোগজনিত মানসিক আনন্দের কিরূপ শ্রেণীনির্ব্বাচন করা যায়? কালিদাসের কবিতায় এক আনন্দ, ভবভূতিতে আর এক প্রকার, ভারবীতে ভিন্ন প্রকার,—এইরূপে আনন্দের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বৈজ্ঞানিক টিকিট আঁটিয়া দিয়া কি তাহার ভাগবিভাগ করিবে? তাহা করা কি সম্ভব, আর সম্ভব হইলেও কি সত্য ও সভ্যতা-অনুমোদিত?

শিল্পবাদী নবপ্রণালীর সমালোচনার বিশিষ্টরূপে সমর্থন করিয়া বলেন যে, উহার আবির্ভাবে সমালোচনা শিল্পে পরিণত হইয়াছে এবং ঐ প্রণালীর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনার খাঁটি বিজ্ঞানত্ব লোপ হইতেছে। বিজ্ঞানবাদীর সহিত শিল্পবাদীর উপরি উক্ত তর্কযুদ্ধে আমরা প্রবেশ করিব না, কার্য্য-অনুরোধে কথা কহিতে হইলেও ইহাদের কোনও পক্ষের সহিত আমরা আপনাদিগকে চিহ্নিত করিব না। মোটের উপর আমাদের বক্তব্য বিবৃত করিয়া ইহাদের নিকট হইতে বিদায় লইব। শিল্পবাদীর অনেক কথা যথার্থ এবং অনেক কথা অযথার্থ। যেগুলি যথার্থ, তাহা হৃদয়গ্রাহী; যেগুলি অযথার্থ, তাহা কূট তর্কের যুক্তি-তুফানযুক্ত হইলেও অযথার্থ। তুঁষ হইতে তণ্ডুল চিনিয়া লইতে আমাদের পাঠকগণ পারিবেন, অতএব শিল্পবাদীর বিস্তারিত বিশ্লেষণ আমরা করিব না। বিজ্ঞানবাদীও নিজ পক্ষ সমর্থনার্থে তর্ক তুলিয়া শিল্পবাদীর সহিত সজোরে সম্মুখ সংগ্রাম করিতে পারেন। যেখানে সংগ্রাম, সেইখানেই সত্য ও সামঞ্জস্যের অভাব অশান্তি, অসিদ্ধান্ত; তর্কতরঙ্গে তুফান উঠে, তাহাতে তৈল নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। এত কথার মধ্যে যেটা উচিত কথা, সেটা কিন্তু এক কথাতেই বলা যাইতে পারে। ফল কথা এই যে, সে দেশেই হউক আর এ দেশেই হউক, আধুনিক সমালোচনা-প্রণালীর এখনও খুব শৈশব অবস্থা। আজও ইহার অস্তিত্ব পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। ইহা এতাবৎকাল ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবৃত্তি-অনুসারে আপন অবয়ব গঠন করিতেছে দেখা যায় না। যিনি বিজ্ঞানের পক্ষপাতী, তিনি ইহাকে বৈজ্ঞানিক

গঠন প্রদান করেন, কেহ বা ইহাকে সূক্ষ্ম শিল্পে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন। উপযুক্ত হস্তপরিচালিত হইলে, ইহা উভয় স্বরূপেই উপাদেয় হয়। এখনকার অবস্থা এই। ফলতঃ ইহার শৈশব, অপরিপক্ক অবস্থা ; অতএব এখনও ইহার ফলাফল গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত মত প্রকাশ হইবার সময় উপস্থিত হয় নাই। ইহার বিশেষত্ব সম্বন্ধে মত দিতে হইলে তাহার বিকাশ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয়, তাহার পরিপক্ক অবস্থা দেখিতে হয়, নতুবা কোনও মত টিকে না। শিল্পেরই হউক, সাহিত্যেরই হউক, আর॰ বিজ্ঞানেরই হউক, কোনও একটা প্রণালী সুপরিপক্ক হইয়া স্থায়িভাব ধারণ করিতে বহুকাল লাগে। সেই কালের মধ্য দিয়া অনেক গঠন-পরিবর্ত্তন পার হইয়া তাহার চলিতে হয়। একবার ভাঙ্গে, একবার গড়ে, আবার ভাঙ্গে, পুনরায় গঠিত হয়, ইহাই স্বাভাবিক নিয়ম। আধুনিক কালের সমালোচনা এই স্বাভাবিক নিয়মেই চলিয়াছে, ইহার ভাঙ্গাগড়া শেষ হইবার অবশ্য এখনও অনেক বিলম্ব আছে। অতএব অগ্রেই ইহার সম্বন্ধে কিরূপে মত প্রকাশ করা যাইতে পারে? তবে শিল্পবাদী যে সমালোচনাকে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হইতে একবারে বিচ্যুত করিতে চাহেন, তাহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি একেবারে উঠাইয়া দেন, সে কেবল তাহার চিত্ত-চাপল্য। এ সম্বন্ধে তাঁহার যেসকল যুক্তি তাহা বিজ্ঞজন-অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয় না। সমালোচনায় এক সময়ের নিয়মাবলী অন্য সময়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং হইয়া থাকে, অতএব শিল্পবাদীর মতে সমালোচনা বিজ্ঞানমূলক হইতে পারে না। ইহা আশ্চর্য্য যুক্তি। বিশেষতঃ যখন পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-শিষ্য এ কথা বলিতেছেন, ইহা অধিকতর আশ্চর্য্য। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান নিজে কি পরিবর্ত্তনশীল নহে? এক সময়ের বৈজ্ঞানিক নিয়ম অন্য সময়ে পরিবর্ত্তন হয় নাই, হইতেছে না? ধ্রুব-ফলপ্রদ গণিত, বিজ্ঞানমূলক শাস্ত্র জড়বিজ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় নব আবিষ্কারের আবির্ভাব এবং আরও অন্যান্য অনেক কারণে নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যাইয়া থাকে, তাহা বলিয়া কি বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞানত্ব লোপ হয়? যদি না হয়, তবে সমালোচনার নিয়মাবলী পরিবর্ত্তন হয় বলিয়া তাহাকে বিজ্ঞান-ভূমি পরিত্যাগ করিতে হইবে কেন?

শিল্পবাদীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় তর্ক এই যে, কাব্যাদি কল্পনামূলক ; অতএব তৎজাতীয় বিষয়ের সমালোচনা বিজ্ঞানমূলক হইতে পারে না, যেহেতু সেই পদার্থই কেবল বিজ্ঞানের বিচার্য্য যাহা নিশ্চিত, নির্দ্দিষ্ট এবং পরিমাপ্য অর্থাৎ কি না মাংস, মেঠাই, রুটী, তরকারী, চা, চিনি, টাকা, পয়সা, কোর্ট, কোর্ত্তা ইত্যাদি স্থূল বস্তুই কেবল বিজ্ঞানের বিচার্য্য। তদ্ভিন্ন যাহা কিছু সূক্ষ্ম, তাহাতে বিজ্ঞানের কোনও অধিকার নাই। জড়বাদীর মুখে বিজ্ঞানের এই ব্যাখ্যা বিস্ময়কর নহে।

সংগ্রহ।

কমলাকান্তের কথা।

রথযাত্রা।

রথযাত্রা—মহাধুম। নসীরাম বাবুর পৌত্র শ্রীমান্ ছোট খোকা একখানি টিনের রথে এক চিত্রবিচিত্র জগন্নাথ চড়াইয়া ও ঠাকুরঘর হইতে বিস্তর পূজা-করা ফুলপত্র প্রভৃতি আনিয়া সাজাইয়া একগাছি লাল ফিতা সহযোগে হিড়্ হিড়্ করিয়া টান মারিতেছে। সঙ্গে বহুতর ক্ষুদে ভক্তের দল। কেহ ভেঁপু বাজাইতেছে, কেহ কাঁসরে ঘা মারিতেছে, কেহ বা অন্য কোনও বাদ্য-যন্ত্রের অভাবে ছোট ছোট গালগুলি ফুলাইয়া শঙ্খের অনুরূপ একপ্রকার শব্দ করিতেছে। পথিমধ্যে আমার পা দু'খানি লম্বাভাবে বিস্তৃত ছিল। সুতরাং টানিতে টানিতে খোকাবাবু হাঁকিয়া বলিলেন 'হেঁইও, পা সরিয়ে লও, নইলে রথে কাটা পড়িবে।' আমি তখন কি জানি কেন মরিয়া হইয়া গিয়াছি; পাটা আর সরাইলাম না। অতএব তাহাতে ধাক্কা খাইয়া খোকা বাবুর সাধের রথ, তাহার জগন্নাথ, ফুলপত্র ও ছেঁড়া কাগজের পতাকা-সমেত একেবারে ভূমিসাৎ হইল!

হরি, হরি, এই তোমার রথের ক্ষমতা! ভাবিলাম কালের কি আশ্চর্য্য গতি! যে রথ এককালে মহা মহাবীরের যুদ্ধ করিবার শ্রেষ্ঠ আসন ছিল, যে রথের ঘর্ঘর-শব্দে সুদূর সমরাঙ্গন প্রতিধ্বনিত হইতে থাকিত, যে রথের চক্রপেষণে অতিকায় মহাগজও ভূমির সহিত সমতল হইয়া যাইত, সেই রথ এখন এ যুগে বালকদিগের খেলিবার জিনিষ হইয়াছে! এই নিবীর্য্য জাতির মধ্যে রথ দেখিলে এখন আর সমরস্পৃহা জাগিয়া উঠে না; শুধু টানিবারই ইচ্ছা হয়। এখানে রথী নাই, সকলেই সারথি! গাড়োয়ানের প্রবৃত্তিই সমস্ত দেশকে ছাইয়া রাখিয়াছে! তাহাই যদি না হইবে, তাহা হইলে নয় শত বাঙ্গালী সৈনিক গড়িতে এই নয় মাসেরও অধিক সময় লাগিবে কেন? রাজার আহ্বানে রাজভক্ত জাতির এই শৈথিল্য কিসের জন্য? রথ দেখিয়া অনেক পুরাতন কথাই মনে পড়িতেছে। এই রথে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। আর আজ তোমার এই হস্তপদরহিত কি জড়মূর্ত্তি ঠাকুর! রথ তো অনেক দেখিতেছি—ট্রামরথে বাঙ্গালী চাকুরে বাবু মাহিনার অর্দ্ধেকের উপর খরচ করিতেছেন; মোটর-রথে সৌখীন বাবু বৈকালে ও রাত্রি বারোটা অবধি হাওয়া খাইয়া বেড়াইতেছেন; ছ্যাকড়া রথেও হেঁজিপেঁজি—মাসের মধ্যে এক দিনের বাবু এ পাড়া ও পাড়া গমনাগমন করিতেছেন; কিন্তু তোমার সেই বিদ্যুন্মণ্ডিত, শত্রুহৃদয়ে ভয়সঞ্চারী, মনুষ্যত্বের পীঠস্থান আসল রথ কোথায় ঠাকুর?

রথীও তো অনেক দেখিলাম। নাট্যরথী, কাব্যরথী, সাহিত্যরথী আর সকলের চেয়ে ভীষণ বাক্য-রথীতে দেশ ভরিয়া গিয়াছে! পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে না শিখিয়াই এদেশে সকলেই রথী মহারথী হইয়া পড়ে! সে সকল 'রোতো' রথী দেখিয়া সাধ মিটিয়া গিয়াছে! এখন একবার তোমার সেই জ্ঞানগরিমাভূষিত, কায়মনোবাক্যে এক, আত্মনির্ভরশীল কর্ম্মরথীকে দেখাও দেখি; তাহা হইলে বুঝিব তোমার ঐ নুলো হাতের মধ্যেও এখনও শক্তি নিহিত আছে: এ জাতির প্রতি এখনও তোমার দৃষ্টি সুপ্রসন্ন।

মনে পড়ে, কুরুক্ষেত্রে এই রথে চড়িয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইয়াছিলে। এখনও নানান্ দিকে নানান্ আওয়াজ শুনিতে পাইতেছি। কেহ বাজারে আসিয়া নিজের ঢাক নিজেই বাজাইতেছে, কেহ প্রাণপণে শিঙ্গায় ফুঁ দিতেছে, কেহ বা শুধু গলাবাজী করিয়াই শত্রুর মনে ভয়ের উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিতেছে। ঐ দেখ এক ব্যক্তি রাস্তার মাঝখানে মুখ ভেঙ্গাইয়া, ডিগবাজী খাইয়া, বগল বাজাইয়া পরের কাছে বাহাদুরী লইতেছে। দোহাই ঠাকুর একবার তোমার ঐ পাঞ্চজন্য শঙ্খটী বাজাও। এই কিচিরমিচির কোলাহল তোমার জলদমন্দ্রে ডুবাইয়া দিয়া একবার বজ্র-নির্ঘোষে বল—"উঠ, জাগ, নয় তো একেবারে রসাতলে যাও—ইহার মধ্যপথ আর কিছু নাই।" তবেই তোমার রথযাত্রা সার্থক বুঝিব; আর তোমায় শুধু সং বলিয়া ধারণা হইবে না।*

পূজা।

[শ্রীঅবনীকুমার দে।]

অশ্রু মম নিরমল পূত গঙ্গোদক,
পূজারী তোমার আমি ভক্ত উপাসক।
অন্তরের গন্ধপুষ্প করিয়া চয়ন,
সাজাব তোমার প্রিয়! রাতুল চরণ।
মানস-চন্দন মাখি ভক্তি-বিল্বদলে,
অর্পিব অঞ্জলি আজি তব পদতলে।
হৃদয়ের প্রতি স্পন্দে উঠে শঙ্খরোল,
কল্যাণ-কামনা-রাজি—জলিবে গুগ্‌গুল।
চতুর্ব্বর্গ ফলে শুভ নৈবেদ্য রচিয়া,
তোমার আসন-নিম্নে দিব সমর্পিয়া।
বাঁধি আনি ছয় রিপু দিব বলিদান,
বিবেকের যূপকাষ্ঠে তব সন্নিধান।
প্রপঞ্চের মহাযজ্ঞ জ্বালি তার পর
করিব তোমার পূজা হে মহাসুন্দর!

* "বাঙ্গালী"।

প্রাচ্যমতে ক্রমবিকাশের একটী লক্ষণ।

[শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্-এ]

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ মস্তিষ্কের বিশেষ পরিণতিকে উচ্চবিকাশের প্রধান পরিমাপক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচ্যে এরূপ কোনও সুনির্দ্দিষ্ট পরিমাপকের বিষয় জানা যায় না বটে, কিন্তু জন্তুদিগের নামকরণে এরূপ ইঙ্গিতই রহিয়াছে যে, তাহা হইতে ক্রমবিকাশের একটী সুন্দর লক্ষণই নিরূপিত হইতে পারে।

আমরা জানি যে, জন্তুদিগের মধ্যে বানরজাতীয় জন্তুই মনুষ্যবিকাশের বিশেষ নিকটবর্ত্তী। 'বানর' নামের অর্থবিচার করিলেও 'নরসদৃশ' এইরূপ ব্যুৎপত্তিই লব্ধ হয়। বানরজাতির মধ্যে এক শ্রেণীর বানর আছে, তাহার নাম "হনুমান্"। "হনুমান্" শব্দের ব্যাকরণসম্মত অর্থ 'অতিশয় হনুযুক্ত'। অতিশয় শব্দে এখানে দীর্ঘ অর্থই বুঝায়। সুতরাং হনুমান্ শব্দের অর্থ দীর্ঘ বা লম্বা হনুবিশিষ্টই হইতেছে। হনুমান্‌দিগের দীর্ঘ হনু এবং মনুষ্যদিগের হ্রস্ব হনু দেখিয়া আমরা হনুর দীর্ঘত্ব যে অপেক্ষাকৃত নিম্নবিকাশের লক্ষণ এবং হনুর হ্রস্বত্ব যে অপেক্ষাকৃত উচ্চবিকাশের লক্ষণ, তাহাই সহজেই উপলব্ধি করিতে পারি। এই প্রকার পাশ্চাত্য মতে যে স্থলে মস্তিষ্কের বৃহদায়তন উচ্চবিকাশের নির্দ্দেশক হয়, তৎস্থলে প্রাচ্যমতে হনুর হ্রস্বায়তন উচ্চবিকাশের নির্দ্দেশক হইতেছে।

'হনু' কেবল যে বানরাদি জাতির নিম্নবিকাশের চিহ্নরূপেই প্রাচ্যদিগের দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু মনুষ্যজাতির মধ্যে নিম্নবিকাশের চিহ্নরূপেও নির্ণীত হইয়াছে। পুরাণাদিতে যে রাক্ষসাদি জাতির উল্লেখ পাওয়া যায় ইহারা যে আদিম অসভ্য অনার্য্য জাতি,—তাহাদের বর্ণনা পাঠ করিলে তাহা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। ইহাদিগের এক নাম অভিধানে "হনূষ" দেখিতে পাওয়া যায়। 'হনু' ও 'হনূ' একই শব্দ। 'হনূষ' শব্দের 'ষ' প্রত্যয়টী 'হনুমৎ' শব্দের 'মতুপ' প্রত্যয়েরই ন্যায় মত্বর্থীয় প্রত্যয় বলিয়াই

বোধ হয়। সুতরাং 'হনূষ' শব্দের অর্থও "অতিশয় হনুযুক্ত"ই হয়। ইহা হইতে সভ্যতার নিম্নস্তরে অবস্থিত রাক্ষসাদি জাতিরও যে বানরাদিরই ন্যায় দীর্ঘ হনূ ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। রাক্ষস ও বানরাদির সাধারণ নামে "হনূ" বিশেষ চিহ্নরূপে গৃহীত হওয়ায় রাক্ষসগণ যে বিকাশে বানরদিগেরই অতি নিকটবর্ত্তী ছিল তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। কেবল রাক্ষসদিগের দীর্ঘ হনুই বানরের ন্যায় ছিল তাহা নহে, কিন্তু পুরাকালে এমনও অনুন্নত অসভ্য জাতি ছিল যাহাদিগের হনূ ও অন্যান্য শরীরাবয়বে বানরজাতির সহিত সবিশেষ সাদৃশ্য ছিল। রামায়ণে বর্ণিত বানরজাতি উক্তরূপ অসভ্যজাতি বলিয়াই আমাদিগের নিকট বোধ হয়।

অসভ্য নিগ্রোজাতির মধ্যে এখনও যে দীর্ঘহনূ বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়, তাহাতে দীর্ঘহনূ যে নিম্নবিকাশেরই সহিত সংযুক্ত তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণই পাওয়া যায়।

'হনুমান্' নামের দ্বারা কেবল 'হনুমান্' জাতীয় বানরেরই দীর্ঘহনু আছে ইহা যেন আমরা মনে না করি, বানর জাতীয় সকল পশুরই দীর্ঘ হনূ আছে। এস্থলে আমরা গরিলা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের একটী মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি; তাহা হইতেই আমাদের উক্তির যাথার্থ্য প্রতীয়মান হইবে :—

"Gorilla—The jaws and lower parts of the face project very much."—Beeton's Universal Information.

দীর্ঘহনূকে যখন আমরা মনুষ্য অপেক্ষা নিম্নস্তরস্থিত বানরজাতির বিশেষ চিহ্ন বলিয়া প্রতিপাদিত করিয়াছি, তখন ইহা যে বানর অপেক্ষাও নিম্নস্তরের পশুদিগেরও বিশেষ চিহ্ন হইবে তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। ইংরেজীতে পশুদিগের লম্বহনুযুক্ত মুখের যে muzzle নাম পাওয়া যায় তাহাতে আমাদের অনুমানের যথেষ্ট সমর্থনই হয়।

রাক্ষস ও বন্য অসভ্য জাতির যেমন বানরাদি জাতির ন্যায় মুখাকৃতি ছিল বলিয়া আমরা জানিতে পারিয়াছি, তেমনই কোনও কোনও আর্য্যেতর জাতির অশ্বাদি পশুর ন্যায় মুখাকৃতি ছিল বলিয়াও আমরা জানিতে পারি। 'কিন্নর' বা 'কিম্পুরুষ' জাতি অশ্বমুখ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। মহিষাসুর আমাদিগের নিকট মহিষের ন্যায় মুখবিশিষ্ট অসুর বলিয়াই বোধ হয়।

আর্য্যগণ দীর্ঘহনুকে যে কুৎসিৎ অবয়ব বলিয়া মনে করিতেন, তাহা কিন্নর ও কিম্পুরুষ নামের কুৎসিৎ অর্থ হইতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

ইহা হইতে আরও প্রতীয়মান হয় যে, আর্য্যদিগের নিজেদের কখনও দীর্ঘ-হনু ছিল না। এইরূপে দীর্ঘহনুর প্রতি নিন্দা প্রকটনপূর্ব্বক আর্য্যগণ প্রকারান্তরে কেবল আপনাদের হ্রস্বহনুত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন তাহা নহে, পরন্তু ইহা যে উচ্চবিকাশেরই বিশিষ্ট লক্ষণ তাহাও প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য প্রাকৃতিক ইতিহাসে ক্রমবিকাশের যে ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিবিষ্টভাবে পাঠ করিলে তাহাতেও হনুর গঠন-খর্ব্বতাই যে বিকাশ-প্রকর্ষের পরিমাপক তাহার স্পষ্টই আভাসই পাওয়া যায়। এক্ষণে আমরা সেই ইতিহাসের বিবরণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব। প্রথমে আমরা যাবাদ্বীপে যে নরবৎ বানরের কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে হনু দীর্ঘাকার হইতে কিরূপ মধ্যমাকার প্রাপ্ত হইয়াছে,—তাহাই দেখিতে পাইব।

"The teeth indicate a jaw-formation equally intermediate."
—The Evolution of mind by MacCabe. Page 260.

"দন্তসকল তুল্যরূপ মধ্যম-গঠন চোয়ালেরই আভাস প্রদান করে।"

এক্ষণে আমরা প্রাচীন নরকঙ্কালের বর্ণনা হইতে কিরূপে মানবের ক্রম-বিকাশের সহিত হনুর বিকাশ হ্রস্বতা প্রাপ্ত হইয়া গঠনের উৎকর্ষ হইয়াছে তাহাই দেখিতে পাইব।

"I need only observe that this long series of human skulls and jaws, spreading over a vast number—probably hundreds of thousands of years, show a slow progressive evolution of human intelligence. The prognasthism is gradually modified, the heavy frontal ridges diminish, the facial index and the cranial capacity continually arise. Ibid p 262.

"আমি কেবল ইহাই মন্তব্য করা আবশ্যক মনে করি যে, মনুষ্য-করোটি ও হনুর এই দীর্ঘপরম্পরা বিপুলসংখ্যকবর্ষ—সম্ভবতঃ লক্ষ লক্ষ বর্ষব্যাপী হইয়া মনুষ্য-বুদ্ধির ধীর ক্রমবিকাশ প্রদর্শন করে। লম্বমান হনু ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ভারী উচ্চ ললাটাস্থি ক্ষয়িত হইয়াছে, মুখভঙ্গী ও মস্তকের পরিমাণ ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাইয়াছে।"

উপসংহারে দীর্ঘহনুত্ব কিরূপে নিম্নবিকাশের পরিচিহ্ন হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে

কিঞ্চিৎ মন্তব্য করিয়াই আমরা আমাদের বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করিব। জীবের পক্ষে প্রথম অবস্থায় মুখের দ্বারাই হস্তাদির কার্য্য করিতে হয় বলিয়া মুখ লম্বা হওয়ার আবশ্যকতা হয়। মৎস্য ও পক্ষীর ঠোঁট, সরীসৃপাদির মুখ এইরূপেই লম্বা হইয়াছে। পশুদিগের মধ্যেও আহার্য্য ধৃত করা, কর্ত্তন করা, ছেদন করা, পেষণ করা প্রভৃতি মুখের দ্বারাই করিতে হয়, তাহাতেই ইহাদিগের মুখ দীর্ঘতা ও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। পশুদিগের মধ্যে মানবকল্প বানরজাতি হস্তের কিয়ৎপরিমাণে ব্যবহার করিতে পারে, তাহাতেই ইহাদের মুখ কিয়ৎপরিমাণে গোলাকার হইয়াছে; কিন্তু হনু মনুষ্যের অপেক্ষা অনেক দীর্ঘই রহিয়াছে। যে সকল জন্তুকে মুখ বাড়াইয়া আহার্য্য ধরিতে হয়, তৎসমস্তেরই মুখ বিশেষভাবে লম্বা দেখিতে পাওয়া যায়; অশ্ব, গো, মহিষ প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত। বিড়ালজাতীয় জন্তুদিগকে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক অগ্রপাদের দ্বারা শিকার ধৃত করতঃ তৎপর আহার করিতে হয় বলিয়া ইহাদিগের মুখ লম্বা না হইয়া বরঞ্চ গোলাকারই হইয়াছে। কিন্তু ইহাদিগের হাঁ অপর জন্তু অপেক্ষা বড় বলিয়া ইহাদের মুখ মোটের উপর বড়ই রহিয়াছে। লম্বামুখ জন্তুর তুলনায় ইহারা অধিক চতুর। সুতরাং ইহারা বিকাশে গো অশ্ব অপেক্ষা অধিক অগ্রবর্ত্তী তাহাই বুঝিতে পারা যায়।

মনুষ্য হস্তের দ্বারা ছেদন, কর্ত্তন, পেষণ এবং রন্ধনাদি করিয়া খাদ্য-দ্রব্য পূর্ব্বেই প্রস্তুত করিয়া লয় বলিয়া তাহাকে মুখের অতি কম পরিচালনই করিতে হওয়ায় তাহার মুখ যেমন গোলাকার হইয়াছে, তেমনই হনুও হ্রস্ব হইয়াছে। কিন্তু অসভ্য মনুষ্যগণ মধ্যে প্রাকৃতিক ভাবে আহার এখনও অধিক মাত্রায় প্রচলিত দেখা যায়। যে পরিমাণে ইহারা পূর্ব্বোক্তরূপে খাদ্য প্রস্তুত ও রন্ধন না করিয়া প্রাকৃতভাবে ভক্ষণ করে, সেই পরিমাণেই ইহাদের মুখাকৃতিতে হনুর দীর্ঘতা বেশী হইয়া ইহাদিগের নিম্নবিকাশের লক্ষণ প্রকাশ করে।

পরাজয়।

[শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

(১০)

নৌকাটা অনুকূল স্রোতের মুখে যখন তর্ তর্ বেগে চলিয়া যায়, তখন দাঁড়ী, মাঝি, আরোহী সকলেই নিশ্চিন্তচিত্তে দিব্য আরাম উপভোগ করিতে থাকে। কিন্তু এমনই সময় যদি বিপরীত দিক্ হইতে একটা অতর্কিত বানের ধাক্কা আসিয়া নৌকার মুখটাকে ঘুরাইয়া দেয়, তাহা হইলে সহসা বড় একটা গোলযোগ বাধিয়া যায়; মাঝি ছুটিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি হাল চাপিয়া ধরে, দাঁড়ীরা দাঁড় ধরিয়া টানাটানি করিতে থাকে, আরোহীরা নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে সহসা বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া ভয়ে কোলাহল করিয়া উঠে। আর নৌকাখানা পাকনার মুখে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতে থাকে।

মুরলী হাজরার শান্তিময় স্বচ্ছন্দ সংসারের মধ্যেও সহসা এমনই একটা গোলযোগ বাধিয়া গেল। সে গোলযোগে সকলেই যেন সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। নিস্তারিণী ব্যস্তসমস্ত ভাবে সংসারের হালটা চাপিয়া ধরিতে গেল, মুরলী, গণেশ দাঁড় খুঁজিতে লাগিল, মাতঙ্গিনী হতভম্ব হইয়া পড়িল, ছোট বৌ চুপ করিয়া রঙ্গ দেখিতে লাগিল। সকলেরই মনে একটা অস্বস্তি আসিল, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অস্বস্তি হইল গণেশের। সে অস্বস্তি গণেশ প্রকাশ করিতে পারিল না; শুধু বুকের ভিতর একটা নিদারুণ ব্যথা চাপিয়া সে গুমরিতে লাগিল। সংসারটা তাহার নিকট তিক্ত বিস্বাদ হইয়া উঠিল। এ তিক্ততা একজন দূর করিতে পারিত, কিন্তু সে তৎপরিবর্ত্তে দিনরাত হলাহল ঢালিতে লাগিল।

অপর সকলে যতটা ব্যস্ত হইল, নিস্তারিণী কিন্তু ততটা ব্যস্ত হইল না। সে যেন আপনার সব নিঃস্বার্থতাটুকু দিয়া এই বিপ্লবটাকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টিত হইল। মাতঙ্গিনী বলিল, "তুমি যতই কর বৌ, সংসার না ভেঙ্গে আর থাকে না।"

নিস্তারিণী রাগিয়া বলিল, "ভাঙ্গলেই হ'লো আর কি। ভাঙ্গতেও আমি, গড়তেও আমি; আমি যদি ঠিক থাকি, তবে ভাঙ্গে কে?"

মাতঙ্গিনী বলিল, "তোমাকে ভাঙ্গতে হবে না, যে ভাঙ্গবার সে ভাঙ্গবে।"

নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিল, "কে, ছোট বৌ ?"

মাতঙ্গিনী বলিল, "আমার অত নাম ক'রে দরকার কি! দেখতেই পাবে।"

মাতঙ্গিনীর উপর একটা ক্রুদ্ধ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া নিস্তারিণী তীব্রস্বরে বলিল, "দেখ ঠাকুরঝি, সত্যি কথা বলতে কি, তোমরা পাঁচ জনে বিষদৃষ্টিতে দেখে দেখেই মেয়েটাকে পর ক'রে দিলে। নইলে ঐ একরত্তি মেয়ে—ও জানে কি ?"

কথা শেষ করিয়াই নিস্তারিণী দ্রুতপদে চলিয়া গেল। মাতঙ্গিনী কাঁদ কাঁদ মুখে বসিয়া মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল, "হে বাবা হরি, হে মা কালি! আমি সব সইতে পারব, কিন্তু সংসারটা বজায় রেখো ঠাকুর।"

নিস্তারিণী গিয়া মহামায়াকে ধরিল। ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "হাঁ লা ছোট বৌ!"

ছোট বৌ তখন আরসি সম্মুখে রাখিয়া চুল বাঁধিতেছিল। সে বাঁ হাতে চুলের গোছা, ডান হাতে চিরুণীটা ধরিয়া উত্তর দিল, "কেন দিদি ?"

নিস্তারিণী বলিল, "তুই নাকি সংসার ভাঙ্গবি ?"

মহামায়া যেন হতভম্বভাবে দিদির মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ ভীত স্বরে বলিল, "আমি তো কিছুই ভাঙ্গি নাই দিদি, পাথরবাটীটা, সে তো বিশু কাল আছড়ে দিয়েছিল।"

নিস্তারিণীর হাসি আসিল; বলিল, "বাটী নয় লো ছুঁড়ি, সংসার; সংসার ভাঙ্গার কথা বলছি।"

যেন কিছুই জানে না এমনই ভাবে মহামায়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে আবার কি দিদি ?"

নিস্তারিণী হাসিয়া উঠিল; হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোর মাথা!" মনে মনে বলিল, "লোকের কথা দেখ। বলে কি না এই মেয়ে সংসার ভাঙ্গবে!"

নিস্তারিণী প্রফুল্লদৃষ্টিতে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুই নিজে যে চুল বাঁধিতে ব'সেছিস্ ?"

আরসীখানার উপর দৃষ্টি রাখিয়া মহামায়া বলিল, "তুমি বিশুকে ঘুম পাড়াচ্ছিলে; বেলাটাও যায়, তাই—"

"ভারী তো বেলা গেছে" বলিয়া নিস্তারিণী তাহার কাছে বসিয়া পড়িল, এবং মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলিল, "ওর নাম কি চুল বাঁধা হচ্চে ? এত বড় মেয়ে হ'লো, এখনো নিজের চুলটা বাঁধতেও শিখলে না। তোর হবে কি ? সরে আয়, চিরুণী দে।"

মহামায়ার হাত হইতে চিরুণীটা কাড়িয়া লইয়া নিস্তারিণী তাহার চুল আঁচড়াইতে বসিল। মৃদু হাসিয়া মহামায়া বলিল, "তুমি আর শিখতে কোথায় দাও দিদি ?"

নিস্তারিণীর স্বর পঞ্চমে চড়িয়া উঠিল; বাঁ হাতে চুলের গোছাটায় টান দিয়া রোষরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কি বল্লি, আমি তোকে শিখতে দিই না ? তুইও আমায় দুষবি ? আচ্ছা; এই রইল তোর চুল, বাঁধ তুই নিজে।"

চুলের গোছায় একটা হেঁচকা টান দিয়া চিরুণীটা ফেলিয়া নিস্তারিণী উঠিয়া দাঁড়াইল। মহামায়া যন্ত্রণাসূচক অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। নিস্তারিণী তাহাতে লক্ষ্য না করিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "আজ তোকে চুল বাঁধতেই হবে। কিন্তু যদি ভাল না হয়, তা হ'লে আজ তোরি এক দিন কি আমারি এক দিন।"

নিস্তারিণী গর্জ্জন করিতে করিতে জোরে জোরে পা ফেলিয়া চলিয়া গেল। মহামায়া দুই হাতে চোখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিল।

গণেশ স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া জামাটা খুলিতে খুলিতে স্ত্রীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অমন ভাবে ব'সে কেন ? কি হ'য়েছে ?"

মহামায়া আঁচলটা মাথায় তুলিয়া দিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। গণেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "হয়েছে কি ?"

এবার গণেশের স্বর অপেক্ষাকৃত চড়া। মহামায়া কিন্তু নীরব নিশ্চল। শুধু তাহার ঠোঁট দুইটা ফুলিয়া উঠিল। অসহিষ্ণুভাবে গণেশ বলিল, "মুখে কথা নাই যে ?"

মহামায়া এবার মুখ তুলিয়া তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল; অভিমানরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "কি কথা কইব আবার ? এক জনের কাছে কথা ক'য়ে মার খেয়েছি, আবার তোমার কাছে—"

মহামায়া আর বলিতে পারিল না, ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল! গণেশ জিজ্ঞাসা করিল, "মারলে কে ?"

ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে মহামায়া বলিল, "যে পারে। যার কাছে বাড়ীশুদ্ধ লোক জুজু।"

ক্রন্দনজড়িত হইলেও মহামায়ার স্বরে যথেষ্ট তীব্রতা ছিল। গণেশ রাগে চীৎকার করিয়া বলিল, "দেখ, এ সব আমার সহ্য হবে না। রোজ রোজ যদি এই রকম হয়—"

নিস্তারিণী অন্য ঘর হইতে ডাকিয়া বলিল, "কি হ'য়েছে রে গণেশ?"

তীব্র কণ্ঠে গণেশ বলিল, "আমার শ্রাদ্ধ।"

নিস্তারিণী বলিল, "তার পর?"

উত্তেজিত কণ্ঠে গণেশ বলিল, "তার পর রোজ রোজ যদি এমনতর হয়, তা হ'লে আমি এ বাড়ী-ছাড়া হব। এ সব কেলেঙ্কারী আমার সহ্য হবে না।"

চটী জুতাটা পায়ে দিয়া গণেশ বাহিরে চলিয়া গেল। নিস্তারিণী নিজের ঘরের দরজা চাপিয়া ধরিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

(১১)

সিদ্ধেশ্বর রায়ের বৈঠকখানায় বেশ একটা আড্ডা জমিত। সেখানে তামাক ও পরচর্চ্চার অভাব ছিল না, সুতরাং সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতে রাত্রি এক প্রহর পর্য্যন্ত লোকের কলরবে বৈঠকখানা মুখরিত হইতে থাকিত। হালদার মহাশয় হইতে বেন্দা হাড়ী পর্য্যন্ত ইতর ভদ্র অনেকেই উপস্থিত হইত, এবং তাম্রকূটধূমের সহিত পরচর্চ্চার মধুর আস্বাদ গ্রহণ দ্বারা সময় অতিবাহিত করিত। প্রায় প্রত্যেক পল্লীগ্রামেই এইরূপ এক একটী আড্ডা থাকে, এবং এই আড্ডা হইতে যে সকল মন্তব্য বাহির হয়, তাহা উচ্চ আদালতের রায় অপেক্ষা মূল্যবান্।

গণেশ চটীজুতাটা পায়ে দিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে আড্ডায় উপস্থিত হইল, তখনও সেখানে অধিক লোকের সমাগম হয় নাই, হালদার মহাশয় এবং নিকটবাসী দুই একজন মাত্র উপস্থিত হইয়াছিল। গণেশকে দেখিয়া হালদার মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "এসো বাবাজী, আজ এত সকাল যে? মুখখানা এত ভার কেন?"

গণেশ একপাশে আসন গ্রহণ করিয়া বিরক্তভাবে বলিল, "আর মশায়, সংসারে আর কিছু ভাল লাগে না। যেন জ্বালিয়ে তুলেছে।"

হালদার মহাশয় সহাস্যে বলিলেন, "ওহে বাপু, এই তো কলির সন্ধ্যা, এখনো অনেক বাকী।"

গণেশ বলিল, "দেখ্ছি, মেয়ে মানুষগুলাই সংসারের যত আপদ্। সংসার ভাঙ্গবার ওস্তাদ।"

নবীন মণ্ডলের হাত হইতে কলিকাটা লইতে লইতে হালদার মহাশয় বলিলেন, "তার আর দু'কথা আছে। তবে সব মেয়ে মানুষই যে সমান তা নয়। অনেকে আবার অন্যায় অত্যাচারের জ্বালায় সংসার ভাঙ্গে।"

গণেশ মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

তামাক টানিতে টানিতে হালদার মহাশয় বলিলেন, "হাঁ হে গণেশ, শুনছি নাকি—"

গণেশ হালদার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিল। হালদার মহাশয় বলিলেন, "শুনছি নাকি মুরলী শ পাঁচ ছয় টাকা দেনা দাঁড় করিয়েছে?"

গণেশ নতমুখে উত্তর করিল, "কি জানি।"

হাল। তুমি আর জান্‌বে কেমন ক'রে? তোমাকে যদি জানাবে তা হ'লে কি আর দেনা দাঁড়ায়?"

গণেশ বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টিতে হালদার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হালদার মহাশয় একবার কাসিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা দেনা দাঁড় করালেই কি হ'লো। ছোট ভাই, সরলপ্রকৃতি, সে না হয় কিছু জানলে না! কিন্তু পাঁচ জনে তো সবই জানে। আজ বিশ তিরিশ বছরের চল্‌তি দোকান।"

গণেশ বিস্ময়ে নির্ব্বাক্। হালদার মহাশয় কলিকাটা নবীনমণ্ডলের হাতে ফিরাইয়া দিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এটাও কি সম্ভব? কি বল হে মোড়লের পো!"

নবীন উত্তর করিল, "আজ্ঞে।"

হালদার মহাশয় তখন গণেশের দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "তোমার কিছু ভয় নাই বাবাজি, আমরা থাক্‌তে যে কেউ অধর্ম্ম ক'রে ঠকিয়ে নেবে, সেটী হচ্চে না।"

গণেশ ভ্রূকুটী করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। নবীন বলিলে, "উঠলে যে?"

"মাথাটা ধরেছে" বলিয়া গণেশ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। হালদার মহাশয় নবীনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ছোঁড়াটা নেহাৎ গোবেচারা!"

সেইদিন মুরলী দোকান হইতে ফিরিয়া নিস্তারিণীকে বলিল, "সব গেল বড় বৌ।"

নিস্তারিণী শিহরিয়া ভয়ে ভয়ে বলিল, "সে কি ?"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুরলী বলিল, "সাড়ে পাঁচ শো টাকা দেনা দাঁড়িয়েছে, মহাজন মাল দেওয়া বন্ধ করেছে।"

নিস্তারিণী শঙ্কাকুল দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মুরলী আকুল কণ্ঠে বলিল, "কি হবে বড় বৌ ?"

নিস্তারিণী আপনার শঙ্কিত ভাব গোপন করিয়া স্বামীকে আশ্বাস দিয়া বলিল, "ভয় কি! একেবারে কি সব টাকা দিতে হবে ?"

মুরলী বলিল, "আপাতত অর্দ্ধেক দিলেও চলে। কিন্তু তাই বা কোথায় পাই ?"

মুরলী মাথায় হাত দিয়া অধোমুখে বসিয়া রহিল। নিস্তারিণী বলিল, "অর্দ্ধেক দিলে যদি চলে তবে ভয় কি ? আমার গয়না, ছোট বোয়ের গয়না, এগুলো বেচলেও কি আড়াই শো হবে না ?"

মুরলী বলিল, "বেচতে হবে না, বাঁধা দিলেই হতে পারে। কিন্তু বড় বৌ !"

স্বামীর গভীর বেদনাপূর্ণ কণ্ঠস্বরে নিস্তারিণী চমকিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি স্বামীর হাত ধরিয়া কোমলকণ্ঠে বলিল, "ছিঃ, এত ব্যস্ত হচ্চো কেন ? গয়না গাঁটী কিসের তরে ? ঈশ্বর যদি দিন দেন, তবে আবার হ'তে ক'দিন লাগবে।"

পত্নীর শান্ত স্থির মুখের দিকে চাহিয়া মুরলী স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

পরদিন মহামায়া আসিয়া নিস্তারিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ দিদি, আমার গয়নাগুলো কোথায় ?"

মাতঙ্গিনী কাছে বসিয়াছিল ; সে বলিল, "কেন ?"

মহামায়া মুখ নীচু করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "তোমার ভাই বলছিল –"

বিরক্তভাবে মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছিল ?"

ভয়ে ভয়ে মহামায়া বলিল, "বলছিল, গয়নাগুলো যখন আছে, তখন বারোমাস বাক্সে তোলা কেন ?" ধমক দিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, "বাক্সে তোলা থাকবে না তো কি হবে ?"

মহামায়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আঁচলের খুঁটে পাক দিতে লাগিল। নিস্তারিণী সহাস্যে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই গয়না পরবি ?"

মহামায়া নীরব। নিস্তারিণী উঠিয়া ঘরে ঢুকিল এবং বাক্স খুলিয়া তাহার

গহনাগুলা বাহির করিয়া আনিল। আনিয়া একে একে সে সকল মহামায়াকে পরাইয়া দিতে লাগিল। মাতঙ্গিনী তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

গহনা পরিয়া মহামায়া চলিয়া গেল। মাতঙ্গিনী রোষগম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল, "বড় বৌ!"

সহাস্ত মুখে নিস্তারিণী উত্তর করিল, "কি ঠাকুরঝি?"

মাত। গয়নাগুলো তো পরিয়ে দিলে, তার পর?

নিস্তা। তার পর আর কি, ছেলেমানুষ, সাধ হ'য়েছে, একবার পরুক।

মাতঙ্গিনী তাহার দিকে একটা তিরস্কারপূর্ণ তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

রাত্রিকালে গণেশ মহামায়াকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত গয়না পরেছ যে?"

স্বামীর মুখের উপর হাস্যোজ্জ্বল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মহামায়া বলিল, "পর্‌তে কি নাই?"

গণেশ বলিল, "এত দিন তো পরনি?"

মহামায়া বলিল, "আজ দিদি পরিয়ে দিলে।"

গণেশ আর কিছু বলিল না।

দুই দিন পরে মুরলী গহনা চাহিলে নিস্তারিণী ছোট বৌকে ডাকিল। গহনা তখন ছোট বোয়ের গায়ে ছিল না, তাহার নিজের বাক্সে উঠিয়াছিল। নিস্তারিণী গহনা চাহিলে মহামায়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শেষে নিস্তারিণী যখন জোর তাগাদা আরম্ভ করিল, তখন সে ধীর গম্ভীরভাবে আপনার ঘরে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মাতঙ্গিনী চীৎকার করিয়া বলিল, "বাক্স ভেঙ্গে গয়না নাও।"

নিস্তারিণী তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "তুমি থাম ঠাকুরঝি।"

মুরলী ক্রোধগম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল, "বড় বৌ!"

নিস্তারিণী স্বামীর হাত ধরিয়া টানিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া গেল। ঘরে গিয়া বাক্স খুলিয়া আপনার তাগা, বালা বাহির করিল; কাণ হইতে মাকড়ি, নাক হইতে নথ খুলিয়া দিল। ছেলের রূপার কোমরপাটা, নিমফল আনিল। ছেলের হাতে দুই গাছা সোণার বালা ছিল। তাহা খুলিতে গেলে ছেলে চীৎকার করিয়া উঠিল; নিস্তারিণী তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না

করিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বালা খুলিতে লাগিল। মুরলী স্তব্ধ দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া হাত দুইটা বুকের কাছে জড় করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মাতঙ্গিনী চীৎকার করিয়া বলিল, "রাক্ষসি!"

নিস্তারিণী ফিরিয়া চাহিয়া হাত দুইটা জড় করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "ওগো, তোমাদের জোড় হাত ক'রে বলছি, আমায় মাপ কর।"

নিস্তারিণী কিন্তু আর পারিল না; চোখে আঁচল চাপা দিয়া চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। মুরলী ধীর গম্ভীর ভাবে অগ্রসর হইয়া রোরুদ্যমান শিশুর হাত হইতে বালা দুই গাছা টানিয়া খুলিয়া লইল।

সন্ধ্যার সময় গণেশ যখন বিশুকে কোলে লইতে গেল, তখন তাহার হাতে বালা না দেখিয়া নিস্তারিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিশের হাতের বালা কি হ'ল বৌদি?"

নিস্তারিণী কোন উত্তর দিল না; মাতঙ্গিনী বলিল, "সে পোদ্দারের দোকানে গেছে।"

গণেশ বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

নিস্তারিণী বলিল, "মহাজনের কাছে অনেক দেনা হ'য়েছে, কতক না দিলে মাল পাওয়া যায় না।"

গণে। দেনা হ'ল কেন?

নিস্তা। চার পাঁচ শো টাকা বিলেত প'ড়ে গেছে।"

গণে। কেন এত ধার দেওয়া হ'লো?

নিস্তারিণী কোন উত্তর দিল না। গণেশ বলিল, "তা ছেলের হাতের বালা টুকু না বেচলে কি চলতো না?"

নিস্তারিণী বলিল, "তিন শো টাকার জোগাড় সহজে কি হয়?"

গণে। ওর গয়নাগুলো লওয়া হ'য়েছে?

নিস্তা। কার? ছোট বোয়ের?

গণেশ। হাঁ।

নিস্তা। না, লওয়া হয় নি।

গণে। কেন?

নিস্তারিণী চুপ করিয়া রহিল। গণেশ তীব্র কণ্ঠে ডাকিল, "বৌদি!"

নিস্তা। কেন ঠাকুরপো?

গণে। তা হ'লে তুমি আমাদের এতটা পর ভাব?

নিস্তারিণী নীরব। উত্তেজিত কণ্ঠে গণেশ বলিল, "তা হ'লে তোমার এত আদর-যত্ন ভালবাসা সব শুধু মুখে ?"

নিস্তারিণী তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "রক্ষা কর ঠাকুরপো, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিও না। আমিও মেয়ে মানুষ।"

গণেশ পরুষ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "সত্যিই তুমি মেয়ে মানুষ, আর তোমার মত মেয়ে মানুষেই সংসার ভাঙ্গে।"

গণেশ ক্ষিপ্রপদে চলিয়া গেল। নিস্তারিণী স্থির ভাবে রুদ্ধশ্বাসে বসিয়া রহিল।

(১২)

"গিন্নি, ও গিন্নি! গিন্নী কি জপে আছ ?"

বাস্তবিকই গৃহিণী তখন জপে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার হাতে মালা ছিল, কিন্তু মনটা কোথায় ছিল বলা যায় না। কেন না তাঁহার চোখ দুইটা মুদ্রিত হইয়া আসিতেছিল এবং মাথাটা থাকিয়া থাকিয়া কোলের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছিল। গৃহিণী মুহূর্ত্তে তাহা সামলাইয়া লইয়া সোজা হইয়া বসিতেছিলেন, কিন্তু ঘাড়টা বেশী ক্ষণ সোজা থাকিতে পারিতেছিল না, একটা মালা না ঘুরিতেই আবার তাহা সম্মুখ দিকে ঢলিয়া পড়িতেছিল।

এমনই সময় হালদার মহাশয় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিন্নি কি জপে আছ ?"

গৃহিণী চমকিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, কিন্তু জপে নিযুক্ত থাকায় কথা কহিতে পারিলেন না; ঠোঁট না খুলিয়াই গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "উঁঃ।"

ঈষৎ হাসিয়া হালদার মহাশয় বলিলেন, "বাকী কত ?"

গৃহিণী আর একটা 'উম্' শব্দ উচ্চারণ করিয়া দ্রুত মালা ঘুরাইতে লাগিলেন। হালদার মহাশয় সম্মুখে চাপিয়া বসিয়া, গৃহিণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "খবরটা শুনেছ কি ?"

গৃহিণী ব্যগ্র দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিলেন। হালদার মহাশয় দুই হাত তুলিয়া আলস্য ভাঙ্গিয়া বলিলেন, "মুরলী হাজরার সংসারটা এবার বোধ হয় ভাঙ্গলো।"

মালাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া গৃহিণী ব্যস্তভাবে বলিলেন, "কেন ?"

হাল। কেন আর কি, ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই চিরকালই আছে।

গৃহিণী। মাগো মা, সব ঘরেই এই! আমি বলি আমাদেরই ঘরে। তা নয়, ছোট কর্ত্তার মত কুলাঙ্গার সব ঘরেই আছে।

হাল। তা আর নাই? পৃথিবী জুড়ে এই কাণ্ড।

মাথা নাড়িয়া গৃহিণী বলিলেন, "তা হোক্ বাবু পৃথিবী জুড়ে, আমাদের ঘরে কিন্তু ঐ মুখপোড়াটা যেমন, এমন আর দুনিয়ায় নাই। তা যেমন মন, তেমন ফলও হ'য়েছে।"

গম্ভীর ভাবে হালদার মহাশয় বলিলেন, "উচ্ছন্নে যাক্, এখন হ'য়েছে কি, আমি যদি ত্রিসন্ধ্যাপূত ব্রাহ্মণ হই, তবে হাড়ীর হাল হবে, পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হবে।"

গৃহিণী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "তা হোক্‌গে বাবু, তোমার আর অভিশাপ দিতে হবে না।"

সগর্ব্বে হালদার মহাশয় বলিলেন, "অভিশাপ কি, যা বলছি, তা হ'তেই হবে। আমাকে ফাঁকি দেওয়া—একি সহজ কথা! তুমি অক্ষরে অক্ষরে আমার কথা মিলিয়ে নিও, ওর সর্ব্বনাশ হ'য়ে ব'সে আছে।"

যেন সত্যই ছোট কর্ত্তার সর্ব্বনাশ হইবে এমনই আশঙ্কা করিয়া গৃহিণী শঙ্কিত ভাবে বলিলেন, "চুপ কর গো চুপ কর, ও সব কথা শুনলেও আমার ভয় করে। দিক্ আমাদের ফাঁকি, দিয়ে প্রাতর্ব্বাক্যে সুখে থাক্।"

সহাস্যে হালদার মহাশয় বলিলেন, "মেয়ে মানুষ কি না, একটুতেই ভয়ে অস্থির। যাক্, তারা, তারা, কালী কৈবল্যদায়িনী মা!"

গৃহিণী পুনরায় মুখে জল ছিটাইয়া জপে নিযুক্ত হইলেন। হালদার মহাশয় চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

একটু বসিয়া থাকিয়া হালদার মহাশয় বলিলেন, "মালা ঘুরলো?"

গৃহিণী বিরক্ত ভাবে উত্তর দিলেন, "হুঁঃ।"

হাল। হুঁ কি, আজ না হয় সংক্ষেপে সেরে নাও না।

গৃহি। কেন?

হাল। কেন কি, সন্ধ্যা তো অনেক ক্ষণ হ'য়েছে, আজ কি আর উনান জ্বালবে না?

গৃহি। উনান জ্বেলে হবে কি?

হাল। খাওয়া দাওয়া হবে না? না এরি মধ্যে এক বেলা খাওয়া অভ্যাস করছ?

মুখ বাঁকাইয়া গৃহিণী বলিলেন, "কথার শ্রী দেখ! আমার তরে তোমাকে ভাবতে হবে না, আমার ওবেলার ভাত আছে।"

হালদার মহাশয় বলিলেন, "তোমার তো আছে, কিন্তু আমার?"

গৃহি। তুমি তো ওবেলা নেমন্তন্ন খেয়ে এসেছ। এ বেলা আর কত খাবে! এক মুটো চাল সিদ্ধ করবার জন্যে পার আমি উনাম জ্বালতে পারব না। বেশী ক্ষিদে হয় এক মুটো মুড়ি খেয়ে একটু জল খেলেই পারবে। খাওয়ার উপর খাওয়া ভাল নয়।

একটু আম্‌তা আম্‌তা করিয়া হালদার মহাশয় বলিলেন, "তাই যা হয় হবে। তবে তোমার ভাত আছে তো?"

ঝঙ্কার দিয়া গৃহিণী বলিলেন, "আছে, গো আছে সে জন্যে তোমার অত ভাবনা নাই। বলে, আমার ভাবনা ভেবে ভেবে তো সব অস্থির। গোড়া হ'তে যদি আমার ভাবনা একটুও ভাবতে তা হ'লে কি আজ আমার এই দশা হয়? তখন ভাই ভাই ক'রে অস্থির! তখন কি আমার কথা শুনলে? এখন যাও, আমি মালাটা সেরেনি।"

ঈষৎ হাসিয়া হালদার মাহাশয় বলিলেন, "তা সার না, আমি না হয় এই খানেই ব'সে রইলাম।"

গৃহি। এখানে ব'সে কি করবে?

হাল। তোমাকে দেখব।

গৃহি। আমাকে আবার কি দেখবে? আমি এখনো ছুকরীটী আছি নাকি?

ঈষৎ হাসিয়া হালদার মহাশয় বলিলেন, "তবে বুড়ী নাকি? তা বুড়ী হ'লেও গিন্নি, আমার চোখে তুমি চিরকালই ছুকরী। বরং যত বয়স হচ্চে, তত যেন তোমার মুখের জৌলস বাড়ছে।"

নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "রঙ্গ দেখ, যত বুড়ো হচ্চেন, তত রঙ্গ বাড়ছে। উঠে যাও, উঠে যাও।"

হালদার মহাশয় মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেলেন। গৃহিণী পুনরায় আচমন করিয়া জপে মনোনিবেশ করিলেন।

সেদিন কিন্তু জপে মনোযোগ দেওয়া তাঁহার অদৃষ্টে ছিল না। দুই তিনটা মালা না ঘুরিতেই তাঁহার কাণে আসিল, ছোট কর্ত্তা বাহির হইতে ডাকিতেছে, "দাদা বাড়ীতে আছেন?"

"আছি" বলিয়া হালদার মহাশয় সদর দরজায় গিয়া দাঁড়াইলেন। গৃহিণীর আর জপে মন দেওয়া হইল না। তিনি উঠিয়া মালা হাতে পা টিপিয়া গিয়া অন্ধকারে উঠানের এক পাশে দাঁড়াইলেন এবং উভয় ভ্রাতার কথোপকথন শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

ক্রমশঃ।

ভাষার সর্ব্বনাশ।

[শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী]

মাসিক খুলে দেখ্‌তে পাই—
বিশেষ কিছু নাই—
উঁচিয়ে কলম কদম্ কদম
সাহিত্যিক্য-সিপাই!
গরম বুলি—গোলাগুলি
দুধার থেকে ছোটে,
মাঝে থেকে কর্ম্মনাশা—
ফুঁসিয়ে ফুলে ওঠে!
ম্যাপের ঘটা, ছবির ছটা
রং বেরংয়ের দেখে,
সাবাস্ সাবাস্ বল্‌তে চাহে
পরাণখানি হেঁকে!
লাজে ভয়ে বীণাপাণি
ঝোপের মাঝে চুপ,
সংবাদে মাসিকে ভরা
তাড়া তাড়া গ্রুপ্!
ঘোর সমরে ত্রাহি ত্রাহি
কলার কণ্ঠশ্বাস;
রক্ত-স্রোতে ভাস্‌ছে ভাষা!—
মায়ের সর্ব্বনাশ!

ভাষা।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়]

কথা কাণে হাঁটে।

কথা কাণে হাঁটে। কাণে হাঁটিতে হাঁটিতে এ দেশ হইতে সে দেশ যায়; সে দেশ হইতে এ দেশে আসে। এক ভাষার শব্দ আর এক ভাষার শব্দের সঙ্গে সখ্যতা করে; "সই পাতায়"; কথায় কথায় মহাকুটুম্বিতা হয়; কুটুম্বে কুটুম্বে গলাগলি হইয়া চলা-ফেরা করে।

সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া, এ দেশের কথা বিদেশে—বিলাতে গিয়া কুটুম্বিতা পাতাইয়াছে; বিদেশের, বিলাতের কত কথা আসিয়া এ দেশীয় কথার কুটুম্ব হইয়াছে। কথা কাণে হাঁটিতে হাঁটিতে গিয়াছে; কাণে হাঁটিতে হাঁটিতে আসিয়াছে।

আরবী, পারসী, পর্ত্তুগীজ ও তুর্কীর মত কত বিলাতী কথাও এখন আমাদের বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে, খাস বাঙ্গালা কথার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইয়া সর্ব্বদা তাহাদের সাথে সঙ্গে ফিরিতেছে। কেবল বিদ্যালয়ে ও বাজারে নয়; কেবল কাছারী বা আদালতে নয়; আমাদের অন্দর-মহলে, রন্ধন-গৃহে ও শয়ন-কক্ষেও, সে সকল কথা কুটুম্বসম্পর্কে কাণে হাঁটিতে হাঁটিতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। লেপ, বালিস, রেজাই, বালা-পোষ, তক্তাপোষ, সিন্দুক, বায়না, বাজু, তাবিজ, জামা, জিনিষ, পোষাক প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ বিদেশী হইয়াও যেমন বহুকাল হইতে আমাদের বাঙ্গালী "জেনানা"য় বসবাস করিতেছে, তেমনি আবার কতক কাল হইতে আমাদের এ আমলের বন্ধু বিলাতের বিলাতী কথা ঝাঁক বাঁধিয়া অন্দরের অনেকটা জায়গা জুড়িয়া বসিয়াছে। ঐ শুনুন না,—ইংরেজী-অশিক্ষিতা আমাদের পাড়াগেঁয়ে বধূমাতা তাঁহার বাপের বাড়ীর চাকরাণীর সহিত চুপি চুপি কি বলিতেছেন; "সদু! আমার সেমিজের আর একটা বোতাম কোথা গেল? বাক্সটা নে আয় ত দেখি, এখন এই আলপিনটে এতে পরিয়ে দে; বাক্সটার বার্ণিস উঠে গেছে যে,—ল্যাম্পটা সরিয়ে দে ত লো, ভাল করে দেখি; তুই যেন এক সঙ; এখনি গেলাসটা পা দিয়ে ফেলে দিলি যে; ঐ ইষ্টাকিন ভিজে গেল; কোটে কাদা লাগলো; পোড়ারমুখি, পেনটুলনটা নাড়া; ছোট ঠাকুরপো আফিস থেকে এসে কার্পেটের উপর

বসে কাপড় ছাড়্‌লেন, চোখ দিয়েত দেখলি ; তবে চুকিস কেন ?" যখন বধূমাতা অন্দরের এক দিকে আড়ালে আস্তে আস্তে এইরূপ বলিতেছেন, অন্দরের অপর দিকে কক্ষান্তরে ঠিক সেই সময়েই খুব হাঁকডাক ছাড়িয়া, স্বয়ং বড়-গৃহিণী গর্জ্জাইতেছেন, "সুশীল যে সাবু খাবে, এরারুট আনলে কেন ? এ বুঝি কেশে-ছোঁড়ার কাজ। দেখ ত কামিনী, ডাক্তার বুঝি এলো ; আর আমায় ঐ কুইনাইন মিক্‌শ্চারের শিশিটে দে ; বামুনঠাকরুণকে বল ফোমেণ্টের জল তপ্ত কর্‌তে ; কেদারে ফেলানেলের ন্যাকড়াখানা কোথা ফেলে দিলে ; ওটা হাঁসপাতালের বোতল ; ফিরে দিতে হবে।" ইতিমধ্যে খুদীর মা আসিয়া খবর দিল যে, "জামাই বাবু ট্রেণ পান নি, ইষ্টিসনে বসে আছেন ; দারোয়ান ফিরে আস্‌ছে।"

বলা বাহুল্য মাত্র যে, বধূমাতা, তাঁহার বাপের বাড়ীর ঝি, বড় গৃহিণী ও তাঁহার চাকর-চাকরাণী, বামুন ঠাকরুণ ও খুদীর মা ও খোট্টা দরোয়ান ; ইহাদের কেহ কোনও জন্মে ইংরেজী পড়াশুনা করেন নাই ; অথচ একত্রে এক ধামা ইংরেজী কথা ব্যবহার করিতেছেন, বলিতেছেন এবং বুঝিতেছেন ! সেমিজ, বোতাম, বাক্স, বার্ণিস আলপিন, ল্যাম্প, গেলাস, ডেস্ক, ইষ্টাকিন, কোট, পেনটুলেন, আপিস ও কার্পেট ; পুনশ্চ সাবু, এরারুট, ডাক্তার, কুইনাইন, মিকশ্চার, ফোমেণ্ট, ফেলানেল, বোতল, হাঁসপাতাল ; পক্ষান্তরে ট্রেণ ও ষ্টেশন ; এতগুলি কথার একটীও বাঙ্গালা কথা নয় ; সবগুলিই বিলাতী শব্দ ; অথচ এক মুহূর্ত্ত মধ্যে তোমার অন্দর মহলে তাহাদের শিলাবৃষ্টি হইয়া গেল। যাঁহারা এই সব কথায় বলা-কহা করিলেন, তাঁহাদের কেহই উহাদিগকে ইংরেজী-জ্ঞানে সে কার্য্যটা করিলেন না। নেহাত প্রয়োজনের অনুরোধে আসন্ন কার্য্য উদ্ধারার্থে আপন ঘরের বাঙ্গালার মত অভিন্ন-জ্ঞানে ঐ বিলাতী কথাগুলিতে বলাবলি করিলেন। এমনতর বলাবলি প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৃহ-স্থালীতে প্রায় প্রতি মুহূর্ত্তেই হইয়া থাকে,—হইতেছে।

এ স্থলে একটা আপত্তি উঠিতে পারে যে, সেমিজ আজও সকল সুন্দরীর শরীর শোভিত করে নাই ; অতএব সেমিজ কথাটা সর্ব্ব বঙ্গে সার্ব্বভৌমিক হইতে এখনও অল্প বিলম্ব আছে। ঠিক কথা। সৌভাগ্যক্রমেই সেমিজ আজও সকলের গায় উঠে নাই ; বডিসও উঠে নাই ; কিন্তু বোতাম কথাটা আবালবৃদ্ধবনিতা, মহারাণী হইতে মেতরাণী পর্য্যন্ত, কোণের কুলবধূ হইতে, বাজারের বার-বধূ অবধি কে না ব্যবহার করেন, বলেন এবং বুঝেন ?

তার পর, বাক্স, বার্ণিস, বোতল শ্রীমতীদিগের কে না জানেন? বেলেস্তারা (Blister) কে না বুঝেন? সাবু কে না জানেন? ল্যাম্প কথাটা অনেক অশীতপরা বৃদ্ধার মুখে "ল্যাম্বোড" নামে উচ্চারিত হইতে শুনা গিয়া থাকে। এইরূপ অসংখ্য ইংরেজী কথা অন্যান্য বিদেশীয় যাবনিক কথার ন্যায় এখন বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। সকলেই তাহা চব্বিশ ঘণ্টা ব্যবহার করে, তাহার মতলব বুঝে, বরং সে কথাগুলি যে বাঙ্গালা নয়,—বিলাতী, শতকরা ৯৯ জনে তাহা জানে না।

আমরা কয়েকটা মাত্রের উল্লেখ করিলাম; কিন্তু এমনতর বহুতর বিলাতী কথা, বিলাতী কাপড় ও দেশলায়ের ন্যায়, অষ্টপ্রহর আমাদের অন্দর মহলে ঘোরা ফেরা করে। তার পর আমাদের সদরে, দরবারে ও বাজারে যে কত বিলাতী কথা বাঙ্গালার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া চলে, তাহা এরূপ প্রবন্ধে গণিয়া গণিয়া, 'কলম বন্ধ' করা যায় না। তাহা আমাদের এখনকার অভিধানকার-দিগের করা উচিত ও আবশ্যক।

আপিল, এফিডেবিট্, অর্ডার, ইস্যু, চার্জ, মোসন, রিটর্ণ, শমন, ওয়ারেণ্ট, শীল, রেজষ্টারী, ষ্ট্যাম্প, কোর্ট-ফি, ড্যামেজ, ডিক্রি, ডিসমিস্, রোডসেস, রেবিনিউ বোর্ড, কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস, বিদিবর, লাইসেন, ইনকম টেক্স, হ্যাণ্ডনোট, চেক, কমিশন, টহরম (term), কৌঁসুলী, (Council), সরাসরি (Summary), লুটিস (Notice), সবজজ, সেসন জজ, কোয়াটার, এটর্ণী (Attorney), হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোট, পেটী কোর্ট (Small Causes Court) প্রভৃতি শত সহস্র ইংরেজী শব্দ মোকদ্দমাকারী ও বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত অতি ইতর লোকদের মুখেও বাঙ্গালা কথার মত ব্যবহৃত হয়। মানিলাম, যে সকল লোকে কখনও মোকদ্দমা-মামলা করে নাই, বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত নহে, তাহারা ঐ সকল শব্দের কোন ও কোনটা জানে না। কিন্তু মাজিষ্টার, কলেক্টর, জজ, ডেপুটি মাজিষ্টর, পুলিস, কনষ্টেবল, টেক্স, ইষ্টিমার প্রভৃতি চলিত শতাবধি শব্দ কে না জানে? কেই বা না বাঙ্গালা ব্যবহারিক শব্দের মত ব্যবহার করে?

প্রায় প্রত্যহই বিলাতী কথা কাণে হাঁটিতে হাঁটিতে বাঙ্গালা ভাষারে কাছে আসিয়া কুটুম্বিতা পাতাইতেছে। এইরূপে নূতন কুটুম্বের সংখ্যা ক্রমেই আমাদের বাড়িতেছে। মুসলমানী আমলের সাবেক পুরাতন কুটুম্বও বিস্তর আছে। সংবশ-উদ্ভূত, সগোত্রীয়, আত্মীয়, দশ রাত্রির জ্ঞাতি অপেক্ষা

কুটুম্বের উপরই যেন স্বভাবতঃ আদর বেশী। পুরাতন অপেক্ষা নূতন কুটুম্বের প্রতি আবার আদর অধিকতর। উদাহরণ এখনই দিতেছি। কিন্তু নূতন হউক, পুরাতন হউক কুটুম্বিতায় আমাদের আদর ও আসক্তি এত বেশী যে, কুটুম্বের সঙ্গে কার-কারবার করিতে আপন গৃহের আত্মবংশীয় ব্যক্তিদিগকে অনেক স্থলেই একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছি; কোথাও বা তাহাদিগকে কর্ম্মচ্যুত ও অব্যবহার্য্য করিয়া রাখিয়াছি। দেখুন, "কার্য্যালয়" শব্দটী সাক্ষাৎ সংস্কৃতের শোণিতোৎপন্ন খাঁটী বাঙ্গালা কথা;—কিন্তু কথাটী কখনও কি আমরা কথাবার্ত্তায় ব্যবহার করিয়া থাকি? কৈ কখনও ত কাহারও মুখে শুনি না। "কার্য্যালয়" কথার বদলে চিরকাল মুসলমান কুটুম্ব "কাছারী" কথাই আমরা ব্যবহার করিয়াছি। এখন আবার 'কাছারীর' বদলে "আপিস" ইংরেজী বলিতেছি; কারণ "আপিস" ইংরেজী আমলের নূতন কুটুম্ব। কাজেই উহার সহিত সখ্যতা ও সৌহৃদ্য স্বভাবতই অধিক। এইরূপ এখন আমরা পিয়াদা না বলিয়া বলি, পিয়ন; দেওয়ান না বলিয়া বলি ম্যানেজার; হরকরার বদলে বলি রণর; খাজাঞ্চীখানার বদলে বলি ট্রেজারী; আমীনের বদলে বলি সরভেয়র; এস্তাহামের বদলে বলি একজামিন; দারোগা না বলিয়া বলি ইনস্পেক্টর; সাবানের বদলে সোপ; নমুনার বদলে স্যাম্পল; থানার বদলে ষ্টেশন; খত বা তমসুকের বদলে বণ্ড; ইমারত না বলিয়া বলি বিল্‌ডিং ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ ইহারা কেহই আমাদের নিজের নিজস্ব খাঁটী বাঙ্গালা নয়; সকলেই কুটুম্ব; কেবল তফাতের মধ্যে এই যে, যে কথাগুলাকে আমরা ত্যাগ করিতেছি, তাহারা আমাদের পুরাণ কুটুম্ব; আর তাহাদের স্থলে যাহাদিগকে গ্রহণ করিতেছি, তাহারা নূতন কুটুম্ব; কিন্তু এই কুটুম্বদিগের কার্য্য আদিকালে আমাদের ঘরের লোক কাহারা করিত, তাহাদিগকে এখন অনুসন্ধান করিয়াও বাহির করা ভার। অব্যবহারে আমাদের বিস্মৃত হওয়ায়, হয় ত তাহাদের অনেকেই এ যাত্রা ভাষা হইতে ভবলীলা সম্বরণ করিয়াছে।

ভাষার সাড়ে বত্রিশ ভাজা।

লেখা আরম্ভের পূর্ব্বেই একটী প্রশ্ন। প্রশ্নটী প্রিয় পাঠক মহাশয়কেই করিতেছি।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার "চণ্ডী" কাব্যে লিখিয়াছেন;—

হাল পিছু এক তঙ্কা, কারে না করিহ শঙ্কা,
পাট্টায় নিশান মোর ধর।
নাহি দিব দাবড়ি, রয়ে বসে দিহ কড়ি,
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
সেলামী বাঁশগাড়ী, নানাবাবে যত কড়ি,
না লইব গুজরাট বাসে।

পুনশ্চ, আমাদের অপর কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁহার "অন্নদা-মঙ্গলে"র উপসংহার "মানসিংহ"-কাব্যে লিখিয়াছেন ;—

মানসিংহ যোড়হাতে, অঞ্জলি বান্ধিয়া মাতে,
কহে জাঁহাপনা সেলামত।
রামজীর কুদরতে, মোকাম হইল ফতে,
কেবল তোমারি কেরামত।
হুকুম শাহন শাহী, আর কিছু নাহি চাহি,
জের হইল নেমকহারাম।
গোলাম গোলামী কৈল, গালিম কয়েদ হইল,
বাহাদুরী সাহেবের নাম।
পাতশা হইল খুসি, কহিতে লাগিলা তুষি,
কহ রায় কি চাহ ইনাম।

এখন আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন, খাঁটি বাঙ্গালী কবি কবিকঙ্কণের বাঙ্গালা কাব্যে ব্যবহৃত উপরোক্ত পাট্টা, দাবড়ী, ডিহিদার, সেলামি, পরন্তু অপর একস্থানে ফজর, নমাজ, পীর, পয়গম্বর, মোকাম, বেরাদর, তিতাব, কোরাণ, বেসাইয়া, শীরণি, দানিসবন্দ এবং রোজা শব্দ বাঙ্গালা কি না? যদি বাঙ্গালা হয়, তবে উহাদের সংস্কৃত বা প্রাকৃত ধাতুপ্রত্যয় দেখাইয়া দিউন; অথবা "দেশজ" মূল কি বলুন। কেবল "ফজর" ও "দানিসবন্দ" কথা দুটী এখনকার বাঙ্গালাভাষায়,—কথোপকথনে ও লিখনে, তত ব্যবহৃত হয় না; ঐ দুটী ব্যতীত উপরোক্ত আর কয়টী শব্দই বাঙ্গালা বলিয়া গৃহীত ও অল্লাধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক কথায়,—উহারা বাঙ্গালা ভাষার অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু প্রিয় মহাশয়! পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিতেছি, উহারা কি বাঙ্গালা?

অতঃপর বলুন, ভারতচন্দ্রের মার্জ্জিত ভাষায় জাঁহাপনা, সেলামত, কুদরত,

কেরামত, হুকুম, শাহনশাহী, জের নিমকহারাম, গোলাম, গোলামী, গালিম, কয়েদ, বাহাদুরী, সাহেব, পাতশা, খুশি, ও ইনাম শব্দও কি সংস্কৃত-মূলক বা প্রাকৃতমূলক খাঁটি বাঙ্গালা ?

মহাশয় বলিতেছেন,—"না, না না, তা কেন ? উহারা সংস্কৃত বা প্রাকৃতজাত বাঙ্গালা কথা নয়, ওগুলি যাবনিক শব্দ, কিন্তু আমাদের বঙ্গভূমির জল-বায়ু ও মৃত্তিকাতে বহুকাল বসবাস করিয়া, বহুকালাবধি আমাদের নিমক খাইয়া, এখন আমাদের নিজেরই বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে। বঙ্গসাহিত্যের ভদ্রাসনের ভিতর আমরা উহাঁদের ভিটা বাড়ী তৈয়ার করিয়া দিয়াছি ;—উহারা আমাদের অভিধানে স্থান পাইয়াছে ; আমাদের অন্যান্য নিজস্বের ন্যায় উহারাও আমাদের এখন নিজস্ব। উহাদের এবং উহাদের অন্যান্য অনেক ভ্রাতা ভগিনীর, আমরা জনয়িতা না হইলেও, অন্নদাতা পালক পিতা। উহাদের উপর আমাদের স্নেহমমতা জন্মিয়াছে ; এত কালের পর এখন কি আর আমরা উহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারি ? বিশেষতঃ উহারা আমাদের কবিকঙ্কণের কাব্যে, ভারতচন্দ্রাদির ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া শোধিত হইয়া গিয়াছে ; অতঃপর আর উহাদিগকে অবাঙ্গালা কে বলিবে ?

আচ্ছা, হাঁ, ঠিক কথা। উহাদিগকে কে অবাঙ্গালা বলিতে পারে ? আর,—চাকরাণী, দেয়াল, তাগাদা, তাকিদ, তহবিল, মাসকাবার, চাবী, কুলুপ, রোয়াক, চিক, ঝরকা, জানালা, এমারত, দালান, মনিব ;—এই সকল ও ইহাদের মত আর শত শত শব্দকেই বা কে অবাঙ্গালা বলিতে সাহসী ? আমাদের কুলের কুল-বধূরাও যে ইহাদিগকে দিনের মধ্যে দুই শত বার ব্যবহার করিয়া থাকেন ! তার পর,—তক্তপোষ, চাদর, তাকিয়া, বালিস, সিন্দুক, লেপ, রেজাই, বালাপোষ, বায়না, খাঁকতি, জামিন, মহল, তামিল, হয়রাণপরেসান, বাজু, তাবিজ, জখম, জামা, পোষাক, পাইজোর, মোজা, তামাসা, ফরমাস, ফরাস, জিনিস, কাগজ, কলম, জাহাজ, তুফান, মাস্তুল, মোকদ্দমা, মামলা, মারফত, গুজরত, গুজস্তা, সেরেস্তা, সাকিন, মুনফা, মুস্কিল, মেরামত, জিলা, আস্তাবল, সওদা, কর্জ, আইন, কানুন, কায়দা, বাজার, দোকান, ময়দা, আসবাব, রেকাবি, চশমা প্রভৃতি অসংখ্য কথা যদি টোল চৌপাড়ীর তাড়নায় আজ অবাঙ্গালা হইয়া যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালীকে ঘর-গৃহস্থালী বন্ধ করিয়া বনগমন করিতে হয় ! কিন্তু বস্তুতঃ এই সকল শব্দ সংস্কৃত বা প্রাকৃতমূলক বাঙ্গালা নহে। ইহারা বাঙ্গালা ভাষার "সাড়ে বত্রিশ ভাজা।" ইহাদের কেহ আরবী, কেহ ফারসী, কোনটা তুরকী,

কোনটা ইংরেজী, কতকগুলি বা পোর্ত্তুগীজ ভাষার শব্দ। চাকরাণী, মনিব, দেয়াল, তাগাদা, তায়দাদ্, হুকুম, তামিল, ঝরকা, সিন্দুক, লেপ, তাকিয়া, জামিন, জুলুম, তাবিজ, মহল ইত্যাদি কথা আরবী; তক্তপোষ, বালাপোষ, বালিশ, চাদর, রেজাই, বাজু, জখম, জামা, পোষাক, মোজা, খুসী, খোসামুদী, খাঁকতি, খুন, এ সকল কথা পারসী; রোয়াক, চিক, ইত্যাদি শব্দ তুর্কী; আরব ও পারস্যবাসীরা উহা তুর্কী হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে জানালা, চাবী, মাসকাবার, ইংরেজ, গির্জ্জা, প্যাদ্‌রী, নীলাম, কামরা, কেদারা, আলমারী, এই সব নিত্য-ব্যবহৃত বাঙ্গালা শব্দ পোর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত; আমাদের বোম্বেটে কথাটাও পোর্ত্তুগীজ Bombardier; কেলেঙ্কারী কথাটা বোধ হয় ফরাসীদের প্রদত্ত। অনেক ইংরেজী কথাও বাঙ্গালা হইয়া গিয়াছে ও যাইতেছে। মাস্তল ইংরেজী; আস্তাবল আধ ইংরেজী, ও আধ-আরবি; নহিলে সাড়ে বত্রিশ ভাজার "সাড়ে" পূরিবে কিরূপে? টাইম, টেবিল, ট্রেণ, রেল, স্কুল, আপিস, চেয়ার, পরাপর, সাট, কোট, তোয়ালে, গুদাম, কার্পেট, বিশকুট, গেলাস, গিনি, এয়ারিং, বুরুষ, ব্যাগ, ব্যাট, বল, সেলেট, পেন্‌সিল, প্লেট, ড্রেণ, পালিস প্রভৃতি খাস ইংরেজী শব্দ ক্রমে বাঙ্গালা হইয়া গিয়া ভাষার সাড়ে বত্রিশ ভাজা বানাইতেছে।

কিন্তু আমরা যে কেবল লইয়াছি ও লইতেছি, তাহা নহে; আমরা দিয়াছি এবং দিতেছিও বিস্তর। দত্তা ও গৃহীতাদিগের মধ্যে পরস্পরে সমানে আদান-প্রদান চলিয়াছে। মুসলমানেরা হিন্দুর হিন্দি লইয়া, তাহা তাঁহাদের পারসীর সহিত ভেয়ান করিয়া অপূর্ব্ব উর্দ্দু ভাষা গড়িয়াছেন। ইংরেজেরাও বিস্তর বাঙ্গালা ও হিন্দি কথা ইংরেজী করত নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন এবং ক্রমে কত লইবেন, কে জানে? ইহারই মধ্যে কয়েকখানি এঙ্গলো-ইণ্ডিয়ান অভিধান লিখিতে হইয়াছে।

বৈষ্ণব কবির কর্‌চা।

[লেখক—শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম্‌-এ, বি-এল্‌]

বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যে কয়েকখানি কর্‌চা আছে। কর্‌চা বা কড়্‌চা-লেখকদিগের মধ্যে মুরারি গুপ্ত ও গোবিন্দ দাসের নাম সুপরিচিত। মুরারি গুপ্ত সংস্কৃত ভাষায় কর্‌চা লিখিয়াছিলেন, সেই জন্য বোধ হয় সমালোচকগণ বাঙ্গালা ভাষার কাব্যসাহিত্যে তাহার স্থান নির্দ্দেশ করা যুক্তিযুক্ত মনে করেন না। সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত বৈষ্ণব কবির কর্‌চা অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ করিলে শ্রীচৈতন্যের জীবনবৃত্তান্ত ও সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে নানা তথ্য অবগত হওয়া যায়। পদ্যময় কর্‌চা লিখিয়া বৈষ্ণব কবিগণ বাঙ্গালা ভাষায় ইতিবৃত্ত রচনার সূত্রপাত করেন। ইহার পূর্ব্বে কবিরা পদাবলী রচনা করিয়া রাধা-কৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক সঙ্গীত শুনাইতেন। পদের শেষে ভণিতায় যদিও তাঁহারা আত্মপ্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাঁহাদের জীবন সম্বন্ধে ভণিতায় সামান্য আভাসমাত্র পাওয়া যাইত। কর্‌চা-রচনার পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া বৈষ্ণব কবিগণ বঙ্গীয় কাব্যসাহিত্যে এক নূতন যুগের অবতারণা করিলেন। কর্‌চা গ্রন্থে কবি নিজের ও অন্যের পরিচয় দিয়া কাব্যের আকার ও বিষয়ে যখন বৈচিত্র্য সম্পাদন করিলেন, তখন হইতেই বাঙ্গালা কাব্যের উপযোগিতা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পূর্ণতা লাভ করিল। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যে সময়ে পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, সে সময়ে কবির হৃদয়ে সবে মাত্র কৃষ্ণ-প্রেম জাগিয়াছে। সে প্রেম তখনও বাঙ্গালী জাতির অন্তরে প্রবেশ করে নাই। চণ্ডীদাস তাঁহার জীবদ্দশায় নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া প্রেমের বার্ত্তা প্রচার করিয়াছিলেন। চণ্ডীদাসের মৃত্যুর পর অনেক দিন প্রেমের চর্চ্চা বাঙ্গালা হইতে লোপ পাইয়াছিল। প্রেমের উৎস কিন্তু চিরকালের তরে শুকাইয়া যায় নাই। শ্রীচৈতন্যের আহ্বানে যখন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হইল, তখন কৃষ্ণ-প্রেম শতসহস্রধারায় প্রবাহিত হইল। বাঙ্গালা-দেশময় প্রেমের শক্তি ছড়াইয়া পড়িল। প্রেম এখন আর ব্যক্তিগত ভাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারিল না। পদ-রচনার প্রথা যদিও অপ্রচলিত হইল না, কিন্তু পদের অল্পায়তন ক্ষেত্রে নূতন শক্তি আবদ্ধ রহিল না। জাতীয় জীবনে যখন ভক্তিপ্লুত প্রেম প্রকাশ পাইতে লাগিল, মুরারি গুপ্ত ও গোবিন্দ দাস প্রভৃতি জনকয়েক

বৈষ্ণব কবি তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্মজীবনে এই নূতন প্রেমের পূর্ণ বিকাশ দেখা যায়। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ভক্ত কবিগণ তাঁহার পার্ষদবর্গের মধ্যে স্থান পাইয়াছিলেন এবং প্রেমের লীলা স্বচক্ষে দেখিতেছিলেন আর সঙ্গে সঙ্গে কর্‌চা লিখিয়া সেই লীলার চিত্র অঙ্কিত করিতেছিলেন। গোবিন্দ দাস শ্রীচৈতন্যের সহিত নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া সমুদয় দক্ষিণ ভারত পর্য্যটন করেন। গোবিন্দ দাসের কর্‌চা সেই জন্য বঙ্গ-ভাষায় সর্ব্বপ্রথম ইতিবৃত্ত। স্বরচিত কর্‌চা সম্বন্ধে গোবিন্দ দাস বলিয়াছেন—

"যে সব আশ্চর্য্য লীলা পাই দেখিবারে।
কর্‌চা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে॥"

আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন—

"দুই চারি বাত কভু প্রভুরে পুছিয়া।
কর্‌চা করিয়া রাখি মনে বিচারিয়া॥
যেই লীলা দেখিলাম আপন নয়নে।
কর্‌চা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে॥"

শ্রীচৈতন্য নীলাচলে প্রত্যাগমন করিবার বহু বৎসর পরে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ব্যাস বৃন্দাবন দাস চৈতন্য-ভক্তগণের নিকট মহাপ্রভুর লীলা সম্বন্ধে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া করিয়া চৈতন্যভাগবত নামে শ্রীচৈতন্যদেবের সুবৃহৎ জীবনী প্রণয়ন করেন।

"বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে।
তাহা লিখি, যেই শুনিয়াছি ভক্ত স্থানে॥"

(চৈতন্যভাগবত)

অন্যত্র,

"নিত্যানন্দ প্রভু মুখে বৈষ্ণবের তত্ত্ব।
কিছু কিছু শুনিলাঙ সভার মহত্ত্ব॥"

(চৈতন্যভাগবত)

রায় সাহেব দীনেশচন্দ্র সেনের মতে গোবিন্দদাসের কড়্‌চা ১৫১০-১৫১১ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। তাঁহার মতে গোবিন্দ দাসের কড়্‌চার পর ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল লেখা হয়। ইহার পর বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবত লেখেন ও তৎপরে লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল লিখিত হয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত রচনার কাল ১৬০৬—১৬১৫ খৃষ্টাব্দ। এই শেষোক্ত গ্রন্থে মহাপ্রভুর লীলা ও বৈষ্ণবধর্ম্মের তত্ত্ব বিশদভাবে

বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণব কবির করচা সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বার বার উল্লেখ দেখা যায়। শ্রীচৈতন্য ও রামানন্দের পরিচয় সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলেন—

"রামানন্দ রায়ে মোর কোটী নমস্কার।
যাঁর মুখে কৈল প্রভু রসের বিস্তার॥
দামোদর-স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ-মিলন লীলা করিল প্রচারে॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত)

কবি হরিদাসের মহিমার কথা বর্ণন করিয়া শেষে লিখিয়াছেন—

"শ্রীরূপগোসাঞির কড়চায় লিখিল।
রঘুনাথ দাস মুখে যে সব শুনিল॥
সেই সব লীলা কহি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্যকৃপায় ত লিখি ক্ষুদ্রজীব হঞা॥
হরিদাস ঠাকুরের কহিলা মহিমা-কথন।
যাহার শ্রবণে ভক্তের জুড়ায় শ্রবণ॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত)

ভণিতায় কবি কাব্য-ক্ষেত্রের প্রান্তদেশে ইতিবৃত্তের যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, করচার কবি সেই বীজ হইতে উদ্ভূত চারাগাছগুলিকে প্রসর ভূমিখণ্ডে রোপণ করেন। চরিত-রচয়িতার যত্ন ও চেষ্টায় যথাকালে ঐতিহাসিক কাব্য-কানন প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রেমের দুগ্ধধারায় ভণিতার দুই চারি ছত্র-পরিমিত ভূমি সিক্ত হইয়াছিল। করচায় বৃহত্তর ক্ষেত্র প্রেম ও ভক্তির সিঞ্চনে সরস হয়। শ্রীচৈতন্যের পদ্মময় জীবনেতিহাসে প্রেম-ভক্তির প্লাবন দৃষ্ট হয়। বৈষ্ণব-কবিতা বাস্তবিক বাঙ্গালীর ধর্ম্মজীবনের সুন্দর ও সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি,—কেবল কবির হৃদয়গত ভাববিশেষের বিকাশ নহে। বৈষ্ণব কবির করচা বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিবৃত্তের শিশু-উদ্যান। ভণিতায় প্রেমের অন্তর্দৃষ্টির ন্যায় করচায় প্রেমের বাহ্যদৃষ্টি সুস্পষ্ট। বাঙ্গালায় যখন ধর্ম্মপ্রবণতা জাগিয়া উঠিল, ভক্তকবির দৃষ্টি তখন বহির্জ্জগতের উপর পড়িল। তিনি নিজের হৃদয়ের প্রেমালোকে সমাজের যেখানে যাহা কিছু দেখিতে পাইলেন, করচার মধ্যে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রাখিলেন। সেই জন্য কেবল যে কবি বা ব্যক্তিবিশেষের জীবনী বৈষ্ণব কবির করচায় পাওয়া যায়, তাহা নহে; গোবিন্দদাসের করচায় নবদ্বীপ.

বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, উড়িষ্যা ও দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানের সামাজিক অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী কবি এইরূপে বঙ্গভাষায় মানব-চরিত্রের সমালোচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত, গোবিন্দদাসের কড়চা বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম ভ্রমণবৃত্তান্ত। বঙ্গের বাহিরে বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারের ইহাই সর্ব্বপ্রথম ইতিহাস। দক্ষিণ ভারতে প্রাচীন হিন্দুতীর্থের বৃত্তান্ত ইহার পূর্ব্বে আর কেহ বঙ্গভাষায় রচনা করেন নাই। বাঙ্গালীর গৌরব করিবার বিস্তর জিনিষ বৈষ্ণব কবির কড়চায় খুঁজিলে পাওয়া যায়; কিন্তু চরিতগ্রন্থসকল প্রচার হইবার পরে কড়চার আদর কমিয়া যায়। ইহার কারণ বোধ হয় যে, "কড়চা, কাব্য বা ইতিহাসের রেখাপাত মাত্র।" কেবল এক গোবিন্দ দাসের কড়চা ব্যতীত আর কোনও কড়চা এক্ষণে সুপঠিত বা সুপরিচিত বলিয়া মনে হয় না। দীনেশ বাবু বলেন, "ইহা একখানা বিস্তৃত চরিতাখ্যান"; আর সেই কারণেই এই প্রামাণিক গ্রন্থের বহুল উল্লেখ আজকাল বৈষ্ণবসাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ ও সমালোচনায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, যে সকল কড়চার উল্লেখ চরিতাখ্যান-লেখকগণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি কোনও কালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই এবং অবশিষ্টগুলি বোধ হয় অনুসন্ধান করিলেও অপ্রাপ্য। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে পরমানন্দপুরী, গোপাল বসু ও গৌরীদাসের গ্রন্থ এখনও পাওয়া যায় নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক সকল গ্রন্থেরই ঐতিহাসিক মূল্য যে খুব বেশী, সে কথা বলা বাহুল্য। মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী লেখকগণ তাঁহার বিস্তৃত জীবনচরিত লিখিলেও যে সকল কড়চার উপর তাঁহারা নির্ভর করিয়াছেন, সে সকলের প্রামাণিকত্ব সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না। কেবল তাহাই নহে, মহাপ্রভুর জীবনবৃত্তান্তের সহিত কড়চা লেখকের নিজের জীবনের আখ্যায়িকা এমন আশ্চর্য্যভাবে গ্রথিত যে, কড়চা পাঠ করিতে করিতে আমরা কবির জীবনের সকল কথা জানিয়া লইবার সুবিধা পাই। কবি ও কাব্যের এমন সুন্দর সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখা যায় না।

বৈষ্ণব কবির কড়চা যে কেবল শ্রীচৈতন্যের ও কবির নিজের জীবনী সম্বন্ধে আমাদিগকে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইয়া দেয় তাহা নহে। বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যে কয়েকখানি কড়চার কথা শুনা যায়; সেইগুলিতে কবি বৈষ্ণব

ধর্ম্মবিষয়ক সংস্কৃত নাটকের সূত্রপাত করিয়া পরে তাহা হইতে পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা করেন।

"এথা প্রভু আজ্ঞায় রূপ আইলা বৃন্দাবন।
কৃষ্ণলীলা নাটক করিতে হৈল মন॥
বৃন্দাবনে নাটকের আরম্ভঃ করিল।
মঙ্গলাচরণ নান্দী-শ্লোক তথাই লিখিল॥
পথে চলি আইসে নাটকের ঘটনা ভাবিতে।
কড়চা করিয়া কিছু লাগিলা লিখিতে॥"

(চৈতন্যচরিতামৃত)

বৃন্দাবন হইতে গৌড়ে আসিবার সময়ে পথে এই করচা রচিত হইয়াছিল। শ্রীরূপ গোস্বামী শেষে বিদগ্ধ মাধব ও ললিত মাধব নামে দুইখানি সুবিখ্যাত সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্য দেবের তিরোভাবের কিঞ্চিদূর্দ্ধ অর্দ্ধ শতাব্দী পরে চৈতন্যচরিতামৃত লেখেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের করচায় বর্ণিত ঘটনাগুলি তিনি তাঁহার রচিত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে প্রায় সর্ব্বাংশে গ্রহণ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীচৈতন্য দেবের চরিতাখ্যান সঙ্কলন করিবার জন্য উক্ত বৈষ্ণব কবিদিগের করচা ও কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর না করিলে মহাপ্রভুর জীবনের শেষ লীলা সম্বন্ধে কোনও সংবাদ পাইবার অন্য উপায় ছিল না। বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবতে মহাপ্রভুর জীবনের শেষ লীলার কথা উল্লিখিত না হওয়াতে উহা যে অসম্পূর্ণ জীবনী তাহা সকলেই স্বীকার করেন। চৈতন্যচরিতামৃতের কবি বৃদ্ধ বয়সে বহু পরিশ্রমসহকারে তৎকালীন প্রচলিত কিম্বদন্তী ও করচা সংগ্রহ না করিলে মহাপ্রভুর জীবনের শেষ অধ্যায় বোধ হয় অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইত। মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা বর্ণন করিয়া কবি লিখিয়াছেন—

"প্রভুর বিরহোন্মাদ ভাব গম্ভীর।
বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যপি হয় ধীর॥
বুঝিতে না পারে যাহা বর্ণিতে কে পারে।
সেই বুঝে বর্ণে চৈতন্য শক্তি দেন যারে॥
স্বরূপ গোসাঞি আর রঘুনাথ দাস।
এই দুই কড়চাতে এ লীলা প্রকাশ॥
সেকালে এ দুই রহে মহাপ্রভুর পাশে।
আর সব কড়চা-কর্ত্তা রহে দূরদেশে॥

ক্ষণে ক্ষণে অনুভবি এই দুই জন ।
সংক্ষেপে বাহুল্য করে কড়চা-গ্রন্থন ॥
স্বরূপ সূত্রকর্ত্তা রঘুনাথ বৃত্তিকার ।
তার বাহুল্য বর্ণি পাঁজি টীকা ব্যবহার ॥
তাতে বিশ্বাস করি শুন ভাবের বর্ণন ।
হইবে ভাবের জ্ঞান পাইবে প্রেমধন ॥"

কৃষ্ণদাস কবিরাজ নিজে অদ্বৈতসূত্র কড়চা নামে একখানি করচা রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে স্থানে স্থানে সংক্ষিপ্ত বিবরণ গদ্যে লিখিত হইয়াছে। বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষায় এই যৎসামান্য গদ্যময় বিবরণ সর্ব্বপ্রথম গদ্যরচনা। বৈষ্ণব কবির করচা বাঙ্গলা গদ্যের জন্মদাতা না হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজের অদ্বৈতসূত্র কড়চায় লিখিত কয়েক ছত্রে বাঙ্গালা গদ্যের যে আবির্ভাব-সূচনা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

নানাবিষয়ক জ্ঞান ও তৎসংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইয়া বৈষ্ণব কবির করচার কলেবর পুষ্ট হইয়াছিল। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালী সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ যদিও করচায় পাওয়া যায় না, কিন্তু কবির লেখনামুখে যৎসামান্য যাহা প্রকাশ পাইয়াছে তাহা হইতে মোটামুটি বুঝা যায় যে, সে সময়কার বাঙ্গালীগণের অবস্থা নেহাত মন্দ ছিল না। গোবিন্দ দাসের করচা হইতে জানা যায় যে, তৎকালে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কাঞ্চননগরে কর্ম্মকার শিল্পী অস্ত্রশস্ত্র ও হাতা বেড়ী প্রভৃতি নিত্য-ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

"বর্দ্ধমানে কাঞ্চননগরে মোর ধাম ।
শ্যামাদাস পিতৃনাম গোবিন্দ মোর নাম ॥
অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতি কর্ম্মকার ।
মাধবী নামেতে হয় জননী আমার ॥"

মেদিনীপুর জেলায় কেশব সামন্ত নামে এক ধনবানের সহিত শ্রীচৈতন্যের কথোপকথন হইতে বুঝা যায় যে, সেখানকার বাঙ্গালী ধনিগণ অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। নারায়ণগড়ের বীরেশ্বর সেন ও ভবানী শঙ্করের "চতুর্দ্দোল হস্তী অশ্ব আর বহু যান ছিল।"

"হস্তীর পৃষ্ঠেতে ডঙ্কা বিচিত্র নিশান ।
চারিটা রূপার হুদ্দা চলে আগুয়ান ॥"

বাঙ্গালীরা দলে দলে নবদ্বীপ ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থান হইতে পুরী গয়া

বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থে পদব্রজে গমনাগমন করিত। পত্রাদিও বাঙ্গালাদেশ হইতে দূরদেশে প্রেরিত হইত। গ্রাম্যদেবতার পূজা, অতিথি-সৎকার, নানা প্রকার নিরামিষ অন্নব্যঞ্জন, ঘৃত, "চিকণিয়া চাউল" প্রভৃতির বর্ণনা পাঠ করিলে প্রাচীন বঙ্গের চিত্র মানসপটে ভাসিয়া উঠে। পুরীধামে যে বাঙ্গালীদের অনেকটা পসার-প্রতিপত্তি ছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কড়চার যুগে বাঙ্গালীদিগের কষ্টসাধ্য তীর্থযাত্রার কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমেদাবাদ হইতে দ্বারকার পথে শ্রীচৈতন্যদেব ও গোবিন্দদাসের সহিত দুই জন বাঙ্গালীর সাক্ষাৎ হয়।

"কিছু দূর গিয়া দেখি নদী শুভ্রাসতী।
কুলু কুলু স্বরে গান করে রসবতী॥
নদীপারে গিয়া দেখি দুই চারি জন।
দ্বারকায় যাইতেছে তীর্থের কারণ॥
দেখিলাম তার মধ্যে বাঙ্গালি দুজনে।
মহাভক্ত রামানন্দ গোবিন্দ চরণে॥
বহুকাল পরে গৌড়বাসীরে দেখিয়া।
আনন্দে মানস যেন উঠিল নাচিয়া॥"

কবির স্বজাতিপ্রিয়তার কথা ভাবিলে আনন্দ হয়। বাঙ্গালী সাধু সন্ন্যাসী তীর্থযাত্রীর বর্ণনা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, কড়চার যুগে বাঙ্গালী-হৃদয়ে কেমন একটা নূতন রকমের বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। ধর্ম্মপিপাসু বাঙ্গালীর অন্তরে এক নূতন শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। বাঙ্গালী যথার্থই সত্যের অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছিল, ভারতের সকল স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা মিটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। বৈষ্ণব কবির কড়চা বঙ্গভাষায় বাঙ্গালী-হৃদয়ের এই নবভাবের রেখাচিত্র আঁকিয়াছে। 'কবিত্ব-হিসাবে বৈষ্ণব কবির কড়চা উচ্চশ্রেণীর রচনা না হইতে পারে, কিন্তু ইতিবৃত্তের মাল-মসলা ইহাতে যথেষ্টপরিমাণে সঞ্চিত হইয়া আছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা *

দূষ্য কাব্য।

যাহা শারীরিক কুপ্রবৃত্তির উদ্দীপক, তাহাই দূষ্য এবং কাব্যের অযোগ্য। কিন্তু এদেশে কতকগুলিন অর্দ্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত লোক হইয়াছেন,— তাঁহাদিগের নিকটি বিশুদ্ধ দম্পতী-প্রেম—যাহা সংসারের একমাত্র পবিত্র গ্রন্থি এবং মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম, চিত্তোৎকর্ষের প্রধান উপায় তাহাও আদিরস-ঘটিত এবং অশ্লীল বলিয়া ঘৃণ্য। তাঁহারা মনে করেন, এইরূপ কথা কহিলেই লোকে ইংরাজিওয়ালা এবং সুসভ্য বলিবে। তাঁহাদিগকে গণ্ডমূর্খ বলিতে আমাদিগের কোন বাধা নাই। এ ঘৃণা তাঁহাদিগের স্বচিত্তের সমলতারই ফল। যাঁহারা কিছুই বিশুদ্ধভাবে দেখিতে জানেন না, তাঁহাদিগের চোখে সকলই সমান। যাঁহাদিগের চিত্ত কেবল কুক্রিয়ার অভিলাষী, বিশুদ্ধ বর্ণনাও তাঁহাদিগের কুপ্রবৃত্তির উদ্দীপক হইয়া উঠে।

আমরা অনেকবার দেখিয়াছি, অতি বিমল প্রসঙ্গেরও এই পাপাত্মারা অসদর্থ বুঝিয়াছে। সে সুসভ্য শ্রেণীমধ্যে আমরা গণ্য হইবার অভিলাষী নহি। আদিরস যদি কেবল বিশুদ্ধপ্রেমাত্মক এবং ধর্ম্মের সহায় হয়, তবে তাহাকে আমরা সমাদর করি, ইহা বলিতে আমাদিগের লজ্জা নাই। কিন্তু কেবল শারীরিক প্রবৃত্তির উদ্দীপক রসে যে সমাদর করে, তাহাকে পশুমধ্যে গণ্য করি। যে কাব্য সে রসাত্মক, তাহা সমাজের ঘোরতর অনিষ্টকারী।

কাব্য-নাটকের প্রয়োজনীয়তা।

কাব্য নাটকের আমরা অবমাননা করি না, এবং আধুনিক বিষয়ী বাহ্যসুখাভিলাষী ইংরাজদিগের ন্যায় বলি না যে, সকলে মিলিয়া কেবল যাহাতে দৈহিক সুখের বৃদ্ধি সেই বিদ্যার অনুশীলন কর—কাব্য নাটক স্পর্শ করিও না। যত দিন মনুষ্যের স্বভাবের পরিবর্ত্তন না হয়, তত দিন বিজ্ঞান এবং সাহিত্য উভয়েরই সমুচিত পর্য্যালোচনা ভিন্ন মনুষ্য উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিবে না।

---

* এই কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে নাই। এ গুলি তাঁহার 'বঙ্গদর্শন' হইতে সংগৃহীত।

পরন্তু বিজ্ঞান অপেক্ষা সাহিত্যের উপকারিতা বা প্রয়োজন লঘু নহে। কিন্তু যে সকল অভিনব কাব্য নাটকাদি দিন দিন বাঙ্গালায় প্রচার হইতেছে—তাহা অপেক্ষা বঙ্গভূমে কাব্য নাটকের একেবারে লোপ হয়, সেও ভাল।

বাঙ্গালীর ইংরেজী রচনা।

আমরা বলি যে, আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর জন্য লিখিতেছি। যদি বাঙ্গালায় কাণ্ট দর্শন বুঝাইয়া লিখিতে পারি লিখিব, বাঙ্গালায় বুঝাইয়া লিখিতে না পারি লিখিব না। প্রবন্ধ যে ইংরাজিতে লিখিবার কোন প্রয়োজন নাই এমন আমরা বলি না। কিন্তু তেলা মাথায় তেল দেওয়া এখন দুদিন থাক। যাহাদের রুক্ষ কেশ, তাহাদের জন্য আগে তৈলের কুলান করিয়া উঠা যাউক।

দেশ-বাৎসল্য।

আমরা বাঙ্গালী, ইংরাজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জাতির তুলনায় আমরা অতি সামান্য জাতি বলিয়া গণ্য। ইংরাজের তুলনায় আমাদের কিছুই প্রশংসনীয় নহে। আমাদের কিছুই ভাল নহে। একথা সত্য কি না তাহা আমরা ঠিক জানি না। কিন্তু প্রত্যহ শুনিতে শুনিতে আমাদের উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হইয়া উঠিতেছে। সে বিশ্বাসটী ভাল নহে। ইহাতে আমাদের স্বদেশভক্তি, স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধার হ্রাস হইতেছে। যাহাতে কিছু ভাল নাই—তাহা কে ভালবাসিবে? আমরা যদি অন্য জাতির অপেক্ষা বাঙ্গালী জাতির, অন্য দেশের অপেক্ষা বাঙ্গালা দেশের কোন বিশেষে গুণ না দেখি, তবে আমাদের দেশ-বাৎসল্যের অভাব হইবে। এই জন্য আমাদের সর্ব্বদা ইচ্ছা করে যে, সভ্যতম জাতি অপেক্ষা আমরা কোনও অংশে ভাল কি না তাহা শুনি। কিন্তু কোথাও তাহা শুনিতে পাই না। যাহা শুনি, তাহা সত্যপ্রিয় সুবিবেচকের কথা নহে যাহা শুনি, তাহা শুদ্ধ স্বদেশ-পিঞ্জর মধ্যে পালিত মিথ্যা দম্ভপ্রিয় ব্যক্তিদের কথা—তাহাতে বিশ্বাস হয় না—বাসনা পরিতৃপ্ত হয় না।

রমেশচন্দ্রের স্বদেশবিষয়ক কবিতা।

তিনি (রমেশচন্দ্র দত্ত) স্বদেশবৎসল, স্বদেশ-বাৎসল্যে তাঁহার অন্তঃকরণ বিচলিত হইলে, তিনি প্রবাস হইতে স্বদেশবিষয়ে যে সকল কবিতা লিখিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছেন, তাহা আমাদের কর্ণে অমৃত বর্ষণ করে। কিন্তু আমরা

দেখিতে পাই যে, গুণহীনা মাতার প্রতি সৎপুত্রের যেরূপ স্নেহ, স্বদেশের প্রতি তাঁহার সেই স্নেহ। গুণবতী মাতার প্রতি পুত্রের সে স্নেহ কোথায়? এই বঙ্গদেশের প্রতি সে স্নেহ কাহার আছে? সে স্নেহ কিসে হইবে? * * * জন্মভূমি সম্বন্ধে আমরা যে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" বলিবার অধিকারী নই, আমাদের সেই কথা মনে পড়িল। সেই কথা মনে পড়ায় আমরা আক্ষেপ করিলাম। যে মনুষ্য জননীকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" মনে করিতে না পারে, সে মনুষ্য মধ্যে হতভাগ্য। যে জাতি জন্মভূমিকে "স্বর্গাদপি গরীয়সী" মনে করিতে না পারে, সে জাতি জাতি মধ্যে হতভাগ্য। আমরা সে হতভাগ্য জাতি বলিয়া এ রোদন করিলাম। যদি কেহ সত্যপ্রিয়, দেশবৎসল বাঙ্গালী থাকেন, তিনি আমাদের সঙ্গে রোদন করিবেন।

বাঙ্গালী-রচিত ইংরাজী কবিতা।

বাঙ্গালী হইয়া যিনি ইংরাজীতে কবিতা রচনা করেন, আমরা কখনও তাহার প্রশংসা করিব না; ইহা আমাদের স্থির প্রতিজ্ঞা।

শ্রীশ্রীজয়দেব-প্রসঙ্গ।

[শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]

শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক।

"মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিদং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥"

বীরভূমি-হৃদয়-নিকুঞ্জের মধুকণ্ঠ কোকিল কবিরাজ-গোস্বামী জয়দেব এই রহস্যময় শ্লোকে তাঁহার অপার্থিব প্রেমগীতিকাব্য শ্রীগীতগোবিন্দের সূচনা করিয়াছেন। কবি তাঁহার কাব্যে বসন্ত-মহারাসের বর্ণন করিয়াছেন। সরস-বসন্তে ব্রজবনভূমি নন্দননিন্দিত কান্তসৌন্দর্য্যে মধুময়-শ্রী ধারণ করিয়াছে; প্রকৃতির

এই উৎসব-সমারোহের মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত প্রেমের অভিসার, বিরহ-মান-মিলনের সুমধুর রঙ্গাভিনয় নিত্যনবভাবে অভিনীত হইতেছে। ইহাই হইল তাঁহার কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয়। কিন্তু প্রথম শ্লোকের বর্ণনীয় বিষয়—"আসন্নবর্ষণোন্মুখ প্রাবৃটের এক রজনী। মেঘ-মেদুর অম্বরের সান্দ্র ছায়াতলে ব্রজবনভূমি তমালতরুনিকরে শ্যামায়মান হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর আবার রাত্রিকাল, শ্রীকৃষ্ণ ভীত হইয়াছেন। অতএব হে রাধে তুমি ইহাকে লইয়া গৃহে যাও। এইরূপে নন্দ-(আনন্দজনক সখী) নিদেশে কুঞ্জতরুতলে প্রস্থিত যমুনাকূলে শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিজন-কেলি জয়যুক্ত হউক।" শীর্ষোদ্ধৃত শ্লোকের ইহাই সাধারণবোধ্য অর্থ। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এরূপ হইবার কারণ কি? শ্রীকৃষ্ণের বাসন্তী লীলা যে কাব্যের প্রধান বর্ণনীয়, বর্ষায় তাহার সূচনা হইল কি প্রকারে? অতীতের কোন্ স্মরণাতীত দিবসে, নববরষার প্রথম আষাঢ়ে, জলভারাবনত বারিধরের স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি, উজ্জয়িনীর প্রাসাদশিখরে এক দিন যে অপূর্ব্ব ভাবের স্পন্দন তুলিয়াছিল, নবজলকণসিক্ত কুটজকুসুমগন্ধবাহী মন্দসমীরণে মন্দাক্রান্তার মধুচ্ছন্দে লীলায়িত বিরহসঙ্গীতের যে তরঙ্গ বহিয়াছিল, প্রিয়-বিরহজনিত ব্যাকুল হৃদয়ের বেদনাকম্পিত তন্ত্রীনিচয়ে যে করুণ সুর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার বহুশতবর্ষ পরে সেই বরষার মায়াময় চিত্র, একটী স্নিগ্ধ-সজল মেঘ-কজ্জল রাত্রি, অজয়ের জলকলধ্বনি-মুখরিত, ললিত-লবঙ্গ-লতাপরিশীলিত কেন্দুবিল্বের বিজন কুঞ্জকুটীরে কবিরাজ গোস্বামী জয়দেবের মনে কে জানে কি নূতন ভাব জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল! টীকাকারগণ এ সম্বন্ধে নানা জনে নানারূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। টীকাকার পূজারি গোস্বামী, বলেন—নন্দ অর্থে আনন্দজনক সখীবাক্য "নন্দয়তীতি নন্দঃ"। "ভীরু" অর্থে—"ভীরুঃ পূর্ব্বরাত্রে ত্বাং বিহায়াস্যাভিঃ কৃতনৃত্যগীতাদ্যপরাধতয়া ভীতঃ তৎকৃত বহু নায়িকাবল্লভ তারোপনাশঙ্কী। "গৃহং প্রাপয়" অর্থে তন্নিমিত্তানুভূত-মর্ম্মব্যথং শ্রীকৃষ্ণ গৃহং "মঞ্জুতরেতি বক্ষ্যমাণ কেলিসদনং প্রাপয়।" পুনঃ কেলিসদনমনুসরন্তি এতস্য কেলিসদনপ্রাপ্তাবনুকূলোভবেতি অথবা ত্বমেবেমং গৃহং প্রাপয় গৃহস্থং কুরু ত্বয়ৈবায়ং গৃহিণীমানস্বিত্যর্থঃ। * * * * * * 'ন গৃহং গৃহমিত্যাহু গৃহিণী গৃহমুচ্যতে' ইত্যুক্তেঃ। লীলাবিলাসের অনুকূল সময়ের জন্য মেঘমেদুর অম্বর ও রাত্রিকালের অবতারণা করা হইয়াছে। এই শ্লোকটী একাধারে নমস্কার ও কাব্যের বস্তুনির্দ্দেশবাচক। শ্রীগীতগোবিন্দ

মহাকাব্য ; সুতরাং তাহাতেই বা 'সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে' তস্য লক্ষণং— 'আশীর্নমস্ক্রিয়াবস্তু-নির্দ্দেশোবাপি তন্মুখং'—কাব্যাদর্শোক্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে কেন? ইহাই পূজারি গোস্বামীর মত। রসিকপ্রিয়াকারমিবারের রাণা কুম্ভ শ্লোকের প্রথম দুই চরণকে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি 'নিদেশতঃ' পদের অর্থ করিয়াছেন, নিকট হইতে ; 'ভীরু' পদের অর্থ করিয়াছেন, "এভির্ভয়হেতুর্ভিঃ স্মরাহতীঃ সোঢ়ুমসমর্থঃ। 'গৃহং প্রাপয়' হে রাধে তত্তস্মাদ্ধেতোঃ ইমং মল্লক্ষণং জনং গৃহং প্রাপয়, সামান্যনারী ব্যাবৃত্ত্যা গৃহিণী নিবর্ত্ত্যে সংভোগাদিকর্ম্মণি সমুদিতা ভবেদিত্যর্থঃ। তস্মাদিতি কিং মতোয়ং মল্লক্ষণো জনো ভীরুঃ।" তিনি মেঘাদিকে উদ্দীপন-বিভাব, শ্রীরাধাদিকে আলম্বন-বিভাব এবং ভীরুতাকে অনুভাবরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৈষ্ণব কবি রসময় দাস শ্লোকের প্রথম দুই চরণকে নন্দবাক্য ও সখীবাক্য উভয় প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের পঞ্চদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে বর্ণিত বিবরণ বিবৃত করিয়াছেন।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে,—"একদা গোপরাজ নন্দশিশু শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া বৎসগাভীসহ গোষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন। তিনি ভাণ্ডীর বনে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময় অকস্মাৎ নিবিড় মেঘে গগনতল আবৃত হইয়া আসিল(১) এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবলবেগে বৃষ্টি পতিত হইতে লাগিল। মেঘগর্জ্জন, কড়কাপাত, ঝঞ্ঝাপ্রবাহ বনমধ্যে দারুণ দুর্য্যোগের সৃষ্টি করিল। ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকিত হইয়া বনভূমির অন্ধকার দ্বিগুণিত করিয়া তুলিল। নন্দ শ্রীকৃষ্ণের জন্য অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে মেঘ ও বৃষ্টি যেমন অন্তর্হিত হইয়া গেল, অমনি দুর্য্যোগ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির প্রসন্ন হাস্যের মত অপরূপ রূপময়ী কিশোরী শ্রীরাধা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নন্দ

"আদ্যাশক্তিস্ত্বং দেবী ত্বমেব বিশ্বরূপিণী।
গোলোকবাসিনী ত্বং হি ত্বমেব শ্রীহরিপ্রিয়া॥"

ইত্যাদিরূপে তাঁহার স্তব করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে সেই কিশোরীর ক্রোড়ে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর—

(১) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই বর্ণন হইতে ইহা অকালজলদোদয় বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকের চিত্র বর্ষার স্মৃতিই জাগাইয়া তুলে।

"ক্রোড়ে কৃত্বা তু শ্রীকৃষ্ণং শ্রীমতী রাধিকেশ্বরী।
জগাম গুপ্তভাবেন নিবিড়ং গহনং বনং ॥"

তথায় শ্রীকৃষ্ণ নটবর-বেশ ধারণ করিলেন। ইত্যবসরে ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীকে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া দিলেন।

ইহাই হইল ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণোক্ত বিবরণের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম। রসময় দাস বলেন, ব্রহ্মবৈবর্তোক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণের এই বিবাহ-ব্যাপারকে লক্ষ্য করিয়াই জয়দেব তাঁহার সূচনা-শ্লোকটী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে এই মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। প্রাগুক্ত বিবিধ মতবাদ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই।(২) আমরা যেরূপ ভাবে এই শ্লোকটী বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি, এ স্থলে সংক্ষেপে তাহাই বিবৃত করিতেছি মাত্র। শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে কবি যেরূপ ভাবে তাঁহার শ্রীরাধা ও কৃষ্ণকে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে তাঁহাদের বিবাহ প্রভৃতি লৌকিক বন্ধনের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, বোধ হয় এরূপ অনুমান না করিলেও চলিতে পারে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ-চরিত্রের কোনও অংশের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, এমন কি শ্রীবৃন্দাবন-লীলারও আনুসঙ্গিক প্রায় অপর সমস্ত অংশটুকু পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের প্রেমলীলাকেই তিনি মুখ্যভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীগীতগোবিন্দের আদ্যোপান্ত শ্রীবৃন্দাবনের শ্রেষ্ঠভাব—মধুরভাবেই ওতঃপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। শ্রীরাধাকৃষ্ণ নিত্যবস্তু। তাঁহাদের লীলা নিত্যলীলা; অনাদি পুরুষ-প্রকৃতির মধুরলীলা; অনাদিকাল হইতে নিত্য বৃন্দাবনে এই লীলারঙ্গ নিত্য অভিনীত হইয়া আসিতেছে। তাই কবি কোনও প্রসঙ্গের অবতারণা না করিয়াই এই অজ-নিত্য-শাশ্বত পুরাণ পুরুষ-প্রকৃতির আদিমধ্যান্তহীন লীলার জয়গান করিয়াছেন—'জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ'।

---

(২) বস্তুনির্দ্দেশ অর্থে কাব্যের বর্ণনীয় বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আভাষ। এই লীলাবিলাস যে পূর্ব্ব হইতেই চলিয়া আসিতেছে এবং গ্রন্থমধ্যে যে মানভঞ্জন বর্ণিত হইবে, 'ভীরু' শব্দে তাহাই সূচিত হইয়াছে। 'নন্দ' অর্থে 'আমরা আনন্দজনক সখী' বলিয়াই মনে করি। আমাদের মনে হয়, কবি এই প্রথম শ্লোকে শ্রীগীতগোবিন্দে বর্ণিত সমগ্র বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র সূত্রাকারে পরিব্যক্ত করিয়াছেন।

"ভক্ত কহে ধরণীর মহারাসে সদা ক্রীড়ামত্ত রসিকশেখর"। ঘূর্ণায়মান রাসমণ্ডলের মণিকিঙ্কিণী হইতে কত বিশ্বজগতের সৃষ্টি হইতেছে। কত বিশ্ব জগৎ ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া এই মহারাস-মণ্ডলে আত্মসমর্পণ করিতেছে। কত সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারকা আসিতেছে, যাইতেছে। কত চতুরাননের উদ্ভব-বিলয় ঘটিতেছে। মহারাসলীলার বিরাম নাই! শ্রীগীতগোবিন্দে সেই মহারাসলীলার বর্ণনে কবি এক অপূর্ব্ব জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি-চাতুর্য্যে আদি কবির সৃষ্টিগৌরবস্পর্দ্ধী মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত'মাত্র এই শ্রীগীতগোবিন্দের সহিত তুলনীয় হইতে পারে। 'মেঘদূতে' কবি যেমন এক নূতন জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; তথায় ঈর্ষা, ক্ষোভ, দুঃখ, কলহ, জরা, মৃত্যু নাই। রজত-শুভ্র শিবনিবাস কৈলাসাচলের এক প্রান্তে সেই আনন্দ-নিকেতন কুবেরপুরী মহানগরী অলকা। কিরূপ সে নগর—

কালিদাস বর্ণনা করিতেছেন—

বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃসেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধগম্ভীরঘোষং।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ॥

* * * *

যত্রোন্মত্ত-ভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা
হংসশ্রেণী রচিতরসনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্য ভাস্বৎকলাপা
নিত্য জ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোঃ বৃত্তিরম্যাঃ প্রদোষাঃ॥

আরও কথা আছে। এমন সে দেশ যে, সেখানে আনন্দজনিত নয়নসলিল ভিন্ন অপর কোনও কারণে লোকের চক্ষে জল দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রণয়-কলহ ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারের কলহ শুনিতে পাওয়া যায় না। তথায় যৌবন ভিন্ন বয়স নাই; তাপ একটু আছে। কিন্তু তাহা মদনশরজ; অবশ্য তাহাও আবার 'ইষ্টসংযোগসাধ্যাৎ' বেশী প্রখর হইবার যো নাই। কারণ শিবধাম বলিয়া! মদনের ভয় আছে কি না! আশ্চর্য্য দেশ! কিন্তু দেশের লোকে দিনযাপন করে কিরূপে? অন্য কবি হইলে কি করিতেন জানি না; তবে কালিদাস পশ্চাৎপদ হইবার পাত্র নহেন, তিনি সে দেশের লোকের ও কার্য্যের তালিকা দিয়াছেন। সে দেশের

লোকও কাজ করে। কেহই বসিয়া থাকে না। সকলেই সুখাস্বাদে ব্যাপৃত। কন্যাকুল স্বর্গগঙ্গার মনোহর সৈকতে মণি লুক্কায়িত রাখিয়া তাহারই অনুসন্ধান-ক্রীড়ায় নিরতা থাকে। মন্দারগন্ধামোদিত মন্দাকিনীস্নাত মন্দ-পবনে তাহাদের সকল ক্লান্তি দূর হইয়া যায়। যদি কেহ কখনও এতটুকুও ক্লান্ত হইয়া পড়ে, পার্শ্বেই পুষ্পস্তবকভূষিত মন্দারতরু, তাহারা তাহারই ছায়ায় গিয়া খেলা করে, এই কাজ! পুরুষসকল বরাঙ্গনাগণসহ বৈভাজ-পুরীর বহিরোদ্যানে আসিয়া কিন্নরদিগের সঙ্গীত শ্রবণ করে, এই কাজ! শ্রীজয়দেবেরও এইরূপ একটী অপূর্ব্ব সৃষ্টি—শ্রীবৃন্দাবন-মাধুর্য্যের দেশ। এই শ্রীবৃন্দাবনে নায়ক চির-কিশোর, নায়িকা চির-কিশোরী, সখাসখীগণও তাঁহাদেরই অনুরূপ। দেশের লোক ঈর্ষাদ্বেষ জানে না। এমন কি সুখ দুঃখ বলিয়াও তাহাদের নিজের বলিতে কিছুই নাই। তাহারা (নায়ক-নায়িকারা) শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা করিয়াই সুখী, শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রীতি-সম্পাদনই তাহাদের জীবনের ব্রত। দেশে কলহ আছে, প্রণয়-কলহ; কিন্তু বড় গুরুতর; আরম্ভ হইলে সে কলহ শীঘ্র শেষ হইতে চাহে না। "দেহি পদপল্লবমুদারম্" —শ্রীবৃন্দাবনে এমন কিছু বেশী কথা নহে। এ দেশের নায়ক-নায়িকার নিত্যকার্য্য মধুরলীলাবিলাস। সে লীলা নিত্য নূতন, কখনও পুরাতন হয় না। লীলায় শ্রান্তি-ক্লান্তি নাই। লীলারস আস্বাদন করিয়া দেশ চির-নবীনতা লাভ করিয়াছে; অমর হইয়া গিয়াছে। দেশবাসী তাই মোক্ষ পর্য্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করে। কেবল মিলনে রসের পুষ্টিসাধন হয় না। যুগলে যদি মিলিত হইয়াই রহিলেন, তাহা হইলে আর রসের বিকাশ হইবে কিরূপে? তাই কবি তাঁহার অপূর্ব্ব দেশের অধিবাসিবৃন্দের দিনযাপনের একটী চিত্র দিয়াছেন। অভিসারে বাসকসজ্জায় উৎকণ্ঠিতা। বিপ্রলব্ধায়, খণ্ডিতায়, মানে, কলহান্তরিতায় দিনরাত্র অবিচ্ছেদে এই লীলা চলিতেছে। আমাদের মনে হয় লীলার এই নিত্যতা-রক্ষার জন্যই কবিকে বর্ষার অবতারণা করিতে হইয়াছে। লৌকিক জগতে প্রচলিত কতকগুলি লীলা-পর্ব্বের মধ্যে শয়ন, পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন, উত্থান, যাত্রা অন্যতম।

ভবিষ্য পুরাণ বলেন,—'নিশিস্বপ্নো দিবোত্থানং সন্ধ্যায়াং পরিবর্ত্তনং'—অর্থাৎ নিশিতে শয়ন, দিবাতে উত্থান ও সন্ধ্যাকালে পার্শ্বপরিবর্ত্তন যাত্রার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু নিত্যলীলার দেশে ত এ সব থাকিবার কথা নহে। সুতরাং লৌকিক জগতের বিধি-নিষেধের এই বাধা-নিরসন জন্যই, সূচনা শ্লোকে কবিকে

বর্ষার আভাষ দিতে হইয়াছে! আষাঢ়ের শুক্লা দ্বাদশী নিশাতে শ্রুতি যখন নিবেদন করিতেছেন—

পশ্যস্ত মেঘাস্থপি মেঘশ্যামং
হ্যপাগতং সিচ্যমানাং মহীমিমাং
নিদ্রাং ভগবান্ গৃহ্নাতু লোকনাথঃ
বর্ষামিমাং পশ্যতু মেঘবৃন্দম্ ॥

রসিক ভক্ত তখন বলিবেন, না না নিদ্রা কিগো? নিদ্রার কথা কি? বৃন্দাবনে কি আবার শয়ন-উত্থান-নিদ্রা-জাগরণ আছে? সে যে অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ-রসে গড়া দেশ। সে দেশে আছে কেবল প্রেম। সে দেশের সম্বন্ধে বলা যায়—

ন যত্র বাচো ন মনো ন সত্বং
তমো রজো বা মহদাদয়োঽমী।
ন প্রাণবুদ্ধীন্দ্রিয় দেবতা বা
ন সন্নিবেশঃ খলু লোককল্প।
ন স্বপ্নজাগ্রন্ন চ তৎসুষুপ্তং
ন খং জলং ভূরনিলোঽগ্নিরকঃ।
সংসুপ্তবচ্ছূন্যবদপ্রতর্ক্যং
তন্মূলভূতং পদমামনন্তি ॥

সে দেশের নায়ককে কি করিয়া বলিব—"নিদ্রাং ভগবান্ গৃহ্নাতু লোকনাথ"? সেই জন্য কবি বলিতেছেন,—"শ্রীরাধামাধবয়োর্জয়ন্তিযমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ"। 'রসোবৈ সঃ'। তিনি যে রসস্বরূপ। রসসমুদ্র কি কখনও স্থির হইয়া থাকিতে পারে? তিনি যে আপনাকে দেখিয়া আপনি বলেন—

অপরকলিতপূর্ব্বঃ কশ্চমৎকারকারী
স্ফুরতু মম গরীয়ানেষ মাধুর্য্যপূরঃ।

তাঁহার যে "আপন মাধুরী দেখিতে না পাই সদাই অন্তর জ্বলে"! তিনি কি লীলাবিলাস ছাড়িয়া নিদ্রিত থাকিতে পারেন? তাই কবি বলিয়াছেন—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুব শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিদং রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ।

কবি-বাক্যের প্রতিধ্বনি করিয়া আমরাও বলি—হে শ্রীরাধামাধব পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের হৃদি-বৃন্দাবনে তোমাদের এই নিত্যলীলা চির-জয়যুক্ত হউক।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

[শ্রীসত্যব্রত তত্ত্বরত্ন]

উপাসনা ঃ—

উত্তর দিবার কিছু না থাকিলেও উত্তর দিবার রীতি অন্য দেশে আছে কি না, জানি না ; কিন্তু এ দেশে তাহার দৃষ্টান্ত নিত্য দেখিতে পাই। এ হিসাবে 'ভারতী' সর্ব্বাগ্রগণ্য। তার পর 'প্রবাসী'র নাম করিতে পারা যায়। দুঃখের বিষয়, রাধাকমল বাবুর 'উপাসনা'ও সেই দলে ঢুকিতেছে !

* * * *

প্রমাণ ইহার যাঁহারা দেখিতে চাহেন, তাঁহারা আষাঢ়ের 'উপাসনায় প্রকাশিত "১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা" শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন। শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ রায় ইতিপূর্ব্বে 'ভারতবর্ষে'র 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে' শ্রীযুত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণের লিখিত "১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গসাহিত্য বিবরণে"র যে সব ত্রুটি দেখাইয়াছিলেন, 'উপাসনা'র উপরি-উক্ত প্রবন্ধে তাহার বিরুদ্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। কথাগুলি যুক্তিপূর্ণ হইলে আমরা খুসী হইতাম। কিন্তু যুক্তিপূর্ণ হওয়া ত দূরের কথা,—প্রবন্ধের অধিকাংশ স্থানই অর্থহীন। লেখক কি বলিতেছেন, তাহা তিনি নিজেই বুঝেন না।

* * * *

অমূল্য বাবুর পক্ষ সমর্থন করিয়া লেখক লিখিয়াছেন, "আমরা ইহার দোষ সমর্থন করিতে না পারিলেও ইহার গুণ উপেক্ষা করিতে পারি না"। আবশ্যক কি ? উপেক্ষা করিতে কে মাথার দিব্য দিয়াছে ? "ত্রুটি দেখাইয়া না দিলে সংশোধনের আশা থাকে না ; কিন্তু ত্রুটী দেখাইয়া দিলেও উৎসাহ দেওয়া হয় না" লিখিয়া এই লেখকটি ত্রুটী-প্রদর্শনের কুফল প্রদর্শন করিয়াছেন। আসল কথা, লেখকের আবদার এই যে, আমরা দোষ সমর্থন করিতে পারিব না ; কিন্তু তোমরা দোষ দেখাইবার কে ?

পরে লেখক সাহিত্য-পঞ্জিকার বিরুদ্ধে অভিযোগের তালিকা দিয়াছেন :—

(১) সাহিত্য-পঞ্জিকায় অনেক গ্রন্থের, গ্রন্থকারের ও লেখকের নাম বাদ গিয়াছে। (২) সুপণ্ডিত অমূল্যচরণের লিখিত বঙ্গসাহিত্য-বিবরণ 'ভারতবর্ষে' প্রতিবাদ-প্রকাশের পরও সাহিত্য-পঞ্জিকায় ছাপা হওয়ায় সাহিত্য-পঞ্জিকার

দৈন্য প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম অভিযোগের উত্তরে লেখক বলিতেছেন,—দেশের সাহিত্যিকেরা তাঁহাদের আহ্বান সত্বেও কোনও সাহায্য করেন নাই। অতএব তাঁহাদের এ অভিযোগ করিবার অধিকার নাই এবং তাঁহারা ভাত না দিয়া কিল মারিয়া গোঁসাইগিরি করিতে গেলে লেখকের আপত্তি আছে। এই অপূর্ব্ব যুক্তি-অনুসারে আর ভবিষ্যতে মাসিক পত্রে সমালোচনা করা চলিবে না। সমালোচনায় বিরুদ্ধ কথা থাকিলেই সম্পাদকেরাও বলিতে পারিবেন যে, যখন আমরা উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য হাত পাতিয়াই আছি এবং সকল খ্যাতনামা সাহিত্যিককেই লিখিত ও মৌখিক তাগিদ নিয়তই করিতেছি, তখন তাঁহাদের উপযুক্ত প্রবন্ধাদি-প্রেরণের অবহেলায় আমাদের মাসিক পত্রের কোনও দৈন্যের জন্য আমরা দায়ী নহি এবং কেহ দায়ী করিলে তাঁহার কষ্টি ছিঁড়িব!

দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে লেখক বলিতেছেন, 'ভারতবর্ষে' প্রতিবাদ বাহির হইবার পরে কোন ও কোনও সমালোচক বলিয়াছেন—ছিঃ ঐ রচনাই আবার ছাপে! 'ভারতবর্ষে' প্রতিবাদ বাহির হইবার পূর্ব্বেই রচনাটী সাহিত্য-পঞ্জিকায় ছাপা হইয়াছিল কি না সে খোঁজ অবশ্য তাঁহারা রাখেন নাই।

হাঁ, এ কথা আমরা স্বীকার করি যে, পূর্ব্বেই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া গিয়া থাকিলে উহাকে বাদ দেওয়া এই কাগজের দুর্ভিক্ষের দিনে অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য; সুতরাং 'সাহিত্য-পঞ্জিকা'র সম্পাদকের দোষ দেওয়া চলে না!

লেখকের মতে অমর বাবুর আর এক অপরাধ যে, তিনি লিখিয়াছেন,—শরৎ বাবুর লেখা এখন বাঙ্গালার পাঠক-সমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত। ইহাতে লেখক আপত্তি করিয়া বলিতেছেন যে, বাঙ্গালার পাঠকসমাজে এক দিকে যেমন দীনেশ বাবুর মত গুণ-বিবেচনের লোক আছেন, অপর দিকে তেমনি অমূল্য বাবুর মত দোষ-বিবেচনের লোকেরও অভাব নাই; সুতরাং শরৎ বাবুর লেখা বাঙ্গালার পাঠকসমাজে সমাদৃত, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাঙ্গালার পাঠকসমাজের সকলেই পারিবেন কি না সন্দেহ। সত্যানন্দ বাবু ও অমূল্য বাবুর আপত্তিতে শরৎ বাবুর লেখা সর্ব্বজনসমাদৃত হইতে পারিল না, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে!

শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর "উল্কা"-প্রসঙ্গে অমূল্য বাবু লিখিয়াছেন, "উল্কাতে উল্কা ও সাজাদী নামক গল্প আছে। লেখিকা গল্পরচনায়ও কিছু আর্ট ও মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন। রচনায় সমাস-বহুল বাক্যাবলী-ব্যবহারের

প্রলোভন লেখিকা সংবরণ করিতে পারেন নাই, এরূপ রচনা সীতার বনবাসের যুগে মানাইত, আজকাল কি শোভন হইবে?"

'শ্রুতিস্মৃতি' সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"মানসী"তে প্রকাশিত নাটোরাধিপতির অহমিকাশূন্য অনাড়ম্বর সরল জীবনস্মৃতিকাহিনী শ্রুতিস্মৃতি নাম দিয়া প্রকাশিত হইতেছে। ইহার ভাষা নিতান্ত সরল ও অনাড়ম্বর অথবা বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ হয় নাই বলিয়া সাহিত্য-সমাজে আদৃত হইয়াছে।"

'শ্রুতিস্মৃতি'র ভাষা লেখকের নিরপেক্ষ ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে আড়ম্বরশূন্য ও সরল বলিয়া বোধ হইয়াছে; আর উল্কার ভাষা সম্বন্ধে তিনি নির্ভীকভাবে বলিতেছেন, "উল্কা" গল্পের 'রচনায় সমাসবহুল বাক্যাবলী ব্যবহারের প্রলোভন লেখিকা সংবরণ করিতে পারেন নাই। এরূপ রচনা সীতার বনবাসের যুগে মানাইত, আজকাল কি শোভন হইবে?' কিন্তু প্রত্যক্ষ দর্শনের স্থির সিদ্ধান্ত বলিতেছে,—উল্কার ভাষা যতই সমাসবহুল হউক, শ্রুতিস্মৃতির ভাষা তাহার চেয়ে সমাস-বহুল এবং সংস্কৃত-ঘেঁষা। সে ভাষার নিকট সীতার বনবাসের ভাষাকেও অনেক সময় মাথা হেঁট করিতে হয়।

এ সম্বন্ধে 'উপাসনা'র লেখক লিখিতেছেন, "বিষয়-হিসাবে শ্রুতিস্মৃতির ভাষার সহিত উল্কার ভাষার তুলনা দেওয়া সঙ্গত নহে।" "রাজার মাথায় রাজমুকুট শোভা পায়," শ্রুতিস্মৃতির ভাষাও অনাড়ম্বর নহে, উল্কার ভাষাও অনাড়ম্বর নহে। শ্রুতিস্মৃতির ভাষা সংস্কৃতবহুল হইলেও উহাতে চলিত শব্দ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। শ্রুতিস্মৃতির ভাষা অমূল্য বাবু কেন অনাড়ম্বর বলিয়াছেন বুঝিলাম না।

আমরাও তাহা বুঝি নাই বলিয়াই এত গোলযোগ। 'উপাসনা'র লেখক যদি তাহা না বুঝিলেন, তবে আমাদের বুঝাইলেন কি? রাজার ভাষা রাজার মাথায় থাকুক, তাহাতে তো আমরা আপত্তি করি নাই বা ঐরূপ ভাষা ভাল কি মন্দ তাহাও বলি নাই, বিষয়-বিভাগের কথাও তুলি নাই। কেবল যিনি উল্কার ভাষাকে সীতার বনবাসের ভাষা ও শ্রুতিস্মৃতির ভাষাকে অনাড়ম্বর বলেন, তাঁহার মতের মূল্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। সে বিষয়ে যখন সত্যানন্দ বাবু আমাদের সঙ্গে একমত, তখন তাঁহার বক্তব্যটা যে কি তাহা আমাদের বোধগম্য হইল না।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-লিখিত গল্পগুলির সম্বন্ধে অমূল্য বাবু যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহার প্রতিবাদ করায় সত্যানন্দ বাবু বলিতেছেন,

শরৎ বাবুর গল্পগুলির সুখ্যাতি না করায় 'ভারতবর্ষ' যদি অসন্তুষ্ট হন, তাহা হইলে যে কোনও মাসিক পত্রিকা যে কোনও লেখকের যে কোনও রচনার প্রতিকূল আলোচনায় অসন্তুষ্ট হইবেন না কেন? তাহা হইলে সমালোচকগণকে আপাততঃ বিশ্রাম করিতে হয় অথবা যিনি বা যাঁহারা প্রতিবাদ করেন না, তাঁহার বা তাঁহাদের বিরুদ্ধে মধ্যে মধ্যে দুই চারি কথা বলিয়া সমালোচনার অভ্যাসটা রক্ষা করিতে হয়। ইহা কি ব্যাজস্তুতি? অমূল্য বাবুর সমালোচনাকে এতটা হেয় ও নীচ আকার দিতে আমরা সাহস করি নাই!

ভারতী:—

'ভারতী' দেখিতেছি ক্রমে জুয়ার আসর হইয়া দাঁড়াইল! যে 'ভারতী' শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত, শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী ও রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক পূজিত, সেই 'ভারতী' আজ কয়েকটা চ্যাংড়ার হাতে পড়িয়া মাটি হইতে বসিয়াছে!

* * * *

'বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়—এ কথাটা ভারী খাঁটি। অনেক অভিজ্ঞতার ইহা ফল। রামানন্দ বাবু ব্রাহ্ম, কিন্তু তাঁহার বেতনভোগী কর্ম্মচারী চারু বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু। অথচ দেখিতে পাওয়া যায়, হিন্দুকে গালি দেওয়ায় শ্রীমান্ চারু যত মজবুত, রামানন্দ বাবু তত নহেন। 'ভারতী'তেও এরূপ দৃষ্টান্ত আছে! 'ভারতী'র স্বত্বাধিকারী শ্রীমান্ মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ঠাকুর-বাড়ীর জামাতা, কিন্তু ইহার অন্যতম সম্পাদক শ্রীমান্ সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় শুনিতে পাই হিন্দু ঘরের ছেলে। অথচ এই সৌরীন এবং আরও দুই একটী হিন্দু ছোক্‌রা 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় হিন্দুর সমাজ-নীতির অঙ্গে আঁচড়াইবার কামড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার প্রমাণ—'ভারতী'র ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস 'আলেয়ার আলো'।

* * * *

এ সব কেলেঙ্কারী ছাড়া 'ভারতী' আর এক নূতন কেলেঙ্কারীর অভিনয় আরম্ভ করিয়াছে। গদ্যে, পদ্যে, ছবিতে ও ছড়ায় 'ভারতী' চিত্তরঞ্জনকে বিনাদোষে অপদস্থ করিবার জন্য বিষম তাল ঠুকিতেছে। রাজ-নীতির কথা লইয়া তাহারা রবি বাবুকে ধ্বনি এবং চিত্তরঞ্জনকে তাহার প্রতিধ্বনি প্রতিপন্ন করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে!

অবশ্য রবি বাবুর বর্ত্তমান যে Political standpoint তাহা 'বিশ্বকবি' 'বিশ্বকবি' বলিয়া গলা কাটাইয়া মরিলেও শিক্ষিত-সমাজে কেহ সমর্থন করিতে পারিবেন না। চিত্তরঞ্জন সেই কাঁচাস্থানটুকুতে আঘাত করিয়াছিলেন বলিয়াই 'ভারতী' ও 'প্রবাসী'র দল নিজের ঘর সামলাইতে না পারিয়া ও ক্রোধে জ্ঞান হারাইয়া পরের ঘরে ছোট ছোট ঢিল ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন। এরূপ অদ্ভুত চেষ্টার ব্যর্থতা ও হাস্যকরতাই গত আষাঢ়ের 'ভারতবর্ষে'র 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে' বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

* * *

'ভারতী'র লেখকও বোধ হয় অন্তরে অন্তরে তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। সেই কারণেই, যদিও সেই লেখায় রঙ্গ থাকিলেও প্রতিবাদ করিবার কিছুই ছিল না, তথাপি কোনও রকমে নিজের পদটা বজায় রাখিবার জন্ত অপরূপ বচনবিন্যাসে ও নানারূপ অবান্তর কথা আনিয়া লেখক একটা গোলে হরিবোল পাকাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। আরও মজা এই যে, চিত্তরঞ্জনের 'সকল রচনার সকল আইডিয়া'র কথা ছাড়িয়া দিয়া লেখক এখন সঙ্কীর্ণতর মূল আইডিয়াটায় (বিশ্ব আইডিয়া নহে তো?) আসিয়া পড়িয়াছেন! তবু মন্দের ভাল। যাহা হউক, সে রঙ্গ আর নূতন করিয়া করিবার কোনও প্রয়োজন নাই। তবে 'ভারতী'র এই নূতন দু'চারিটি লঘু ভারতী যাচাই করিয়া দেখিলে নেহাৎ মন্দ হয় না। কারণ তাহাতে কিঞ্চিৎ রসের উপাদান আছে।

সর্ব্বপ্রথমেই লেখক 'ভারতবর্ষে'র 'সাহিত্য-প্রসঙ্গে'র কোটেশানে খুঁত ধরিয়াছেন। গত ১৩২৩ সালের পৌষের 'ভারতী'তেও এরূপ একটা অভিযোগ ছিল; কিন্তু তাহার উত্তরে 'ভারতবর্ষে'র লেখক 'ভারতী'র অর্থ বুঝিবার গলদ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। এই 'ভারতী'র দলের কাজকর্ম্ম বড় অদ্ভুত রকমের!—পাণ্ডিত্য-পাগলামীর অপরূপ নিদর্শন। ইঁহাদের 'বিশ্ব-সাহিত্যে'র সহিত ভাল রকম পরিচয় আছে, কথায় কথায় গ্রীক্, লাতিন, ফরাসী, রুসীয় সকল সাহিত্যের ঠিকুজী-কোষ্ঠী গণিয়া দেন; আবার এদিকে মনে মনে আপনাদিগকে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের কর্ণধার বলিয়া মনে করেন, কিন্তু মজা এই যে, আসল বাঙ্গলা রচনা ব্যাখ্যা করিতে বসিলেই গোলযোগ হইয়া যায়। তখন বঙ্কিমকে নীতির পরিপন্থী বলিয়া ঠাওরাইয়া ফেলেন; "এমন কি" "দিয়া" প্রভৃতি কথাগুলির কোনও সার্থকতা

খুঁজিয়া পান না। এবারেও তদ্রূপ দু' চারিটি উদ্ভট সিদ্ধান্ত করিয়া ফেলিয়াছেন ! প্রথমে একটা ছোট উদাহরণ দেখাই:—লেখক অনন্ত আর সান্তের কথা লইয়া বড় দুরন্ত তর্কের সৃষ্টি করিয়াছেন। চিত্তরঞ্জন লিখিয়াছিলেন, "যখন জানিলাম মা আমার আপন গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন" অর্থাৎ অনন্ত যে বিশ্বরূপ তাহা এই নিজ বিশিষ্ট গৌরবে গৌরবান্বিত সান্ত স্বদেশেই প্রকটিত হইয়াছে। এই সান্তের মধ্যেই তিনি অনন্তকে দেখিতে ভালবাসেন—যেমন হিন্দু তাহার প্রতিমায় বিশ্বরূপ দেখিতে পায়। ইহার সহিত 'বিশ্বময়ীর আঁচলপাতা'র কোনও সম্বন্ধই নাই, তবে ইহা অবশ্য পরিতাপের বিষয় যে, যে 'বিশ্ব' কথাটা লইয়া লেখক এত দিন নাড়াচাড়া করিতেছেন, যাহার জোরে তিনি সকলের মুখ চাপিতে চান, সেই 'বিশ্ব'ই এখন তাঁহাকে এরূপ ফাঁদে ও ক্যাসাদে ফেলিয়াছে! হ্যামলেটের কথায় এখানে বাস্তবিক বলা চলে—The engineer is hoist with his own petard !

*　　*　　*　　*

এইবার একটু 'বঙ্কিম-বিপত্তি' উপভোগ করুন! 'ভারতী' অমর বাবুর কোটেশানের খুঁত ধরাইতে গিয়া কমলাকান্তের "জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো! ইহাই তাহাদের পলিটিক্স"—এই কথাটির ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "যে জাতি পরাধীন, সে জাতির পলিটিক্স মানেই ভিক্ষা চাওয়া"—অতএব ইহার মধ্যে আত্মশক্তির কোনও কথা নাই। কি সর্ব্বনাশ! এই ব্যঙ্গের মধ্যে যে আত্মশক্তির গূঢ় ইঙ্গিত নিহিত রহিয়াছে তাহা লেখক ধরিতে পারিলেন না! এই ব্যঙ্গোক্তিকেই পরিষ্কার রাষ্ট্রনীতি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন! হায় বঙ্কিম! 'বিশ্বসাহিত্যে'র সহিত যাহাদিগের ভাল রকম পরিচয় আছে, তাহারাই যখন তোমার কমলাকান্ত বুঝিল না, কমলাকান্তের ব্যঙ্গকে সহজ-ভাবে গ্রহণ করিল,—তখন আর তোমার ঐ লেখার সার্থকতা কি ?

*　　*　　*　　*

লেখক অনেক পরিশ্রম করিয়া ভূদেবের জাতিত্বের আইডিয়ার সহিত চিত্তরঞ্জনের জাতিত্বের আইডিয়ার প্রভেদ দেখাইয়াছেন। সেজন্য ধন্যবাদ, তবে ইহা না দেখাইলেও চলিত। ভূদেব-বর্ণিত জাতিত্বের বিশেষত্ব কি, তাহা আবিষ্কার করিয়া 'ভারতী'র দল—যাঁহারা রবীন্দ্র-সাহিত্যকেই একমাত্র বাঙ্গালা সাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথের উক্তিমাত্রকেই "আদি ও অকৃত্রিম" পেটেণ্ট আইডিয়া বলিয়া মনে করেন,—তাঁহারা বিপুল আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন; তবে

খাঁটী বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা কিছু নূতন তথ্য হইবে না। এক জাতি যে অন্য জাতির সাহিত মিশ খায় না, ইহাই আমরা তাঁহার রচনা হইতে তুলিয়া দিয়াছিলাম। 'ভারতী' বলিতেছেন, এখানে জাতি অর্থে বংশ! লেখক এই সুযোগে "জাতিত্ব এবং বিশ্বমানবের মধ্যে যে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ তাহা ভূদেব প্রভৃতিতে নাই"—প্রভৃতি দুষ্পাচ্য কথা লাগাইয়া ধাঁধা লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু আসল কথা এই যে, ভূদেব বা বিবেকানন্দ শুধু বাঙ্গালী বা হিন্দুজাতি বলিয়া কোনও কথা বলেন নাই—সাধারণ জাতিহিসাবেই জাতিতত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। "এক জাতীয় লোক কিছুতেই অপরজাতীয় হইতে পারে না"—ইহা কি সাধারণ ও সার্ব্বভৌমিক কথা নহে? তবে একটা কথা এই যে, তাঁহারা ঐ বিশ্ব কথাটি ব্যবহার করেন নাই। কি করিবেন বলুন, যুগধর্ম্মের দোষ—তখন তো আর ঐ সব ফাজিল কথার এত প্রচলন ছিল না!

* * * *

এই সব দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, এ কেলেঙ্কারী কেন? এমন করিয়াই কি সাদাকে কালো ও কালোকে সাদা করিতে হয়? 'ভারতী' কি শেষে জুয়ার আসরে পরিণত হইল? দিন দুপুরে স্পষ্ট দিবালোকে 'ভারতী' প্রচার করিতেছেন—"বঙ্কিম নীতির পরিপন্থী ছিলেন, বিবেকানন্দের লেখায় আত্মশক্তির উদ্বোধন নাই, রবীন্দ্রনাথ নূতন morality, নূতন দেশভক্তি, নূতন সদ্‌গুণাবলী আবিষ্কার করিয়া জগৎ আলোকিত করিতেছেন। হায় রে, এই গত পাঁচ হাজার বৎসর যাহারা জন্মিয়া মরিয়া গিয়াছে তাহারা কি অভাগা—তাহারা অর্দ্ধশিক্ষিত দেশভক্তি ও অর্দ্ধবিদিত আত্মশক্তি লইয়া কিরূপে মুক্তিমার্গে গমন করিয়াছে! ছিঃ! ছিঃ! ভগবান তোমার সেরা সৃষ্টি মানুষকে গড়িয়া এত দিন পশু করিয়া রাখিয়াছিলে! রবীন্দ্রনাথের জন্মের পূর্ব্বে তাহাদিগকে আত্মনির্ভরের শক্তি পাঠাইয়া দাও নাই!

* * * *

আর কি বলিব, তবে শেষ একটা বলিয়া রাখি। কথার জাল বুনিয়া ও শব্দের 'ছিনিমিনি' খেলিয়া বিশ্বসাহিত্যেরই চর্চ্চা কর বা কীট্‌স্, শেলী, হুইট্‌ম্যান, ইব্‌সেন ও জলালুদ্দীন রুমি প্রভৃতিকে জড় করিয়া, রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিয়া নিজে নিজেই মস্‌গুল্ হইয়া থাক, তাহাতে কাহারও কিছু আসিয়া যাইবে না কিন্তু বেচারা ভূদেব, বঙ্কিম বা বিবেকানন্দের মস্তক

লইয়া অনর্থক ভাঁটা খেলিও না; কারণ তাহাতে ফাঁকি চলিবে না ; এখনও দেশের বিস্তর লোক বঙ্কিম-ভূদেব-বিবেকানন্দে মজিয়া আছে।

একটা কথা ছাড়িয়া যাওয়া উচিত হইবে না। 'ভারতী' লিখিতেছেন—"তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) থিওরিও আছে এবং তার practical applicationও আছে।" আছে নাকি? আঃ বাঁচিলাম! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি সে থিওরিটা কি? আমরা তো হবুবোলার মত অনেক বোলই তাঁহার মুখে শুনিয়াছি,—এখন কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা ধরি? মতের সাদৃশ্য, মতের অপহরণ প্রভৃতি বলিয়া এত যে লম্পঝম্প করিতেছ, জিজ্ঞাসা করি, রবীন্দ্রনাথের কি মত বলিয়া একটা জিনিষ আছে? সে কথা তো বহু পূর্ব্বেই 'রবিয়ানা'য় আলোচিত হইয়াছে। এখনও তদ্দ্বারাই এক কথায় তর্কের শেষ হইতে পারিত; তবে 'ভারতী'র তর্কযুক্তির দৌড় একটু বিস্তৃত করিয়াই দেখাইয়া দিলাম। কাচের গাড়ীতে যাহার বাস, তাহার কি বাহিরে ঢিল ছোঁড়া সুবুদ্ধির কাজ হয়?

মানব ও ক্রোধ।

[শ্রীকেশবচন্দ্র দাঁ]

মেঘ নাই, বৃষ্টি নাই, নাহি ঝঞ্ঝাবাত;
সহসা ঝঞ্ঝায়—মেঘ ভরিল আকাশ!
কর্ম্মস্রোতে ভাসে নর সন্ধ্যা ও প্রভাত—
তারি মাঝে জাগে ক্রোধ—প্রচণ্ড প্রকাশ!
মেঘ যায়, ঝঞ্ঝা যায়, বহে স্নিগ্ধ বায়,
ক্রোধ যায়, আসে শান্তি, কালিমা ঘুচায়!

মিলন।

[শ্রীসুরেশচন্দ্র পালিত]

(১)

সবেমাত্র সুরবালা প্রদীপ নিবাইয়া শুইতে যাইতেছে, এমন সময় সুরবালার শাশুড়ী তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—"বৌমা প্রমদা এখনও আসেনি ?" সুরবালা মস্তক নাড়িয়া উত্তর দিলে শাশুড়ীর মুখে অসন্তোষের ছায়া দেখা গেল। সুরবালা উহা লক্ষ্য করিয়াছিল। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল।

আজ পাঁচ বৎসর মাত্র সুরবালার বিবাহ হইয়াছে। তাহার পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ভদ্রলোক। সুরবালার তিনটি ভগিনী ও একটী ভাই। সংসারে খরচ অনেক। সুরবালার বিবাহে তাহার পিতা যৎকিঞ্চিৎ খরচ করিয়াছিলেন। তেমন দেখিয়া শুনিয়া দিতে পারেন নাই। জামাইটি পাটের কলে কাজ করে। রোজগার মন্দ নয়, কিন্তু অসৎ সঙ্গে পড়িয়া সংসারের দিকে তত নজর নাই। বিবাহে শ্বশুর তেমন দেন নাই, একথা সময়ে ও অসময়ে সুরবালাকে শুনাইয়া তিনি নিজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখেন। সুরবালাও ভয়ে কিছু বলিতে পারে না। স্বামীর কথায় তাহার অগাধ বিশ্বাস। তাহার আপনার বলিতে কে আছে ? তিনি অনুগ্রহ করিয়া বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া আজ তাঁহার স্ত্রী। ইহার চেয়ে বেশী তাহার কি অধিকার ?

গৃহিণী বধূর স্বভাব জানিতেন। আগে আগে তিনি বধূর শিষ্ট-শান্ত, ঠাণ্ডা মেজাজের সকলের কাছে শতমুখে প্রশংসা করিতেন। কিন্তু কর্ত্তা মারা পড়িবার পর গুণধর ছেলে প্রমদাচরণ দুই দিন অন্তর বাড়ীতে আসিতে আরম্ভ করিল। ইহা সত্ত্বেও বধূ কিছু না বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল দেখিয়া গৃহিণী বধূর উপর চটিলেন; মুখে কিন্তু কিছু প্রকাশ করিতেন না। সম্প্রতি সুরবালার একটী পুত্র সন্তান হইয়াছে। তবুও প্রমদাচরণের স্বভাব কিছু বদলাইল না দেখিয়া শাশুড়ীর যত রাগ বধূর উপর পড়িল। মেয়ে মানুষ শাসন করিতে না জানিলে পুরুষ বিগড়ায়, তাঁহার এই ধারণা।

বধূর ধারণা অন্যরূপ। স্বামীর উপর স্ত্রীর ভালবাসার অধিকার; অত্যাচারের অধিকার নয়। ভালবাসায় যাহা না হয়, জোর-জবরদস্তিতে তাহা কখনও হয় না। বধূর এই ধারণার জন্য যখন তখন অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত; কিন্তু মুখ ফুটিয়া সুরবালা কোনও দিন স্বামীকে রূঢ় কথা বলে নাই। কখনও কখনও বারণ করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে নাই। একটি অব্যক্ত বেদনায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইত; বুক ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইত; কিন্তু মুখে কথা সরিত না। সবে মাত্র সে সন্তানের জননী হইয়াছে, কিন্তু স্বামী এক দিনের জন্য পুত্রটিকে কোলে লন নাই বা আদর করেন নাই। স্ত্রী নিজের অনাদর সহ্য করিতে পারে। নিজের অনাদরের প্রতীকার তাহার নিজের হাতে। তাহার নারীত্বের অভিমান দুর্জ্জয় দুর্গের ন্যায় সবল ও সুদৃঢ়। কিন্তু সন্তান সম্বন্ধে তাহার ভাব অন্য রকম। সন্তানের অবজ্ঞা কোনও স্ত্রী সহ্য করিতে পারে না। কালো কুৎসিত সন্তানও মায়ের চোখে প্রস্ফুটিত শতদল। হৃদয়ের সমস্ত রস সিঞ্চিত করিয়া পুত্রকে তিনি পালন করেন। সুতরাং এমন সন্তানের উপর পিতার উপেক্ষা কোন্ পতিপ্রাণা নারী সহ্য করিতে পারে? ক্রমে ক্রমে বিদ্রোহের ভাব আসিয়া বধূর হৃদয় অধিকার করিতেছে। শাশুড়ীর নীরব তিরস্কার ও অযথা অভিযোগ সুরবালার প্রাণে আঘাত করিতেছে। মেঘহীন আকাশে ঝড় উঠিবার আগে যেমন প্রকৃতি গম্ভীর ভাব ধারণ করে, সুরবালাও সেইরূপ গম্ভীর ও নীরব। শাশুড়ীর কথায় ও মুখের ভাবে সুরবালা যথেষ্ট আঘাত পাইল। বিছানায় শুইয়া নিদ্রা যাইতে পারিল না। হৃদয়ের গভীরতম দেশ হইতে ভগ্ন হতাশ্বাস উত্থিত হইয়া কোথায় মিশিল!

(২)

বেলা দুইটার আগে সুরবালা বিছানা হইতে উঠিয়া সংসারের কাজকর্ম্মে লাগিয়াছে। প্রমদাচরণ এখনও ফিরেন নাই। সময় কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না। ক্রমে দুইটা বাজিয়া গেল; তখনও প্রমদাচরণের দেখা নাই। গৃহিণী কেবল খোঁজ করিতেছেন, আর বধূর প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেছেন। মায়ের মন ছেলের শত দোষ দোষের মধ্যে গণ্য করে না। তাঁহার সেই এক কথা—"বৌ ঠিক থাক্‌লে ছেলে কি বিগড়ায়! সাধ্য কি?

কি অলুক্ষণে বৌ? আমার কি? নিজে ভুগ্‌বে। আমার আর ক'দিন?"
এই প্রকারের কথা ঘণ্টায় ঘণ্টায় শুনিয়া সুরবালা বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আজ সে একটা হেস্তনেস্ত করিবে। সকল বিষয়ের একটা সীমা আছে। তাহার সহিষ্ণুতা সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

দুইটার কিছুক্ষণ পরে প্রমদাচরণ বাড়ীতে আসিল; ছাই ফেলিতে ভাঙ্গা কুলা। স্ত্রীর উপর মহারাগ। কারণ কি নিজে সে জানে না; তবে সে পুরুষ মানুষ, রাগ করা তাহার ধর্ম্ম। কারণে বা অকারণে, সময়ে বা অসময়ে, স্থানে বা অস্থানে সকল সময় রাগ করিয়া সে পুরুষের লক্ষণ বজায় রাখিয়াছে। অতএব সে আজও রাগ করিল। সুরবালা কিছু বলিল না। প্রত্যহ সে যাহা করে আজও সে তাহাই করিল। নীরবে সহ্য করিল। মাঝে মাঝে তাহার দুইটি ব্যাকুল সজল চক্ষু তাহার হৃদয়ের বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রমদাচরণের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

আহারাদি শেষ করিয়া প্রমদাচরণ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সান্ধ্য-ভ্রমণে বহির্গত হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সুরবালা নীরবে সব দেখিতে লাগিল। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারিতেছে না। সে কি করিয়া নির্লজ্জার মতন স্বামীকে বলিবে—আমায় ফেলিয়া তুমি যাইও না? তিনি যদি ভুল বুঝেন। খাশুড়ীর নাম করিয়া বলিতে তাহার বড় লজ্জা হইল। সে স্বামীর অনাদৃত। এ অবস্থায় সেই স্বামীর উপর তাহার কি দাবী আছে? ভালবাসার দাবী ত নাই? ছিঃ! রূপের দাবী আবার দাবী? সুরবালা বিষম বিপদে পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইল স্বামীর পা ধরিয়া চীৎকার করিয়া খানিকক্ষণ কাঁদে। আবার নারীত্বের মর্য্যাদা তাহার অন্তরায় হইল। স্বামীর পদতলে তাহার কি অধিকার? স্বামী তাহাকে সেই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। আজ সে উপযাচিকা হইয়া কেমন করিয়া তাহার পদতলে আশ্রয় লইবে? একটি দুর্জ্জয় অভিমান তাহার হৃদয় অধিকার করিল। সে কিছুতেই ঠিক করিতে পারিল না—এ সময় তাহার কি করা উচিত। ক্রোড়স্থিত পুত্রের ক্রন্দনে তাহার চেতনা হইল। সে নীরবে পুত্রটি প্রমদাচরণের ক্রোড়ে স্থাপন করিল। প্রমদাচরণ পত্নীর এই প্রকার অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে প্রথমটা কিছু ইতস্ততঃ করিল। তার পর পুত্রটিকে পত্নীর ক্রোড়ে দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। সুরবালা পুত্রটীকে কোলে লইয়া বিছানায় শুইয়া রহিল।

(৩)

এদিকে যথাসময়ে প্রমদাচরণ প্রমোদ-আসরে আসিয়া উপস্থিত হইল। অচিরে সুরাস্রোতে, রমণী-কণ্ঠের বাহিরের মধুর সঙ্গীতে সে স্থানপূর্ণ হইল। সে বাড়ী ভুলিল। সুরবালাকে ভুলিল। পুত্রটীকে ভুলিল। সে নিজেকে ভুলিল। কেবল ভুলিতে পারিল না—শিশুর সেই কোমলস্পর্শ। জলস্রোতে ভাসমান কাষ্ঠ-খণ্ডের ন্যায় মাঝে মাঝে একটা অস্পষ্ট অব্যক্ত বেদনা তাহার হৃদয়ে আসিয়া প্রবাহিত হইয়া দেখা দিয়া সরিয়া পড়িতে লাগিল। বেদনাটি যে কি, সে তাহা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না; কেবল একটা অস্পষ্ট অনুভূতি মাত্র তাহার মনে জাগিয়া রহিল। জীবনে আজ প্রথম তাহার অখণ্ড আমিত্বে একটি অবিশ্বাস জন্মিল। এমন সময়ে বারাঙ্গনাটী একটি তিন মাসের মেয়ে আনিয়া প্রমদাচরণের কোলে ফেলিয়া দিয়া বলিল যে, এ মেয়েটীকে আমি পোষ্য করিব বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ইহার মাতা এখানে আছে। পরে যাহাতে পুলিশ-হাঙ্গামা না হয়, সে বিষয়ে তুমি একটা ব্যবস্থা করিয়া দাও। প্রমদাচরণের নেশা মুহূর্ত্তের মধ্যে কাটিয়া গেল। তাহার হৃদয়ে একটা বিষম আন্দোলন উত্থিত হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহা শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইয়া সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। স্মৃতির একটা অব্যক্ত বেদনা তাহার হৃদয় অধিকার করিল। কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না; কিন্তু প্রমদাচরণ বুঝিতে পারিল,—এত দিনে সে জীবনের সাড়া পাইয়াছে। ছিঃ! সে কি মানুষ! মানুষ স্বীকার করিতে তাহার লজ্জা হইল! সে পশুর চেয়েও অধম। পশুরাও তাহাদের সন্তানের মায়ায় আকৃষ্ট।

একটু পরে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া মেয়েটির সম্বন্ধে প্রমদাচরণ অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। মেয়েটির মা বড় গরীব। অন্য উপায় না পাইয়া মেয়েটিকে সে পোষ্য দিতে স্বীকার করিয়াছে; কিন্তু মেয়ের কাছে সে থাকিবে। মেয়েটিকে ছাড়িয়া দিতে সে রাজী নয়। আজ প্রমদাচরণের চক্ষে তাহার মাতৃত্ব তাহাকে দেবীত্বে পরিণত করিল। সে আজ মায়ের কি গর্ব্ব, মায়ের কি স্নেহ, সন্তানের কি আকর্ষণী শক্তি তাহা বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া সে নীরব রহিল। আজ বারাঙ্গনার হৃদয়টা সে বুঝিতে পরিল। নারী-হৃদয়ে মাতৃত্বের কতখানি স্থান, আজ বারবিলাসিনীর কার্য্যে সে তাহা দেখিতে পাইল। নিজের ভ্রম ঘুচিল। মনুষ্য নিজেকে সুখী করিবার চেষ্টা করিয়া প্রকৃত সুখী হয় না। নিজের সুখ-দুঃখ পরের উপর নির্ভর। আত্মত্যাগ ব্যতীত সুখ নাই। শত সুখের মধ্যে থাকিয়া বারাঙ্গনার হৃদয় মাতৃ

জাগিয়া উঠিয়াছে। আর পশুর অধম সে নিজের পুত্রকে ফেলিয়া, পতিপ্রাণা পত্নীকে ফেলিয়া, কুৎসিৎ আমোদে আজ লিপ্ত। প্রমদাচরণ নিজের চিন্তায় বিভোর। মেয়ে হঠাৎ কাঁদিয়া উঠিল। মেয়ের মা ও বারাঙ্গনা আসিয়া প্রমদাচরণের কোল হইতে মেয়েটিকে উঠাইয়া লইল। উহাকে যত্ন না করায় প্রমদাচরণকে বেশ দুই কথা শুনিতে হইল। হায় রে অদৃষ্ট! প্রমদাচরণ বুঝিল, পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই প্রকারেই হয়।

অল্পক্ষণ পরে গৃহে যাইবার জন্য প্রমদাচরণ উঠিয়া দাঁড়াইল। বন্ধুরা হাসিয়া ঠাট্টা করিতে লাগিল। বারাঙ্গারমণী তাহাকে ধরিয়া রাখিবার অনেক চেষ্টা করিল। সাগরগামী নদীর ন্যায় প্রমদাচরণের গৃহগামী মন কিছুতেই ফিরাইতে পারিল না।

ঘোর রাত্রি। দিবসের পরিশ্রমের পর এক গভীর অবসাদ চরাচরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। বাহিরের অবসাদের চেয়ে প্রমদাচরণের হৃদয়ের অবসাদ অধিকতর। কিন্তু সেই অবসাদের মধ্যে সে একটা ক্ষীণ জ্যোতিঃ দেখিতে পাইতেছে। সেই ক্ষীণ জ্যোতিঃ ক্রমে প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। প্রমদাচরণের হৃদয়ে আশার বাণী উত্থিত হইয়াছে। এখনও সে সম্পূর্ণ উৎসন্ন যায় নাই। এখনও সে মনুষ্যসমাজ হইতে চিরনির্ব্বাসিত হয় নাই। মানবপ্রীতি তাহার হৃদয়ের গভীরতম দেশে প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কাইত আছে। কতকটা মসীপ্রলেপ তাহার উপর পড়িয়াছে মাত্র। এখনও সময় আছে।

প্রমদাচরণ বাড়ীতে আসিয়া শয়নকক্ষে গিয়া দেখিল,—পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া সুরবালা নিদ্রিতা। তাহার সুপ্ত অধরকোণ হইতে একটি বিষাদরেখা দেখা যাইতেছে। কিন্তু মুখের উপর এক অসীম গভীর অব্যক্ত শান্তি বিরাজ করিতেছে। পৃথিবীর-দেনা পাওনা যেন শোধ হইয়াছে। সেই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া প্রমদাচরণ সব ভুলিল। ধীরে ধীরে সুপ্ত পুত্রটিকে কোলে লইয়া চুম্বন করিল। সুরবালার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্বামীর কোলে পুত্রটিকে দেখিতে পাইয়া কৃতজ্ঞতায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। নয়নপ্রান্তে অশ্রুবিন্দু দেখা দিল। দুইজনেই নির্ব্বাক্; কিন্তু দুইজনেই অনুভব করিল—মিলন সম্পূর্ণ। সেই সময়ে বাহিরে কে গাইয়া যাইতেছিল,—

বঁধুয়া কি আর কহিব আমি
জনমে জনমে জীবনে মরণে
প্রাণনাথ হ'ও তুমি।

পুস্তক-পরিচয়।

তর্পণ।—শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীঅনিলেন্দ্রনাথ সিংহ। দত্ত এণ্ড ফ্রেণ্ডস্ ৬৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা মূল্য ৸৹ বার আনা।

এখানি কবিতার বই পুস্তকের প্রারম্ভেই কবি লিখিয়াছেন—

"স্মরণীয়, বরণীয়, কত মহাজন,
সমাজের হিত সাধি' বিবিধ পন্থায়,
ধর্ম্মে, কর্ম্মে, অর্থে, পুণ্যে বাণীর সেবায়,
ধন্য করি মাতৃভূমি—মানব-জীবন,
যশঃস্বর্গে করেছেন দেহান্তে গমন।
তাঁদের নমস্য স্মৃতি, বিচিত্র মায়ায়,
উদাস পরাণে, স্তব্ধ গভীর নিশায়,
ফুটে উঠে নীলিমায় নক্ষত্র মতন।
ব্যগ্র হয়ে দিতে গিয়ে ভক্তি উপচার
শতমূর্ত্তিভরা দেখি, মানসদর্পণ!
গণ্ডুষ গঙ্গার বারি সম্বল আমার,
কুলাবে না জনে জনে করিতে অর্পণ,
অগ্রণীর নামে তাই বিবিধ শাখার,
সবার(ই) উদ্দেশে করি শ্রদ্ধায় তর্পণ।"

ইহাতেই কবির উদ্দেশ্য পরিস্ফুট। আমাদের আর বিশেষ পরিচয় দিতে হইবে না। দেশের পরলোকগত বহু সুসন্তানের তর্পণ তিনি 'সনেটে'র সাহায্যে করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠ করিলে হৃদয় শ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠে; মন উন্নত হয়। তাহার উপর তাঁহাদের আলেখ্যও পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে তাঁহারে প্রতিমূর্ত্তি-দর্শনেরও সৌভাগ্য হয়। 'তর্পণে'র কবিতাগুলি সদ্ভাবমূলক। এক একখণ্ড 'তর্পণ' প্রত্যেকেরই রাখা উচিত।

ভ্রাতৃস্নেহ।—(কৌতুক-নাট্য) শ্রীনির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত। মূল্য।৵৹ ছয় আনা।

আমাদের দেশে পুরাতন অনেক চুট্‌কী গল্প আছে। হাস্য-কৌতুকের অবতারণায় সেগুলি সিদ্ধহস্ত। এই শ্রেণীর একটী গল্পের কাঠামোর উপর নির্ম্মল বাবু কৌতুক-নাট্যের প্রতিমা গড়িয়াছেন; গড়নে বাহাদুরী আছে। মুন্সীয়ানা আছে। হাস্য খুব মিঠা। লিখিবার কায়দাও ভাল। এই শ্রেণীর পুস্তক যাঁহারা পড়িতে ভালবাসেন, তাঁহারা নির্ম্মল বাবুর "রাতকাণা" পড়িলে তৃপ্ত হইবেন, এমন কথা আমরা ভরসা করিয়া বলিতে পারি।

অভিমান—(সামাজিক উপন্যাস)।—শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র; লক্ষ্মীবিলাস পবলিসিং হাউস; ১২ নং নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

'অর্ঘ্যে'র পাঠক-পাঠিকাগণকে 'অভিমান'-রচয়িতা নারায়ণ বাবুর পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার ছোট গল্পের প্রশংসা ইঁহাদের অনেকেই করিয়াছেন। ছোট গল্প-রচনায় নারায়ণ বাবু অনেক দিন হইতে, সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় পল্লীজীবনের চিত্র নিখুঁত হইয়া ফুটিয়া উঠে। পল্লীর মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র ঘরের চিত্রাঙ্কনে তিনি সিদ্ধহস্ত। নারায়ণ বাবু আলোচ্য-গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে'র এক স্থলে লিখিয়াছেন,—'সামাজিক ছোট গল্প লিখিলেও সামাজিক উপন্যাস লিখিবার চেষ্টা আমার এই প্রথম। প্রথম চেষ্টায় যে সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিব এরূপ আশা করিতে পারি না।" কিন্তু গ্রন্থকারের সে আশঙ্কা করিতে হইবে না; তাঁহার প্রথম প্রয়াস সাফল্য-মণ্ডিত হইয়াছে। 'অভিমান' তাঁহার সুযশঃ সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। পুস্তকখানি পড়িতে বসিলে শেষ না করিয়া ছাড়া যায় না। আমরা উপন্যাসানুরাগী পাঠক-পাঠিকাকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। 'অভিমানে'র লিখনভঙ্গী ভাল; ভাষা সুমার্জ্জিত অথচ সরল, চরিত্রাঙ্কনও প্রশংসনীয়। ইহার ছাপা ও কাগজ বেশ; তাহার উপর সুচিক্কণ রেশমী বাঁধাই ও সোণার জলে নাম লেখা। পুস্তকখানির ভিতর বাহির দুই-ই সুন্দর।

—

বিবেকানন্দের উপদেশ।

তপস্যা।

'তপস্' শব্দের ধাত্বর্থ তাপ দেওয়া বা উত্তপ্ত করা। এটা আমাদের উচ্চ প্রকৃতিকে 'তপ্ত' বা উত্তেজিত করবার সাধনা বা প্রক্রিয়াবিশেষ।

প্রেমের শক্তি।

জগতে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, তা প্রেমের শক্তিতেই হয়েছে। দোষ দেখিয়ে দেখিয়ে কোন কালে ভাল কাজ করা যায় না। হাজার হাজার বছর ধরে সেটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। নিন্দাবাদে কোনই ফল হয় না।

কাব্য-চিত্র সঙ্গীত।

সমুদয় কাব্য, চিত্র-বিদ্যা ও সঙ্গীত কেবল ভাষার, বর্ণের ও শব্দের মধ্য দিয়ে ভাবের অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়।

স্বর্গ ও বাসনা।

স্বর্গ আমাদের বাসনাসৃষ্ট কুসংস্কার মাত্র, আর বাসনা চিরকালই বন্ধন,—অবনতির দ্বারস্বরূপ।

প্রেম ও সৃষ্টি।

প্রেম সৃষ্টির মূল। মাতা ব্যতীত যেমন সন্তান জীবিত থাকতে পারে না, প্রেম ব্যতীত তেমনি কোন সৃষ্টি স্থায়ী হয় না।

নির্ভীকই মুক্ত।

জীবনের সমগ্র রহস্য হচ্ছে নির্ভীক হওয়া। তোমার কি হবে, এ ভয় কখনও করো না, কারও উপর নির্ভর করো না। যখন তুমি অপরের সাহায্যের আশা-ভরসা ছেড়ে দাও, কেবল সেই মুহূর্ত্তেই তুমি মুক্ত।

ধর্ম্ম কি?

ধর্ম্ম অনুরাগে—অনুষ্ঠানে নহে। হৃদয়ের পবিত্র অকপট প্রেমই ধর্ম্ম।

জড় ও চৈতন্যের পূজা।

জড়ের পূজায় মৃত্যু, চৈতন্যের উপাসনায় অমরত্ব। নশ্বর ক্ষণভঙ্গুর মায়াময় সংসারকে ত্যাগ করিয়া সেই অবিনশ্বর সনাতন সত্যকে আশ্রয় কর।

হনুমানের ভক্তি।

ভক্ত শ্রেষ্ঠ হনুমানকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আজ মাসের কোন্ তারিখ? তিনি তাতে উত্তর দিয়েছিলেন, 'রামই আমার সন তারিখ সব। আমি আর কোন সন তারিখ জানিনা'।

অগ্রসর হও।

বিশ্বাস! বিশ্বাস! সহানুভূতি! অগ্নিময় বিশ্বাস! অগ্নিময় সহানুভূতি! জয় প্রভু জয় প্রভু! তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত! জয় প্রভু; অগ্রসর হও। প্রভু আমাদের নেতা। পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে চাহিও না। এগিয়ে যাও সম্মুখে সম্মুখে! এইরূপে আমরা অগ্রগামী হইব, একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।

শান্তি।

শান্তি—ভোগে নহে, ত্যাগে। হে ভোগসুধা ভোগকে ছাড়িয়া ত্যাগকে আশ্রয় কর।

দুঃখের অবসান।

তাঁহার নামে, তাঁহার প্রতি অনন্ত বিশ্বাস রাখিয়া শত শত যুগ সঞ্চিত পর্ব্বত-প্রমাণ অনন্ত দুঃখরাশিতে অগ্নি-সংযোগ করিয়া দাও, উহা ভস্মসাৎ হইবেই হইবে।

ভারতবাসীর পৈত্রিক শক্তি।

ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় এই আধুনিক ভারতবাসীতে পৈত্রিক শক্তি বিদ্যমান; যথাকালে মহাশক্তির কৃপায় তাহার পুনস্ফুরণ হইবে।

ধর্ম্ম ও দর্শন।

দর্শন বর্জ্জিত-ধর্ম্ম কুসংস্কারে গিয়ে দাঁড়ায়, আবার ধর্ম্ম-বর্জ্জিত দর্শন শুধু নাস্তিকতায় পরিণত হয়।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

সমুদয় হিন্দুদর্শন বলেন, আমাদের পাঁচটী ইন্দ্রিয় ছাড়া একটী ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। তাই দিয়েই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানলাভ হয়ে থাকে।

অর্ঘ্য
৮ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৩[illegible]।

মতিলাল শীল।

[স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়-বলে মানুষ কি করিতে পারে, সামান্য বাঙ্গালা ও শুভঙ্করীর হিসাবপত্রের সাহায্যে মানুষ কিরূপ আত্মোন্নতি-সাধনে সমর্থ হয়, এবং ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রাণপণ যত্ন-চেষ্টার ফলে মানুষ জীবনের পথে কতদূর অগ্রসর হইতে পারে, স্বর্গীয় মতিলাল শীল তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

মতিলাল শীলের জীবন-চরিত পাঠ করিলে, আরব্য-উপন্যাসের "আলাদিন এবং তাহার অত্যাশ্চর্য্য প্রদীপে"র উপাখ্যান সত্য বলিয়া মনে হয়। সে জীবনীপাঠে দুইটি প্রধান ভাব সর্ব্বোপরি মনে জাগিয়া উঠে;—প্রথম সৎপথে থাকিয়া ধনোপার্জ্জন-বাসনা, দ্বিতীয় তাঁহার হৃদয়ের বিশালতায় আত্মহারা হইয়া বহু সদনুষ্ঠানে অকাতরে অর্থব্যয় করিবার ইচ্ছা।

ধনলিপ্সা-পরায়ণ কৃপণ ব্যক্তি মতি শীলের জীবনী-পাঠে ধনসঞ্চয়ের সহজ সদুপায়টা আয়ত্ত করিতে পারিবে না। আর যে পথে মতি শীল ধনোপার্জ্জন করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, সে পথ সহজ ও সরল হইলেও, সে পথে কৃপণের ধনসঞ্চয়ের সম্ভাবনা বড়ই অল্প; কারণ, সে পথ বিধাতার প্রদর্শিত পথ। আলাদিন যেমন প্রদীপের অধিকারী হইয়াছিল, সংসারের অন্ধকারপথে মতিলালও সেইরূপ বিধাতার অঙ্গুলিসঙ্কেত ধরিয়া ধনের পথে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাই তিনি অর্জ্জিত অর্থ অকাতরে ব্যয় করিয়া দেশে বহু সদনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

মতিলাল শীল অল্প বয়সে পিতৃহীন হন। তখন তাঁহার বয়স পাঁচ বৎসর মাত্র। মধ্যবিত্ত সুবর্ণবণিক-পরিবারে মতিলালের জন্ম। সুতরাং মূলে পৈতৃক সম্পত্তিতে তিনি পুষ্ট ছিলেন না। অতি সামান্য অবস্থায় তাঁহাকে বাল্যজীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। সে কালের গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় যে বিদ্যালাভ সে সময়ে সম্ভব ছিল, মতিলাল অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাহা অর্জ্জন করিয়া-

ছিলেন; বাহিরের দৃষ্টিতে বিদ্যাহিসাবে তাঁহার হাতের লেখাটি উত্তম ছিল, আর শুভঙ্করী-হিসাব কণ্ঠস্থ ছিল। এই সামান্য সম্বল লইয়া সপ্তদশবর্ষীয় বালক মতিলাল শীল সংসারধর্ম্মে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তখনও তিনি কোনও প্রকার বিষয়কর্ম্মে লিপ্ত হন নাই। বিবাহের পর তিনি শ্বশুর মোহনচাঁদ দে মহাশয়ের সহিত তীর্থপর্য্যটনে বাহির হন। সে আজ প্রায় এক শত বৎসরের উপরের কথা। সেকালে আজকালকার মত একদিনে হাজার মাইল পথ গমনাগমনের সুবিধা ছিল না। এখন ইংলণ্ডে, আমেরিকায় যাওয়া বরং সহজ; কিন্তু সেকালে কাশী, গয়া, প্রয়াগ, পুষ্কর, মথুরা বৃন্দাবনে যাওয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে বিপজ্জনক ছিল। এইরূপে বিপদসঙ্কুল তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া ৩।৪ বৎসরে নানাস্থান পরিদর্শন ও সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থা ও ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, প্রভূত জ্ঞানলাভে পুষ্ট হইয়া মতিলাল ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে দেশে প্রত্যাগমন করেন। পরে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম্ দুর্গে এক সামান্য বেতনের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কিন্তু এই কর্ম্মে তাঁহাকে বহুদিন লিপ্ত থাকিতে হয় নাই। এই কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহার অন্তরে কি এক ঝোঁকের উদয় হইল! তিনি বোতল ও ছিপি ক্রয় করিতে লাগিলেন। বোতল ও ছিপি ক্রয় করিয়া, বোতলের পাহাড় করিয়া ফেলিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে কোনও উত্তর দেন না। কেবল ক্রয় করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কিছু দিন এইরূপ ক্রয়ের পর সহসা বোতল ও ছিপির বাজার গরম হইয়া উঠিল এবং অতি উচ্চ মূল্যে তাঁহার সঞ্চিত মাল বিক্রয় হইয়া গেল। ইহাতে তাঁহার প্রচুর ধনাগম হইল।

তিনি ফোর্টের চাকুরি ছাড়িয়া দিলেন। এই সহজ ও সদুপায়ে অর্জ্জিত অর্থের সাহায্যে মতিলাল সওদাগরী জাহাজের কাপ্তেনদের মাল-সরবরাহ-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অনেকগুলি জাহাজে ঐরূপ কার্য্যের ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু সকল কার্য্যই তিনি নিখুঁতভাবে নিষ্পন্ন করিতেন। ইহার উপর তাঁহার সৌজন্যও যথেষ্ট ছিল। এই জন্য সাহেবেরা সকলে তাঁহাকেই খুঁজিত। তাঁহারও কর্ম্মক্ষেত্র দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে ও সেই সঙ্গে অর্থোপার্জ্জনের পথও প্রশস্ততর হইতে লাগিল। এই কার্য্যে তিনি কখনও কাহারও সন্দেহের পাত্র হন নাই। তাই সকলে তাঁহাকে চাহিত ও বিশ্বাস করিত।

এখন তিনি বেশ অর্থপুষ্ট হইয়া ক্রমে এক একটি করিয়া তিনটি সওদাগরী

আফিসের মুচ্ছুদ্দির কাজ গ্রহণ করিলেন। তিনটা হাউসের কাজ তাঁহার হাতে ঠিক যেন কলে চলিত, কোথাও কোনও কাজে ত্রুটি হইত না, কেহ তাঁহার অনুপস্থিতির জন্য বিরক্ত হইত না। এইরূপে ইংরাজদের সঙ্গে কর্ম্মসূত্রে বেশ লিখিবার ও পড়িবার মত ইংরাজী ভাষাও তিনি শিখিয়াছিলেন। অভিজ্ঞ লোকের যে বিদ্যা, যে জ্ঞান, যে দূরদর্শন আবশ্যক, তাহা তাঁহার প্রচুর পরিমাণে ছিল।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্নান, পূজা, আহ্নিক ও আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক নয়টার পর হইতে সাড়ে নয়টার মধ্যে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন আর রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত সমানে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। প্রতিদিনের সকল কাজ শেষ করিয়া তাঁহার দেনা ও পাওনার হিসাব ঠিক করিতেন। প্রতিদিনই নিজের প্রাপ্য ও অপরের প্রাপ্য পাই পয়সা হিসাব মিলাইয়া তবে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। প্রতিদিন এইভাবে হিসাব-নিকাশের ক্লেশভোগ করার বিরুদ্ধে কেহ কিছু বলিলে বলিতেন, "আমার নিকট কার কত টাকা পাওনা সে সংবাদ আমার প্রতিদিনই জানা থাকা আবশ্যক, কারণ কেহ তাহার প্রাপ্য চাহিবামাত্র তাহাকে দিতে পারিব। লোকের দেনা দিতে বিলম্ব হইলে লোকে দুকথা বলিবে, তাহা সহ্য করিতে পারিব না, আর কেনই বা সহ্য করিব?" লোকের সঙ্গে কারবারে সর্ব্বদা খাঁটি থাকাই মতিলাল শীলের জীবনের প্রধান বিশেষত্ব ছিল, এইজন্য কখনও কোনও কারণে তাঁহাকে অন্যের অবিশ্বাসের পাত্র হইতে হয় নাই। অর্থের আদানপ্রদান সম্বন্ধে তিনি দীর্ঘজীবন নিষ্কলঙ্কভাবে কাটাইয়া গিয়াছেন।

দেনা-পাওনা-বিষয়ে মতিলালের সঙ্গে লেখাপড়া, রেজেষ্টারি করা ইত্যাদি কিছুই করিতে হইত না। মুখের কথাই যথেষ্ট। অর্থের প্রাচুর্য্য-নিবন্ধন যখন কলিকাতার নানাস্থানে সম্পত্তি-ক্রয়কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল, তখন সেই সকলের ক্রয়কালে বায়নাপত্র করিতে হইত না। মুখের কথায় বায়না করিয়া টাকা দিতেন। ইহাতে কখনও কখনও ঠকিতেন, কিন্তু ঠকিলেও দেশের সকল লোককে অবিশ্বাস করিতে শিখেন নাই। যে ঠকাইত, তাহাকেই অবিশ্বাস করিতেন; আর সেরূপ লোককে নিজের কাজকর্ম্মের ত্রিসীমায় পা দিতে দিতেন না।

কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠে প্রচুর ভূসম্পত্তি ও অট্টালিকা মতিলাল শীল ক্রয় করেন, সেগুলি আজ পর্য্যন্ত শীল বাবুদের সম্পত্তিভুক্ত হইয়া

রহিয়াছে। এইসকল সম্পত্তির মধ্যে অনেক সম্পত্তি হাইকোর্টের ডিক্রীসূত্রে সরিপ-সেলে ক্রয় করিতেন। সরিপ-সেলে ক্রয় করা বাড়ী ও জমি দখল করিতে যাইবার সময়ে অনেক লোকজন সঙ্গে যাইত। তিনি কোনও দিন নিজে খুব বড় একটা পদমর্য্যাদাশালী লোক বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন না। তাঁহার সেই শ্যামবর্ণ দেহে ধনী ও পদস্থ লোকের কোনও লক্ষণ প্রকাশ পাইত না। তিনি নিরীহ বৈষ্ণবপ্রকৃতি লোক ছিলেন, অনেক সময়ে অনেক কাজের পশ্চাতেই থাকিতে ভালবাসিতেন। সরিপ-সেলের ক্রয়বিক্রয়ে অনেক সময়ে মারাপট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ধাক্কাধাক্কি ইত্যাদি ব্যাপারও ঘটিত; সে সকল বিপদে ত্রাণ পাইবার জন্য লোকজন সঙ্গে থাকিত। আজ কলিকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলের অধিকাংশ অট্টালিকা, ভূমি ও বাজার শীল বাবুদের। এ সমস্তই মতিলাল শীলের ক্রীত সম্পত্তি।

মতিলাল শীল জমিদারী করিবার জন্য কোনও দিন ব্যস্ত হন নাই। দূরবর্ত্তী স্থানে সম্পত্তি করার ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। দূরের সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে অন্য লোকের সাহায্যের প্রয়োজন হয়। কর্ম্মচারীরা প্রজার উপর অত্যাচার করে। এইজন্য লোকের নির্য্যাতন, লোকপীড়ন ইত্যাদি কার্য্যের প্রশ্রয় দেওয়াটা আদৌ পছন্দ করিতেন না। ইহাতেই বুঝা যায়, তিনি কিরূপ নিরীহ লোক ছিলেন। অনেক স্থলে জমিদারী বন্ধক রাখিয়া অনেক বড়লোক তাঁহার নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া পরিশোধ করিতে না পারায় তিনি জমিদারী ক্রয় করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইরূপ অনিচ্ছাসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির সমষ্টিতেই দেশের নানাস্থানে জমিদারী আপনাআপনি হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এবিষয়ে তিনি কতকটা উদাসীন ছিলেন, তাই বাঙ্গালাদেশের অনেকাংশ তাঁহার জমিদারীভুক্ত হয় নাই। তিনি জীবনপণ পরিশ্রমের ফলে যে টাকাটা সে সময়ে উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা কল্পনাও করা যায় না। ঠিক ধনী বলিলে মতিলাল শীলকেই সে সময়ে বুঝিতে হইত।

এই ত গেল তাঁহার ধনোপার্জ্জনের উপাখ্যান। এখন তাঁহার কর্ম্মজীবন ত্যাগ করিয়া তাঁহার লোকসেবা ও দানধর্ম্মের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের শেষ করা যাইতেছে। তাঁহার অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠাকালে রাজা রামমোহন রায়ের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধাচরণ জন্য এক ধর্ম্মসভার প্রতিষ্ঠা হয়। মতিলাল শীল বাহিরে বাহিরে লোকের নিকট ধর্ম্মসভার কার্য্য-কলাপ অবগত হইয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ হন। তিনি বলেন যে, কেবল বাক্‌বিতণ্ডার

জন্য এতগুলি বড় বড় পদস্থ লোক মিলিত হন, ইহা বড়ই পরিতাপের কথা। তিনি নিজে স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বৈষ্ণব ছিলেন। সুতরাং রাজার কার্য্যকলাপে তাঁহার বিশেষ সহানুভূতি ছিল না। তাই কিছু দিন পরে ধর্ম্মসভায় নাম লিখাইয়া সভ্য হন এবং দুই চারিবার উপস্থিত থাকিয়া নীরবে সেখানকার কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরিশেষে একদিন সংক্ষেপে কিছু বলিতে চাহিলেন। সকলের আগ্রহ দেখিয়া তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :—আপনারা এত লোক মিলিত হইয়া ধর্ম্মের নামে সভা করিয়া কেবল বাক্যব্যয় ও বাজে কাজ করেন, এতে দেশের কি উপকার হইবে? যদি কিছু করিতে চান, তবে আসুন আমরা এই সহরের অসংখ্য বিপন্ন পরিবারের সাহায্যের জন্য, পিতৃমাতৃহীন বালকদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য কিছু করি। এরূপ কোনও ভাল কাজে হাত না দিলে ধর্ম্মসভার প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে না। তাঁহার এই প্রস্তাবে অনেকেই সায় দিলেন ও সম্মত হইলেন। তদনুসারে অসহায়া হিন্দু বিধবাদের সাহায্যের জন্য এক ভাণ্ডার খোলা হইল। সেই সভা হইতে প্রতি মাসে বিপন্ন ও অসহায়া হিন্দু ভদ্রমহিলাদের সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইল। কিন্তু অন্যান্য দানশীল ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে পর ধর্ম্মসভা উঠিয়া যায়, কিন্তু মতিলাল শীল যে কার্য্যের সূচনা করিয়াছিলেন তাহা আর উঠিল না। বরং ধর্ম্মসভার তিরোধানে মতিলালের কৃত অনুষ্ঠান আরও দৃঢ় ভিত্তি প্রাপ্ত হইল। তিনি তাহার বিপুল অর্থের কিয়দংশ ট্রষ্ট ফণ্ডে পরিণত করিয়া কলিকাতায় হিন্দু বিধবাগণের মধ্যে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সাহায্যপ্রাপ্তির সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। সেই মহাদানের আশ্রয় লাভ করিয়া আজিও এই কলিকাতায় কত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্য জাতীয়া বিধবা সাহায্য পাইয়া প্রাণধারণ করিতেছেন! আজকাল দশ বিশ টাকা দান করিয়া সংবাদপত্রে ঢাক বাজাইয়া লোক দাতা সাজিতে কুণ্ঠাবোধ করে না, কিন্তু হায় মতি শীলের নীরব দানশীলতার ফলে আজ যে কত লোক প্রাণধারণ করিয়া সেই মহাত্মাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছে, এ সংবাদ কেহ রাখে না আর সংবাদপত্রেও ঢাক বাজে না। না বাজুক; দানবীর মতিলাল ঢাক বাজানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। কারণ তিনি জানিতেন, দানটা গোপনেই ভাল। তাহাতেই ধর্ম্মলাভ হয়। ধর্ম্মার্থে মতিলাল এই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন।

তাহার পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়—শীলস্ ফ্রি কলেজ। দেশের

কত পিতৃমাতৃহীন বালক এই বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ধন্য হইতেছে ও নিজ নিজ জীবিকা-অর্জ্জনের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয়ের প্রথম সূত্রপাত হয়। তখন বিদ্যালয়ে এক টাকা বেতন লওয়া হইত। তৎপরিবর্ত্তে পুস্তক ও কাগজ-কলম বালকদিগকে দেওয়া হইত। ক্রমে পুস্তকাদি দেওয়া ও বেতন লওয়া বন্ধ হইয়া যায়। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া মতিলালের বিদ্যাবিতরণকার্য্য সমানে চলিয়া আসিতেছে। এক বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বাদ দিলে এমন করিয়া সুদীর্ঘকাল ধরিয়া বিদ্যাবিতরণ এদেশে অল্প লোকই করিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ও ট্রষ্ট ফণ্ডের অন্তর্ভুক্ত এবং এক্ষণে ইহার ফণ্ডে এত টাকা মজুত আছে যে, নির্ভয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজ খোলা যাইতে পারে ; কিন্তু খোলে কে ? পরামর্শদাতার এবং কর্ণধার হইবার লোকাভাবে তাহা হইতেছে না। অন্যের অনুষ্ঠান হইলে হয়ত এত দিন উঠিয়া যাইত, কিন্তু মতিলাল সূক্ষ্মবিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। এরূপ ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার অনুষ্ঠানগুলি অক্ষয় বটবৃক্ষের ন্যায় দীর্ঘ ভবিষ্যতেও সুফল দান করিবে।

তাহার পর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা। তিনি কেবল ভদ্রসন্তানের লেখা-পড়ার ব্যবস্থা করিয়া বা দরিদ্র হিন্দু বিধবার গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া নিজের ধর্ম্মবুদ্ধিকে শান্ত করিতে পারেন নাই। মহাপ্রভুর উপদেশে গঠিত, মহাপ্রভুর বিনয়-সৌজন্যে পূর্ণ, মহাপ্রভুর প্রেমের প্রবাহে ভাসমান, মহাপ্রভুর জীবে দয়ায় অনুরঞ্জিত হৃদয় লইয়া মতিলাল জাতিবর্ণ ও ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এক মুষ্টি অন্নবিতরণের ব্যবস্থা না করিয়া কি তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন ? পারেন না। তাই তিনি কলিকাতার উত্তরে বারাকপুর রোডের উপর বনহুগলী নামক স্থানে তাঁহার বাগান-বাটীতে এক অতিথিশালার প্রতিষ্ঠা করিয়া সেটিকেও ট্রষ্ট ফণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দীনহীন কাঙ্গালদের সুহৃদরূপে, অন্ধ খঞ্জ ও চিররুগ্ন ব্যক্তিবর্গের নিত্য আশীর্ব্বাদের পাত্র হইয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন। আমি বাল্যকালে সে অতিথিশালার সুব্যবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া এবং এক দিন সে অতিথিশালায় অন্নগ্রহণ করিয়া অপার তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলাম। আমি যে এক দিন বিপন্ন হইয়া সে অতিথিশালার অন্নগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলাম, আজ তাহা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি এবং সেখানকার অন্নবিতরণের ব্যবস্থা দেখিয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিলাম।

তুমি ধনীই হও আর দরিদ্র হও, বিশ্বাস কর, যে তিনটী মহৎ কাজ স্থায়ী

ভাবে এই অমর পুরুষ মতিলাল শীল সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন, সংসারে এইরূপ মহদনুষ্ঠানের তুলনা হয় না। তুমি রাজভবনসদৃশ অট্টালিকায় বাস কর আর নাই কর, তুমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হও আর নাই হও, তুমি গাড়ী ঘোড়া ও মোটর চালাইতে পার আর নাই পার, তুমি তোমার উপার্জ্জনের কিয়দংশ—সামান্য কিছু মতি শীলের ন্যায় সৎকার্য্যে ব্যয় কর, দেশের অনেক অভাব দূর হইবে; শত শত হাহাকার নীরব হইবে। পাঠক! তুমি মতি শীল নাও হইতে পার, কিন্তু একটা বিধবার অন্নের গ্রাস, একটা অনাথ বালকের পড়ার ব্যবস্থা, একটা ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুন্নিবৃত্তি তুমি অবশ্যই করিতে পার। তাই কর, তুমি কর, তোমার মত দশ জনে করুক, দেশের দুর্দ্দশা দূর হইবে। আর তাহা হইলে, দেশে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, তাহা না হইলে তোমার আমার সকলেরই এই দর্প হাহাকার ও কাকের ন্যায় কা কা রবমাত্র সম্বল লইয়া পরিণামে দেশ রসাতলগত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পরাজয়।

[শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

(১৩)

গিরিশ ডাকিল, "দাদা!"

গম্ভীরস্বরে হালদার মহাশয় উত্তর দিলেন, "কেন?"

গিরিশ ধীরে ধীরে বলিল, "মেয়েটা বড় হ'য়ে উঠেছে, ওর যা হয় একটা গতি না কর্‌লে তো চলে না।"

ঈষৎ রুক্ষভাবে হালদার মহাশয় বলিলেন, "তাও আবার চলে? না হিঁদুর ঘরে মেয়ে এত বড় ক'রে রাখে? তুমি ব'লেই তাই পেটে ভাত দিচ্ছ।"

মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে গিরিশ বলিল, "কি করি বলুন, পেটই চলে না।"

বিরক্তির স্বরে হালদার মহাশয় বলিলেন, "চলে না আর কোথায়? বন্ধ থেতেও তো দেখি না।"

একটা ক্ষীণ দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গিরিশ বলিল, "একেবারে বন্ধ যাবার নয় দাদা. তাই বন্ধ যায় না। নইলে বড় কষ্টেই চলছে।"

হালদার মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন, "ওকথা যেতে দাও। কেউ কখনো বলে না যে, আমার সংসার বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলছে।"

গিরিশ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হালদার মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "উচিত কথা বলি ভাই, রাগ কর করবে। তোমার সংসারটা কষ্টেই বা চলবে কেন? মাস গেলে কর্‌করে পঁচিশটী টাকা আন, এর অর্দ্ধেক টাকায় একটা সংসার সুখে স্বচ্ছন্দে চলে যায়। তা আমার কাছে এত লুকোচুরি কেন? আমি দাদা ব'লে কখনো তোমার কাছে হাত পাততে যাব না, সে ভয় নাই। অপরের কাছে বরং ভিক্ষে ক'রে খাব, তবু তোমার মত ভায়ের কাছে হাত পাতব না।"

হালদার মহাশয় একটু গর্ব্বের হাসি হাসিলেন। গিরিশ যে কি বলিবে খুঁজিয়া পাইল না। সে হতভম্ব হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল। তখন হালদার মহাশয় তারা ব্রহ্মময়ীকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "চুলোয় যাক্, এখন কি বলতে এসেছ বল।"

গিরিশ ধীরে ধীরে বলিল, "মেয়েটার একটা সম্বন্ধ স্থির করেছি।"

হাল। ভালই ক'রেছ। সব ঠিকঠাক ক'রে বুঝি দাদাকে খবরটা দিতে এসেছ? তা আমি তোমার কে বল, যে আমাকে আগে খবর দেবে! যাক্, তারা শিব সুন্দরী! যখন স্থির হ'য়ে গিয়েছে, তখন কাজ সেরে দাও।

গিরিশ। না দাদা, এখনো তেমন পাকাপাকি কিছু হয় নি, শুধু কথাবার্ত্তাই চলছে।

হাল। শুধু কথাবার্ত্তা চললে তো হবে না, পাকাপাকি ক'রে ফেল। আমার ওতে কিছুমাত্র দুঃখ নাই, বরং আনন্দ। তোমার মেয়ে বড় হচ্ছে, কিন্তু লোকের কাছে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে।

গিরিশ একটু আমতা আমতা করিয়া বলিল, "কিন্তু দাদা, টাকার যোগাড় হচ্ছে না।"

হালদার মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, "যোগাড় হচ্ছে না? কত টাকা যে যোগাড় হচ্ছে না।"

গিরিশ বলিল, "অন্ততঃ তিন শো টাকা চাই।"

হালদার মহাশয় যেন অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "তি—ন—শো—টাকা! এত টাকা কি হবে?"

নম্রস্বরে গিরিশ বলিল, "এর কমে কি মেয়ে পার হয় দাদা ?"

রাগত ভাবে হালদার মহাশয় বলিলেন, "বড় লোকের ঘরে তিন হাজারেও হয় না, কিন্তু গরীবকে তিরিশ টাকাতে মেয়ে পার করতে হয়।"

গিরিশ চুপ করিয়া রহিল। হালদার মহাশয় বলিলেন, "দাদা ব'লে যদি খোঁজ কর তবে সবই হয়। তা তো করবে না, এখন তোমার হাত পা হ'য়েছে, দাদা আর কে ?"

লজ্জাজড়িত কণ্ঠে গিরিশ বলিল, "তা দাদা, আমি বুঝতে পারি নাই।"

হালদার মহাশয় ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বুঝবে কোথা হ'তে বল, হাজার মূর্খ ই হই আর যা হই, আমি বড় তুমি ছোট। যাক্, এখন আমার পরামর্শ শুনবে ?"

গিরিশ ব্যস্তভাবে বলিল, "শুনবো দাদা।"

অন্তরালে দাঁড়াইয়া গৃহিণী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আপন মনে বলিলেন, "ইস্, বড় দরদ যে !"

হালদার মহাশয় একটা উদ্গার তুলিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "বেশ, যেমন অবস্থা তেমন ব্যবস্থা কর, বিশ তিরিশ টাকায় কাজ শেষ হ'য়ে যাবে।"

গিরিশ উৎসুকভাবে জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে চাহিল। হালদার মহাশয় বলিলেন, "সেনপুরে আমার পিসতুতো সম্বন্ধীর একটী ছেলে আছে। ছেলেটী দেখতে একটু কালো, তা বেটা ছেলে কালোই কি আর ধলোই কি ! এক পয়সা দিতে হবে না, শুধু বিশ পঁচিশ টাকা ঘর-খরচ।"

গিরিশ শিহরিয়া উঠিল ; বলিল, "সে যে আকাট মূর্খ, কাল কি খাবে তার সংস্থান নাই !"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে হালদার মহাশয় বলিলেন, "তবে তুমি রাজপুত্র চাও নাকি ?"

গিরিশ নীরব। হালদার মহাশয় বলিলেন, "বুঝেছি ভায়া বুঝেছি, আমার মেয়ের বিয়েতে পাঁচ সাত শো খরচ করেছি, একটু ভাল ঘরেও পড়েছে। তা তুমি কি মন্দ ঘরে মেয়ে দিতে পার ? এদিকে কিছু তো নাই, কিন্তু হিংসাটুকু তো চার পো আছে !"

বুকের ভিতর দীর্ঘনিঃশ্বাসটা চাপিয়া রুদ্ধকণ্ঠে গিরিশ বলিল, "তা নয় দাদা, অমি সর্ব্বপ্রথম মেয়ে, তাকে জলে ফেলতে"—

ক্রোধে চীৎকার করিয়া হালদার মহাশয় বলিলেন, "কে তোমাকে জলে ফেলতে বলছে ? তবে আমার কাছে এসেছ কেন ?"

নতমুখে কাতর স্বরে গিরিশ বলিল, "এসেছি দাদা, আপনি যদি দয়া ক'রে টাকাটা দেন।"

অবজ্ঞার সহিত হালদার মহাশয় বলিলেন, ওঃ, তাই দাদা ব'লে মনে পড়েছে? তা "আমি টাকা কোথায় পাব? আমার কি তেজারতী কারবার আছে? আর তুমিই বা টাকা শুধবে কোথা হ'তে?"

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গিরিশ বলিল, "জানি না কোথা হ'তে শুধবো, কিন্তু মেয়ের বিয়ে দিতেই হবে। আমি জমি-জায়গা সব বাঁধা রাখব দাদা।

হাল। সব? সরভিটে পর্য্যন্ত?

গিরি। হাঁ।

হাল। টাকায় আড়াই পয়সা সুদ দিতে পারবে?

গিরিশ। তাই দেব।

হালদার মহাশয় একটু ভাবিয়া বলিলেন, "আচ্ছা কাল এস, দেখি গহনাপত্র বাঁধা দিয়ে যদি শ'দুয়েক টাকা যোগাড় ক'রতে পারি।"

গিরিশ জ্যেষ্ঠের পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল, তাঁহার পা দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দুশো নয় দাদা, তিনশো টাকা দাও, শুধু ঘর ভিটেয় না হয়, আমাকে পর্য্যন্ত বাঁধা রাখ; মেয়েটার গতি ক'রে দাও।"

তাহার হাত হইতে পা ছাড়াইয়া লইয়া হালদার মহাশয় বলিলেন, "আচ্ছা আজ যাও, কাল এসো, দেখা যাবে।"

গিরিশ উঠিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল; হালদার মহাশয় বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিলেন। গৃহিণী কাছে আসিয়া শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "লক্ষ্মণের চোখের জলে একেবারে গ'লে গেলে যে!"

হালদার মহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "গলে যাই নাই গিন্নী, আমি ঠিক আছি। টাকাটা যোগাড় ক'রে দিতে পারলে জমি ভিটে সবই তো আমার। ও কি আর ছাড়াতে পারবে?"

গৃহিণীর হাতে তখনও মালাটা ছিল। তিনি মালা সমেত হাতটা নাড়িয়া বলিলেন, "আহা হা, যেমন দেহখানি, তেমনি বুদ্ধি। ভায়ের বিষয় বেচে নেবে? লোকে যে মুখ পুড়িয়ে দেবে?"

হালদার মহাশয় বিকৃতমুখে বলিলেন, "তা দেয় দেবে। কবুকরে টাকা

বের ক'রে দেব, বিষয় বেচে সুদ আসল আদায় ক'রে নেব। লোকে কি বলবে না বলবে, সে খোঁজে আমার দরকার নাই।"

ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে নাকি সুরে গৃহিণী বলিলেন, "দেখা যাবে গো দেখা যাবে। তখন বলবে ছোট ভাই, গরীব!"

উচ্চ কণ্ঠে হালদার মহাশয় বলিলেন, "বটে আর কি, হরিশ হালদার সে পাত্রই নয়। তার টাকার কাছে ভাই বন্ধু কেউ নাই।"

(১৪)

"তুমি কি চাও মহামায়া?"

মহামায়া মুখ না ফিরাইয়াই অবজ্ঞার সহিত উত্তর করিল, "আমি আবার চাইব কি? আমার চাইবার আছে কি?"

গণেশ বলিল, "কিছুই কি নাই?"

মহা। একটা আছে, মরণ।

গণে। তোমার এত কিসের দুঃখ, মহামায়া?

মহা। দুঃখ আবার কি, সুখটাই সব।

গণে। সুখেরই বা অভাব কি?

মহা। কিছুই না. চার পো সুখ। খেতে, শুতে, বসতে, গাল, বকুনি, মার।

গণে। আর আদর, যত্ন, ভালবাসা?

মহা। অমন ভালবাসার মুখে ঝাঁটা।

ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে গণেশ বলিল, "সেইটাই তোমার পক্ষে ঠিক উপযুক্ত।"

তীব্রস্বরে মহামায়া বলিল, "নিশ্চয়, যখন তোমার মত উপযুক্ত পাত্রের হাতে প'ড়েছি।"

স্থিরদৃষ্টিতে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিয়া গণেশ জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কি তোমার অনুপযুক্ত ব'লে মনে কর?"

একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া মহামায়া বলিল. "কি জানি।"

গণেশ মহামায়ার হাতটা চাপিয়া ধরিল; পরুষ কণ্ঠে বলিল, "না, তোমায় বলতে হবে।"

"কি বলবো?"

"আমি কিসে তোমার অনুপযুক্ত?"

মুখটা উঁচু করিয়া মহামায়া গর্ব্বস্ফীত কণ্ঠে বলিল, "সকল রকমে।"

হাতে জোর দিয়া গণেশ ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে বলিল, "কি রকমে তাই বল।"

"তুমি কি মানুষ ?"

"তবে কি ?"

"বড় গিন্নীর পোষা ভেড়া।"

হাত ছাড়িয়া দিয়া গণেশ স্ত্রীর ঘাড়টা সবলে চাপিয়া ধরিল। মহামায়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

সে চীৎকার শুনিয়া নিস্তারিণী ছুটিয়া আসিল ; মাতঙ্গিনীও তাহার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। নিস্তারিণী দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া, উচ্চ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ওকি ঠাকুরপো ?"

নিস্তারিণীর দিকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গণেশ মহামায়ার ঘাড় ছাড়িয়া দিল এবং রাগে ফুলিতে ফুলিতে গিয়া বিছানার উপর বসিল। ছোট বৌ চোখে আঁচল চাপা দিল।

নিস্তারিণী গণেশের দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "তুমি ছোট বৌকে মারছিলে ?"

মুখ তুলিয়া গণেশ ক্রোধগম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, "হঁা।"

নিস্তা। কেন ?

গণে। আমার খুসী।

গর্জ্জন করিয়া নিস্তারিণী বলিল, "কি বল্‌লি ?"

গণেশ অবিচলিতস্বরে বলিল, "বলছি, আমার স্ত্রীকে আমি শাসন করবো, তাতে কারো কোন কথা বলবার অধিকার নাই।"

নিস্তারিণী দাঁতে দাঁতে চাপিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ; ক্রোধদীপ্ত কণ্ঠে ডাকিল, "গণশা !"

গণেশ বলিল, "তোমাকে বারণ ক'রে দিচ্চি বৌদি, তুমি এ সব কথায় থেক না।"

রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে নিস্তারিণী বলিল, "আর তোমাকেও বারণ ক'রে দিচ্চি, তুমি যে আমার সামনে ওকে মার-ধর করবে তা হবে না।"

গণেশও তখন রাগে হতজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল। সে চীৎকার করিয়া বলিল, "এক শো বার হবে ; আমি ওকে এইখানে কুঁচি কুচি ক'রে কাটব, দেখি কার বাবার সাধ্যি একটা কথা বলে !"

নিস্তারিণী দুই হাতে দরজার বাজু দুইটা ধরিয়া নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

মাতঙ্গিনী এতক্ষণ এক পাশে গালে হাত দিয়া স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়াছিল। সে একটু অগ্রসর হইয়া বলিল, "তুই হ'লি কিরে গণশা ?"

গণেশ উচ্চ কণ্ঠে বলিল, "আমি যাই হই, কিন্তু তোমাদের এ সব অন্যায় আবদার আমার সহ্য হবে না। তোমরা যদি বার বার এই রকম জ্বালাতন কর, তা হ'লে আমি এর একটা হেস্তনেস্ত না করে ছাড়্ব না।"

মাতঙ্গিনী রাগিয়া বলিল, "কি হেস্তনেস্ত করবি ? পৃথক্ হবি ?"

গণেশ বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। রোষরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল, "হাঁ, তাই হব। পৃথক্ হ'লে যদি তোমাদের এ অত্যাচার হ'তে রক্ষা পাই, তবে তাই হব।"

দরজা হইতে নিস্তারিণীর হাতটা সরাইয়া দিয়া গণেশ রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল। মাতঙ্গিনী নিস্তারিণীর হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া আসিল।

নিস্তারিণীর যেন বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। আপনার ঘরে আসিয়া সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মাতঙ্গিনী কিছুক্ষণ তাহার পাশে বসিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে ডাকিল, "বড় বৌ!"

নিস্তারিণীর মুখে কথা নাই। মাতঙ্গিনী বলিল, "গণশা একেবারে অধঃপাতে গিয়েছে বড় বৌ!"

নিস্তারিণী মুখ তুলিয়া চাহিল ; ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "চুলোয় যাক্ সে ; যে আমার বাপ তুলে কথা কয়, তার মুখ দেখাও পাপ।"

মাতঙ্গিনী একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু আমার মনে হয় বড় বৌ, এ সকলই ছোট বোয়ের কাণ্ড।"

ভ্রূকুটী করিয়া নিস্তারিণী বলিল, "কে বল্লে ?"

মাতঙ্গিনী বলিল, "বলবে আবার কে ? তুমি ওকে চেননা বড় বৌ, ও বড় সহজ মেয়ে নয়।"

নিস্তারিণী তাহার মুখের উপর জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তীব্র কণ্ঠে বলিল, "তা হ'লে এক কাজ কর ঠাকুরঝি, তোমরা ভাই বোনে মিলে মেয়েটার গলায় পা দিয়ে দাঁড়াও। সব আপদ্ চুকে যাক্।"

নিস্তারিণী মুখ ফিরাইয়া মেঝের উপর শুইয়া পড়িল। মাতঙ্গিনী ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

(১৫)

সংসার ভাঙ্গিল। গ্রামের লোকেরা যখন শুনিল যে, মুরলী হাজরা ভায়ের

সঙ্গে পৃথক্ হইতেছে, তখন তাহারা প্রথমে বিস্ময় প্রকাশ করিল, তারপর স্থানে স্থানে বৈঠক করিয়া উভয় ভ্রাতার মধ্যে দোষার বিচারে প্রবৃত্ত হইল। হালদার মহাশয় দোকানে বসিয়া মুরলার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং ছোট ভাইদের হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে বিস্তর উদাহরণ দিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে করিতে আপনাকে ইহাতে রীতিমত ভুক্তভোগী বলিয়া প্রকাশ করিলেন।

নেত্যর মা পুকুর-ঘাটে নিস্তারিণীকে পাইয়া ধরিয়া বসিল, এবং গণেশ ঘোরতর অধর্ম্মের কাজ করিতেছে, এরূপ অধর্ম্ম যে ধর্ম্মে সহিবে না, ভবিষ্যতে তাহাকে ভয়ানক কষ্ট পাইতে হইবে, এইরূপ মত প্রকাশ করিল। নিস্তারিণী কিন্তু সে মতে সম্পূর্ণ সায় দিল না; সে বলিল, "শুধু তার একার দোষ নয় মা, দোষ আমারও আছে। এক হাতে কখন তালি বাজে না।"

নেত্যর মা সপ্রতিভ ভাবে উত্তর করিল, "তা হোক্ না মা, তুই তো তাকে হাতে ক'রে মানুষ করেছিস্?"

নিস্তারিণী সহাস্যে বলিল, "মানুষ ক'রেছি ব'লে কি সে চিরকাল আমার কথা সইবে? সকলেরই তো রক্তমাংসের শরীর।"

অগত্যা নেত্যর মাকে নীরব হইতে হইল। কিন্তু পরের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশের এরূপ অভাবনীয় সুযোগ হারাইয়া সে নিস্তারিণীর উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল, এবং পাড়ায় পাড়ায় প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, হাজরাদের বড় বৌটা হারামজাদার হাড়, তার দোষেই সংসারটা উচ্ছন্ন গেল।

বাস্তবিক পৃথক্ হইবার জন্য নিস্তারিণীই যেন বেশী উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। মুরলী, যাহাতে সংসারটা না ভাঙ্গে তাহার জন্য একটু চেষ্টা করিল, কিন্তু নিস্তারিণীর জেদের নিকট তাহার চেষ্টা বিফল হইয়া গেল। বড় বৌয়ের জেদ দেখিয়া মুরলী আশ্চর্য্যান্বিত হইল।

তখন পৃথক্ হইবার বন্দোবস্ত হইল। হালদার মহাশয় এ সকল বিষয়ে সবিশেষ পারদর্শী, সুতরাং মুরলী তাঁহাকেই মধ্যস্থ মানিল। গণেশের কাহাকেও মধ্যস্থ মানিবার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মুরলী বলিল, "ভাগাভাগির ব্যাপারে একজন মধ্যস্থ থাকা ভাল।"

হালদার মহাশয় আসিয়া জাঁকিয়া বসিলেন। আমোদ দেখিবার জন্য পাড়ার দুই চারিজন মেয়ে পুরুষও আসিয়া জুটিল। জমি-জায়গার ফর্দ্দ করিয়া সমান ভাগে চিহ্নিত করিয়া দেওয়া হইল। তিনখানা ঘর ছিল।

হালদার মহাশয় মুরলীকে দুইখানা এবং গণেশকে একখানা ঘর দিবার প্রস্তাব করিলেন। মুরলী বলিল, "আমার দু'খানা ঘরে দরকার কি, একখানা হ'লেই চলবে।" কাজেই হালদার মহাশয় গণেশের ভাগে দুইখানা ঘর ফেলিলেন।

তারপর জিনিষপত্র, বাসন-কোসন ভাগের ব্যবস্থা। হালদার মহাশয় বলিলেন, "সোণা রূপার গহনা যা কিছু আছে, সব ওজন করে সমান ভাগ করতে হবে।"

মহামায়া শুনিয়া ঘরের ভিতর বসিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল।

মুরলী মাথা নাড়িয়া বলিল, "না না, গহনা গাঁটী স্ত্রীধন, ও সব যার যা আছে তাই থাক্।"

মাতঙ্গিনী বলিল, "বড় বোয়ের যে রাংরত্তি নাই।"

ভ্রূকুটী করিয়া মুরলী বলিল, "সে কপাল! কপালে নাই তা আমি কি ক'রব।"

অতঃপর সে মাতঙ্গিনীকে ঘটী-বাটী বাসন-কোসন সব বাহির করিতে বলিল। মাতঙ্গিনী তাহাতে কাণ দিল না, সে খিড়কী দরজা দিয়া বাহির হইয়া ঘোষেদের বাড়ী চলিয়া গেল। মুরলী বাসন বাহির করিবার জন্য ডাকাডাকি করিতে লাগিল। তখন নিস্তারিণী নিজেই মাথায় কাপড় দিয়া, কোমরে আঁচলটা জড়াইয়া থালা ঘটী ঘড়া গাড়ু প্রভৃতি বাহির করিতে লাগিল এবং সে সকল বহিয়া আনিয়া উঠানের মাঝখানে ঝন্ ঝন্ শব্দে ফেলিতে লাগিল। গণেশ মুখ ফিরাইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া বসিয়া রহিল।

বাসন ভাগ হইয়া গেল। তবে দুইটা ভাগ সমান হইল না, একটা কিছু কম একটা বেশী হইল। থালা ঘটী ভাঙ্গিয়া সমান ভাগ করিবার উপায় নাই। হালদার মহাশয় বলিলেন, "মুরলী বড়, জ্যেষ্ঠত্বের সম্মানস্বরূপে বড় ভাগটা লউক।"

নিস্তারিণী কিন্তু তাহা লইল না; সে তাড়াতাড়ি আসিয়া ছোট ভাগটা লইয়া আপনার ঘরে তুলিল। মহামায়া সর্ব্বাঙ্গ বেশ করিয়া কাপড়ে ঢাকিয়া আপনার ভাগ বহিতে লাগিল। নিস্তারিণী ছেলের জন্য একখানা ছোট থালা এবং একটা ছোট ঘটী সাধ করিয়া কিনিয়াছিল; তাহা গণেশের ভাগে পড়িয়াছিল। নিস্তারিণী একটু অন্তরালে গিয়া মহামায়াকে বলিল, "ছোট বৌ, খোকার থালা ঘটীটা দে, ওর বদলে আমি একটা বড় থালা ঘটী দিচ্ছি।"

"আমিও সব কিছু জানি না" বলিয়া মহামায়া সেগুলা ঘরে তুলিল। গণেশ দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং মহামায়ার হাত হইতে থালা ঘটীটা লইয়া বড় বোয়ের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। নিস্তারিণী আর একখানা বড় থালা, একটা বড় ঘটী আনিয়া দিয়া খোকার থালা ঘটী তুলিয়া লইল। গণেশ ক্রোধরক্ত দৃষ্টিতে একবার নিস্তারিণীর মুখের দিকে চাহিল, তার পর নিস্তারিণীর হাত হইতে জিনিষ দুইটা ছিনাইয়া লইয়া আপনার ঘরে রাখিয়া আসিল। মহামায়া ঘোমটার ভিতর মৃদু হাসিল।

এ দিক্‌কার খুচরা ভাগ হইয়া গেলে দোকানের কথা উঠিল। হালদার মহাশয় বলিলেন, "দোকান এত সহজে ভাগ হবে না; তার মালপত্র দেখতে হবে, খাতাপত্র দেখে হিসেব-নিকেশ কর্‌তে হবে। যে ক'দিন তা না হয়, ততদিন দুই ভায়ে দু'টো চাবী বন্ধ ক'রে রাখ।"

গণেশ মুখ তুলিয়া কঠোরস্বরে বলিল, "দোকান ভাগ হবে না।"

সকলেই বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টিতে গণেশের মুখের দিকে চাহিল। গণেশ বলিল, "দোকানে আমার বখরা নাই, দোকান দাদার একার।"

বিষাদের হাসি হাসিয়া হালদার মহাশয় বলিলেন, "বেশ বেশ, তুমি যখন ছেড়ে দিচ্ছ তখন নাই বা বখরা হ'লো। আর এ রকম ছেড়ে দেওয়াই তো উচিত; হাজার হোক, বড় ভাই তো বটে। চিরকালই জানি, গণেশ খুব ভাল ছেলে, তার উপর লেখাপড়া শিখেছে। সে তো আমার ছোট ভায়ার মত নয়। তারা শিবসুন্দরী মা!"

মুরলী গর্ব্বপ্রফুল্ল দৃষ্টিতে একবার গণেশের মুখের দিকে চাহিল। তার পর দৃষ্টি ফিরাইয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কিন্তু আমার কাছে মাতুর সাড়ে তিন শো টাকা আছে, সেটার কি হবে?"

হালদার মহাশয় বলিলেন, "গণেশ মাতঙ্গিনীর সহোদর, টাকাটা তার হাতেই দেবে।"

মুরলী বলিল, "কিন্তু টাকা তো আমার হাতে নাই। আর একবারে এত টাকা দিতে পারব না।"

হালদার মহাশয় বলিলেন, "একবারে না পার দু'বারে দেবে, দু'বারে না হয় তিনবারে দেবে। মোদ্দা দেওয়া চাই, অবীরার টাকা!"

মুরলী বলিল, "আমি ছ'মাসের ভিতর দেব।"

ভাগ শেষ করিয়া যাইতে যাইতে পথে হালদার মহাশয় দর্পকরূপে

উপস্থিত শিবু ঘোষকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখলে হে ব্যাপারটা ; দু'টো ভাইই বোকা।"

শিবু ঘোষ মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা বই কি বাবা ঠাকুর, বোকা না হ'লে আপন গণ্ডা ছেড়ে দেয় ?"

মাতঙ্গিনী গণেশের সংসারে থাকিবে স্থির হইল। মুরলী ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, "না, মাতু আমার সংসারে থাক্।"

নিস্তারিণী কিন্তু ইহাতে রাজি হইল না। মাতঙ্গিনী বলিল, "আমি কি দোষ করলাম বড় বৌ যে, আমাকে পর্য্যন্ত তাড়ালে ?"

সহাস্যে নিস্তারিণী বলিল, "তাড়াব কেন ঠাকুরঝি, তুমি তোমার ভায়ের কাছে থাকবে।"

মাতঙ্গিনী রাগিয়া বলিল, "দাদা কি আমার ভাই নয় ?"

নিস্তারিণী বলিল, "সতাতো ভাই, কিন্তু গণেশ মার পেটের ভাই।"

চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, "দেখ বড় বৌ, তোমাকে যদি না চিনতাম, তা হ'লে তুমি আমাকে ভোলাতে পারতে ; সত্যি বল, কেন তুমি আমাকে তাড়ালে ? আমি তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরবো বড় বৌ।"

মাতঙ্গিনীর হাত দুইটা ধরিয়া মৃদু হাসিয়া নিস্তারিণী বলিল, "তুমি না থাকলে ঐ কচি মেয়েটা কি সংসার রাখতে পারবে ঠাকুরঝি ?"

মুখ ভার করিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, "না পারে না পারবে। ওর সঙ্গে আমার বনিবনাও হবে না।"

নিস্তা। বনিয়ে নিতে হবে। নয় তো গণশা যে ভেসে যাবে।

মাতঙ্গিনী রাগে চীৎকার করিয়া বলিল, "চুলোয় যাক্ গণশা, যে তোমাকে চিনতে পারলে না, তার কি ভাল হবে মনে কর ? এই আমি দিব্যি ক'রে বলছি বড় বৌ, ওর কখনো ভাল হবে না, ও নিশ্চয় উচ্ছন্ন যাবে যাবে—"

নিস্তারিণী তাড়াতাড়ি তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কর কি ঠাকুরঝি, কা'কে অভিশাপ দিচ্ছ।"

মাতঙ্গিনী হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

(ক্রমশঃ)

এক পেয়ালা চা।

[লেখক—নিমচাঁদ]

"চা! চা! চা!"—চায়ের বিজ্ঞাপন বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু সেদিন অভিধান খুলিয়া দেখিলাম যে, 'চা' শব্দটী অত্যন্ত রহস্যময়। বিজ্ঞাপনের শিরোনামা পাঠ করিয়া আমরা ইহার যে অর্থ বুঝি, বাস্তবিক সে অর্থে চা-ব্যবসায়ী ইহা ব্যবহার করে না। চা-সেবক পাঠকের অবগতির জন্য এ স্থলে "বঙ্গ ইঙ্গ শব্দার্থ অভিধান" হইতে পরিভাষা সমেত কয়েক ছত্র অবিকল উদ্ধৃত হইল :—

চা (ইচ্ছা শব্দজ) বি, সং, স্পৃহা, বাঞ্ছা ; (n) wish desire ; (যাবানক) বৃক্ষবিশেষ, চা বৃক্ষ, বৃক্ষবিশেষের পত্র ; tea plant, tea leaves ; চা-সিদ্ধ জল ; decoction of tea leaves ; (দেশজ) ক্রি, বাং, চাহ, চাও, চাহিয়া লও ; (v) ask ; (হিন্দি) চায়ে = চা = tea ; চা-কর, যে চায়ের আবাদ করে, চায়ের শুল্ক ; tea planter, tea duty ; চাকর, যে চা প্রস্তুত করে, ভৃত্য, বাঙ্গালী ; one who prepares tea, servant, Bengali ; চা কর, চা প্রস্তুত কর ; prepare tea ; চায় চাহিয়া লয়।

(১) "চা-কর চা করে, চা-কর চায়!
চাকর চা করে চাকর চায়॥" (ভারতচন্দ্র)

(২) "তারা আমি আর কিছুই চাই না গো মা ;
প্রাতঃকালে পাই যেন এক পিয়ালা চা॥" (রামপ্রসাদ)

(৩) "চায়ে চুরুট বুলি বেশ।
চায় লেকে বঙ্গলা দেশ॥" (তুলসী দাস)

একজন আমেরিকান বিশেষজ্ঞের মতে আমরা এক পেয়ালা চায়ের সহিত টেনিন নামে যে বিষ পান করি, তাহাতে আমাদের পাকাশয়ের প্রভূত অনিষ্ট হয়। চায়ের বিষ স্বাস্থ্যের অত্যন্ত হানিকর, কারণ এই বিষ পাকাশয় হইতে নির্গত পেপসিন নামে পাচক রসকে ভুক্ত দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইতে দেয় না। চায়ের বিষের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এক পেয়ালা চা পান করিলে পাকস্থলীর গ্যাসট্রিক নামে পাচক রস এমন নিস্তেজ হইয়া যায়, রক্ত হইতে দূষিত পদার্থকে শোষণ করিয়া লইবার জন্য দেহাভ্যন্তরে যে সকল যন্ত্র আছে সেগুলি এমন অতিরিক্ত শ্রমভারে পীড়িত হয় এবং অন্যান্য

যন্ত্রগুলি এরূপ উত্তেজনার বশবর্ত্তী হয় যে, তদ্দ্বারা পাকক্রিয়া কিছুতেই সুসম্পন্ন হয় না। গরম চা যেমন উত্তেজক, তেমনি আবার দৃঢ় ও সবল স্নায়ুকে দুর্ব্বল ও শিথিল করিবার উপায়; আফিমের ন্যায় চায়ের নিদ্রা আনয়ন করিবার গুণ বা ক্ষমতা অল্প পরিমাণে আছে, কিন্তু অধিক পরিমাণে চা সেবন করিলে কুম্ভকর্ণেরও অনিদ্রা রোগ জন্মে। চা-সেবনকারীর মস্তিষ্কের স্বাভাবিক শক্তি ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সুগন্ধ মুখরোচক সুখ-সেব্য চায়ের এতগুলি দোষ আছে বলিয়া, চা-ব্যবসায়ী আমাদিগকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করিয়া বলে, "চা চা চা" অর্থাৎ "তোরা চেয়ে নে, আমাকে যেন দোষী না হইতে হয়।" চা-ওয়ালা ভদ্রলোক—আর আমরা কি? আমরা যে বোকা তাহাই বা কেমন করিয়া বলি? নিত্য চা পান করিলে যখন হজম করিবার শক্তি একেবারে কমিয়া যায়, তখন এই মহার্ঘের দিনে চা দরিদ্র বাঙ্গালীর পরম বন্ধু বলিতে হয়!

উৎকৃষ্ট চায়ে টেনিন নামে বিষ আছে, কিন্তু ভেজাল চা বিশ্লেষণ করিয়া আরও অনেকগুলি বিষ পাওয়া যায়। (১) নীল, (২) বাজারে প্রুসিয়ান ব্লু নামে যে নীল রং বিক্রয় হয়, (৩) কৃষ্ণ সীসা—যাহা হইতে পেনসিল প্রস্তুত হয়, (৪) সূক্ষ্ম লৌহচূর্ণ, (৫) বাজারে ভিনিসিয়ান্ রেড্ নামে যে রং বিক্রয় হয়, (৬) তাম্রক্ষার, (৭) জাঙ্গাল বা চিরাকস, (৮) উদ্ভিজ্জ-ভস্মের ক্ষার যাহা রং প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়, (৯) প্যারিস গ্রিন নামে যে রং সুপরিচিত (১০) সালফেট অব লাইম, ইত্যাদি। যে সকল দ্রব্যের সংযোগে ভেজাল চা প্রস্তুত হয়, তাহার তালিকা এখনও সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। ভেজাল চা হইতে প্রস্তুত এক পেয়ালা পানীয় সেবন করিয়া আমরা যে পরিমাণ রং উদরস্থ করি, তাহার হিসাবে আমাদের চামড়ার রংয়ে যতটা জলুষ বাহির হওয়া উচিত ততটা যে হয় না, ইহাই দুঃখের বিষয়।

মদ্যপায়ীরা বলে, চা সুরা-সুন্দরীর পরিচারিকা। প্রাতঃকালে শিথিল ও অবসন্ন দেহকে আশ্রয় করিয়া যখন সুরা-সুন্দরী বিকলা বিহ্বলা হইয়া পড়েন, তখন সৈরিন্ধ্রী চা আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করে। নীরবে সাধারণের, বিশেষতঃ বাঙ্গালী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিয়া চা আমাদের সমাজের যে ইষ্টানিষ্ট সাধন করিতেছে, তাহার বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। নিমন্ত্রণ-সভায়, সাহিত্য-সম্মিলনে, পাঠাগারে, গৃহস্থের অন্দর-মহলে সুরা-সুন্দরীর প্রবেশাধিকার নাই; কিন্তু তাঁহার পরিচারিকার সর্ব্বত্র

অবাধ গতি। কবি কাউপার যে দিন বলিলেন, "এক পেয়ালা চা মনকে প্রফুল্ল করে মাত্র; কিন্তু মানুষকে প্রমত্ত করে না" (The cup that cheers and not inebriates), সেই দিন হইতে আমরা চায়ের পক্ষপাতী হইয়া পড়িলাম। এখন বিজ্ঞানবিদের শত উপদেশ সত্ত্বেও আমরা চায়ের দোষ দেখিতে পাই না। ইংরাজ কবি যখন চায়ের গুণ কীর্ত্তন করিয়াছেন, তখন তাহার কোনও দোষ থাকা অসম্ভব। তা' ছাড়া, যখন দুগ্ধ ও শর্করা চায়ের সঙ্গিনী, তখন যে ব্যক্তি চায়ের দোষ দেখায়, সে বিশ্বনিন্দুক।

হায় দুগ্ধ! তোমার দোহাই দিয়া চা মানবসমাজের যে কি সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা ভাবিলেও পাপ হয়! এক পেয়ালা চায়ের মধ্যে বাস্তবিক তোমার অস্তিত্ব কি খুঁজিয়া পাওয়া যায়? অথবা তুমি চায়ের সহিত পেয়ালা রূপ নরককুণ্ডে বাস করিয়া নিজেও অপবিত্র হইয়াছ? শুনিতে পাই, চর্ব্বির সহিত সীসা, দগ্ধ চিনি, লবণ, জল ও কয়েক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্যের সংযোগে ভেজাল জমাট দুগ্ধ প্রস্তুত হয়। জলবৎ তরলং দুগ্ধম্ টাইফইড প্রভৃতি নানা রোগের কারণ। চিনির ভেজালের কথা একখানা ইংরাজি কেতাবে যাহা পড়িয়াছি তাহাই এস্থলে বিবৃত করিতেছি। সালফিউরিক এসিডে ষ্টার্চ, তুলা ও কাঠের আঁইস সিদ্ধ করিয়া একের নম্বর চিনির ভেজাল প্রস্তুত হয়; দুয়ের নম্বর ভেজাল প্লাষ্টার ও মৃত্তিকা; তিনের নম্বর হাড়ের গুঁড়া। চারের নম্বর ক্লোরাইড অব টিন। অলম্ অতি বিস্তরেণ।

চায়ের আধার যে পেয়ালা তাহার এনামেল আবরণেই বা কত প্রকার বিষাক্ত দ্রব্য মিশ্রিত! সীসা, এণ্টিমনি ইত্যাদি। তাই কি চায়ের একটি মাত্র আসবাব পেয়ালা? পিরিচ, পেয়ালা, কেটলি, টি-পট্, ছাঁকনি, চামচ, চিনিদান, দুগ্ধাধার, ট্রে, ষ্টোভ্। ধন্য তুমি চা! আমাদের ঘরকন্না কেমন সাজাইয়া দিয়াছ! আসবারের কোনওটি এদেশে প্রস্তুত হয় না। জারমানি ও অষ্ট্রিয়া এই সকল আসবাব বিক্রয় করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে যে কোটী কোটী টাকা লাভ করিয়া লইয়াছে, তাহারই জোরে আজ আমাদের রাজা পঞ্চম জর্জ্জের বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ করিতেছে। এত দিনে আসবাবগুলি অব্যবহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। গত বিশ বৎসরে যে সকল চায়ের আসবাব বৃদ্ধি হইয়াছে সেগুলিকে যদি স্তুপাকার করা যায়, তাহা হইলে পিরামিড হইতেও উচ্চ বাঙ্গালীর নির্ব্বুদ্ধিতার কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রস্তুত হয়!

ইংরাজিতে একটা প্রবাদ বাক্য আছে যে, এক পেয়ালা চায়ে সময়ে সময়ে ঝড় উঠিয়া থাকে (Tempest in a tea-cup)। কথাটা যে একেবারে উপহাসের যোগ্য তাহা নহে। চায়ের ঝড়ে আমেরিকায় ইংরাজ-অধিকারের একটী প্রকাণ্ড ভূখণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া যুক্তরাজ্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এই ঝড়ের বেগে বিতাড়িত হাজার হাজার লোক ভারতের নানা প্রদেশ হইতে আসামের চা বাগানে নীত হইয়া কুলির কার্য্য করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিতেছে। চায়ের ঝড়ের প্রকোপ হ্রাস করিবার জন্য আইন-আদালত আছে। কত আড়কাটি যে এই ঝড়ের তাড়নায় কারাবাস ভোগ করিয়াছে, তাহার সংখ্যা হয় না। পেয়ালা-শোভনা চা, তুমি ধন্য, তোমায় নমস্কার করি। তুমি যুদ্ধস্থলে বীরের অবসাদ দূর করিয়া তাহার বাহুতে শক্তি সঞ্চারিত করিতেছ। ইংলণ্ডে তুমি কোটী কোটী টাকা শুল্ক আদায় করিয়া প্রজা-সাধারণের উপকার করিতেছ। তুমিই হাড়ভাঙ্গা পাশের পড়ায় ছাত্রগণকে সাহায্য করিয়া থাক। তুমিই রাত্রি জাগিয়া খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিয়া থাক। তোমার অপার মহিমায় কলিকাতার হোটেলগুলি শ্রীক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও মুসলমান একই পেয়ালায় চা পান করিয়া অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিতেছে। এক পেয়ালা চায়ের যে কি অলৌকিক শক্তি, তাহা শত মুখে ব্যাখ্যা করা যায় না। ভক্তেরা চায়ের গুণে মুগ্ধ হইয়া গান করে,—

"(ওরে) আমার মন রসনা,
এক পেয়ালা চা বিনা,
আর কিছুই চা'বি না"।

নবেল।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।]

আলঙ্কারিক কাব্য-গ্রন্থকে গোটা তিন ভাগে বিভক্ত করেন। সে বড় সামান্য ভাগ নয়, বিপুল বিভাগ। মহা-কাব্য, দৃশ্য-কাব্য ও গীতি-কাব্য। কাব্যের এই তিন সুবিশাল শ্রেণী। আলঙ্কারিকের এই 'বেড়া জালে' সুবৃহৎ রোহিত হইতে সামান্য শফরী অবধি সকলকেই পড়িতে হইবে। যাহা পড়িবে না তাহা মৎস্য নয়, অথবা মৎস্য হইলেও নিরামিষ মৎস্য। কিন্তু রূপকের ঝগড়ে দরকার নাই। সাদা কথায় এই বুঝুন যে, কাব্যের এই তিন শ্রেণীতে যাহা আসিবে না, তাহা কাব্য নয়, অথবা কাব্য হইলেও উদ্ভট কাব্য।

দৃশ্য-কাব্য ও গীতি-কাব্য, উভয়কে গ্রাস করিয়াও মহা-কাব্যের উদরে স্থান থাকে, সে স্থান তাহার নিজস্ব খাস সম্পত্তি উপাখ্যান অংশের অর্থাৎ দৃশ্য-কাব্য ও গীতি-কাব্য উভয়ই মহা-কাব্যের অধিকারাধীন। অথবা ইহাও আর এক দিক দিয়া বলিলেও চলে যে, দৃশ্য-কাব্য ও গীতি-কাব্য মহাকাব্যেরই দুইটা সুদীর্ঘ শাখা। তবে শাখা যখন স্বতন্ত্র বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন সে নিজের নিজস্ব কি না বৃক্ষত্ব অবশ্য 'জাহির' করে। দৃশ্য কাব্যের ও গীতি-কাব্যের স্ব স্ব স্বতন্ত্র সত্তায় স্বকীয় নিজস্ব বিশেষত্ব অবশ্যই আছে, ইহা বলাই বাহুল্য। তবে মহা-কবি, দৃশ্য-কবি ও গীতি-কবির ক্ষমতা পরিচালনা করিতেও পারেন। দৃশ্য-কাব্য মানে নাটক গীতি-কাব্য অর্থে সংগীত-কাব্য বা সংগীতের অনুরূপ খণ্ড খণ্ড কবিতা। খণ্ডাকার বলিয়া ইহাকে খণ্ড-কাব্যও কহে।

কোনও একটা মনোভাবের বা চিত্ত-আবেগের যে অংশ ক্রিয়া এবং কথা দ্বারা প্রকাশিত হয়, সেই অংশে নাটককারের অর্থাৎ দৃশ্যকাব্যকারের অধিকার। পক্ষান্তরে মনোভাবের বা চিত্ত-আবেগের যে অংশ ক্রিয়া বা কথা দ্বারা প্রকাশিত হয় না; কতকাংশ ক্রিয়া বা কথা দ্বারা প্রকাশিত হইয়া গিয়া, আবেগের যে অবশিষ্ট অংশ মনোমধ্যে রুদ্ধ থাকিয়া উদ্বেলিত হয়, সেই অংশে গীতিকাব্যকারের অধিকার। এই দুই অধিকারই মহা-কবির আছে। মহাকবি মনুষ্য-মনের ক্রিয়াশীল ও চিন্তাশীল দুই অংশেই কলম চালাইতে পারেন।

সংক্ষেপতঃ কাব্য এই এবং কাব্য এই তিন শ্রেণীর। এখন কথা এই যে, আমাদের এই নবেল-কাব্য, কাব্যের এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কোন শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর অত্যন্ত আক্ষেপের সঙ্গেই দিতেছি যে, এই তিনও শ্রেণীর কোন শ্রেণীতেই নবেল-কাব্যের স্থান হইতে পারে না। নবেল রাঢ়ীও নহে, বারেন্দ্রও নহে, সপ্তসতীও নহে। নবেল মহাকাব্যও নহে, দৃশ্য-কাব্যও নহে, গীতি কাব্যও নহে। তবে নবেল কি? যদি আজ্ঞা করেন ত, ভয়ে হউক নির্ভয়ে হউক বলি,—আলঙ্কারিকের অলঙ্কারযুক্ত বাক্যেতেই বলি যে, নবেল মহাকাব্যের রূপান্তরিত এক 'উদ্ভট' কাব্য। 'উদ্ভট বটে, কিন্তু উৎকট বা বিকট নহে।' বরং উহার "শঠ ষটপদ সম ব্যবহার"। 'উৎকটে' আর 'বিকটে' কি আর সে 'ব্যবহার' করিতে পারে। নবেল রসের বাজারে 'নটবর,' পীরিতি-পারাবারে নবীন কর্ণধার।

নবেলকে মহাকাব্যের শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিলে কিন্তু ভাল হইত। তাহা হইলে মনুষ্য-লোকের প্রায় অর্দ্ধেক লোক মহাকবি হইতে পারিত। কারণ পৃথিবীর প্রায় অর্দ্ধেক লোকেই নবেল লিখিয়া থাকেন; কিন্তু নবেল মহাকাব্য নহে।

প্রকৃত প্রস্তাবে যাহাকে নির্জ্জলা নবেল বলা যায়, নবেল যে প্রকৃতি লইয়া প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সে প্রকৃতির ক্রমশঃ যে প্রকার পরিণতি হইতেছে, তাহাতে নবেল খাঁটি, অবিমিশ্র, নিখুঁত গদ্যকাব্য। গদ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং হইতেছে। গদ্য, কবিতার কোমল কান্তি বক্ষে ধরিয়া ক্রীড়া করিতেছে; তাহার সুবিমল সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সৌরভ বহন করিয়া উচ্চ আকাশে উড়িতেছে; কিন্তু গদ্য আজিও গীতের উপযুক্ত হয় নাই। বৈদিক কালের সংস্কৃত গদ্যে গীত হইত বটে; কিন্তু সে এক সময় গিয়াছে। আধুনিক কোনও দেশীয় কোনও ভাষার গদ্যেই গীত সম্ভবে না। মহাকাব্যের এক অংশ গীতিকাব্য: অতএব গদ্য-কাব্য মহাকাব্য হইতে পারে না; পরন্তু নবেল গীতিকাব্য নহে। তৃতীয়তঃ নবেল নাটকাকারে গঠিত নয়, দৃশ্য দেখাইবার জন্যও সৃষ্ট নয়; অতএব উহা নাটক বা দৃশ্য-কাব্য নহে। নবেলে নাটকত্ব থাকা চাই, কিন্তু নবেল নাটক নহে। কারণ নবেল ভাঙ্গিয়া নাটক না গড়িলে, তাহাকে অভিনয় করা যায় না।

এখন আর অধিক বলা বাহুল্য যে, কবিতাময় সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন উচ্চশ্রেণীর নবেল-কাব্যে মহাকাব্যের কতক কতক লক্ষণ থাকে। তাহাতে নাটকত্ব

থাকে, উপাখ্যান থাকে এবং গীতি না থাকিলেও, আবেগের যে অংশ লইয়া গীতি, সে অংশের অভিব্যক্তি থাকে। নবেল মহাকাব্যের রূপান্তর বা নকল। নকল হইয়াও নূতন পদার্থ। নবেল সাহিত্যক্ষেত্রে কাব্য-গ্রন্থের স্বাভাবিক 'ক্রম-বিকাশ'—এক অভিনব শস্য। উহা সময়ের ফল; সাময়িক রুচি-প্রবৃত্তির আকাঙ্ক্ষিত এক নূতন সাহিত্যাধ্যায়।

মহাকাব্যাদি, পদ্যময় কাব্যাদি সাধারণতঃ এখন আর কেহ পড়ে না। পড়িতে ক্লান্তি বোধ করে। কাজেই কাব্যরাজ্যে এখন নবেলের 'রেওয়াজ'। নবেল অল্পে অল্পে আত্মাধিকার বিস্তার করিয়া এখন সুকুমার সাহিত্যকে সর্ব্বগ্রাস করিয়াছে বলিলেও চলে। পাশ্চাত্য দেশনিচয়ে নবেলের প্রচলন সংবাদপত্রের সদৃশ। অক্ষরজ্ঞ হইয়া এমন লোক নাই যে, নবেল ও সংবাদপত্র না পড়ে। উচ্চ, মধ্য, নিম্ন—সমাজের সকল শ্রেণীর এবং সম্প্রদায়ের ও সর্ব্বপ্রকার শ্রমজীবীরও স্ব স্ব শিক্ষা ও শক্তি-অনুসারে পঠনোপযুক্ত বিবিধ প্রকারে নবেল রচিত হয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, নূতন শিল্প ব্যবসা ও বিজ্ঞান, বিদ্রূপ, ব্যক্তিগত বিশেষ মতামত (কি নয়?) নবেলের আশ্রয়ীভূত হইয়া প্রচারিত হয়। বিলাতে প্রতি সপ্তাহে শতাবধি নূতন নবেল প্রচারিত ও পঠিত হয়; ফ্রান্সে ততোধিক; মার্কিণ মুলুকে বোধ করি, তাহা অপেক্ষাও বেশী। পাশ্চাত্য জাতিনিচয় ভয়ানক প্রত্যক্ষবাদী; কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে সাংঘাতিকরূপে উপন্যাস-খোর। প্রকৃতির একি এক অভিনব অসঙ্গত লীলা বুঝা যায় না। বোধ করি এটা প্রকৃতিরই প্রতিশোধ, খরতর 'খেসারৎ'-আদায়! পাশ্চাত্য প্রকৃতি যে পরিমাণে ঘোরতর সাংসারিকতায়, সংসারের কঠিন কার্য্যে, কলে, কব্জায়, লোহা, লক্কড়ে ব্যাপৃত, ঠিক সেই পরিমাণে উপন্যাসের কেচ্ছা-কাহিনীতে আসক্ত এই পরস্পর-বিরোধী বস্তুদ্বয়ের একটা হইতে আর একটায় গিয়া তাহারা 'হাঁপ' ছাড়ে।

আমাদের দেশেও 'নবেল' আসিয়া অল্পে অল্পে রাজ্য বিস্তার করিতেছে। বঙ্গদেশ অবশ্য সর্ব্বাগ্রেই দখল করিয়াছে এবং তথা হইতে ভারতের অন্যান্য দেশে ক্রমে 'কুচ' করিতেছে।

জীবনের জীবন্ত চিত্রাঙ্কনে কাব্য-সৌন্দর্য্য। নবেল-কাব্যও জীবন-চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত। মনুষ্য-জীবন, মানুষ-মানষাই মুখ্য-কল্পে নবেলের বিষয়ীভূত। নবেলের একটা "তাজা, টাটকা" লক্ষণ দিতেছি। এটা এই সবে সে দিন মাত্র বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

"রূপকথা" অন্যান্য কাব্য-কথার ন্যায় মানুষের জীবন-ভূমির সমস্তটা জায়গাই জুড়িয়া থাকে। উহা মানুষের মনের সব প্রবৃত্তি, সমস্ত আবেগ, সকল প্রকার হর্ষ-বিষাদ, আহ্লাদ ও অবসাদ অঙ্কন করে। রাজা-মহারাজ হইতে গোবরা-গোবর্দ্ধন, সাটিন-কিংখাপওয়ালা হইতে ছিন্ন ন্যাকড়াধারী সকলেই রূপকথার নায়ক হইতে পারে। মানুষ জীবনের প্রত্যেক সম্ভাবিত ও কল্পিত অবস্থান ও অবস্থিতি, প্রত্যেক অবস্থা, প্রত্যেক অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ও অত্যন্ত উচ্চতম উন্নতি হইতে অত্যন্ত নিম্নতম অধোগতি;—মহা আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসিতার বাবুয়ানি হইতে মহা মলিন দুঃখ-যাতনার দুর্গতি;—পরন্তু মানুষ মানুষীর স্বল্পস্থায়ী সুখের স্বর্গটুকু হইতে তাহাদের আত্ম-নির্ম্মিত নরক-নিবাস—এ সমস্তই উপকথার অধিকারাধীন। কেবল প্রয়োজন এই যে, উপন্যাসকার তাঁহার অবলম্বিত বিষয়টী শিল্পোপযোগী করিয়া লইবেন এবং সূক্ষ্ম শিল্পের নিয়মানুসারে তাহার সৎকার করিবেন।

সংস্কৃত সাহিত্যে নবেল আছে। বাণভট্ট-বিরচিত কাদম্বরী কাব্যকে নবেল বলা যাইতে পারে;—আর সে অতি উপাদেয় নবেল। তাহার অনুবাদ আমাদের বাঙ্গালা কাদম্বরীও মনোহারিণী। পরন্তু নবেল-লক্ষণাক্রান্ত পদ্য-গ্রন্থের কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তার পর আজ-কালিকার ইংরেজি-অনুকৃত গদ্য নবেল, সেত পদে পদে জন্মিতেছে; অতএব পরিচয় অধিক আর তাহার কি দিব? পাঠক প্রতিদিনই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

দু-দশখানা উৎকৃষ্ট নবেল বাঙ্গালা গদ্যে জন্মিয়াছে। কিন্তু সেই দু-দশ-খানাইমাত্র। 'স্কটে'র পর 'বুলুয়র' বাঙ্গালায় কেহ হয় নাই; "জর্জ্জ ইলিয়ট"ও কেহ জন্মে নাই; ডিকেন্স, থ্যাকারী, সে ত সারি সারি। তবে নিন্দা আপাততঃ আমাদের উদ্দেশ্য নয়; নবেল-নির্ণয় করাই অভিলাষ। কিন্তু তাহাতেই বাঁধিয়া যাইতেছে কিঞ্চিৎ গোল। আমরা লক্ষণের সহিত উদাহরণ মিলন করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। ইদানীন্তন অনেক নবেলকেই আমরা কোনও নিয়ম-কানুনেই 'পাকড়া' করিতে সক্ষম হইতেছি না। জানি না, সেগুলি স্বেচ্ছাচার, কি অত্যাচার! তবে এটা নিশ্চিত বটে যে, সেগুলি নবেলও নহে, টেলও নহে কাব্যও নহে; কেচ্ছাও নহে; সেগুলি বোধ করি সরকার মহাশয়ের সমালোচিত "কাব্যি"। কিন্তু কাব্যির কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ আমরা ঠাওর করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সেই জন্যই এ স্থলে অগত্যা এই আত্মনাদ!

আমাদের নবীন সাহিত্যজাত নবেল য়ুরোপীয় নবেলের অনুকরণ। উপন্যাসের আকার, অবয়বের গঠন, তাহার কথন-ভঙ্গী, তাহার রসোৎপাদন-প্রণালী, তাহার চরিত্র-সৃষ্টি ও চিত্র-অঙ্কন-কৌশল, প্রায় সকল বিষয়েই স্বদেশীয় অপেক্ষা বিদেশীয় অনুকরণ অধিক। কিন্তু এ স্থলে এই বিদেশীয় অনুকরণ অভিনব শক্তির পরিচায়ক। তাহা ভিন্ন এ সম্বন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুসরণ না করিয়া ইংরেজি সাহিত্যের সাহচর্য্য করাতে যে ফল দাঁড়াইয়াছে, তাহা অসন্তোষকর বলিয়া বোধ হয় না; পরন্তু তদ্দ্বারা এমন কোনও পাতক স্পর্শে নাই যাহা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে ব্যভিচারপ্রবণ হইতে পারে। সাহচর্য্য দ্বারা শক্তিসংগ্রহ নিন্দনীয় নহে, সর্ব্বথা প্রশংসনীয়, তা সে শক্তি স্বদেশীয়, হউক আর বিদেশীয়ই হউক। কোনও প্রকারে প্রত্যবায়ী না হইয়া বিদেশ হইতে ধনরত্নাদি সংগ্রহ করিতে পারা গৌরবেরই বিষয়; সে বরং বিজয়লব্ধ বস্তু; ব্যভিচারলব্ধ নহে। তবে পরস্ব হইতে নিজস্ব আহরণ করিতে অপরিসীম পবিত্রতার প্রয়োজন বটে; নতুবা সাহচর্য্য শঙ্কার কারণ হয়; জয়ের সঙ্গে জারজতা মিশে। অনুকরণ আত্মসাৎ করিতে অতি উচ্চ অঙ্গের শক্তির আবশ্যক। যে স্থলে উপযুক্ত শক্তিদ্বারা সে কার্য্য সম্পাদিত হয় সে স্থলে তাহাকে অনুকরণই বা বলিব কেন, উন্নতিই বলি; কিন্তু যে স্থলে অক্ষম হস্তের অনুকরণ, সে স্থলে তাহা অনুকরণও নহে;—তাহা অতি নীচ, কুৎসিত, অপমানকর অপহরণমাত্র। তদ্দ্বারা সাহিত্যশরীর শোভনীয় হয় না; কেবল ব্যথিত, ক্ষত-বিক্ষত ও কুঞ্চিত হইয়া 'কিম্ভুতকিমাকার' ধারণ করে। আমাদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইউরোপীয় অনুকরণে ইষ্টানিষ্ট দুই-ই হইতেছে।

এখনকার নবেল নামক গদ্য-কাব্য য়ুরোপীয় আদর্শমূলক, অগ্রেই বলিয়াছি। অতএব নবেল কাব্যের আদি বৃত্তান্ত কিছু জানিতে হইলে, আমাদের আদর্শেরই আদি বৃত্তান্ত অনুসন্ধান করিতে হয়। ইংরাজী নবেল আমাদের আদি-আদর্শ, এ কথা অবশ্যই বলিতে পারি। কাব্য-নামোপযুক্ত আমাদের প্রথম নবেল দুর্গেশ-নন্দিনী। দুর্গেশ-নন্দিনী কোনও প্রকারে অনুকৃত না হইলেও, ইংরেজী আদর্শ-মূলক, ইহা ত আর অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইংরাজী 'নবেল' সাহিত্যের বয়স কত?

বয়স যে খুব বেশী, তাহা নয়। স্যর ফিলিপ সিডনীর সময় হইতে ইংরেজী সাহিত্যে নবেলের আবির্ভাব ধরিতে হয়। সে সময়টা খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দ।

ইংরাজী সাহিত্যে সমালোচনা-প্রণালী ও নবেল কাব্য প্রায় একই সময় হইতে এবং এই সময় হইতে সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। অতএব নবেল কাব্যের বয়ঃক্রম এই আড়াই—তিন শত বৎসরের বেশী নয়। এই সময়ের মধ্যে ইংরেজী সাহিত্যে নবেল গ্রন্থের নানা মূর্ত্তি ও বিবিধ স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়াছে। ফিলডিং, স্মলেট, রিচার্ডসন আদির সময় হইতে স্যর ওয়াল্‌টার স্কটের আমল; স্কটের আমলে যত বড় বড় বিশিষ্ট নবেল্‌কার, বুলওয়ার, ডিকেন্‌স্, থ্যাকারী; তার পর ইলিয়ট ও উইলকি কলিন্সের আমলই ধর। এই সব আমলেরই আদর্শ নবেলগুলি সন্তোষকর ও সুখপাঠ্য।

এই লক্ষণ অনুসারেও ইংরাজী আদর্শ নবেলনিচয় তাহাদের কার্য্যকারিতায় অকৃতকার্য্য হয় নাই। সমাজের সাময়িক স্রোতে ইংরেজী জীবন যখন যে ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে, তখনকার ঠিক সেই ভাবগুলি তৎ তৎ সাময়িক নবেলে অবিকল অঙ্কিত হইয়াছে। উপরোক্ত লক্ষণটীর অর্থও তাহাই। তবে একালের অর্থাৎ আজকালকার ইংরেজী নবেলনিচয় তাহাদের পূর্ব্ব-পিতৃপুরুষদিগের নাম বজায় রাখিতে পারিতেছে না; প্রত্যুত নাম হাসাইতেছে একথা অবশ্যই বলিতে হয়। ইহার কারণ কবিত্বের অভাব হইতে পারে, প্রতিভার স্বল্পতা হইতে পারে, নানা কারণ হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বপ্রধান কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে একটা। সে কারণটা নবেল লিখিবার রীতি-পরিবর্ত্তন। সে কথা আমরা নিম্নে সংক্ষেপে বলিতেছি।

নবেল কাব্যকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। যথা, "রোমানটিক" ও "রিয়েলিস্‌টিক" (Romantic and Realistic)। প্রথমোক্তের অর্থ স্বাভাবিক অথচ স্বভাবাতিরিক্ত; দ্বিতীয়োক্তের মানে স্বাভাবিক এবং অতি-প্রত্যক্ষ। প্রথম, সুকুমার কল্পনা ও কাব্যরসযুক্ত; দ্বিতীয় কার্য্যময় কঠিন সংসারের প্রাত্যহিক প্রত্যক্ষ দৃশ্যসমন্বিত। একে রূপরসলালিত্যের, অপরে সাদা-মাঠা শুষ্ক ঘটনার বিবৃতি। প্রথোমক্তের রচনা কবিতাময়ী; শেষোক্তের রচনা সংবাদপত্রের সংবাদস্তম্ভের মত। রোমানটিকের নায়ক-নায়িকা অধিকাংশ স্থলে মনুষ্য-প্রকৃতির উচ্চতর স্তর হইতে গৃহীত, রিয়েলিসটিকের নায়ক-নায়িকা অতি নিম্ন অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ-মানুষী। প্রথম বিভাগীয় নবেলে মনুষ্য-প্রকৃতির বর্ণনা; দ্বিতীয়ে তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ। একে প্রমোদকানন, অপরে হাঁসপাতাল-ভবন।

ফল কথা এই যে, এখন "রিয়েলিসটিক" অর্থাৎ 'অতি-সাত্যিক'

নবেলেরই পাশ্চাত্য মুল্লুকে প্রাদুর্ভাব। ফরাসী দেশে তাহার আদি আকর স্থান। ইংলণ্ড প্রভৃতি অন্যান্য দেশ ফরাসী ফ্যাসনের অনুগামী, কাজেই নবেলে সে কালের সে রস শুকাইয়া গিয়াছে, সে গীত থামিয়া গিয়াছে, সে আদর্শ মুছিয়া গিয়াছে। এখন এ সকলের স্থূল অধিকার করিয়াছে, বিজ্ঞান, প্রখর দৃষ্টি, পরিপক্কতা, শক্তি এবং কঠিনতা। পাশ্চাত্য প্রকৃতি যে উপাদানে গঠিত তাহাদের উপন্যাসের নায়ক-নায়িকাদেরও, অক্ষরে অক্ষরে সেইরূপ হওয়া চাই; নহিলে তাহাদের আশা মিটে না।

রিয়েলিস্‌টিক-বিভাগেও কিন্তু উৎকৃষ্ট ও উচ্চ অঙ্গের নবেল আছে।

মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত।

'সত্যকার-সংসারে' 'সংসারে'র ন্যায়, উপন্যাসের সংসারেও সংসার আছে; ঘর গৃহস্থালী ধর্ম্ম কর্ম্ম জন্ম মৃত্যু বিবাহ আছে; সুখ শোক ও সম্ভোগ আছে; মিলন ও বিচ্ছেদ আছে; আনন্দ-উৎসব ও শ্মশান-সৎকার আছে। সংযোগে সুখ ও বিয়োগে বিষাদ। নিত্যপ্রত্যক্ষ সংসারের ন্যায়, উপন্যাসেও সংযোগ ও বিয়োগ অবশ্যম্ভাবী ঘটনাপ্রবাহে উভয়ই ঘটে। নিয়তি অলঙ্ঘনীয়। সৃষ্টি-কার্য্যের সহিত নিয়তির নিত্য-সম্বন্ধ। এক হইতে অপরকে কেহই অন্তরিত করিতে পারে না। পরন্তু নিয়তির গতিরোধ নিয়তি নিজেই করিতে পারেন না। কর্ম্মফল বড়ই কঠোর; কর্ম্ম-ফল মনুষ্য-জীবন হইতে একান্ত অবিচ্ছিন্ন। কর্ম্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হইবে, তা সে কর্ম্ম যে জন্মেই কর না, নিয়তি তোমাকে সর্ব্বত্র অনুসরণ করিবে। তুমি সংসারেই থাক, আর স্বর্গেই যাও, কর্ম্ম-সূত্র তোমাকে ছাড়িবে না, সঙ্গে সঙ্গেই থাকিবে। 'ছাদন-দড়ির' সে বাঁধন যোগীরাই যুগ-যুগান্তে কদাচিৎ কাটিতে পারেন; ভোগীর ত কথাই নাই। কর্ম্মসূত্রের সূক্ষ্ম তত্ত্ব বুঝা বড়ই কঠিন; বুঝান ত পরের কথা। শাস্ত্রের সূক্ষ্মানুসন্ধানে আমাদের এখন প্রয়োজন নাই। সাহিত্য-সম্বন্ধে দুই চারিটা সাদা কথা কহিলেই চুকিয়া যাইবে।

মনুষ্যজীবনের উপসংহার অনুকৃত করিয়াই উপন্যাস-আখ্যায়িকার উপসংহার করা হয়; মিলন সম্ভোগে বা বিয়োগ বিষাদে। উপসংহারে এই প্রকৃতিভেদে কাব্যাদি নাটক নবেল দুই শাখায় বিভক্ত হয়—মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত। উপসংহারের বিচিত্রতা অনুসারে কাব্যাদির এই দুই নাম দেওয়া হইয়া থাকে। এখন বলিতে পার, উপন্যাসকার ইচ্ছা করিলেই

উপন্যাসকে মিলনান্ত বা বিয়োগান্ত করিতে পারেন। অবশ্য উপন্যাসকারের ইহাতে 'এক্তিয়ার' আছে বটে, কিন্তু উপন্যাসকার যদৃচ্ছা যথা তথা অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচরানুসারে এ এক্তিয়ার চালাইতে পারেন না। তিনি উপন্যাসের আরম্ভ হইতে ঘটনা-পরম্পরার যেরূপ সমাবেশ করিবেন, অবস্থা-স্রোত যে ভাবে প্রবাহিত করিবেন, উপন্যাসের উপসংহারও তাঁহাকে সেই রূপে ও সেই ভাবে করিতে হইবে। অন্যথা সে উপন্যাস অস্বাভাবিক, অর্থশূন্য ও উদ্দেশ্যহীন হইবে। বলা আবশ্যক, উপন্যাসে সৃষ্ট-সৃষ্টিপ্রবাহেও একটা গূঢ় অর্থ ও উদ্দেশ্য থাকা চাই; তাহা যাহাতে না থাকে, সে উপন্যাস, উচ্চ সাহিত্যের অন্তর্ভূত নয়। কর্ম্মসূত্রের বিচিত্র লীলা ও নিয়তির নিগূঢ় খেলা যে উপন্যাসকার যত স্বাভাবিকতার সহিত দেখাইতে পারেন, তিনি সাহিত্য-শিল্পে তত উচ্চস্থানীয়; অতএব এখন আর অধিক বলিতে হইবে না যে, উপন্যাসের উপসংহার, ঘটনা-বৈচিত্রও কবিসৃষ্ট কর্ম্মসূত্রজাত,—উপন্যাসকারের যদৃচ্ছাজাত নহে।

আমাদের আলঙ্কারিকেরা কাব্যে মিলনান্ত মাত্র উপসংহারের বিধি দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা বিয়োগান্তের বিরোধী, এই বিধি ও বিরোধ অসঙ্গতও নহে। সন্তাপসঙ্কুল সংসারের স্বাভাবিক শোক দুঃখে মনুষ্যজীবন সতত জর-জর, তাহার উপর আবার কাব্যামোদ উপভোগ করিতে যাইয়া ঔপন্যাসিক দুঃখ-যাতনায় জড়িত হওয়া মহাকষ্টকর, তাহাতে সন্দেহ কি? এ একরূপ আমোদ করিয়া আপদ আহ্বান করা। কিন্তু আধুনিক কবি আলঙ্কারিকেরা এ ব্যবস্থা বুঝেন না; তাঁহার শক্তিশালিনী লেখনী ইহা স্বীকার করে না; মনের তীক্ষ্ণানুভূতি ইহা মানে না; তাঁহার সৃষ্টি-প্রবণা প্রতিভা ইহা উপেক্ষা করে। তিনি সম্ভোগ-সুখের ন্যায় সংহারের সন্তাপও সৃষ্টি করেন; নিয়তির নির্ম্মম মূর্ত্তি চিত্রে মূর্ত্তিমতী করিয়া দেখান। ইহাতে দুঃখের ভাগ বৃদ্ধি পায়।

ইংরেজিতে 'মিলনান্ত' কাব্যকে 'কমিডি' ও 'বিয়োগান্ত'কে 'ট্র্যাজিডি' বলে। নাম দুইটী মন্দ নয়। এই ট্র্যাজিডি ও কমিডি সম্বন্ধে 'সাহিত্য-মঙ্গলে' যাহা লেখা আছে, এখানে তাহাই উদ্ধৃত করিব, তাহাই উপরোক্তপ্রশ্নের উত্তর।

"মনুষ্য-মনের দুই রূপ অবস্থা মোটের উপর কল্পনা করা যায়। মন কখনও চিন্তাশীল, কখনও ক্রীড়াশীল অবস্থাপন্ন হয়। এই দুই অবস্থাই স্বাভাবিক। চিন্তাশীলতাকে মনের-মন ও ক্রীড়াশীলতাকে মনের শরীর বলি। মনের এই চিন্তাশীলতা উদ্দীপ্ত, বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্টি করে 'ট্রাজিডি'; আর ক্রীড়া-শীলতা জাগাইয়া দেয় ও পোষণ করে 'কমিডি'।

"মনের চিন্তা-শীলতা ও ক্রীড়া-শীলতা আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরে দুইটী সম্পূর্ণ বিরোধী ভাব; কিন্তু গৌণকল্পে উভয়েরই প্রাকৃতিক কার্য্য এক বটে ও উহাদের কার্য্যগত চরমোদ্দেশ্যও ভিন্ন ভিন্ন নয়। ট্র্যাজিডির উদ্দেশ্যও চিত্তশুদ্ধি, কমিডির গৌণ উদ্দেশ্যও তাই।

"মনের চিন্তাশীলতা ও ক্রীড়াশীলতা পরস্পর বিরোধী ভাব। মন যখন ক্রীড়াশীল, অন্ততঃ তাহাতে যখন ক্রীড়াশীলতা উদ্দীপন করার চেষ্টা হয়, তখন চিন্তামাত্র যাহাতে তাহার দিকে না ঘেঁসে, এমত করা প্রয়োজন। তখন মন সম্পূর্ণরূপে চিন্তাশূন্য, ভাবনাশূন্য, আশায় উদ্দেশ্যবন্ধনমাত্র শূন্য হইয়া কেবল নাচিবে, হাসিবে আর মাতিবে, পুলকে "পূর্ণ কাণে কাণে" হইয়া উছলিয়া পড়িবে, ক্ষণিক আনন্দের অস্থায়ী রহস্যোল্লাসের আবেগময় উল্লাসে মন তখন কেবল উধাও ছুটিবে। মনের এই অবস্থাকেই তাহার ক্রীড়াশীল অবস্থা বলি। দাবা টিপিতে বসিয়া মন যেরূপ বিটকেল ভাবাপন্ন হয়, অবশ্য তাহার কথা বলিতেছি না। মনের উল্লিখিত ক্রীড়াশীলতা যে কাব্য নাটকে উত্তেজিত হয়, তাহাই মেটের উপর 'কমিক অংশে' শ্রেষ্ঠ। ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, শ্লেষ, রহস্য কমিডিরই অন্তর্গত। মিলনান্ত কাব্য-নাটকই যে কমিডি তাহা নয়।

"পরন্তু মনের চিন্তাশীল অবস্থা কিরূপ চিন্তা? তাহা নানা প্রকৃতির আছে। রুষিয়ার জারও চিন্তা করেন, আর ওপাড়ার গোবরার মাও চিন্তা করে। জার চিন্তা করেন কিরূপে রাজ্য বিস্তার হইবে। গোবরার মা চিন্তা করে, কি উপায়ে গোবর্দ্ধনের শুভ বিবাহ দিবে। উভয়েরই চিন্তা চিন্তা বটে। চৌধুরীদের কুমুদিনী চিন্তা করে, চুড়-চৌদানীর; আর ঐ কেরাণী বাবু চিন্তা করেন, মনিবের মুখ-ভ্যাঙচানীর। উভয়েরই চিন্তা চিন্তা বটে। কেন না উভয়ই স্ব স্ব চিন্তায় চিন্তিত, একান্ত ব্যতিব্যস্ত। এখন কুমুদ বা কেরাণী বাবু, রুষ সম্রাট বা গোবরার মা যে চিন্তায় চিন্তান্বিত, সে প্রকৃতির চিন্তাকে আপাততঃ আমরা চিন্তাশীলতা বলিতেছি না, একথা বোধ হয় আর বলিয়া বুঝাইতে হইবে না। শয্যা-সঙ্গিনীর চুড়-চৌদানীর চিন্তা, লক্ষ্যে অলক্ষ্যে, প্রতি মুহূর্ত্তে মস্ত ট্র্যাজিডি, প্রকাণ্ড হুলুস্থূল কাণ্ড ঘটাইতে পারে বটে; কিন্তু সে বিষয়ে পাঠক মহামতি—নবীন ও প্রবীণ আপাততঃ আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন। কৈফিয়ত চাহিবেন না। রাজনীতিক চিন্তা করেন রাজ্য-শাসন; সমাজ-নীতিক করেন সমাজবন্ধন; বৈজ্ঞানিক ব্যবচ্ছেদ-বিশেষণ লইয়া হরণ-পূরণের চিন্তায় একান্ত নিযুক্ত। এখন কথা এই যে, পৃথিবীতে যত প্রকার চিন্তা

তাহা সমস্তই একটী চিন্তার নিকট পরাভূত হয়, একটী চিন্তায় ডুবিয়া যায়। সে চিন্তা, ইহ পার্থিব জীবনের অস্তিত্বের অস্থায়িত্ববিষয়িণী চিন্তা। সে চিন্তা অনন্ত ও সান্তের পারস্পারিক সম্বন্ধবিষয়ক; সে চিন্তায় অন্য যাহা কিছু চিন্তা নামের বাচ্য, তাহা ডুবিয়া যায়; সে চিন্তায় মানুষের মনে বৈরাগ্য উদয় ও উদ্দীপ্ত করে। বৈরাগ্য চিত্তশুদ্ধি করে।

"আমি কি, আমি কেন, আমি কয় দিনের জন্য? আমার এই সুন্দর শরীর, ততোধিক সুন্দর হৃদয়, আমার জ্ঞানপূর্ণ বিজ্ঞানমার্জ্জিত মন, আমার রুচি, রসজ্ঞতা, সহানুভূতি, সহৃদয়তা, স্নেহ, দয়া, প্রণয়, বন্ধুত্ব, পরিবারপ্রেম, আত্মীয়-অন্তরঙ্গ, যাহা ও যাহাদের বিহনে আমি পলকে প্রলয় জ্ঞান করি, হায় এ সমস্তই অনিত্য! আমার সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক সুখ, পারিবারিক বন্ধন, সামাজিক সম্বন্ধ মুহূর্ত্তের লীলাখেলা! আমি এই আছি, এই নাই!

"সংসারের দুঃখশোক আছেই আছে। দুঃখশোকেই অধিকাংশের অবশ্যম্ভাবী অধিকার। কিন্তু যিনি আজীবন কোনও শোকে সন্তপ্ত হন নাই, কোনও বিঘ্ন-বিপত্তি, যাতনা-ভাবনা যাঁহার অঙ্গ কখনও স্পর্শ করে নাই, তাঁহারই বা শেষ দশা কি? তিনিও ত কৃতান্তের করতলস্থ, নিয়তির অনিবার্য্য হস্তায়ত্ত,—কালের কালিমাময় করাল জাল-বিজড়িত, যমের কঠিন দংষ্ট্রাভ্যন্তরে নিপতিত! এই এখন আর তখন. যখনই হউক অবিলম্বে তাঁহার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিবে! * * * আমি আমার প্রিয়বস্তু ছাড়িয়া যাইব! আমার প্রিয়বস্তু আমায় ছাড়িয়া যাইবে! প্রিয়, প্রিয়তর, প্রিয়তম যিনি, জীবনের বল, সংসারের সম্বল, আঁধারের জ্যোতিঃ অন্ধের একমাত্র যষ্টি, দরিদ্রের মাণিক, হৃদয়ের আশা, সাগর-ছেঁচা ধন হায় হায় ঐ কোথায় চলিয়া গেল! ফিরিল না, আর ফিরিবে না! * * *।

"সংযোগে বিয়োগ, সম্ভোগে সংহার, প্রণয়ে বিচ্ছেদ, আশায় নৈরাশ্য, কামনায় বিড়ম্বনা, অমৃতে গরল, বাড়া ভাতে ছাই, সংসারের দশাই এই! এ সকলই অনিত্য ক্ষণেকের খেলা।

"মনুষ্য-মনের উপরি-উক্ত অবস্থা, সুর বা চিন্তা ট্র্যাজিক ভাবাপন্ন। মনের এই অবস্থা, ভাব, সুর বা চিন্তাকে আমরা চিন্তাশীলতা বলিতেছিলাম। এই চিন্তা সান্তের সীমান্ত-স্থলে দাঁড়াইয়া অনন্তের। এই চিন্তা অন্য চিন্তামাত্রের উচ্চতম স্তরে স্থিত; সকল চিন্তা এই চিন্তায় আসিয়া মরে। তাই ইহাকে প্রকৃত চিন্তাশীলতা বলি। এই চিন্তায় জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ক্ষণেকের জন্যও চিন্তান্বিত হইয়া থাকেন।"

"এই চিন্তার উদ্দীপন ও স্থায়িত্বের প্রথম ফল বৈরাগ্য, দ্বিতীয় চিত্তশুদ্ধি, তৃতীয়—পরমার্থ-চিন্তা।"

"সংক্ষেপতঃ ট্র্যাজিডি প্রদান করে সান্তে অনন্তের আভাস;—প্রমাণ করে সংসারের অনিত্যতা ও মনুষ্য-জীবনের বিয়োগপ্রবণতা; আর দেখায় অদৃষ্ট-গতির সহিত ইচ্ছাশক্তির সংগ্রাম। দেখাইয়া সম্বন্ধ বুঝায়-সান্তে অনন্তে সমন্বয়ের জন্য।"

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

[শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়]

"কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম।"

স্যর রবীন্দ্রনাথের "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" প্রবন্ধটী লইয়া দেশে বেশ একটু আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে। এক দল ইহার প্রাণ খুলিয়া নিন্দা করিতেছেন। অপর দল ইহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছেন। এক দল বলিতেছেন, দেশের এ দুর্দ্দিনে হিন্দুর সমাজ-পদ্ধতির নিন্দা করিয়া এ প্রবন্ধ না লিখিলেই রবীন্দ্রনাথ ভাল করিতেন। অন্য দল বলিতেছেন, এমন লেখা দেখি নাই কভু—পড়ি নাই কভু;—অপূর্ব্ব! অপূর্ব্ব!!

আমরা বলি, এ লেখাটির যাঁহারা নিন্দা করিতেছেন, তাঁহাদের কথায় সামান্য অত্যুক্তি থাকিতে পারে, তবে মোটের উপর তাঁহারা ঠিক। কিন্তু ইহার প্রশংসা করিতে যাইয়া যাঁহাদের দুই কস্ বহিয়া লাল গড়াইয়া পড়িতেছে, তাঁহারা বিলক্ষণই বাড়াবাড়ি করিতেছেন। প্রবন্ধটিতে বাজে কথা প্রচুর আছে, সন্দেহ নাই। তবে শুনাইবার মত কথা যে ইহাতে কিছুই নাই, এমনও বলিতে পারি না।

ভারতবাসীর 'স্বাধীন কর্ত্তৃত্ব' লাভ সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদেরই অন্তরের কথা। যে কথা দাদাভাই নৌরজী, সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র-প্রমুখ রাজনীতি-বিশারদগণ বহুকাল হইতে বলিয়া আসিতেছেন, উহা তাহারই কতকটা প্রতিধ্বনি। "এখনও যোগ্য হও নাই—কর্ত্তৃত্ব

তার হাতে পড়িলেই ভুল করিবে"—এই এক কাল্পনিক বিভীষিকা এ দেশের শাসন-সংস্কারের অন্তরায় হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু রাজপুরুষগণের এই 'অকাট্য যুক্তি'র উত্তরে এ দেশে যে সকল তর্কের সৃষ্টি হইয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তাহার কোনই উত্তর নাই। সেই তর্কের সমাবেশ রবীন্দ্রনাথের এই লেখাটির মধ্যেও স্থানে স্থানে পরিষ্কার প্রকাশ পাইয়াছে, দেখিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্ব্বনাশ নয়, স্বাধীন কর্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁৎ নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জ্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে না হয় ভুলই করিলাম। আমাদের বলিবার আরও কথা আছে। কর্তৃপক্ষদের এ কথাও স্মরণ করাইতে পারি যে, আজ তোমরা আত্মকর্তৃত্বের মোটর গাড়ি চালাইতেছ কিন্তু একদিন রাত থাকিতে যখন গোরুর গাড়িতে যাত্রা সুরু হইয়াছিল তখন খালখন্দর মধ্য দিয়া চাকা দুটোর আর্ত্তনাদ ঠিক জয়ধ্বনির মত শোনাইত না। পার্লামেন্ট বরাবরই ডাইনে বাঁয়ে প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া এক নজীর হইতে আর এক নজিরের লাইন কাটিতে কাটিতে আসিয়াছে, গোড়াগুড়িই ষ্টীমরোলার টানা পাকা রাস্তা পায় নাই। কত ঘুষঘাস ঘুষাঘুষি, দলাদলি, অবিচার এবং অব্যবস্থার মধ্য দিয়া সে হেলিয়া হেলিয়া চলিয়াছে। কখনো রাজা, কখনো গির্জ্জা, কখনো জমিদার, কখনো বা মদওয়ালারও স্বার্থ বহিয়াছে। এমন এক সময় ছিল সদস্যেরা যখন জরিমানা ও শাসনের ভয়েই পার্লামেন্টে হাজির হইত। আর গলদের কথা যদি বল, সেকেলে কালে সেই আয়ার্লণ্ড আমেরিকার সম্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া আজকের দিনে বোয়ার যুদ্ধ এবং ডার্ডানেলিস মেসোপোটেমিয়া পর্য্যন্ত গলদের লম্বা ফর্দ্দ দেওয়া যায়; ভারত বিভাগের ফর্দ্দটাও নেহাৎ ছোটো নয়—কিন্তু সেটার কথায় কাজ নাই। আমেরিকার রাষ্টতন্ত্রে কুবের দেবতার চরগুলি যে সমস্ত কু-কীর্ত্তি করে সেগুলো সামান্য নয়। ড্রেফুসের নির্য্যাতন উপলক্ষ্যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রতন্ত্রে সৈনিক-প্রাধান্যের যে অন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে রিপুর অন্ধ শক্তিরই ত হাত দেখা যায়। এ সকল সত্বেও আজকের দিনে এ কথায় কারো মনে সন্দেহ লেশমাত্র নাই যে, আত্মকর্তৃত্বের চির সচলতার বেগেই মানুষ ভুলের মধ্য দিয়াই ভুলকে কাটায়, অন্যায়ের গর্ত্তে ঘাড় মোড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে উঠে। এইজন্য

মানুষকে পিছমোড়া বাঁধিয়া তার মুখে পায়সান্ন তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে অন্ন উপার্জ্জনের চেষ্টায় উপবাসী হইতে দেওয়াও ভালো।......অতএব ভুল-চুকের সমস্ত আশঙ্কা মানিয়া লইয়াও আমরা আত্মকর্ত্তৃত্ব চাই। আমরা পড়িতে পড়িতে চলিব—দোহাই তোমার, আমাদের এই পড়ার দিকেই তাকাইয়া আমাদের চলার দিকে বাধা দিও না।"—এ কথা নূতন না হইলেও খাঁটি কথা। স্বামী বিবেকানন্দও এই ধরণের কথা বলিয়াছেন। এ কথার জবাব নাই।

কিন্তু এই রাজনীতির সঙ্গে হিন্দুর সমাজনীতির কথা জড়াইতে গিয়া প্রবন্ধটির অনেকস্থানেই রবীন্দ্রনাথ জগা খিচুড়ীর সৃষ্টি করিয়াছেন। এ বৎসর পরীক্ষার সময় যখন প্রশ্ন-পত্র চুরি যায়, তখন দুই একখানা বাঙ্গালা কাগজ বলিয়াছিল যে, যাহারা প্রশ্ন-পত্র ঠিক করিয়া রাখিতে পারে না, তাহাদের জাতি-ভাইরা স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী করে কোন্ হিসাবে? স্যর রবীন্দ্রনাথও এই প্রবন্ধে সেই ধরণের যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"এত নিষ্ঠুর জবরদস্তি দ্বারা যাদের অতি সামান্য খাওয়া ছোঁয়ার অধিকার পর্য্যন্ত পদে পদে ঠেকানো হয়, সেটাকে যারা কল্যাণ বলিয়াই মানে, তারা রাষ্ট্রব্যাপারে অবাধ অধিকার দাবি করিবার বেলায় সঙ্কোচ বোধ করে না কেন?" রায়সাহেবের বিচার-পদ্ধতির সহিত স্যরের বিচার-পদ্ধতির সাদৃশ্য দেখিয়া বাস্তবিকই আমরা লজ্জিত হইয়াছি! স্যর রবীন্দ্রনাথের এই যুক্তির প্রত্যুত্তরে আমরা ভূতপূর্ব্ব রবীন্দ্রনাথের এই কথা বলিতে পারি যে,—"আধুনিক সংস্কারগুলিকে বক্ষে পোষণ করিয়া লইয়া বসিলে আমরা উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে চাপাই। যদি বর্ণভেদের উপর আমাদের রাগ থাকে, ভারতবর্ষের যেখানে যত কিছু দুর্গতি হইয়াছে, সমস্তই ঐ বর্ণভেদের ঘাড়েই চাপান হয়"।—রবীন্দ্রনাথ তাহাই করিয়াছেন। তাঁহার যত আক্রোশ হিন্দুর সমাজ-পদ্ধতির—হিন্দুর আচার-পদ্ধতির উপর। কাজেই আমাদের সমস্ত দুর্গতির কারণ তিনি উহার ঘাড়েই চাপাইয়াছেন। যেন সমাজের দোষেই আমরা রাজনীতিক জীবনে উন্নতর পথে অগ্রসর হইতে পারিতেছি না!

রবীন্দ্রনাথ এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কাজেই প্রবন্ধটি অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক কথার ভারে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সমাজ-বিদ্বেষ প্রবন্ধের যে-সে স্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিক, দেশের এ দুর্দ্দিনে কোনও সম্প্রদায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়া কিছু বলাটা সুবুদ্ধির কাজ বলিয়া মনে করি না।

রাজ-নীতির বেলায় রবীন্দ্রনাথ ঠিক বলিয়াছেন, আর সমাজ-নীতির বেলায় ভুল বলিয়াছেন, আমাদের এ কথা শুনিয়া রবীন্দ্রনাথের অতি-ভক্তগণ হয় ত বিচলিত হইতে পারেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিচলিত হইবার কোনও কারণ নাই। রবীন্দ্রনাথের সহিত রাজার জাতির যে সম্বন্ধ আমাদের সহিতও সেই সম্বন্ধ। ব্যথা যেখানে এক, সেখানে তাহার অভিব্যক্তিও একই ধরণের হইয়া থাকে। কাজেই রাজ-নীতি-ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছেন, তিলক ও মদনমোহন যাহা বলিয়াছেন, সেই রকম কথাই রবীন্দ্রনাথের মুখ হইতেও বাহির হইয়াছে। এখানে হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম খৃষ্টান ভেদ নাই। রাজনীতিক্ষেত্র জগন্নাথদেবের সার্ব্বজাতিক মিলনভূমি।

কিন্তু হিন্দু সমাজের দোষ-ত্রুটি বিচার করিয়া কিছু বলিবার তাঁহার অধিকার নাই। কারণ, তিনি ব্রাহ্ম। হিন্দুসমাজের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি নাই— সহানুভূতি থাকিতেও পারে না। যেখানে সহানুভূতি নাই, সেখানে সঙ্কীর্ণতা স্বতই আসে। রবীন্দ্রনাথের লেখার মধ্যে ও সেই সঙ্কীর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। পাদ্রী সাহেবেরা যেমন বলিয়া থাকেন যে—'আমাদের যিশুকে না ভজিলে তোমরা নরকে যাইবে।'—রবীন্দ্রনাথও সেই ধরণের কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিতে চাহেন যে, হিন্দুর সমাজ-পদ্ধতিই যত অনিষ্টের মূল। আমরা রসাতলে যাইতে বসিয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের এই সকল উক্তির দ্বারা দেশের মঙ্গল যত না হউক, অমঙ্গল ঘটিবারই বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সত্য বলিতে কি, ইহার দ্বারা আপোষের মধ্যে বিরোধের ভাব জাগিয়া উঠিতেছে। ফলে এই হইবে যে, রবীন্দ্রনাথ আজ বলিবেন, হিন্দুদের মধ্যে নির্জলা একাদশী আছে বলিয়াই তাহাদের জীবনে উন্নতি অসম্ভব। কাল তাহার উত্তরে হিন্দুরা বলিবে, ব্রাহ্মদের উপাসনাপদ্ধতি যেরূপ বিটকেল, তাহাতে তাহারা ক্রমশই ভণ্ডামির রাজা হইয়া উঠিতেছে আবার পরশ্ব হয়ত। রবীন্দ্রনাথ বলিবেন, মুসলমানদের রোজা-পদ্ধতিই তাঁহাদের সকল উন্নতির অন্তরায়। তাহার পর দিন আবার মুসলমানগণও তাহার উত্তরে হয় ত দুইটা কড়া কথা বলিলেন।—এমনই করিয়াই মানুষ সর্ব্বনাশকে ডাকিয়া আনে। দোহাই রবীন্দ্রনাথের। তিনি কবি হউন, ঋষি হউন, রাজনীতি-বিশারদ হউন, আমরা কথা কহিব না। কিন্তু—তিনি যেন আমাদের সমাজ-সংস্কারক সাজিবার চেষ্টা না করেন। এখন বড় দুঃসময়!—এ সময়ে বিদ্বেষের আগুনে ইন্ধন যোগাইলে দেশের যে

কি ক্ষতি হইবে, তাহা বলা যায় না, অন্ততঃ দেশের মুখ চাহিয়াও এ সময়ে তাঁহার একটু সংযত হওয়া আবশ্যক। তা' ছাড়া, সমাজ-সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিতেছেন, যুক্তির হিসাবেও তাহা কিছু নহে।

স্যর রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধের যে অংশটুকু প্রশংসা পাইবার যোগ্য, তাহার প্রশংসা আমরা করিয়াছি। কিন্তু সেই অংশটুকু ছাড়া ইহাতে যাহা আছে, তাহার প্রায় সমস্তটাই দেশের ও দশের পক্ষে ভয়ঙ্কর বিষ। তিনি দুই হাতে ইহাতে হিন্দু-বিদ্বেষ ছাড়াইয়াছেন বলিয়া যে এমত বলিতেছি, তাহা নহে। তিনি এক প্রকার স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন যে, হিন্দু যতদিন আপন সমাজের গণ্ডীর ভিতর থাকিবে,—সামাজিক আচার-ব্যবহার মানিয়া চলিবে, অর্থাৎ, এক কথায়—হিন্দু যতদিন হিন্দু হইয়া থাকিবে, ততদিন তাহাদের কোনই আশা-ভরসা নাই।—রাষ্ট্রব্যাপারে তাহাদের সকল রকম অধিকারেরই দাবী ততদিন কেবল ব্যর্থতা বহন করিতে থাকিবে।

এমন ছেলেমানুষী যুক্তি, এমন হাস্যজনক তর্ক রবীন্দ্রনাথের মুখ দিয়া যে বাহির হইতে পারে, তাহা হয় ত কেহ কেহ বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং কি বলিয়াছেন, তাহা পাঠক এখানে একবার শুনুন:— "দেশের যে আত্মাভিমান আমাদের শক্তিকে সমুখের দিকে ঠেলা দিতেছে তাকে বলি সাধু, কিন্তু যে আত্মাভিমান পিছনের দিকের অচল খোঁটায় আমাদের বলির পাঁঠার মত বাঁধিতে চায় তাকে বলি ধিক্! এই আত্মাভিমানে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তৃত্ব-সভায় আমাদের আসন পাতা চাই, আবার সেই অভিমানেই ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি, "খবরদার, ধর্ম্মতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে, এমন কি, ব্যক্তিগত ব্যবহারে কর্ত্তার হুকুম ছাড়া এক পা চলিবে না,"—ইহাকেই বলি, হিন্দুয়ানির পুনরুজ্জীবন। দেশাভিমানের তরফ হইতে আমাদের উপর হুকুম আসিল, আমাদের এক চোখ জাগিবে আর এক চোখ ঘুমাইবে। এমন হুকুম তামিল করাই দায়।"—এই কথা এক-আধস্থানে নহে,—প্রবন্ধের প্রায় তিন ভাগ স্থান জুড়িয়া নানা ভাবে—নানা আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বাড়ীতে যে মানুষ পিতার আদেশ পালন করিয়া চলে, সে মানুষ কি বিদ্যালয়ে বসিয়া গুরুগিরি করিতে পারে না?—এক হাতে চাবুক চালাইলে কি অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম টানিয়া রাখা অসম্ভব?

'যে আত্মাভিমানে বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বলিতেছি, রাষ্ট্রতন্ত্রের কর্তৃত্ব

সভায় আমাদের আসন পাতা চাই; সেই অভিমানেই যে আবার ঘরের দিকে মুখ ফিরাইয়া হাঁকিয়া বলিতেছি, ধর্ম্মতন্ত্রে, সমাজতন্ত্রে কর্ত্তার হুকুম মানিয়া চলিতে হইবে',—ইহা ত আশার কথা। শুধু আশার কথা বলি কেন? ইহাই সত্য, ইহাই স্বাভাবিক। আমার সমাজ, আমার রীতি-পদ্ধতির প্রতি এত দিন বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলাম বলিয়াই ত আমরা সকল রকমে দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলাম। এখন কিন্তু ঠেকিয়া শিখিয়াছি যে, পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করিলেও জেতাবিজেতার মধ্যে ভেদ সমানই থাকে। তাই নিজের ঘরকে রাস্তা করিবার চেষ্টা না করিয়া ঘর করিবার ইচ্ছাই প্রবল হইয়াছে। আত্ম-রক্ষার ইহাই একমাত্র উপায়। শুধু তাহাই নহে। আমার সমাজ, আমার ধর্ম্মের প্রতি টান যত বাড়িবে, আত্মরক্ষার বল ততই বৃদ্ধি পাইবে। এই সংরক্ষণ বুদ্ধির দ্বারা প্রণোদিত হইয়াই আজ আমরা দেশকে স্বদেশ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি।

রবীন্দ্রনাথের আর মনে পড়ে কি না জানি না; কিন্তু তিনিই একবার ১৬ বৎসর পূর্ব্বে আমাদিগকে শুনাইয়াছিলেন,—"এ কথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়। আমরা যে হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায় অধঃপতনের শেষ সীমায় তলাইয়া যাই নাই, এখনো যে আমাদের নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে মনুষ্যত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আচারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহু দুঃখের ধনকে সকলের সহিত ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয়ঃ বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের বেহারা সাত টাকা বেতনের তিন টাকা পেটে খাইয়া চারি টাকা বাড়ী পাঠাইতেছে, পনেরো টাকা বেতনের মুহুরি নিজে আধমরা হইয়া ছোট ভাইকে কলেজে পড়াইতেছে—সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদিগকে সুখকে বড় বলিয়া জানায় নাই—সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্ম্মের মন্ত্র কাণে দিয়াছে। সে সমাজকেই সর্ব্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেপ করা আবশ্যক।" বলা বাহুল্য, এ আবশ্যক-বোধ রবীন্দ্রনাথের এখন আর নাই। তিনি আমাদের সমাজটাকেই রাষ্ট্রীয় অধিকার-লাভের প্রতিকূল ভাবিয়া—যত অনিষ্টের মূল মনে করিয়া ইহাকে ডালে মূলে উপড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ

করিয়াছেন। কিন্তু তিনিই এক দিন উপদেশ দিয়াছিলেন, "ইউরোপের বন্যা জগৎ প্লাবিত করিতে ছুটিয়াছে, তাই আজ সভ্য এসিয়া আপনার পুরাতন বাঁধগুলিকে সন্ধান ও তাহাদিগকে দৃঢ় করিবার জন্য উদ্যত। প্রাচ্য সভ্যতা আত্মরক্ষা করিবে। যেখানে তাহার বল; সেইখানে তাহাকে দাঁড়াইতে হইবে। তাহার বল ধর্ম্মে, তাহার বল সমাজে।" রবীন্দ্র বাবুর এই কথাই সত্য। আমার ধর্ম্ম, আমার সমাজ;—ইত্যাকার যে অভিমান, সেই অভিমানই সকল শক্তির মূল। ইহারই চতুর্দ্দিকে অন্যান্য ভাব ও আদর্শ সংলগ্ন হইয়া মানুষকে বড় করিয়া তুলে। এই অভিমান স্বায়ত্ত-শাসন-লাভের অনুকূল,—প্রতিকূল নহে। এই অভিমান মনুষ্যত্ব-অর্জ্জনের সহায়ক,—প্রতিবন্ধক নহে।

আসল কথা, মনু পরাশরকে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজ-রাজের সহিত এক কোঠায় ফেলিয়াই গোড়ায় গলদ করিয়াছেন। আমাদের সমাজের কর্ত্তার সহিত রাষ্ট্রীয় কর্ত্তার তুলনা যে সহজ-বুদ্ধিতে আসিতে পারে, তাহা আমাদের ধারণাই ছিল না। বাদীর সহিত প্রতিবাদীর যে সম্বন্ধ, শিষ্যের সহিত গুরুর কি সেই সম্বন্ধ? মনু-পরাশরের প্রতি বক্র কটাক্ষ করিবার পূর্ব্বে এ সামান্য কথাটা কি তাঁহার মনে উদয় হইল না যে, গুরু বিচারকের আসনে বসিলে যাহা হয়, প্রতিবাদী বসিলে তাহা হয় না? কিন্তু বলিব কাহাকে? বিদ্বেষ-বুদ্ধির বশে যখন মানুষ চলে, তখন ভক্ষ্য ও ভক্ষকের মধ্যে যে কতটা পার্থক্য, সে বিচারবুদ্ধি তো তাহার থাকে না! রবীন্দ্রনাথ আজ ভুলিয়া গিয়াছেন যে, হোটেলের কর্ত্তার সহিত বাড়ীর কর্ত্তার কি তফাৎ। হোটেলের কর্ত্তার দৃষ্টি কেবল নিজের পকেটের প্রতি; আর বাড়ীর কর্ত্তার দৃষ্টি শুধু সংসারের প্রতি। সুতরাং ঐ উভয় কর্ত্তার প্রতি ছেলেদের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা যে সমান হইবে, এমন আশা করাই দুরাশা। অতএব, এজন্য যদি বলা যায় যে, ছেলেরা যে শ্রদ্ধা-ভক্তির জোরে ঘরের কর্ত্তার হুকুম মানিয়া চলে, সেই শ্রদ্ধা-ভক্তির গুণেই সে হোটেলের কর্ত্তার নিকটও আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিবে, তখন হাস্য সম্বরণ করা সত্যই কঠিন হইয়া উঠে। দুই জনেই কর্ত্তা বটে, কিন্তু ঐ দুই জনের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। এক জনের সহিত স্বার্থের সম্বন্ধ, অপরের সহিত ভালবাসার সম্বন্ধ।

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু সমাজের উপর আজ ছুরি চালাইতেছেন। তাই তাঁহাকে স্বামীজির কথায় জিজ্ঞাসা করিতেছি,—"তোমার ভাইদের জন্য যথার্থই

কি তোমার প্রাণ কাঁদিয়াছে? জগতে এত দুঃখ কষ্ট, এত অজ্ঞান, এত কুসংস্কার রহিয়াছে, ইহা কি তুমি যথার্থ প্রাণে প্রাণে অনুভব কর? সকল মানুষকে ভাই বলিয়া যথার্থই কি তোমার অনুভব হয়? তোমার সমগ্র অস্তিত্বটাই কি ঐ ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে? উহা কি তোমার রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়াছে? তোমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইতেছে? উহা কি তোমার প্রত্যেক স্নায়ুর ভিতর, শিরার ভিতর বহিতেছে? তুমি কি এই সহানুভূতির ভাবে পূর্ণ হইয়াছ? যদি হইয়া থাক, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ। তার পর চাই কৃত-কর্ম্মতা। বল দেখি—তুমি দেশের কল্যাণের কোনও নির্দ্দিষ্ট উপায় স্থির করিয়াছ কি?—জাতীয় ব্যাধির কোনওরূপ ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছ কি? হইতে পারে—প্রাচীন ভাবগুলি কুসংস্কারপূর্ণ, কিন্তু ঐ সকল কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে অমূল্য সত্য মিশ্রিত রহিয়াছে, নানাবিধ খাদের মধ্যে সুবর্ণখণ্ড-সমূহ রহিয়াছে। এমন কোনও উপায় কি আবিষ্কার করিয়াছ যাহাতে খাদ বাদ দিয়া খাঁটি সোনাটুকুমাত্র লওয়া যাইতে পারে? যদি তাহাও করিয়া থাক, তবে বুঝিতে হইবে, তুমি দ্বিতীয় সোপানে পদার্পণ করিয়াছ। আরও একটী জিনিষের প্রয়োজন—প্রাণপণ অধ্যবসায়; তুমি যে দেশের কল্যাণ করিতে যাইতেছ, বল দেখি তোমার আসল অভিসন্ধিটা কি? নিশ্চিত করিয়া কি বলিতে পার যে, কাঞ্চন, মান, যশ বা প্রভুত্বের বাসনা তোমার এই দেশের হিতাকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে নাই? তুমি কি নিশ্চিত করিয়া বলিতে পার যদি সমগ্র জগৎ তোমাকে পিষিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে, তথাপি তোমার আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া কাজ করিয়া যাইতে পার?”

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনও কালেই সে ভাবে কাজ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আদর্শ বলিয়া কোনও জিনিষ তাঁহার নিকট নাই। তিনি কল্য যাহাকে আদর্শ বলিয়া মাথায় তুলিয়াছিলেন, অদ্য তাহাকে জঘন্য বলিয়া দুই পায়ে দলিতেছেন। সেই জন্যই কর্ত্তার বিচারে তিনি বিষম গোল বাধাইয়াছেন।—হিন্দু সমাজকে আক্রমণ করিতে যাইয়া তিনি ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

আমরা আমাদের সামাজিক রীতিনীতি মানিয়া চলি বলিয়া রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তিনি বলিয়াছেন, আমাদের “ধর্ম্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না কর তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারো কল্যাণ

হয় না। কিন্তু ধর্ম্ম-তন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দ্দয়ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মান' তবে ধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্ম্ম বলে, যত অসহ্য কষ্ট হোক্, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ কর্ম্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন; কিন্তু ধর্ম্মতন্ত্রে বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চৌদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার।...স্বচ্ছন্দে পান খাইবার স্বাধীনতাটুকু যে দেশের মানুষ অনায়াসে বর্জ্জন করিতে প্রস্তুত, সে দেশের লোক স্বাধীনতার অন্ত্যেষ্টি সৎকার করিয়াছে। অথচ দেখি যারা গোড়ায় কোপ দেয় তারাই আগায় জল ঢালিবার জন্য ব্যস্ত"।—বলা বাহুল্য, সমাজ-বিদ্বেষই ইহার ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার সার মর্ম্ম এই যে, যে দেশের লোক বিধবা মেয়েকে নির্জ্জলা একাদশী করিতে দেয়, যাহারা গ্রহণের দিন গঙ্গাস্নান করিতে যায়, তাহারা স্বায়ত্ত শাসনের দাবী করে কোন্ হিসাবে?—যুক্তি-তর্কের গতি অপূর্ব্ব বটে!

রবীন্দ্রনাথের ঐ বিদ্বেষ-বিজৃম্ভিত নিন্দাগুলিকে যদি সত্য বলিয়াও গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলেও দেখা যায় যে, তাঁহার সিদ্ধান্ত একেবারেই ভুল হইয়াছে। কারণ, ইতিহাস বলে, গ্রহণের দিনে জলে ডুব দিয়াও এ দেশে সীতারাম রায়, কেদার রায়, প্রতাপাদিত্য, মোহনলাল প্রভৃতি মাথা তুলিয়াছিল। ইতিহাস আরও বলে যে, যত দিন এদেশ আচারধর্ম্মকে বেশ ভাল করিয়া মানিয়া চলিয়াছি, তত দিন এখানকার লোক ডিস্‌পেপসিয়া ও ডায়াবিটিজ প্রভৃতি ও-কারাদি রোগে জীর্ণ হইয়া অকালে কাল-কবলিত হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ আমাদের আচার-ধর্ম্মকেই সকল অনিষ্টের মূল মনে করিয়া উহার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন, কিন্তু অভিজ্ঞতা বলিতেছে, এ রসপ্রধান দেশের লোককে বিনাশের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্যই উহার সৃষ্টি;—নষ্ট করিবার জন্য নহে। যাহা আমাদের রক্ষা করিয়াছে, রবীন্দ্রনাথের মতে তাহাই আমাদিগকে উৎসন্নের পথ দেখাইয়া দিতেছে। তাঁহার যুক্তি এই যে, অন্দর-মহলের আইন অন্দরে মানিয়া চলিয়া, সদর মহলে বসিবার যোগ্যতা আমরা হারাইয়াছি।—যুক্তি অপূর্ব্ব নয় কি?

স্বার্থ ও স্বেচ্ছাচারকে দমন করিয়া চলিবার জন্যই সামাজিক বিধি-বিধানের সৃষ্টি। সংযম শক্তির উৎস; শক্তিকে ইহা বিনষ্ট করে না। ধর্ম্ম-শাসনে

নিয়মিত হইলেই মানুষ যে শস্ত্র-শাসনে সংযত হয়, এ কথার কোনই অর্থ নাই। কারণ, এই ভারতবর্ষের ইতিহাসেই প্রমাণ আছে যে, ধর্ম্মে আঘাত লাগিলে ভারতবাসী মৃত্যুবেদনা পায় এবং আত্মরক্ষার জন্য সে মরিয়া হইয়া উঠে। তখন সে জাগ্রত জাতিকে রাজা বা রাজসৈন্য কিছুতেই ঠেকাইয়া রাখিতে পারা যায় না। অতএব ধর্ম্ম বা সমাজ-শাসন আমাদের মনকে পঙ্গু করিয়া তুলিতেছে যিনি এরূপ বলিতে চাহেন, তিনি কি বলিতেছেন তাহা তিনি নিজেই জানেন না।

এই "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর এক অপূর্ব্ব যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—"গাছতলায় বসিয়া জ্ঞানী বলিতেছে, 'যে মানুষ আপনাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে ও সর্ব্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে, সেই সত্যকে দেখিয়াছে', অমনি সংসারী ভক্তিতে গলিয়া তার ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া দিল। ওদিকে সংসারী তার দরদালানে বসিয়া বলিতেছে, 'যে বেটা সর্ব্বভূতকে যতদূর সম্ভব তফাতে রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোবা নাপিত বন্ধ,'—আর জ্ঞানী আসিয়া তার মাথায় পায়ের ধূলা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া গেল—'বাবা বাঁচিয়া থাক!' এই জন্যই এদেশে কর্ম্ম-সংসারে বিচ্ছিন্নতা জড়তা পদে পদে বাড়িয়া চলিল, কোথাও তাকে বাঁধা দিবার কিছু নাই। এই জন্যই শত শত বছর ধরিয়া কর্ম্ম-সংসারে আমাদের এত অপমান! এত হার! য়ুরোপে ঠিক ইহার উল্টা।"—কিন্তু হিন্দুসমাজকে বিদ্বেষের চক্ষে না দেখিলে রবীন্দ্রনাথ দেখিতে পাইতেন যে, ইয়োরোপেও উহার উল্টা নাই। সে দেশেও দেখা যায় যে, গির্জ্জায়-গির্জ্জায় পাদ্রীরা গিয়া যীশু ঠাকুরের এই উপদেশ প্রদান করিতেছেন যে, "বৈরীশূন্য হও, একগালে চড় মারিলে আর এক গাল পাতিয়া দাও, কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়া পোটলা-পুঁটলি বাঁধিয়া বসিয়া থাক। পৃথিবীর আয়ুঃ শীঘ্রই শেষ হইবে। প্রভু আসিতেছেন।"—সংসারীরা চক্ষু বুজিয়া কাণ পাতিয়া তাহা শ্রবণ করিতেছেন। ওদিকে আবার সংসারের কর্ত্তারা যখন বলিতেছে, "কার্য্যশীল হও। কাজ করিতে করিতে মরাই মনুষ্যত্ব। মহা উৎসাহে দেশান্তরের ভোগ সুখ লইয়া আনিয়া নিজে ভোগ কর।"—তখনও তাঁহারা ইহা শুনিতেছেন। অতএব, এ ক্ষেত্রে ইউরোপকে ভারতের উল্টা মনে করাই ভুল।

আসল কথা, রবীন্দ্রনাথ রোগ-নির্ণয়ে ভুল করিয়াছেন। এদেশের

লোকেরা গ্রহণে স্নান করে বলিয়াই যে চিৎপুরে জল জমে আর চৌরঙ্গীতে জল জমে না, ইহা কবির উক্তি হইতে পারে; কিন্তু যুক্তি নহে।

সঙ্কলন।

উদ্ভিদ ও প্রাণী।

উদ্ভিদের প্রাণ আছে, উদ্ভিদও যে জীবরাজ্যের অন্তর্গত,—এ কথা কেবল আধুনিক বিজ্ঞানের কথা নহে; ইহা অতি পুরাতন কথা। আর্য্যঋষিগণ এ কথা বহুকাল পূর্ব্বে বলিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি ঢাকার 'কৃষি-সম্পদ' নামক কৃষিবিষয়ক মাসিক পত্রে শ্রীযুত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। নিম্নে তাঁহার কথা আমরা তুলিয়া দিলাম :—

আর্য্যঋষিগণ জীবসমুদয়কে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন;—যথা, জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ। পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করিলে, উদ্ভিদের জীবত্ব উপলব্ধিকারক শত শত বচন দেখিতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক পক্ষে, চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট উদ্ভিদের জীবত্ব কিছুমাত্র অভিনব বা আশ্চর্য্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। রামায়ণ ও মহাভারত সংস্কৃত এবং বঙ্গ-সাহিত্যের অমৃত-প্রস্রবণ। আমরা জানি, "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে"। মহাভারত উদ্ভিদবিদ্যাবিষয়ক গ্রন্থ নহে; তথাপি ইহাতে উদ্ভিজ্জগতের মূলতত্ত্বসমূহ যেরূপ সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা উদ্ভিদ-বিদ্যাসম্বন্ধে ভারতীয় জ্ঞানের যথেষ্ট পরিচয় লাভ করিতে পারি। সুতরাং, এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় প্রাচীন উদ্ভিদবিদ্‌গণের জ্ঞান, বহুদর্শিতা ও অভিজ্ঞতা যে কিরূপ ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। উদ্ভিদ-বিদ্যা সম্বন্ধে ভিষকপ্রবর শার্ঙ্গধর-প্রণীত 'সংহিতা' এবং বরাহমিহির প্রণীত 'বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ' সাক্ষ্য প্রদান করে।

"তাপসংযোগে বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফল ও ত্বক্ ম্লান এবং শীর্ণ হয়; অতএব বৃক্ষের স্পর্শানুভব আছে। বায়ুশব্দ, অগ্নিশব্দ এবং বজ্রনির্ঘোষে বৃক্ষের পুষ্প

ও ফল বিশীর্ণ হইয়া যায়। কর্ণ দ্বারাই শব্দ গৃহীত হয়; অতএব ইহাতে জানা যায় যে, পাদপেরা শ্রবণ করে। বল্লী বৃক্ষকে বেষ্টন করে এবং সর্ব্বদিকে গমন করে; দৃষ্টিহীনব্যক্তির পথজ্ঞান নাই, অতএব বৃক্ষেরা দর্শন করিয়া থাকে। পুণ্যাপুণ্য গন্ধ ও বিবিধ ধূপের দ্বারা পাদপেরা নীরোগ হয় এবং পুষ্পিত হইয়া থাকে; অতএব তাহারা গন্ধও গ্রহণ করে। বৃক্ষেরা পাদ দ্বারা জলপান করে, তাহাদের ব্যাধি হয় এবং তাহার প্রতিক্রিয়াও হয়; অতএব বৃক্ষের রসানুভব আছে। (ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত) পদ্মনালরূপ মুখের দ্বারা জল যেমন উর্দ্ধে উত্থিত হয়, বৃক্ষও সেইরূপ বায়ুসংযোগে পাদ দ্বারা জলপান করে। বৃক্ষ সুখ দুঃখও অনুভব করে এবং তাহার কোনও অঙ্গ ছিন্ন হইলে, তাহা আবার ভাল হইয়া যায়। অতএব, আমি বৃক্ষগণের জীবন দেখিতে পাইতেছি; তাহাদের অচেতনা নাই। বৃক্ষেরা যে জল গ্রহণ করে, অগ্নি ও বায়ুর প্রভাবে তাহা জীর্ণ হয়।• তাহাদের ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক হয় এবং ইহা হইতেই তাহাদিগের স্নেহ জন্মে এবং বৃদ্ধি হয়।"

মহাভারত শান্তিপর্ব্ব; ১৮৪ অধ্যায়)

উদ্ধৃত শ্লোকাবলী হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আর্য্যঋষিগণ উদ্ভিদ জগতকে জীবরাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। উদ্ভিদের প্রাণ আছে, ইহা বলিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হয়েন নাই; পরন্তু, উদ্ভিদ পঞ্চেন্দ্রিয়সমন্বিত এবং সুখ-দুঃখ-অনুভবশীল, তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন। অন্যান্য প্রাণিগণের ন্যায়, ইহারাও আহার, বিহার, বিবাহ, জনন, উৎপাদন, পান, ভোজন, নিদ্রা, জাগরণ এবং শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত। আত্মরক্ষা এবং আত্মোন্নতিই যে জীবজগতের প্রধান কার্য্য, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। উদ্ভিদজগতেও এই দুইটী ক্রিয়াই স্পষ্ট পরিস্ফুট রহিয়াছে। চৌরাশী লক্ষ যোনিভ্রমণ-বর্ণনাকালে সনাতন আর্য্যঋষিগণ উদ্ভিদ-জগতকে ক্রমোন্নতি এবং ক্রমবিকাশের প্রথম সোপানস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুষ্যাদি প্রাণিগণের ন্যায়, ইহারাও বংশানুরূপ এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিধানমতে পরিচালিত হইয়া, আপনাদিগের জীবনধারণোপযোগী প্রকৃষ্ট উপায়সমূহ অবলম্বন করে। এইরূপ করিতে যদি তাহাদের কোনও অঙ্গের অভাব অনুভব হয়, তাহা হইলে অতি বিচিত্র উপায় উদ্ভাবন করিয়া, তাহারা ঐ অঙ্গের পূর্ণতা সম্পাদন করে।

সাহিত্যিক-কূপমণ্ডুক।

বাঙ্গালা সাহিত্যের আসরে এক শ্রেণীর লেখক জুটিয়াছে, ইহাদের কথা,—রবীন্দ্রনাথই যেন বাঙ্গালা সাহিত্যের সর্ব্বস্ব। তিনি ব্যতীত বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। তাঁহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্য যাহা ছিল, যাহা গণনার সামিল নহে। কেবল তাহাই নহে, ইহারা স্থাকা স্থাকা ভাষায়, কাঁদুনী ছন্দে বিনাইয়া বিনাইয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন বা লিখিতেছেন, তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অভিনব সামগ্রী, 'নিতুই নব'। এমন কি অপর কেহ কিছু বলিলে বা লিখিলে ইহারা তাহা রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিধ্বনি বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই কূপমণ্ডুকেরা বুঝে না যে, বাঙ্গালা সাহিত্য কেবল রবীন্দ্রনাথের একচেটিয়া নহে এবং 'বিশ্ব'-অনুভবের আইডিয়াটা তিনিই প্রথম বাঙ্গালায় আমদানী করেন নাই। ভূদেব, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ তাঁহার অনেক পূর্ব্বে এ ভাবের কথা দেশবাসীকে শুনাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই কূপমণ্ডুকের দল তাহা ত বুঝিতে চাহিবে না।

সম্প্রতি সহযোগী 'বাঙ্গালী' 'এডুকেশন গেজেটে'র এতদ্বিষয়ক মন্তব্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে আমাদের বক্তব্য অনেকটা পরিস্ফুট হইয়াছে। সেই জন্য আমরা সহযোগীর উক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

বিগত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মিলনে ব্যারিষ্টার-প্রবর শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা রবীন্দ্রনাথেরই চর্ব্বিতচর্ব্বণ বলিয়া রবীন্দ্র-ভক্তেরা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বলা বাহুল্য, বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র 'ভারতবর্ষ' তাঁহাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন। 'ভারতবর্ষ' চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, সে আইডিয়াগুলি কাহারও আদি অকৃত্রিম পেটেণ্ট করা নহে;—তাহা দেশেরই প্রাণের কথা। তাহা বহুকাল হইতে ভূদেব, বঙ্কিম ও বিবেকানন্দ প্রভৃতি দেশভক্ত মনীষিবৃন্দের মুখ হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। তাঁহারা বলিতে চাহেন যে, রবিবাবুই দেশমাতাকে বিশ্বদেবতাকে অনুভব করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে আমরা সাধারণতঃ অনন্তকে সান্তরূপে দেখিতে ভালবাসি; অনন্তকে অনন্ত করিয়া অনুভব করিতে চাহি না। তাঁহারা কি বলিতেছেন,

তাহা তাঁহারা নিজেরাই জানেন না। তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত। সহযোগী 'এডুকেশন গেজেট' এ কথার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী পাঠকের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সহযোগী লিখিতেছেন,—

"বিশ্বাত্মার কথা।—সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম; সর্ব্বং সর্ব্বাত্মকং; বিশ্বব্যাপী; সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মা; বিশ্বান্তরাত্মা প্রভৃতি কথা সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষত্ববাচক অতীব প্রাচীন কথা। উহা গূঢ়ভাবে অদ্বৈতবাদী হিন্দুর নিজস্ব। অভেদে ভেদবুদ্ধি করিতে হিন্দুশাস্ত্রই নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন, "একত্বং পরিচিন্তয়েৎ" "ভেদকৃৎ নরকং যাতি; "সরিৎ সমুদ্রশ্চ হরেঃ শরীরং; যৎ কিঞ্চ ভূতং প্রণমেৎ অনন্তং"। হিন্দুর বাস্তুদেবতা, গ্রাম্যদেবতা, নদী-পর্ব্বতের দেবতা, বনদেবতা, পৃথ্বী-দেবতা, গ্রহাদি দেবতা সবই অভিন্ন। রামচন্দ্রের স্তবে হিন্দু বলেন— পরব্রহ্মব্যাপকং, ভজেহ রামমদ্বয়ং"। এই সনাতন সত্য রবিবাবু—আজন্ম দেবতায় অবিশ্বাসী ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেও যে কবিত্বের মুখে একবার ধরিতে পারিয়াছেন তাহাও কম কথা নহে।

রবিবাবুর রচিত ভারতমাতার স্তব হিন্দুর প্রাণস্পর্শী। মার ভুবনমোহিনী রূপের কথা কবি ভালই লিখিয়াছেন। ভক্তের দৃষ্টিতে মা অনেকটা এক ভাবেই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। ঐ সময়টায় রবি বাবুর মনে দেশভক্তির উদয় হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ভূদেব বাবুর পুষ্পাঞ্জলিতে। (১৮৭৬ অব্দে প্রকাশিত) আছে:—"পাদপদ্মের কি অনুপম সৌন্দর্য্য—* * * ইনি পর্ব্বত-রাজপুত্রী পার্ব্বতীর ন্যায় সিংহবাহনে আরূঢ়া নহেন—ত্রিপথগামিনী গঙ্গা-দেবীর যাবতীয় শোভা ইঁহার অঙ্গের একদেশেই বিদ্যমান—* * রমা রক্তাম্বরা—ইনি হরিদ্বসনা—ব্রহ্মনন্দিনীর ন্যায় ইঁহার সুস্নিগ্ধ সৌম্যভাব বটে, কিন্তু ইনি বীণাপাণি নহেন—আর, অন্য সকল দেবদেবী হইতে ইঁহার বৈচিত্র এই যে, ইনি নিরন্তর অপত্যবর্গ লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অন্নপান প্রদান করিতেছেন। ইনি কোন দেবী? ইঁহার পূজাবিধি কি? ইঁহার সাধনে কি কি বিঘ্নের সম্ভাবনা?" ইত্যাদি—

কিন্তু কূপমণ্ডূকগণের কর্ণ-কুহরে কি এ কথা পৌঁছিবে? যাহারা রবীন্দ্র-সাহিত্যকেই বাঙ্গালা সাহিত্য মনে করিয়া দুনিয়াকে মধুপর্কের বাটী বলিয়া ভাবিতেছে, তাহাদের আক্কেল কে দিবে?

"বেগম সমরু"।

(সমালোচনা)

[শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়]

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্ এর আট আনা সংস্করণ-গ্রন্থমালার সপ্তদশ গ্রন্থ "বেগম-সমরু" সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে। "বাঙ্গালার বেগম," "নূরজহান" প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ভারতবর্ষ-সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্য-সেবী শ্রীযুক্ত জলধর সেন মহাশয় গ্রন্থের পরিচয় লিখিয়া দিয়াছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাল্টার রাইনহার্ড নামক অজ্ঞাত কুলশীল জর্ম্মান যুবক অন্ন-সংস্থানের জন্য সুইস সেনাদলের সহিত ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া ফরাসি-সৈন্যদলে প্রবেশ লাভ করেন, এবং অল্প সময়ের মধ্যে বহু প্রভুর সেবা করিয়া অবশেষে স্বীয় সৈন্যগণের ভরণপোষণের জন্য দিল্লীর বাদশাহ সাহ আলমের নিকট হইতে মিরাটের সন্নিকটস্থ সার্ধানা পরগণায় এবং তৎসন্নিহিত স্থানে বার্ষিক ছয় লক্ষ মুদ্রা আয়ের এক জায়গীর লাভ করেন। সার্ধানাতেই তিনি জীবনের সায়াহ্ন সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার বিষণ্ন আকৃতি এবং গম্ভীর প্রকৃতির জন্য তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে সোম্বার (Sombre) বলিয়া অভিহিত করিতেন। ক্রমে তাঁহার আসল নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং সোম্বার নাম প্রচলিত হইয়া পড়িল; অবশেষে সোম্বার সমরুতে পরিণত হইল। সমরু যখন ভরতপুরের জাঠ-রাজার অধীনে দিল্লী অবরোধ করেন, তখন এক আরব কুমারী তাঁহার চাকুরী গ্রহণ করে। এই আরব কুমারীর অসামান্য রূপলাবণ্য-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া সমরু তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। এই আরব কুমারীই বেগম সমরু নামে পরিচিত। সমরুর মৃত্যুর পর বেগম সমরু দিল্লীশ্বরের সম্মতিক্রমে পতির পরিত্যক্ত বিপুল-সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। সমরুর সৈন্যদলও তাঁহার নেতৃত্ব অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়া লইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে, মোগলের অধঃপতন এবং ইংরাজ অভ্যুদয়ের সন্ধিক্ষণে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিরোধ

এবং বিপ্লবের যুগে, কিরূপে এই নগণ্য আরব কুমারী অতি হীন অবস্থা হইতে ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্যের উচ্চ-শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কেমন করিয়া অবশেষে জীবনের শেষকালে তাঁহার সঞ্চিত বিপুল অর্থরাশি অকাতরে সৎকার্য্যে ব্যয় করিয়া জগতে অক্ষয়-কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অপূর্ব্বকাহিনী কল্পনা-প্রসূত উপাখ্যান অপেক্ষাও মনোরম। ঐতিহাসিক কীন সাহেব তদীয় Hindusthan under Free Lances নামক গ্রন্থে বেগম সমরুর বিচিত্র জীবনকাহিনীর আলোচনা করিয়া যথার্থই লিখিয়াছেন, "Such was the splendid termination of the Slave-girl's career—a romance scarcely to be outdone by the most inventive fiction."

বেগম সমরুর কাহিনী ইংরাজী বহু গ্রন্থে এবং সাময়িক পত্রিকায় আলোচিত হইয়াছে। নানা কিংবদন্তীতে আস্থা স্থাপন করিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্ত্তিরূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনাঙ্কের প্রতি কার্য্যকলাপ আলোচনা করিয়া তাঁহাকে দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু এই বীরাঙ্গনার জীবন-কাহিনী ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় আর কেহ আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানি না। সুলেখক ব্রজেন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষার এই অভাব দূর করিয়াছেন এবং ভাষা-জননীর শ্রীবৃদ্ধি করিয়া বঙ্গবাসীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। তিনি সুনিপুণ হস্তে তাঁহার উচ্ছ্বাসপূর্ণ আবেগময় ভাষায় এই বীরাঙ্গনার কীর্ত্তিকাহিনী অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার লিপিচাতুর্য্যে এবং লিখনভঙ্গীর প্রসাদগুণে গ্রন্থখানি উপন্যাসের ন্যায় সরস হইয়াছে। বেগম সমরু ঐতিহাসিক বীর রমণী বলিয়া পরিচিত হইলেও ব্রজেন্দ্র বাবু এই গ্রন্থ ইতিহাস-হিসাবে রচনা করেন নাই; তাঁহার রচনা ঐতিহাসিক রচনার ন্যায় পাদ-টীকা-কণ্টকিত নহে। প্রমাণ-প্রয়োগ দ্বারা স্বাধীন মত প্রতিষ্ঠাপিত করিবার উদ্দেশ্যে নূতন জটিল যুক্তিজালের অবতারণা করিয়া, তিনি তাঁহার রচনা ভারাক্রান্ত করেন নাই; অথবা আর্চার-বেকন-মণ্ডি-প্রমুখ বেগমের কুৎসা-রটনাকারীদিগের সমুদয় মতবাদ এবং যুক্তি-তর্ক উপ-স্থাপিত করিয়া তাহা খণ্ডন করিবারও প্রয়াস পান নাই। কীন-কম্পটন-স্লিমান-টমাস প্রভৃতি পূর্ব্ব সূরিগণকে তিনি গতানুগতিক ভাবেই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহারা যেস্থলে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, ব্রজেন্দ্র বাবু তাহা যত্ন

পূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া, তাঁহার স্বাভাবিক ওজস্বিনী ভাষায় তাহার উপর একটু রং ফলাইয়া, এই গ্রন্থে সুন্দররূপে বিন্যস্ত করিয়াছেন। সুতরাং সাধারণ পাঠকেরও এই গ্রন্থপাঠে ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কা নাই; বরং একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে গ্রন্থ শেষ করিবার জন্য ব্যাকুলতা জন্মিবে। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে সামান্য ক্রটী-বিচ্যুতি রহিয়াছে, তাহা গ্রন্থের গুণের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। আমরা তাহার কয়েকটির প্রতি গ্রন্থকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আশা করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে তাহা সংশোধিত হইবে।

"এই বেগম সমরুকেই বিবাহ করিবার জন্য একাধিক ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন"...(বেগম সমরু ২ পৃষ্ঠা)। ঐতিহাসিক কীন অনুমান করিয়াছেন যে, বেগম সমরুর পাণিগ্রহণের জন্য টমাস এবং লঃ ভেসো প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই অনুমান কোনও প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হয় নাই। টমাসের এবং স্লিমানের গ্রন্থে ইহার কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। টমাস কর্ত্তৃক বেগমের কর্ম্মত্যাগ যদিও এই অনুমানের অনুকূল বটে, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী কালের কার্য্যপ্রণালী আলোচনা করিলে ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে হয়। টমাসের কর্ম্মত্যাগের কারণ সম্ভবতঃ স্বতন্ত্র। কিন্তু ব্রজেন্দ্র বাবু অতি সাবধান লেখক হইয়াও কীনের এই অনুমানকে অভ্রান্ত সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া সত্যের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

"১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা আগষ্ট ঘিরিয়ায় মীরকাসিমের সহিত ইংরাজের সংঘর্ষে সমরু বিশেষ রণচাতুর্য্য দেখাইয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল"...... (৬ পৃষ্ঠা)। গিরিয়ার যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ মুতক্ষরীণ ও অন্যান্য গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। তৎসমুদয় পাঠ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই যুদ্ধে সমরু তাঁহার সেনাদল লইয়া পশ্চাৎপদ হইয়াছিলেন। গিরিয়ার যুদ্ধে মীরকাশিমের মুসলমান সেনা-নায়কগণ সেরূপ রণপাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই। সমরু কোনও সমর বিজয় করিয়াছেন কি না তাহা জানা যায় না। সমরুর যুদ্ধপ্রণালী সম্বন্ধে লিখিত আছে, "Samru's party was never famed for their military achievements. Samru was distinguished for his excellent retreat."

(N. W. P. Gazetteer Vol. II. P. 96 & Military Adventure of of Hindusthan. Page 404)।

"It was a rule, it was said, will Sombre to enter the field of battle at the safest point, form line facing the enemy, fire a few rounds, without regard to the distance or effect, form squre, and await the course of events. If victory declared for the enemy, he sold his unbroken force to him to great advantage, if for his friends, he assisted them in collecting the plunder, and securing all the advantage of the victory"...... Rambles and Recollections of an Indian Official by Sir W. H. Sleeman. Edited by V. Smith. Vol. II. P. 273.

"১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ভরতপুরের জাঠ রাজার অধীনে, সমরু যখন দিল্লী অবরোধ করে, তখন এক আরব কুমারীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয়" (৯ পৃষ্ঠা)। কিরূপে কোন সূত্রে পরিচয় হইয়াছিল তাহা শ্লিমানের গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু গ্রন্থকার তাহার উল্লেখ করেন নাই। শ্লিমানের গ্রন্থে লিখিত আছে, "She entered the service of Samru and accompanied him through all his compaigns".

"বেগম সমরুর বংশপরিচয় সম্বন্ধে মতভেদ আছে। বিভিন্ন লেখকের কথা আলোচনা করিলে জানা যায় যে, মীরাটের ৩০ মাইল উত্তর পশ্চিমে কোটানা গ্রামে লতিফ আলি খাঁ নামে জনৈক আরব-বংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বাস করিতেন। তাঁহার দুই বিবাহ। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে, আনুমানিক ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে, একটি অপরূপ লাবণ্যময়ী কন্যার জন্ম হয়" (৯।১০ পৃষ্ঠা)। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বেগম সমরুকে কাশ্মীর-দেশীয়া নর্ত্তকী বলিয়া নির্দ্দেশিত করিয়াছেন, কেহ বা তাঁহাকে কোনও দুরবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত মোগল ওমরাহের তনয়া বলিয়াছেন, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে সৈয়দবংশীয়া বলিয়াও পরিচিত করিয়াছেন। কিন্তু শ্লিমান তাঁহাকে আসাদ খাঁর অবৈধ পত্নীর গর্ভজাত তনয়া (The daughter of by a concubine of Asad Khan") বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আসাদ খাঁ কি লতিফ আলি খাঁর নামান্তর ?

সার্ধানার বিদ্রোহ, লঃভেসোর সহিত বেগম সমরুর পলায়ন, লঃভেসোর আত্মহত্যা, বেগমের আত্মহত্যার ব্যর্থ প্রয়াস, সার্ধানার বিদ্রোহী সেনার হস্তে বেগমের লাঞ্ছনা ও টমাসের চেষ্টায় বেগমের স্বীয় পদে পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিবরণ

ব্রজেন্দ্র বাবু স্লিমানের এবং টমাসের গ্রন্থ হইতে সঙ্কলন করিয়াছেন, কিন্তু স্থানে স্থানে মূলের সহিত অনুবাদের এক-আধটুকু অনৈক্য দৃষ্ট হয়। স্লিমান এবং টমাসের বিবরণের সহিত আর্চার-লিখিত বিবরণ উদ্ধৃত করা সঙ্গত ছিল। ব্রজেন্দ্র বাবু টমাসের লিখিত বিবরণ শত্রুপক্ষের লিখিত বিবরণ বলিয়া তাহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু টমাসের বিবরণ মধ্যে অসম্ভব কথা একটিও দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ স্লিমানের বিবরণ টমাসের বিবরণ অপেক্ষা অসম্পূর্ণ। বেগম সমরুর প্রতি টমাসের পরবর্ত্তী কালের ব্যবহারের বিষয় চিন্তা করিলে টমাসের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক না হইয়া পারে না। সুতরাং টমাসের বিবরণকে শত্রুপক্ষের বিবরণ বলিয়া অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা সঙ্গত হয় নাই। টমাসের লেখায় অবিশ্বাস করিয়া তিনি সার্ধানার বিদ্রোহের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অভ্রান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। সমরুর সেনাদল যেরূপ প্রকৃতির লোক দ্বারা গঠিত ছিল, তাহাতে সমরুর প্রতিও যে তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল, এমন বোধ হয় না। তাহারা অর্থলোভে এবং লুণ্ঠনের অবসর পাইবে বলিয়াই তাহার দলভুক্ত হইয়াছিল। সমরুর সৈন্যগণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, "His troops were most mutinous in India and are said to have frequently attacked their own officers and beaten them with clubs, whilst on more than one occassion Samru was tied astride a gun and exposed to the midday heat, to compel him to obey their wishes." (N. W. P. Gazetteer Vol. II. P. 6. See also Military Adventures of Hindusthan P. 404.)। এই স্বেচ্ছাচারী নিরক্ষর বর্ব্বর সৈন্যগণের বিদ্রোহই নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। তাহারা তাহাদের খেয়ালের বশেই কার্য্য করিত। সুতরাং টমাসের লিখিত লিগোইসের পদচ্যুতির জন্য যে তাহারা বিদ্রোহী হয় নাই, একথাও বলা চলে না।

ব্রজেন্দ্র বাবু সমরুকে যেরূপ "পূতচরিত্র", "মহিমবিজড়িত" এবং "গৌরব-শ্রীমণ্ডিত" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তিনি তাহার ঠিক বিপরীত ছিলেন। পাটনায় হত্যাকাণ্ড, প্রতিপালক প্রভু মীরকাসিমের সর্ব্বস্ব অপহরণ ও তাঁহার প্রতি দুর্ব্ব্যবহার প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিলেই ব্রজেন্দ্র বাবু সমরুর চরিত্র বুঝিতে পারিতেন। কম্পটনও লিখিয়াছেন, "Sombre's disposition was merciless, cruel, and blood-thirsty, and he

was totally wanting in honour and fidelity. Avaricious and unscrupulous to an astounding degree, he bartered his sword to the highest bidder, with the eagerness of a huckster disposing of perishable goods, and changed his fealty with the same unconcern that he changed his coat".—Military Adventures of Hindusthan by H. Compton. Page 404.

এসাই-যুদ্ধে বেগম সমরুর সৈন্যগণের, তথা বেগমের কার্য্যকুশলতার প্রশংসা করিয়া গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, সিন্ধিয়ার সৈন্যগণের মধ্যে একমাত্র বেগমের সৈন্যবর্গের চারি দল অক্ষত-শরীরে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছিল" (৫৮।৫৯ পৃষ্ঠা)।

বেগমের সৈন্যদল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অক্ষতশরীরে ফিরিয়া আসিয়াছিল অথবা তাহারা পলায়ন করিতে (Made good their escape—Military Adventures—Compton) বাধ্য হইয়াছিল তাহা কম্পটনের গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ আছে। ইহাদের কার্য্যকুশলতা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে, কেবল একটী কথা লিখিতে বাকী ছিল। তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল, "They never gained a gun and never lost one."…N. W. P. Gazetteer Vol. II. P. 6.

সুতরাং তাহারা কিরূপ সমরকুশল ছিল, এবং এসাই-যুদ্ধে কিরূপ ভাবে এবং কেন তাহারা অক্ষতশরীরে ফিরিয়া আসিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

"তাহার (লেডি ফরেষ্ট) মৃত্যু হইলেও আগ্রার ক্যাথলিক সম্প্রদায়...... প্রাসাদ ও তৎসংলগ্ন উদ্যান নীলামে ক্রয় করেন। এক্ষণে তথায় দেশীয় খ্রীষ্টানদিগের অনাথাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে"—ইহার পরেই ব্রজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, "হায়! অদৃষ্টের কি ঘোর বিড়ম্বনা!......যেথানে কত দীন দরিদ্রের অভাব পূর্ণ হইত, কত ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত, কত অনাথ আশ্রয় লাভ করিত, তথায় এক্ষণে কাকাতুয়ার বিকট চীৎকার, আর নিকটবর্ত্তী মীরাট দুর্গের আমোদপ্রমোদে রত সৈন্যবর্গের হাস্যধ্বনির প্রতিধ্বনিমাত্র শুনা যায়! (৮৬ পৃষ্ঠা)। সার্ধানার অনাথাশ্রমে কি অনাথগণ আশ্রয় প্রাপ্ত হয় না? সেই অনাথাশ্রমে কি ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুন্নিবৃত্তি এবং দরিদ্রের অভাব পূর্ণ হয় না?

"একটি দেশীয় মহিলা বিপুল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ধনজনপূর্ণ বিশাল রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন"—(১০০ পৃষ্ঠা)। রাজ্যস্থাপন করা এবং দিল্লীশ্বর

সাহ আলমের নিকট হইতে জায়গীর প্রাপ্ত হওয়া কি এক কথা ?

সমরুর পুত্র জাফর-ইয়াব্ খাঁর পরিণাম সম্বন্ধে ব্রজেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন, "১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে বিসূচিকা রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়" (৪৬ পৃষ্ঠা)। কিন্তু কম্পটন বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া লিখিয়াছেন। (Compton's Military Adventures. P. 407)।

সার্ধানার প্রাসাদ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "প্রাসাদের মধ্যস্থলের হলঘরে, বেগমের বৃদ্ধ বয়সের একখানি সুন্দর চিত্র ছিল—বেগম সমরু মূল্যবান উচ্চাসনে বসিয়া ধূমপান করিতেছেন। এই চিত্রখানি মেল্‌ভিলের (Melville) অঙ্কিত ; আমরা ইহার প্রতিকৃতি প্রদান করিলাম" (৯৪ পৃষ্ঠা)। আমরা বুঝিতে পারিলাম না, ব্রজেন্দ্র বাবু এই চিত্রখানির আলোকচিত্র সার্ধানার প্রাসাদ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন অথবা অন্য কোনও স্থান হইতে ইহা গৃহীত হইয়াছে। আমরা এই চিত্রের ন্যায় একখানি চিত্র Keen's Hindusthan under Free Lances নামক গ্রন্থে দেখিয়াছি। টমাস এবং সার্ধানা-প্রাসাদের চিত্রও উক্ত গ্রন্থে সন্নিবেশিত আছে। ব্রজেন্দ্র বাবু এই শেষোক্ত চিত্র দুইখানি সম্ভবতঃ কীনের গ্রন্থ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের এই অনুমান যদি সত্য হয়, তবে ব্রজেন্দ্র বাবু তাহা স্বীকার করিলেই শোভন হইত। তাঁহার গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কোনও কথাই লিখিত হয় নাই।

পুস্তক-পরিচয়।

দাক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। —শ্রীরেবতীমোহন সেন-প্রণীত। ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৹ বার আনা।

গ্রন্থকার 'নিবেদনে' লিখিয়াছেন,—"শ্রীশচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গের জগন্মঙ্গল-বিচিত্র-লীলার এক অধ্যায়, ভক্ত পাঠক-বৃন্দের অগ্রে, যেন তেন প্রকারে, আপনার ক্ষীণকণ্ঠে কীর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইলাম।" কিন্তু আমরা দেখিলাম, গ্রন্থকারের এ বিনয়-স্বীকার নিরর্থক হইয়াছে। পুস্তকখানি 'যেন তেন প্রকারে' লিখিত হয় নাই। উহা সুলিখিতই হইয়াছে। উহার লিখন-প্রণালী ও ভাষা উভয়ই প্রশংসার যোগ্য। যে উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহা যে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে, এমন কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব। এমন মধুর-ভাবাত্মক, ভক্তিরস-প্রধান গ্রন্থের এদেশে যতই প্রচার হয়, ততই মঙ্গল।

ভাদরে।

[শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কুণ্ডু, এম্-এ, বি-এল]

দেখ্‌তে দেখ্‌তে স্বপ্ন তোমার, ঘুমটা আমার গেল টুটে,
পাগল মনে, আগল খুলে বাইরে এনু হঠাৎ ছুটে !—
জন-মানব নাইকো পথে, টান্‌ছে কুকুর 'এঁটো' পাত,
রাজার বাড়ী, বাজ্‌ল ঘড়ী, শুনুনু তখন—দুপুর রাত।
স্তব্ধ-উদাস নয়ন মেলি' পথের পানে চাইনু খানিক।
আকাশ তখন জ্যোৎস্নাভরা, জ্বল্‌ছে তখন তারার মাণিক।
ঠিক-ঠিকানা নাইকো কিছু, চল্‌নু কোথা—কেই বা জানে !
কে যেন রে চল্‌ল নিয়ে, আমায় টেনে কঠিন টানে।
এপথ-ওপথ কর্‌নু কত, ঘুর্‌নু আমি দিশেহারা,
কয়েদী ঠিক যেমন ঘোরে পালায় যদি ভেঙ্গে কারা।
বুঝনু কেন গন্ধ-মৃগ বনে বনে এক্‌লা ছোটে,
ভ্রমর কেন গুণগুণায়, নাই বা কুসুম রইল মোটে।
ভুলে গেছি, কোন পথেতে চরণ আমার গেল থেমে,
শিউরে উঠ্‌ল বুকটা হঠাৎ, সর্ব্ব শরীর উঠ্‌ল ঘেমে।
বন্ধ সকল পৌর-দুয়ার, সুপ্তি-পাথর চাপা বুকে,
কে গায় ঐ চেনা গান হর্ম্ম্যশিরে এক্‌লা সুখে !
চিনেছি, ও কণ্ঠস্বর, আর কি থাকে বুঝ্‌তে বাকি ?
ভেব নাকো, হে রূপসী ! পার্ব্বে আমায় দিতে ফাঁকি।
ঐ সুরেতে নিশিদিন বাঁধা আমার বীণার তার,
বাজে সুধু তোমার গান, না হয় বাজে হাহাকার।
হে রূপসী ! শুধাই তোমায়, কোন বঁধু সে ভাগ্যবান ?
দেবে যারি চরণতলায় তোমার হাসি, রূপ ও গান ?
বাতায়ন-পথে দেখে পড়েছে যে চাঁদের আলো,
কোন স্বরগ-সুখের লাগি মর্ত্ত্যে তোমার লাগ্‌ছে ভালো।
কোন বঁধুয়ার প্রাণের সাথে, মিশিয়ে দেবে তুমি প্রাণ,
লুটিয়ে প'ড়ে চরণ-তলায় কর্ব্বে সবই অবসান !

আমি যে ঐ মরণ তরে, আমি যে ঐ সুখের লাগি,
"এমন চাঁদের আলো" দেখে, আজ্‌কে আমি গৃহত্যাগী !
জ্যোস্না ক্রমে নিভে এল, শারদাকাশ ছাইল মেঘে,
বইতেছিল বাতাস ধীরে, থেমে গেল হঠাৎ রেগে ;
ঝঞ্ঝাবায়ু ছুট্‌ল ভীষণ, সৃষ্টি যেন উঠ্‌ল ক্ষেপে,
অশ্রুভরা আর্ত্তনাদে, বৃষ্টি-ধারা নাম্‌ল চেপে।
বাতায়ান-পথে তোমায় ছুটল বায়ু মত্ত বিভোল,
আচম্বিতে করে গেল মাতলামি ও হট্টগোল।
লুটছে আঁচল, শ্লথ বসন টেনে ধরে কোনো মতে,
রুধ্‌বে বলে বাতায়ান, ছুটে এসে চাইলে পথে ;
এলোচুলে উড়িয়ে দিতে হাওয়া আবার এল রুথে,
ঝট্‌কা হাওয়ায় ঝাপটা বারি, পড়্‌ল তোমার বুকে মুখে ;
উঠ্‌ল কেঁপে স্পর্শে তাহার, ছুটল দেহে কি হিল্লোল,
বর্ষাবারি শিরায় শিরায়, দিয়ে গেল সুখের দোল।
স্নিগ্ধ সজল কোমল পরশ, বুঝি কাহার পড়্‌ল মনে,
থম্‌কে তুমি দাঁড়িয়ে গেলে, রুধ্‌তে গিয়ে বাতায়নে।
রইলে চেয়ে সজল পথে, ক্ষণেক উদাস নয়ন মেলি,
বাইরে শুধু চল্‌ছে কেবল, হাওয়ায় জলে ঠেলাঠেলি।
বিশ্ব তখন ঘুমে ভরা, নিভে গেছে সকল দীপ,
গভীর নিবিড় অন্ধকারে, নাইকো কোথাও আলোর টিপ।
জ্বল্‌ছে শুধু তোমার আলো, উজল তোমার কপোল চোখ,
তোমায় ঘিরে রেখে দে'ছে, কোন স্বরগের দিব্যালোক।
ওই আলো মোর কর্ণধার, ঐ আলো মোর ধ্রুবতারা,
চিনিয়ে দেবে তোমায় পথ, আমি যে আজ গৃহহারা !
বন্ধ করা বাতায়ন হল নাকো কোনো মতে,
সুদূরেতে রইলে চেয়ে, যেন কাহার আশা-পথে।
কাহার কথা পড়্‌ল মনে, ভরে এল চোখে জল,
দুল্‌ল নয়ন-তলায় তোমার সিক্ত দুটি মুক্তাফল।
বোঝা গেল, আজ্‌কে এসে বক্ষে তোমার কচ্ছে বাস,
একটা যেন চাপা কান্না, একটা যেন দীর্ঘশ্বাস।

বুঝ্ছো আজ প্রাণে প্রাণে, যে কাহিনী ছিল শোনা,
বিরহী সে যক্ষ-বুকে বেজেছিল কি বেদনা !
বৃন্দাবনে তমাল-তলে, ঝর্‌ত যে দিন বাদল-ধার,
ব্যাকুল প্রাণে হ'ত কেন শ্রীরাধিকার অভিসার !
মাথায় আমার খরস্রোতে ঝর্‌ছে অঝোর বারিধারা,
দাঁড়িয়ে কেন সঙ্গিহীন, দাঁড়িয়ে কেন গৃহহারা !
ভাব্‌ছ এখন মনে মনে,—কইলে কথা হল ভাল,
নয়ন-কোণে যখন তাহার প্রাণের কথা বোঝা গেল।
রেখেছিল চরণতলে, সে ত তার প্রেমের ভার,
মাড়িয়ে যাওয়া হয়নি, ভালো করে শুষ্ক নমস্কার।
ধরা তুমি দেবে নাক, ধর্‌বে শুধু বুঝছে ভুল,
তোমার প্রাণের ব্যথা ঠিক্, আমারো যা,—সমতুল ॥
আর কেন ও অশ্রুজল, আর কেন এ অভিমান,
হে রূপসী ! ঘুচে যাক্, সকল বাধা-ব্যবধান ;
লুপ্ত হোক্ বিশ্ব আজ, লুপ্ত হোক চরাচর,
জগত—সে ত মোরা দুটি, স্বর্গ—সে ত মোদের ঘর।
মোদের মিলন উজল করি', জ্বলুক্ তোমার গন্ধদীপ,
বহুক পবন পরাগ মেখে, সিক্ত কেশর ছড়াক নীপ ;
শ্রান্তিহীন বৃষ্টিধারে, চৌদিকেতে উঠুক নিতি,
বাদল রাতের এক তারাতে মোদের মহামিলনগীতি।
এত দিন তোমায় আমায়, হয়নি কো জানাজানি,
প্রাণের মাঝে চাপা কথার, আজকে হোক্ জানাজানি।
আজ্‌কে মোদের মিলন-রাতের নাইক শেষ, নাইক ভোর,
দিবস—সে ত অন্ধকার, রজনী ত আঁধার ঘোর।
ছুটে গেল তোমার পানে, নিবিড় ঘন অন্ধকারে,
দেখ্‌তে তুমি পেলে নাক, রুধ্‌লে তুমি মুক্তদ্বারে,
মনে হ'ল চেঁচিয়ে ডাকি, কে' যেন গো চাপ্‌ল গলা ;
বাদল-রাতের এমন কথা, হ'ল নাক তোমায় বলা।
ফিরে এনু যখন ঘরে—বুকে চাপা বেজায় ভার,
মূর্ত্তি তোমার জাগে শুধু উজল ক'রে অন্ধকার ॥

দীন।

[শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার, বি-এ]

তুমি যখন ডাক কেমন
ধাই অসংশয়;
নিজে হতে ডাক্‌তে গেলেই
এত আসে ভয়!
আমার বুকে কত পাপ
কত দৈন্য-ত্রুটী;
কত জন্মান্তের বোঝা
এসে পড়ে জুটি'।
আমি কি সে দৈন্য নিয়ে
চাইতে পারি মুখে?
ধর্‌তে পারি জ্যোতিঃ তব
এ আঁধার বুকে!
তুমি মহাপ্রেমিক তাই
এ পাতকী জনে,
নিয়ে যাও আপন পাশে
কত স্নেহ-টানে;
তোমারি ডাকে মনে হয়
নহি আমি দীন,
নিজে ডাক্‌তে গেলেই বুঝি
কত আমি হীন!

মুসলমান বৈষ্ণব কবির পরিচয়।

[লেখক—শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম্‌-এ, বি-এল্‌।]

বৈষ্ণব-কাব্য-সাহিত্যে মুসলমান কবির পদাবলী এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। বৈষ্ণব সাকার-উপাসক, দ্বৈতবাদী ও নিরামিষভোজী। বাঙ্গালা তাহার ভাষা, রাধাকৃষ্ণ তাহার উপাস্য দেবতা। মুসলমানের সহিত আচার-ব্যবহার ধর্ম্ম সমাজবিধি প্রভৃতি কোনও বিষয়ে তাহার ঐক্য নাই। মুসলমান যখন বঙ্গদেশের রাজা, বৈষ্ণব তখন তাহার প্রজা।, যে সময়ে উৎপীড়নকারী মুসলমান রাজার শাসনে বৈষ্ণবের হিন্দুয়ানী রক্ষা করা অসম্ভবপ্রায় হইয়াছিল, সেই-সময়েই কিন্তু মুসলমান বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব। শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাবের শত বৎসর পরে যখন বৈষ্ণবধর্ম্ম বঙ্গদেশের সকল স্থানে বাঙ্গালীর জাতীয় ধর্ম্ম বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল, সে সময়ে পাঠান রাজত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। মোগলের অধীনতায় হিন্দু ও পাঠান উভয়েই যখন অভিন্ন শাসন-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল, তখন বোধ হয় পাঠানগণ নিজেদের অবস্থার অবনতির বিষয় ভাবিয়া হিন্দুদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করিতে শিখিয়াছিল। মোগল-অধিকৃত বঙ্গদেশে প্রথমে পাঠানের অপেক্ষা হিন্দুর অবস্থা কতকটা যে ভাল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। টোডরমল্ল ও তাঁহার পরে মানসিংহ আকবরের সময়ে বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করিয়া পাঠান-বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। তখন হিন্দুর সহানুভূতির উপর মোগল-প্রাধান্যকে অনেকটা নির্ভর করিতে হইত। বিজিত পাঠানগণ যেমন মোগলের শাসনে নিস্তেজ হইয়া পড়িল, হিন্দুর প্রতিপত্তি সেই সঙ্গে অল্পে অল্পে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হইবার উপক্রম হইল। পাঠানেরা এখন দলে দলে হিন্দু ভূস্বামীর অধীন সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশে মোগল রাজত্বের যুগে হিন্দু ও পাঠানে যতটা সাম্যভাবে মেশামিশি দেখা যায়, সেরূপ বোধ হয় বাঙ্গালার ইতিহাসে আর কোনও সময়ে দেখা যায় না। মুকুন্দরামের চণ্ডীতে ও ভারতচন্দ্রের কাব্যে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রতাপাদিত্য, কৃষ্ণচন্দ্র, দেবপাল প্রভৃতি

বঙ্গীয় রাজন্যবর্গের সময়ে হিন্দু ও পাঠানের মধ্যে যে নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহার ফলে বাঙ্গালা ভাষা পাঠানেরও ভাষা বলিয়া যে গৃহীত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। হিন্দু রাজার সরকারে ফারসির পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা ভাষার প্রভাব যখন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন যে এই ভাষা পাঠানকেও বাধ্য হইয়া ব্যবহার করিতে হইত, তাহা বেশ বুঝা যায়। এই সময়ে হিন্দু রাজারা বঙ্গদেশের নানা স্থানে মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের ও হিন্দু শক্তির এক নূতন অধ্যায় বাঙ্গালার ইতিহাসে প্রবর্ত্তন করেন। বৈষ্ণবেরা যে এখন পূর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বিঘ্নে শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের আলোচনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি বৈষ্ণবের অবশ্যপালনীয় কার্য্যসকল করিতে পারিতেন, তাহা সুনিশ্চিত। বৈষ্ণবধর্ম্মের গ্রন্থসকল যে এখন বহুলভাবে পঠিত হইত, তাহাও স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। পাঠান শরিফ অর্থাৎ ভদ্রলোক ও পাঠান ফকিরগণ অর্থাৎ সাধুরা বৈষ্ণবধর্ম্মের যে এই সময়ে বিশেষভাবে চর্চ্চা করিতেন, তাহা মুসলমান বৈষ্ণব কবিদিগের পদাবলীতে সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। বৈষ্ণবধর্ম্ম পাঠানের আত্মবৈশিষ্ট্য লোপ করিয়া সন্তুষ্ট হয় নাই, তাহাকে বঙ্গভাষার প্রেমিক কবির পদে বরণ করিয়া চারি শতাব্দীর অত্যাচারের প্রতিশোধ লইয়া তবে ক্ষান্ত হইয়াছিল। তদবধি বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমান দুইটী বিভিন্ন পরিবারভুক্ত হইলেও বঙ্গভাষা তাহাদের মাতৃভাষা বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে।

হিন্দু বৈষ্ণব পদকর্ত্তার ন্যায় মুসলমান বৈষ্ণব কবির পরিচয় আমরা তাঁহার রচিত গীতি-কবিতা হইতে যৎসামান্য প্রাপ্ত হই। মুসলমান কবি যে হিন্দু কবির পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কবিতা রচনা করিতেন, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ কিন্তু মুসলমান কবির পদাবলীতে পাওয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমান কবির পদাবলীর ভাষায়, ভণিতায় ও ভাবে যে বিশেষ ঐক্য আছে, তাহা পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। উভয় শ্রেণীর কবিই সঙ্গীতপ্রিয়। দুই একজন মুসলমান কবির সঙ্গীতপ্রিয়তা তাঁহাদের রচিত পদাবলীতে বিশেষভাবে পরিস্ফুট। মুসলমান পদকর্ত্তা আলিরাজা যে সুরে কোনও একটি পদ গেয়, সেই সুরের গুণ কীর্ত্তন করিয়া পদবিশেষের গীতি-সৌন্দর্য্য আশ্চর্য্যভাবে ফুটাইয়া বাহির করিয়াছেন। কানু ফকির নামে পরিচিত আলিরাজা; তাঁহার রচিত অনেক বৈষ্ণব পদাবলীতে রাগ-রাগিণীর প্রশংসা করিয়াছেন। শ্যামরূপ বর্ণন করিয়া তিনি গাইয়াছেন,—

"শ্যামরূপ, শ্যামচন্দ্র, শ্যাম অলঙ্কার।
শ্যাম মেঘে পূর্ণাসন করিছে মল্লার॥

মাতঙ্গবাহন রাজা স্বর্গের উপর।
মল্লারের আলাপন চাতকের স্বর ॥"

মল্লারের ন্যায় কেদার নামক সুরের উল্লেখ করিয়া তিনি গাইয়াছেন,—

"পিরীতি রতন-মূলে, হীন আলিরাজা বোলে
প্রাণ-সখা পদে ব্রত করি।
কেদার হেমন্ত ঘরে, বঞ্চে নিত্য প্রিয়েশ্বরে
বসন্ত হইল প্রাণ-বৈরী ॥"

যখন প্রেমের জ্বালায় রাধিকার মর্ম্ম বিদীর্ণ হইতেছে, কবি তখন মাধবী রাগিণীতে গীত গাহিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।—

মাধবী পিরীত-বশে আলিরাজা গায়।
যার বাণে তিনলোক মারিয়া জীয়ায় ॥"

কানড়া সুরের উল্লেখ করিয়া কবি গাইয়াছেন,—

"গুরু-পদে আলিরাজা গাহিল কানড়া।
চিত্ত হতে প্রেমানল না হউক ছাড়া ॥"

আলিরাজা "ধ্যান-মালা" নামে একখানি সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। আলিরাজার ন্যায় অন্যান্য মুসলমান বৈষ্ণব কবিগণ যদিও সুরবিশেষের গুণ কীর্ত্তন করিয়া পদ রচনা করেন নাই, কিন্তু সঙ্গীতের পক্ষপাতী যে সকলেই তাহা তাঁহাদের পদাবলী-পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রেম-যন্ত্রে"র কথা অনেকেই বলিয়াছেন। হিন্দু কবির ন্যায় মুসলমান কবিও বাঁশীর স্বরে মুগ্ধ। আলিরাজা মালব সুরে গাইয়াছেন,—

"বনমালী শ্যাম, তোমার মুরলী জগ-প্রাণ। ধু
শুনি মুরলীর ধ্বনি, ভ্রম যায় দেব মুনি
ত্রিভুবন হয় জর জর।
কুলবতী যত নারী, গৃহবাস দিল ছাড়ি
শুনিয়া দারুণি বংশীস্বর ॥
জাতি ধর্ম্ম কুল নীতি, তেজি বন্ধু সব পতি
নিত্য শুনে মুরলীর গীত।
বংশী হেন শক্তি ধরে, তনু রাখি প্রাণি হরে
বংশী মূলে জগতের চিত ॥

যে শুনে তোমার বংশী, সে বড় দেবের অংশী
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়।
গৃহবাসে কিবা সাধ, বংশী মোর প্রাণনাথ
গুরুপদে আলিরাজা কয়॥"

আলিরাজার আর একটি পদে জানা যায় যে, তাঁহার গুরু সাহা কেয়ামদ্দিনও বাঁশীর স্বরে মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

"যার নাম বেদশাস্ত্র অক্ষরে না ধরে।
পরম বংশীর সানে সে নাম নিঃসরে॥
সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু বংশীনাদে বশ।
আলিরাজা কহে বাঁশী অমূল্য পরশ॥"

কবি সৈয়দ মর্ত্তুজা বলেন, "কালা নিল জাতি কুল, প্রাণি নিল বাঁশী।"

"সই রে, আমার কি করে পরাণে।
প্রাণি মোর হরে নিল কালার বাঁশী টানে॥
যে চাহসি দিমু বাঁশী তোর যেই শ্রদ্ধা।
রাঙ্গা পায় মিনতি করি বাঁশী না ডাকিও রাধা॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে শুন মোর কথা।
মন মোর মজি রৈল বাঁশী পুরে যথা॥"

কবি মীর্জ্জা ফয়জুল্লার শ্যাম "মোহনিআ বাঁশী বাজাএ।" "শুনিতে বাঁশীর গান, দ্রবীভূত হএ পাষাণ, রমণীর প্রাণ কত দড় ?" কবিবর সৈয়দ নাছিরদ্দিন বলেন,—"নাম রস বাঁশীর স্বনে দিতে নারি সীমা।" নাছির মহম্মদ মুরলীর শক্তির উল্লেখ করিয়া একটি পদের ভণিতায় বলিয়াছেন, "মুরলীর স্বরে রাধার প্রাণি নিল হরি।" পদকর্ত্তা মহম্মদ হানিফের মতে "মধুর মুরলীধ্বনি শুনিতে সুস্বর।" মুসলমান বৈষ্ণব কবির উপর মুরলীর আশ্চর্য্য প্রভাবের কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে যেমন কবির সঙ্গীতপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁহার গুরু-ভক্তিরও সেইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। আলিরাজা বহুসংখ্যক ভণিতায় তাঁহার গুরু সাহা কেয়ামদ্দিনের প্রতি আন্তরিক ভক্তির নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

"হীন আলিরাজা ভণে গুরুদাতা সার।
ষট্ কলে রোমে রোমে গুণ গাহে যার॥"

"গুরুপদে শির করি আলিরাজা কহে," "গুরুকৃপা সিন্ধুজলে, হীন আলিরাজা বোলে," "হীন আলিরাজা চাহে ভক্তি গুরু পায়," "মোর দুঃখভার, গুরুপদ সার, কহে আলিরাজা হীনে," এইসকল ও অন্যান্য অনেক উক্তিতে কবি যেরূপ গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন তাহার তুলনা বোধ হয় জনকয়েক হিন্দু বৈষ্ণব কবির ভণিতা ছাড়া আর কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। প্রেমিক মুসলমান কবির গুরুভক্তির যে বিশেষ কারণ আছে, কয়েকটি ভণিতা হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আলিরাজার গুরু সাহা কেয়ামদ্দিন নিজে প্রেমিক পুরুষ ছিলেন এবং তিনি আলিরাজাকে প্রেমতত্ত্ব শিক্ষা দেন। "সাহা কেয়ামদ্দিন গুরু প্রেমগানে বশ," আর সেই কারণে আলিরাজা তাঁহার নিকট "প্রেমরত্ন" দান চাহিয়াছেন।

"প্রেম রত্ন নিধি বস্তু, গুরুপদ সিদ্ধি রস্তু
হীন আলিরাজা মাগে দান।
জানাও প্রেমের পাঠ, করাও পিরীত নাট
সর্ব্ব অঙ্গে গাহে প্রেম গান॥"

আলিরাজা বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, গুরুর কৃপা না হইলে তিনি প্রেমের রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিতেন না। প্রেমের জ্বালায় কাতর হইয়া কবি গুরুর উপদেশরূপ সুচিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন।

"আলিরাজা কহে প্রেম-শর-বিষ বুকে।
কাংনাগে দংশিলে ঔষধ গুরু-মুখে॥"

কবি এবাদোল্লাও গুরুভক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীরাধাকে গুরু-পদ ভজনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

"এবাদোল্লা কহে ধনী ভজ গুরুপদ।
কদম্বতলে গিয়া দেখ পিয়ার সম্পদ॥"

সৈয়দ আইনদ্দিন বলেন যে, গুরুর সেবা করিলে মনের অন্ধকার দূর হয়।

"সৈয়দ আইনদ্দিন কহে না করিও হেলা।
গুরুসেবা করিলে সে নাহি আন্ধিয়ারা॥"

কবি নাছির মহম্মদেরও একটি ভণিতা হইতে তাঁহার গুরুভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

"এতিম নাছিরে কহে ভজ রাজা পায়।
সাহা আফ্‌জল পীর রহিতে সহায়॥"

সৈয়দ নাছিরদ্দিনও একটি ভণিতায় গুরুভক্তির পরিচয় দিয়াছেন।

"কহে সৈয়দ নাছিরদ্দিনে পুরিয়া আরতি।
সাহা আবছল্লা পদে করিয়া ভকতি॥"

মুসলমান বৈষ্ণব কবির ভণিতায় গুরুভক্তির বৃথা আড়ম্বর নাই। সকল গুরুভক্ত মুসলমান কবিই সরল ভাষায়, অন্তরের সহিত ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি লইয়া গুরুর চরণ পূজা করিয়াছেন। ভক্তি যে প্রেমের চির-সহচরী তাহা মুসলমান বৈষ্ণব কবি গুরুর কৃপায় যেমন বুঝিয়াছিলেন, বোধ হয় সেরূপ অপর কোনও অহিন্দু কবি বুঝেন নাই। আলিরাজার ন্যায় অন্যান্য মুসলমান কবিরা সরলভাবে প্রেম-ভক্তির যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার বিষয় ভাবিয়া দেখিলে বিস্ময়ে ও আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হয়। হিন্দু বৈষ্ণব কবি ছাড়া এতটা আন্তরিকতা যে ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী কোনও বৈষ্ণব কবিতে সম্ভবে, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার সন্দেহ নাই। প্রেমের অপরিমেয় শক্তি মুসলমান কবির হৃদয়কে দ্রবীভূত করিয়া তাঁহার পদাবলীর ভিতর দিয়া একটু একটু করিয়া বাহির হইয়াছে। হিন্দু বৈষ্ণব কবির ন্যায় মুসলমান বৈষ্ণব কবির বিনয়ের পরিচয় ভণিতার মধ্যে পাওয়া যায়। সৈয়দ আপনাকে আলাওল "গুরুর কিঙ্কর," মীর্জ্জা ফলজুল্লা "কাঙ্গালী," সৈয়দ মর্ত্তুজা "জনম ফকির," সৈয়দ নাছিরদ্দিন "এতিম" অর্থাৎ পিতৃমাতৃহীন, "হীন", "খাকী"(১) "শিশু", বলিয়াছেন; আলিরাজার বিনয়ের তুলনা নাই।

"সাহা কেয়ামদ্দিন লক্ষ্যে আলিরাজা ভণে।
অপরাধী আছি আমি ঐ রাঙ্গা চরণে॥"

শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম বলেন—"আলিরাজার কৃত ধ্যানমালা, সিরাজ কুলুপ এবং জ্ঞানসাগর নামক তিনখানা গ্রন্থ আমি পাইয়াছি। তিন-খানাই সাহা কেয়ামদ্দিনের চরণে সমর্পিত হইয়াছে। কবি পদে পদেই তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়াছেন। এরূপ গুরুভক্তি অধুনা সুদুর্ল্লভ।"

হিন্দু বৈষ্ণব কবির ন্যায় মুসলমান বৈষ্ণব কবিও যে রাধাকৃষ্ণের রূপ দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ তাঁহার পদাবলীর অনেক স্থানে পাওয়া যায়। সৈয়দ মর্ত্তুজা শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনায় বলিয়াছেন, "এমন বিনোদ রূপ কভু নাহি দেখি।" আলিরাজা শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিয়া গাইয়াছেন,—

(১) মৃত্তিকা-গঠিত।

"গাহে আলিরাজা হীনে, সার সেই রূপ বিনে
অন্য রূপে না বান্ধিমু চিত।"

কবি সৈয়দ আইনদ্দিন বলেন, "রূপ না থাকিলে কার রাধা কানু নাম?" সৈয়দ মর্ত্তুজা যেমন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা, আলিরাজা তেমনি রাধার ভক্তিতে মোহিত। আলিরাজার রাধা "তত্ত্বরূপী নবীন যৌবনী।" "জন্মে জন্মে ভক্ত রাধা হরির চরণে।"

"গাহে আলিরাজা হীনে, রাধা সম ত্রিভুবনে
প্রেম ভক্ত নাহি দেব মুনি।
জীব যত পরী নর, এক নহে সমস্বর (১)
কুল ভক্ত রাধার নিছনি॥"

মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে প্রেম-ভক্তির প্রভাব যতটা দেখা যায়, রূপের প্রভাব ততটা দেখা যায় না। মুসলমান বৈষ্ণব কবিরা রাধা-কৃষ্ণের রূপে মুগ্ধ হইলেও তাঁহারা যে স্বধর্ম্মনিরত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের পদাবলী-পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায়। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেব যে প্রেমের বন্যা আনিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব মুসলমানের হৃদয়ের ভিতরে পঁহুছিয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম হিন্দু বৈষ্ণব-পদাবলীর সাহায্যে মুসলমানের কবি-হৃদয়ের চিত্রপটে প্রেমভক্তির এক নূতন আদর্শ অঙ্কিত করিয়াছিল। মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদাবলীর নায়ক-নায়িকা কৃষ্ণ ও রাধা এই নূতন আদর্শের বর্ণনীয় বিষয়। মুসলমান কবির প্রেম-ভক্তির চিত্রে সেই জন্য কবির উদারতা, সহৃদয়তা, আন্তরিকতা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদাবলী হইতে বুঝা যায় যে, এই অভিনব পদাবলী-সাহিত্যের জন্মস্থান পূর্ব্ব বাঙ্গালা। মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে সামান্য প্রাদেশিকতা যাহা লক্ষিত হয়, আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি না। মুসলমান বৈষ্ণব কবির নায়ক ও নায়িকার লীলাক্ষেত্র যে পূর্ব্ব বাঙ্গালা, তাহার সুস্পষ্ট আভাস তাঁহার পদাবলীতে পাওয়া যায়। কবিবর সৈয়দ আইনদ্দিন অভিসারের দৃশ্য বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন—

"এ মেঘ আঁধার রাত্রি কেহ নাহি সাথে।
একেলা আসিছ বন্ধু, প্রাণি লৈয়া হাতে।

(১) সমান।

বন্ধু এ মেঘ আঁধার রাত্রি বিজলীর ছটা।
ধীরে ধীরে বাড়াইও পাও পিছল হৈছে ঘাঁটা॥ (১)
এ মেঘ আঁধার রাত্রি ভুজঙ্গিনী চরে।
এথ রাত্রি আইলা বন্ধু, খাইয়া যাও মোরে॥
এ মেঘ আঁধার রাত্রি আর বাঘের ভয়।
বন্ধুয়া আসিব করি মোর মনে লয়॥"

ইহা যে বৃন্দাবনের দৃশ্য নয় তাহা পাঠককে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। বর্ষায় সাপ ও বাঘের ভয় পূর্ব্ব বাঙ্গালায় যে খুব বেশী তাহা সকলেই জানেন। আর এক স্থানে রাধা বলিতেছেন,—

"বিনোদ, আজু যাও ঘর।
তোমা খাইবে বাঘে সাপে কলঙ্ক আমার॥
উঠানেতে হাঁটু পাণি সম্মুখে গড়খাই।
সোণা হেন বন্ধুয়া রাখিমু কোন ঠাঁই॥"

সৈয়দ নাছিরুদ্দিন ও নাছির মহম্মদের "সুবর্ণের ভরা"র বর্ণনা পাঠ করিলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথের "সোণার তরী"র কল্পনা নূতন নহে। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান কবিরা রবীন্দ্রনাথের অনেক পূর্ব্বে কবিত্বময় বঙ্গদেশের নদনদীতে ভাসমান সোণার তরীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন।

"ভরিয়া সুবর্ণের ভরা ভাসাইলুম্ তরঙ্গে।
কেহ করে হাসি খেলি কেহ যাএ রঙ্গে॥"

(সৈয়দ নাছিরুদ্দিন)

ভরিলুম্ সুবর্ণের ভরা না রাখিলুঁ ধারে।
লহরে মারিল নাও পাইয়া বালুর চড়ে॥"

(নাছির মহম্মদ)

নাছির মহম্মদ প্রসিদ্ধ আউলিয়া পীর বদর আলামের উদ্দেশে একটী পদ রচনা করিয়া গাইয়াছেন—

"করুণা সাগর পীর বদর আলাম।
তরাও সঙ্কট হতে চরণ ভজিলাম॥
ব্যাঘ্রচর্ম্ম আরোহি সমুদ্র হৈল্ছ পার।
কে বুঝিতে পারে প্রভু মহিমা তোমার॥

---

(১) বাড়ী প্রবেশের পথ।

চাটিগাতে আসিআ হইল উপস্থিত।
সেবক জনেতে তাকে পূরাও বাঞ্ছিত ॥"

পাইক, মাঝি, ভুর অর্থাৎ বংশ বা কাষ্ঠরাশি যাহা জলে ভাসাইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, সমুদ্র, দরিয়া প্রভৃতির উল্লেখ মুসলমান কবির পদাবলীতে মাঝে মাঝে দৃষ্ট হয়। বর্ষা-প্লাবিত পূর্ব্ববঙ্গে বাঙ্গালীর কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া সৈয়দ নাছিরদ্দিন লিখিয়াছেন—

"স্থল নাই, কূল নাই, রৈবার নাই ঠাঁই।
দুই কূল হারাইয়া নাথ ভাঁসিতে বেড়াই ॥
দরিয়া তরঙ্গ দেখি স্থির নহে মন।
নাছিরদ্দিনে কহে ভাব নিরঞ্জন ॥"

সৈয়দ মর্ত্তুজা এক স্থানে বলিয়াছেন যে, নদীর ধারে যাহারা বাস করে তাহাদের সাঁতার জানা দরকার।

"সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে আকুলী পাথার।
নদীয়া কিনারে থাকি না জান সাঁতার ॥"

কবিবর আলিরাজা চট্টগ্রামবাসী হইলেও পূর্ব্ববঙ্গের চিত্র তাঁহার পদাবলীতে দেখা যায় না; বৃন্দাবনের দৃশ্য যে মুসলমান বৈষ্ণব কবিতায় নাই তাহা নহে, তবে সে দৃশ্যের মধ্যে আমরা সময়ে সময়ে ঘটনাবলীর এমন বিচিত্র সমাবেশ দেখিতে পাই যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের স্মৃতি আমাদের মনে জাগিয়া উঠে। মুসলমান বৈষ্ণব কবি এইরূপে বঙ্গভূমির খণ্ড-চিত্র অঙ্কিত করিয়া আমাদের জাতীয় কবির আসন অধিকার করিবার দাবী সপ্রমাণ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় কাব্য-জগতে মুসলমান বৈষ্ণব কবি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার না করিলেও তিনি যে এক সময়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া অসংখ্য হিন্দু ও মুসলমান নর-নারীর অন্তরে প্রেম ও ভক্তির আলোক বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। চিত্রাঙ্কন-শিল্পে মুসলমান বৈষ্ণব কবি পারদর্শী না হইলেও তাঁহার পদাবলীতে আমরা নির্ম্মল কাব্যরস আস্বাদ করিয়া থাকি। অভি-সারের কোনও দৃশ্যে অশ্লীলতার অভিনয় দেখা যায় না। মুসলমান বৈষ্ণব কবির নৈতিক জীবন যে বিশুদ্ধ ছিল, তিনি যে ভগবদ্-কৃপার উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন এবং কুনীতি ও হৃদয়হীনতার জন্য আক্ষেপ করিতেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার রচিত পদাবলীর সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সৈয়দ নাছিরদ্দিন এক স্থানে দুঃখের সহিত বলিয়াছেন—

"কলি হৈল বলী রে ধরম নাই তার মনে।
আপন্ পর পরিচয় নাহি বিবাদ জনে জনে॥"

নাছির মহম্মদেরও ঐ কথা।

"কলি হৈল বলী ধর্ম্ম নাহি মনে।
বল বুদ্ধি হারাই আমি ফিরি বনে বনে॥"

শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম ও শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজসুন্দর সান্যালের চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে অনেকগুলি অজ্ঞাত-পূর্ব্ব মুসলমান বৈষ্ণব কবির নাম ও পদাবলী এক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে। মৌলবী সাহেবের মতে মুসলমান বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে "সৈয়দ মর্ত্তুজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার পদগুলি লালিত্য, মাধুর্য্য ও কবিত্বে হিন্দু কবির পদের সহিত তুলনীয়।" ব্রজসুন্দর বাবু সৈয়দ মর্ত্তুজা ও আলিরাজা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"সৈয়দ মর্ত্তুজা প্রেমিক কবি; তাঁহার ভাষা সরল ও প্রসাদগুণবিশিষ্ট। তাঁহার রচনা অনেকটা হিন্দু বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের আদর্শে গঠিত; সর্ব্বত্র স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে টলটলায়মান। আলিরাজা কেবল প্রেমিক নহেন, তিনি ভক্তও বটেন। তাঁহার ভাষা সর্ব্বত্র আড়ম্বরহীন ও সহজভাবে মনোজ্ঞ নহে। তত্রাচ আমরা তাঁহাকে সুকবি বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে বাধ্য। হিন্দু বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিতে যেমন সম্বন্ধ, মুসলমান বৈষ্ণব কবি সৈয়দ মর্ত্তুজা ও আলিরাজাতেও তেমনি সম্বন্ধ বলিয়া আমার বোধ হয়। সৈয়দ মর্ত্তুজার 'পরাণের ধন'—শ্রীকৃষ্ণ; আলিরাজা 'রাধাকানুচরণ'-ভক্ত।" মুসলমান পদরচয়িতা-গণকে কেন মুসলমান বৈষ্ণব কবি বলিয়া অভিহিত করা হয়, ইহার উত্তরে ব্রজসুন্দর বাবু বলেন,—"প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে, হরিদাসের ন্যায় বহুতর একেশ্বরবাদী মুসলমান স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণ করতঃ চৈতন্যের বিজয়-বৈজয়ন্তী-মূলে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। চারিশত বর্ষ পূর্ব্বের সেই প্রবল ধর্ম্মপ্লাবনে বঙ্গদেশ হইতে ভেদ-বিচার ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। এইরূপে কতিপয় মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণ-লীলা-বিষয়ক গাথা রচনা করিয়া বৈষ্ণব-জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের প্রকৃত ধর্ম্মমত কি ছিল তাহা অভ্রান্তরূপে জানিতে না পারিলেও, তাঁহারা যে প্রভূত পরিমাণে বৈষ্ণবধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, তাহাতে সংশয় করিবার কিছুমাত্র কারণ দেখা যায় না এবং এই জন্যই আমরা তাঁহা-দিগকে 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' বলিয়া অভিহিত করিতে সাহসী হইলাম।"

হত্যাকারী।

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার]

(১)

টুপ্‌—টুপ্‌—টুপ্‌—ও কিসের শব্দ?—ওপাশে স্নান কর্‌বার ঘরে নয়?—ওঃ—জলের কল্‌টা ভাল করে বন্ধ করেনি বুঝি?—একবার দেখ্‌তে—হ'ল—হাঁ তা'ই বটে;—চৌবাচ্ছায় দুই তিন সেকেণ্ড অন্তর ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়্‌চে, তা'তেই নিশীথের নীরবতাকে এত মুখরিত করে তুল্‌ছে।—একটু এঁটে বন্ধ করে দি।—কই—ভাল বন্ধ হ'ল না ত!—লিক্‌ কচ্চে না?—খারাপ হয়ে গেছে বোধ হয়। বড় শব্দ হচ্চে,—যাক্‌,—এ শব্দে তত কিছু ক্ষতি হ'বে না,—এখন কাজটা তাড়াতাড়ি হাসিল করে ফেল্‌তে হ'বে।

আমার উড়ানিখানা দিয়ে, আমার নাক আর মুখ ভাল করে আবৃত করে মাথার উপর ফের দিয়ে, পাগড়ির মতন, বাঁধ্‌লাম। পকেট থেকে অটোম্যাটিক্‌ ল্যাম্প্‌টা বা'র করে, সুইচ্‌টা টিপ্‌লাম,—বেশ আলো হ'ল। সেই আলোয় আমার পকেটের মালপত্র বা'র করে কর্ম্মকাণ্ডের জন্য আপনাকে প্রস্তুত কর্‌তে প্রবৃত্ত হ'লাম। প্রথমে আমার বুক-পকেট থেকে একখানা বড় রুমাল নিয়ে বেশ পুরু করে ভাঁজ কর্‌লাম; তা'র পরে একটা ছোট কাগজের বাক্সে সযত্নরক্ষিত ক্লোরোফর্ম্মের শিশির ছিপি খুলে, রুমালখানিতে আট দশ ফোঁটা ঢেলে, একখানা পূর্ব্বসংগৃহীত খবরের কাগজে মুড়ে নিলাম; ক্লোরোফর্ম্মের শিশিটা আগের মত প্যাক করে আর আলোটাকে নিবিয়ে আবার পকেটে রাখ্‌লাম। এখন কাজে এগোনো যা'ক। স্নান কর্‌বার ঘর থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে, সদরের দরজাটা আর একবার দেখ্‌লুম,—বেশ বন্ধ আছে,—কা'রও হঠাৎ প্রবেশ ও আমার কার্য্যকলাপ অতর্কিত-ভাবে পর্য্যবেক্ষণ কর্‌বার সম্ভাবনা নেই।

(২)

পা টিপে, ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে আবার উপরে উঠ্‌লাম। সিঁড়ির ঠিক সাম্‌নের ঘরে ঝি শোয়। ঘরের দরজা ঠেলে দেখ্‌লাম—খোলা আছে। বারেণ্ডাটা সম্পূর্ণ ঘেরা; গ্রীষ্মের আতিশয্যে পূর্ব্বে ঘরের দরজা খুলে রাখাই

হ'ত, আর বাড়ীর মনিবের ঘরের দরজা বন্ধ না হ'লে দাসীর ঘরের দরজা বন্ধ কর্‌বার হুকুম ছিল না;—আজও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি।

ঘরের দেওয়ালে একটা কেরোসিনের দেওয়ালগিরি ল্যাম্প জ্বল্‌ছে, আলোটা একটু কমান। আমি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে, খবরের কাগজের মোড়াটা খুলে, রুমালখানা বা'র কর্‌লাম।

ধীরে, ধীরে, অতি সন্তর্পণে ঘরের ভিতরে গিয়ে, পরিচারিকার বিছানার পাশে দাঁড়ালাম। একখানা ছোট তক্তপোষের উপর একখানা চাদর-ঢাকা তোষকের বিছানায়, একটা চেপ্টা বালিসের উপর মাথা রেখে, দরজার দিকে পেছন করে স্ত্রীলোকটা ঘুমোচ্চে। ডানহাতখানা মাথার বালিসের উপর ন্যস্ত, আর বামহাতখানা ও বাম পাটা পাশের বালিসের উপর রক্ষিত।

আমি কালবিলম্ব না ক'রে, রুমালখানা দিয়ে তা'র নাক আর মুখটা চেপে ধর্‌লুম।—একবার যেন শিউরে উঠ্‌লো,—তা'র পর নিস্পন্দ, অসাড়। রুমালখানা পকেটে রেখে তা'র নাড়ী দেখ্‌লাম,—অত্যন্ত নিস্তেজ;—হৃদ্‌পিণ্ডের সংক্কোচ ও বিক্ষোভ অতি তেজহীন;—রুমালটা সরিয়ে নাকের কাছে হাত দিয়ে দেখ্‌লাম,—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অতি ধীরে ধীরে প্রবাহিত। একবার ঠেলা দিলাম,—জেগে উঠ্‌ল না,—ক্লোরোফর্ম্মের কাজ আরম্ভ হয়েছে;—যে রকম অবস্থা তা'তে এর বড় শীগ্‌গির যে চৈতন্য হবে, তা' বোধ হয় না। আমি আমার আটোম্যাটিক ল্যাম্প্‌টা জ্বেলে একবার তা'র চোখ্‌টা পরীক্ষা করে দেখলাম,—ক্লোরোফর্ম্ম কাজ করেছে—চোখের তারা অত্যন্ত সঙ্কুচিত; ঔষধ ত আর নিমক্‌হারাম হয় না!

আমি উঠে কেরোসিনের আলোটা নিভিয়ে, বারেণ্ডায় এসে, আমার অটোম্যাটিক ল্যাম্প্‌টার সুইচ বন্ধ করে দিলাম। অন্ধকার বটে, কিন্তু এ আমার পরিচিত বাড়ী, আলোর বিশেষ আবশ্যক নেই। এখন আমার আসল কাজটা হাসিল কর্‌তে হ'বে।

(৩)

আজ রাত্রিটা বেশ একটু নিস্তব্ধ,—বড় বেশী গোল্‌মাল নেই। এক আধটা দূরাগত শব্দ শোনা যাচ্চে বটে, কিন্তু তা'তে এই নৈশ নীরবতা যেন একটু ঘনীভূত ও গম্ভীরতর হয়ে উঠ্‌ছে। নিশীথিনীর ধ্যানভঙ্গের দু'-একটা আয়োজন হচ্ছে বটে, কিন্তু সে নিস্ফল উদ্যম। একটা মূর্ত্তিমান্‌, মূক, শব্দহীন স্তব্ধতা যেন নিবিড় আলিঙ্গনে জগৎকে বদ্ধ ক'রে তা'র রক্তিম ওষ্ঠপুট একটী সস্নেহ স্নিগ্ধ চুম্বনে নীরব ক'রে দিয়েছে।

একটা মাতাল রাস্তা দিয়ে জড়িত স্বরে কি একটা গান গেয়ে গেল। একখানা গাড়ী ঘরের সার্সী খড়্‌খড়ি কাঁপিয়ে চলে গেল; ক্রমে তা'র শব্দ ক্ষীণ, ক্ষীণতর, ক্ষীণতম হয়ে গেল, তার পর আবার সেই নিস্তব্ধতা; কেবল স্নান কর্‌বার ঘরে ওই ফোঁটা ফোঁটা জলের শব্দ—টুপ্,—টুপ্,—টুপ্,—নিশীথিনীর অস্ফুটক্রন্দনের মত, অন্ধকারকে অধীর ক'রে তুলেছে।

আর ওই একটা শব্দ—ওই অবিরাম ধুক্, ধুক্, ধুক্,—আমার এই বুকের ঘড়িটা আমার যৌবনের বিষাদ্‌ময় ঘণ্টাগুলির মিনিট ও সেকেণ্ড মেপে চলেছে।—কবে এ ঘড়ি বন্ধ হ'য়ে যা'বে!—কে জানে!—কিন্তু আজ এত শব্দ কেন?—বুক্‌টা চেপে ধর্‌লে কি শব্দটা কমে? —কই কম্‌ল না ত!—এত শব্দে যদি উঠে পড়ে!—নিঃশ্বাসের এত জোর কেন?—নাক্‌টা একটু চেপে ধরি।—এখন আর দেরী করা হ'বে না; এমন সুবিধা পেয়ে যেন আজ না হারাই।

* * * *

আর এই সেদিন,—এখনও বোধ হয় এক বৎসর হয়নি,—কি নেশায় আমাকে সে মাতিয়ে রেখেছিল! মনে কর্‌তুম, ওই রূপ বুঝি সকল সৌন্দর্য্য-রাশি মন্থন করে সৃষ্ট হয়েছে;—মনে হ'ত, যেন সে সকল কমনীয়তার, সকল মাধুর্য্যের, সকল প্রীতির চরম পরিণতি;—মনে হ'ত, যেন তা'তে আছে কেবল নির্ম্মল জ্যোৎস্নার বিমল উৎসব, বৃষ্টিধৌত যূথিকার স্নিগ্ধশুভ্রতা, পেলব রজনী-গন্ধার স্বর্গীয় সৌরভ। যে সৌন্দর্য্যের নেশায় আপনাকে ভুলেছিলাম, যে মুখখানি এই পৃথিবীতে আমার স্বর্গ রচনা করেছিল, এখনও ত তা' ঠিক তেম্‌নি আছে,—তবে এখন স্বপ্নরাজ্য বিলীন হ'য়ে গেছে, অমৃত শুকিয়ে গেছে, স্বর্গের ছায়ার অন্তরালে নরকের করাল মূর্ত্তি দেখা দিয়েছে।—নেশা এখন ছুটে গেছে, এখন বাস্তব জগতে এসে পড়েছি;—এত দিনে বুঝ্‌তে পেরেছি যে দেখ্‌তে যা' সুন্দর, তা'র ভিতরটা ঠিক বিপরীত।—কিন্তু এটা যদি একবার দিন-কতক আগে বুঝ্‌তাম!—যদি বুঝ্‌তাম যে সৌন্দর্য্য যা' তা' কেবল চোখের নেশা, একটা মোহ, একটা স্বপ্নমাত্র, তা' হলে বোধ হয়, আজ এত বড় ভয়ানক কাজে অগ্রসর হ'বার আবশ্যক হ'ত না।

কিন্তু এখনও কি এ কাজ কর্‌বার কিছু আবশ্যক হয়েছে!—যদি নেশা ছুটে গিয়ে থাকে, যদি আপনাকে এত দিন পরে আজ খুঁজে পেয়ে থাকি, যদি মরীচিকাকে মরীচিকা ব'লে বুঝ্‌তে পেরে তা'র দিকে ছুটে যাওয়া থেকে

বিরত হ'য়ে থাকি, তবে ত সব মিটে গেছে, এ কাজ কর্‌বার ত তা' হ'লে আর আবশ্যক নেই,—ফিরে যাই।

তা' কি আর এখন হ'তে পারে?—তা' হ'লে আর আমার প্রতিশোধ লওয়া কি হ'ল?—কিসের প্রতিশোধ?—সে আর আমায় চায় না,—আমাকে ভালবাস্‌তে, এমন কি তা'র চেষ্টা কর্‌তেও সে একেবারে অক্ষম;—তা' সেটা যদি এখন তা'র ক্ষমতার বহির্ভূত হয়েই পড়ে থাকে, তা'র জন্য আবার প্রতিশোধ কি?

প্রতিশোধ নিতে হ'বে বই কি।—মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য এক-একবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে যাই।—প্রতিশোধ কিসের?—আমাকে উপেক্ষা করার প্রতিশোধ;—আমি তা'কে যে ভালবাসার ডালা সাজিয়ে উপহার দিয়েছিলেম সে তা'তে অবজ্ঞাভরে পদাঘাত করেছে। আমি যে তা'কে প্রাণের চেয়েও ভালবাসতাম সেটা যেন সে মোটেই বুঝ্‌তে চাইত না।—তা'কে ত আমি সাধারণ অবস্থায় রাখিনি!—তাকে আমি আমার সংসারের অবলম্বন ব'লে জান্‌তাম;—তা'কে কেন্দ্র ক'রে, আমার উচ্ছৃঙ্খল হৃদয়ের উন্মত্ত বৃত্তিগুলিকে শাসনের গণ্ডী দিয়ে আবদ্ধ করেছিলাম।—সেই এক দিন, যে দিন সে সমাজ, লজ্জা, ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে আমার সঙ্গে চলে এসেছিল। সে দিন আমি মনে করেছিলাম যে, এতটা ত্যাগ বুঝি আমার প্রেমের প্রতিদান। কিন্তু সেটা আমার কি ভ্রম! ও যে আমাকে অবলম্বন ক'রে, একটা বড় রকম রূপের ব্যবসা ফেঁদে বস্‌ল, তা' আমার তখন চিন্তা কর্‌বার অবসর হ'ল না, মানব-হৃদয় যে সকল সময়ে ভাবের বশবর্ত্তী নয়, এ কথাটা আর তখন আমার মস্তিষ্কে প্রবেশ কর্‌ল না।—তা'র পর আমায় সে প্রবঞ্চনা কর্‌তে আরম্ভ কর্‌ল,—অর্থের আশায় আমাকে ছাড়্‌তেও পারে না, অথচ অতৃপ্ত লালসায়, আমার অনুপস্থিতির সুযোগে, নিত্য নূতন বিনোদলীলা হ'তে লাগ্‌ল। যেদিন আমি সব জান্‌তে পার্‌লাম, সব বুঝ্‌তে পার্‌লাম,—ওঃ—সে দিন আমি পাগলের মত হয়ে গেলাম, মন শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়্‌ল, বুক ভেঙ্গে গেল।

কিন্তু আজ তার প্রতিশোধ। আজ আমার বিচ্ছিন্ন মনের টুক্‌রোগুলিকে একত্র ক'রে জোড়া লাগাতে হ'বে, প্রাণের উপর তালি দিতে হ'বে, ভগ্ন দুর্গপ্রাকারের সংস্কার কর্‌তে হ'বে; প্রতিশোধের সুধা সিঞ্চন ক'রে মৃতকে সঞ্জীবিত কর্‌তে হ'বে।—তবে, আমার পুনরুত্থানে আর এক জনের পতন;

এ ত প্রকৃতির নিয়ম;—এক দিকে যে পরিমাণে সঞ্চয়, অপর দিকে ঠিক সেই পরিমাণে অপচয়।

(৪)

ধীরে ধীরে তা'র শোবার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেম—এখনও কি জেগে আছে?—না, ওই যে বেশ নিশ্চিন্তভাবে ঘুমোচ্চে!—কিন্তু কেমন করে যাই?—পায়ের শব্দে যদি উঠে পড়ে!—আবার দেরী কর্‌লেও বিপদের আশঙ্কা,—যদি বা'র থেকে আর কেউ এসে পড়ে!—আজ ওঁর প্রিয়জনের আস্‌বার বিষয়ে এক রকম নিশ্চিন্ত,—বাছাধন মধুপানে প্রমত্ত হ'য়ে রাস্তায় শয্যারচনা করেছিলেন, তার পর তাঁ'র ভাই দেখ্‌তে পেয়ে, তাঁ'কে গাড়ী করে বাড়ীতে নিয়ে গেছে।—কিন্তু এ কি এক জনের উপর নির্ভর করেই আছে?—এত দূর একনিষ্ঠা কবে থেকে হ'ল?—না, আর দেরী করা হ'বে না।

আর একটু অগ্রসর হ'য়ে তা'র বিছানার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালেম্। সেই পুরাতন পরিচিত ঘর; দেওয়ালের ছবিগুলি ঠিক তেম্‌নি ভাবে ঝুলান আছে; জানালার স্ক্রীনগুলো একটু ময়লা হয়ে, একটা বহু পুরাতন বিলাস-স্মৃতির পতাকার মত নিদাঘ নৈশসমীরণে সঞ্চালিত হচ্চে; আলমারি, দেরাজগুলো তা'দের পুরাতন স্থানে দাঁড়িয়ে বিগত প্রেমবৈভবের সাক্ষ্য দিচ্ছে; ঘরের দেওয়ালগিরিগুলো, কত বিচিত্র বর্ণের ফানুস কাঁধে ক'রে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে,—ঠিক পূর্ব্বেকার মত, তবে যেন একটু নিষ্প্রভ হ'য়ে গেছে। ঘরের মেঝেয় ঠিক তেমনিই গালিচা পাতা আছে।—এসব ত আমিই এনে দিয়েছিলাম; আমার জীবনের একটা পরিচ্ছেদ এদের সঙ্গে গাঁথা আছে, আমার জীবন-নাটকের একটা অঙ্ক এইখানেই অভিনীত হ'য়েছিল। আল্‌মারি চার্‌টেতে ঠিক আগেকার মত কাচের ও চিনেমাটির পুতুল সাজান আছে। জানালাগুলো সব খোলা। এক দিকে একটা নিঃশেষ-বাতি-দেওয়ালগিরি, তার নির্ব্বাণোন্মুখ কম্পিত আলোকে, মানবজীবনের অনিশ্চয়তা ও নশ্বরতার চিত্ররচনার প্রয়াস পাচ্ছে। আর,—তা'র পর,—সেই খাট, সেই শয্যা, সব সেই। মশারিটা ঠিক পূর্ব্বের মতই উপরে তোলা আছে,—সব ঠিক যেমন ছিল তেমনি আছে,—ঘরের কোণের টেবিলখানিও তার পুরাতন স্থান পরিত্যাগ করেনি। পরিবর্ত্তন যেন এ ঘরের কোনও জিনিষকে ছুঁতে সাহস পায় নি।

খাটের উপর দরজার দিকে মুখ ফিরিয়ে, বাঁ পাশ ফিরে বিজয়া শুয়ে আছে।

বাতির আবিল আলো তা'র কুসুমসুন্দর মুখখানির উপর যেন মৃত্যুর ম্লান ছায়া রচনা করেছে। সেই শ্বাসকম্পিত প্রস্ফুটসৌন্দর্য্য ছায়ালোকের সন্নিপাতে, কোনও স্বপ্নপুরের সুপ্তা রাজকুমারীর চিত্রের ন্যায় উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। গায়ের কাপড় অসম্বৃতভাবে বিছানায় পড়ে আছে। কোমল পরিষ্কার শয্যা দেহলতার ভারে চারিদিকে একটু নেমে গেছে, বোধ হচ্ছে যেন একটা সাদা ফ্রেমে একখানি ছবি কে এঁটে রেখে দিয়েছে। কবরী শিথিল হয়ে গেছে; চুলগুলি কতক কাঁধের কাছে, কতক বা বিস্তৃত বাঁ হাতের উপর ছড়িয়ে পড়েছে। ডান হাতখানি বুকের উপর দিয়ে মাথার বালিসে রেখেছে, তা'তে ডানদিক্‌কার নিটোল রক্তাভ বক্ষস্থল একটু প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে। দক্ষিণদিকের ভ্রূর অর্দ্ধেকটা চূর্ণকুন্তলরাশি দ্বারা আবৃত হয়ে আছে। ঠোঁট দু'খানি একটু পৃথক হ'য়ে সম্মুখের মুক্তা ক'টি ঈষৎ প্রকাশিত কর্‌ছে; যেন কোনও সুদূরআনন্দস্মৃতি রক্তিম দু'খানি ঠোঁটে একটা মুগ্ধ অপার্থিব হাসির রেখা টেনে দিয়েছে। আমার একটা মোহ এসে জুট্‌ল। কি সুন্দর!—কি মধুর!—এ রূপরাশি কখনও কি রেমব্রান্ত বা গুইদোর চিত্রে দেখেছি?—কই মনে ত হয় না!

কিন্তু এখন আর এখানে দাঁড়িয়ে সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্‌বার ত সময় নয়,—কাজ হাসিল কর্‌তে হ'বে;—এই অতুল রূপ নিয়ে সে ব্যবসা আরম্ভ করেছে; মানব-হৃদয়ের কোমল ভাবগুলি নিয়ে সে কন্দুক ক্রীড়া কর্‌ছে; সমাজের উপকারের জন্য, আত্মোদ্ধারের জন্য, আজ একে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হ'বে।

কিন্তু তা'র পূর্ব্বে একটী চুম্বন ওই দু'টী ঠোঁটের উপর মুদ্রিত কর্‌ব না? এ গোলাপ আমিই তুলে এনে এত যত্নে রেখেছিলাম, আজ তাকে ফেলে দেবার পূর্ব্বে তার স্নিগ্ধ সৌরভ একবার উপভোগ কর্‌ব না?

না; হৃদয়কে বিশ্বাস নেই;—পিশাচীর মুগ্ধ সৌন্দর্য্যে আর ভুল্‌ব না;—আর দেরী করা হ'বে না।

ছোরাখানা পকেট থেকে বা'র করে একবার ধারটা পরীক্ষা কর্‌লুম,—হাঁ ঠিক আছে,—সেটাকে মুড়ে আবার পকেটে রাখলাম। অতি ধীরে ও সন্তর্পণে পকেট থেকে রুমালখানা বা'র কর্‌লাম; ক্লোরোফর্মের শিশির ছিপি খুলে, আরও ফোঁটা চারেক তাতে ঢেলে, আবার শিশিটা বন্ধ করে পকেটে রাখ্‌লাম। তার পর আর আপনাকে চিন্তা করবার অবসর দিলাম না;

রুমালখানা দিয়ে তা'র নাক আর মুখ চেপে ধর্‌লাম। একবার যেন শিউরে উঠে চোকটা খুল্‌লে, তা'র পর আবার নেত্র নিমীলিত হ'য়ে এল, জ্ঞান লুপ্ত হ'ল।—বিশেষ ক'রে তা'কে পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌লাম, অনেক ঠেলাঠেলি কর্‌লাম, চুল ধ'রে টান্‌লাম, জোরে চিম্‌টী কাটলাম,—কিছুতেই তা'র চৈতন্য হ'ল না।

রুমালখানা ভাল করে কাগজটায় মুড়ে আবার পকেটে পূর্‌লাম। ছোরাখানাকে পকেট থেকে বা'র ক'রে খুলে বিছানায় রাখলাম। তা'র বিছানার চাদর আর বিছানায় পাতা পাতলা তোষকটা দিয়ে তা'কে ভাল ক'রে আবৃত কর্‌লাম,—যেন রক্তটা ছিটকে আমার গায়ে লাগ্‌তে না পারে। আল্‌না থেকে থান তিনেক কাপড় নিয়ে, তা'র গলার চারিদিকে বেশ পুরু করে একটা বেড় দিলাম,—রক্তটা যেন তা'তে শোষণ করে নেয়। তা'র সমস্ত দেহটা এক রকম ঢাকা পড়্‌ল; কেবল গলাটায় একটু ফাঁক রেখে দিলাম। আমার মাথার চাদরটা খুলে, ধোপার দাগ দেওয়া অংশগুলো কেটে একটা দিয়াশলাই জ্বেলে পুড়িয়ে ফেল্‌লাম; তা'র পর সেই চাদরখানা দিয়ে তা'র মুখের কতকটা অনাবৃত অংশ ঢেকে দিলাম। উড়ানিখানা তা'র মুখে চাপা দেবার পূর্ব্বে বেশ করে পরীক্ষা ক'রে দেখে নিলাম যেন তা' সনাক্ত হ'বার উপায় না থাকে।

আহা! কেন এমন কাজ কর্‌তে যাচ্চি?—না, না, আর না, আর দেরী করা হ'বে না। হৃদয়কে আর বিশ্বাস কর্‌ব না, আর মনকে ভা'ব্‌বার অবসর দেব না, তা' হ'লে লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'ব। ছোরাখানা জোর ক'রে ডান হাতে ধ'রে নীচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে চেপে, আমার সমস্ত দেহের বল হাতের কব্জীতে সঞ্চারিত ক'রে, বাঁ হাতে তার মাথাটা ঠিক ক'রে চেপে ধ'রে, একটা অমানুষিক উত্তেজনায় আমার সেই পৈশাচিক অস্ত্রটা তার গলার উপর উপর দিয়ে টেনে দিলাম, কিছুদূর এসে হাড়ে ঠেক্‌ল, একটু জোরে চাপ দিতেই ছোরাখানা নেমে গিয়ে বিছানা স্পর্শ কর্‌ল; হাতের চাপে মাথাটা গড়িয়ে বালিসের উপর সরে গেল। আমি বুঝতে পার্‌লাম যে, মাথাটা দেহ থেকে পৃথক হ'য়ে গেছে। একটা বিষম বিক্ষেপে সমস্ত দেহটা আলোড়িত হ'ল, বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত একবার শিউরে উঠ্‌ল, তা'র পর আবার সব স্থির, নিশ্চল, নিস্পন্দ, পাথরের মত কঠিন।

তা'কে সম্পূর্ণরূপে আবৃত করাতে রক্তটা ছিট্‌কে আমার কাপড় চোপড়ে লাগেনি।—হাতে একটু লেগেছে না?—হাতটা ধুতে হ'বে।—

এখন হাত ধুয়ে আর কাজ নেই;—যদি কেউ এসে পড়ে!—যদি ধরা পড়ি!—এখন আর এখানে অপেক্ষা করা সুবিধা বলে বোধ হচ্চে না।—কিন্তু হাত দু'টোতে রক্ত মেখে কলিকাতার রাস্তা দিয়ে চলা বড় নিরাপদ?—না, হাতটা ধুয়েই যেতে হ'বে।—সদরের দরজা ত বন্ধ আছে। সহজে বা অতর্কিত ভাবে কেউ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করতে পারবে না। আমি হাতটা ধুয়ে, সাধারণ লোকের মত অনায়াসে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে, অবাধে রাস্তা দিয়ে চলে যেতে পারব। সব দিক ভেবে চলা এখন বিশেষ দরকার।

ছোরাখানা বিছানার ঘষে মুছে মুড়ে ফেললাম। রুমালখানা পকেট থেকে বা'র ক'রে ঘরের বাইরে বারেণ্ডায় এসে দিয়েশালাই জেলে পুড়িয়ে ফেললাম। স্নান করবার ঘরে গিয়ে আমার অটোম্যাটিক ল্যাম্প্‌টা জাললাম। কলে আমার হাত দুটি আর ছোরাখানা অতি সযত্নে পরিষ্কার ক'রে ধুলাম। তা'র পর কলটা বন্ধ ক'রে, বারণ্ডায় এসে, রেলিং থেকে তোয়ালেখানা নিয়ে ভাল ক'রে মুছে ফেললাম; আর ছোরাখানা মুড়ে পকেটে রাখলাম।

(ক্রমশঃ)

সাহিত্য-চিন্তা।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়]

লেখা ও লেখক।

'লেখা না লেখা—লিখিলেই হইল।' কিন্তু লিখিলেই লেখা হয় না; যেমন কেবল কতকগুলা আওয়াজ করিলেই কথা কহা হয় না; কেবল মুখ নাড়িলেই আহার করা হয় না। কেহ লিখেন, কেহ বা কালির আঁচড় পাড়িয়া লেখা ও লেখকের মুখে কলঙ্ক লেপেন। কালির আঁচড় পাড়া লেখা নয়; পরের উচ্ছিষ্ট অজীর্ণ অবস্থায় উদ্গার করাকেও লেখা বলা যায় না। চিন্তা-বিহীন চর্ব্বিত চর্ব্বণে দন্তের কিছু কিছু কসরত-কসরত হয় বটে; কিন্তু চিত্তের সহিত তাহার কোনও পুরুষে চেনা-শোনা বা দেখা-সাক্ষাৎ হয় না; সুতরাং তাহা লেখা নয়; কেন না বাক্যের ভিতর দিয়া চিন্তার চলা-ফেরা করানর

নামই লেখা। বাক্যযোজনা বাঁধারাস্তা-বিশেষ। রাস্তাটী ভাল বাঁধান হইলে, পাকা পোক্ত পরিষ্কার প্লেন হইলে, সুশ্রী ছায়ালোকময় ও সুন্দর হইলেই সে রাস্তা দিয়া, "রাহী"দের চলা-ফেরা সুসম্পন্ন হয়; সর্ব্বদাই সে রাস্তা দিয়া লোকে চলিতে চায়। মনুষ্য-রাহীরা একই রাস্তায় চিরকাল চলে,—তাহাদের জন্ত একবার কতকগুলি রাস্তা বানাইয়া ও বাঁধাইয়া মধ্যে মধ্যে মেরামত করিয়া দিলেই চলে। কিন্তু চিন্তারূপী রাহীদিগের রুচি বড়ই চিক্কণ; তাঁহারা এক রাস্তা একবারের বেশী দুইবার চলিতে চাহেন না; নূতন চিন্তা নিত্য নূতন রাস্তা চাহেন; পুরাতন চিন্তাও চাহেন প্রতিবারে নূতন রাস্তা; উভয়ের কেহই পুরাতন পথে পা বাড়াইতে রাজি হন না। চিন্তার চলাচলের জন্য ফি হাত নূতন, প্রশস্ত, পরিষ্কার ও পাকা রাস্তা প্রস্তুত করিতে সুনিপুণ ইঞ্জিনিয়ারেই পারেন; আনাড়ি মিস্ত্রী বা কুলি-মজুরে পারে না। তাহারা বড় জোর দু-কোদাল মাটি কাটিয়া একটা "আলি" বাঁধিয়া দিতে পারে; তাহার বেশী আর কিছুই পারে না। কোদালের কোপে ইষ্টক-প্রস্তরে বাঁধা রাস্তা বানাইতে আগে তাহা কলমের আগায় আঁকিতে হয়; নহিলে সরল সুপ্রশস্ত ও সুন্দর পথ হয় না। অতএব চিন্তা-চলাচলের জন্য যে রাস্তা,সে রাস্তা বাঁধিতে কেবল মন ও কলমের কাজ। যাহার সহিত কোদাল, কাস্তে, কর্ণিক ও সাবলের কোনও সম্বন্ধই নাই, ভাল হউক, মন্দ হউক, পাকা আর কাঁচা হউক, কুলি-মজুরে তাহা কিছুতেই তৈয়ার করিতে পারে না। কিন্তু কালের এমনি কুটিল গতি যে, কুলি-মজুরও কোদালের পরিবর্ত্তে সটান কলম ধরিয়াছে; কলমে কালির আঁচড় পাড়িয়া আঁচড়াইতে আসে। কুলি কোদাল ছাড়িয়া কর্ণিক ধরিলে আঁকা বাঁকা ইট বসাইয়া কোনও গতিকে কাদার গাঁথনি কিছু কিছু গাঁথিলেও গাঁথিতে পারে; কিন্তু যে লেখক কোদাল ছাড়িয়াই কলম ধরিয়াছে, অথবা কলমের পরিবর্ত্তে যাহাদের কোদাল, কাস্তে বা কাটারির কাজ করাই উচিত ছিল, তাহাদের লেখা অলেখা থাকিলেই বিশ্বসংসারের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের বিশেষ উপকার হইত। কাঁচা কণ্টকাকীর্ণ কর্দ্দমময় দুর্গম রাস্তা দিয়া কেহই চলিতে চাহে না; বরং বহু দূর ঘুরিয়া গম্য স্থানে যায়; চিত্তস্থিতা চিন্তা ঠাকুরাণীরা এরূপ রাস্তার রাহী হইতে চাহিবেন কেন? জোর করিয়া গলায় গামছা দিয়া টানিয়া আনিয়া এমনতর পথে তুলিয়া দিলেও কোন্ তাঁরা চলিতে পারেন? প্রতি পদক্ষেপে পা টলে, গা কাঁপে, দুই পা না চলিতেই চিন্তা চিৎপাত হইয়া পড়েন;

অগ্রে পশ্চাতে আছাড় খান ; আড়ষ্ট ও জড়সড় হইয়া কোনও দিকেই নড়িতে চড়িতে পারেন না ; খানিক ক্ষণ কোস্তাকুস্তী করার পর ক্রমে নির্জীব হইয়া পথের মধ্যেই মারা পড়েন ; লোকের চিত্তস্পর্শ করা ত পরের কথা, চিত্তের চারি চৌহদ্দি পর্য্যন্ত পৌঁছিতেই পারেন না।

বাক্য-যোজনা রচনা বা চিন্তা-চলাচলের বাঁধা রাস্তা, বাহক বা বেহারা। কাঁচাই হউক আর পাকাই হউক, রাহী না চলিলে রাস্তা নিরর্থক।—বাহন-হীন যান বৃথা, রস-বিহীন রচনা কেবল বিদ্রূপেরই উদ্রেক করে। অমর-কোষ হইতেই আমদানি কর, আর শব্দকল্পদ্রুম ছাঁকিয়াই শব্দ বসাও,—আওয়াজের সঙ্গে তোমার আক্কেল অন্ততঃ দু'চারি বুঁদ না মিশাইতে পারিলে লেখা হইবে না। লেখায় বাক্যযোজনা সবিশেষ আবশ্যক বটে; কিন্তু কতকগুলা অভ্যস্ত বাঁধি বোল্ যখন তখন সাদায়-কালায় একত্র করাকে লেখা বলা যায় না। ছাপাখানায় নিযুক্ত নিয়মিত কাপী-লেখকদিগকে এরূপ লেখা এক নিঃশ্বাসে অনেক সময়েই পাঁচ সাত কলম করিয়া লিখিতে হয়; কিন্তু এরূপ লেখা লিখিয়া কিছুমাত্র লিখিলাম বলিয়া মনে করা অন্যায়; তাহা আত্ম-গৌরব নহে, ঘোরতর আত্মাবমাননা বা আত্ম-বঞ্চনা। যেহেতু ইহা অপেক্ষা মুদ্রাকরের মেহনতেরও বরং মূল্য বেশী।

বাক্যের সহিত অর্থ অবশ্যই বাঁধা আছে। কিন্তু অর্থযুক্ত বাক্য বাছিয়া ব্যবহার করা বড় কঠিন। তাহা অপেক্ষা আরও কঠিন,—বাক্যের অঙ্গে আপনার চিন্তাটুকুকে বাঁধিয়া দেওয়া। অর্থযুক্ত বাক্য বাছিয়া তাহার সহিত অন্ততঃ চলন-সই একটা চিন্তাকে বাঁধিয়া দিতে পারিলেও ভাল না হউক, মন্দ রকমেরও একটা লেখা হয়। কিন্তু এ লেখাও যতটা সহজ বলিয়া লোকে মনে করে, ফলতঃ কাজটা তত সোজা নয়। কাজটা সহজ যে নয়, তাহা নিয়মিত লেখকমাত্রেই অবগত আছেন। লিখিব মনে করিলেই লেখা হয় না; লেখ বলিলেই লেখা যায় না। এরূপ লেখা কলম পেশা কোদাল পাড়ারই মধ্যে। কোদাল পাড়িলেই পড়ে, কিন্তু কলম চালাইলেই চলে না। শরীরটা যন্ত্র বটে, কিন্তু মনটা এঞ্জিন নয়। আদেশমাত্রই 'আইডিয়া' 'উপজে' না। রেডিমেড জুতা, পোষাক সব জিনিসপত্র পাই বলিয়া রেডিমেড মনোভাব যে অর্ডার মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইবে, এমন প্রত্যাশা করিতে পারি না। মনোভাবের ন্যায় মনোভাব-প্রকাশ-সমর্থ প্রকৃত প্রস্তাবে প্রকাশ-ক্ষম অর্থযুক্ত বাক্যও তুমি বিদ্বান বলিয়া যে তোমার

ব্যবহারের জন্ত চব্বিশ ঘণ্টা গরজ করিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকিবে; সরস্বতী এমন কিছু সর্ত্তও তোমার সহিত করেন নাই যে, হুকুমমাত্রই "হুজুর" বলিয়া আসিয়া হাজির হইবে। তবে এখন নাকি অনেকেরই কলমের মোচে ও জিহ্বার আগায় সরস্বতী সর্ব্বদাই মূর্ত্তিমতী, তাই লিখিবার কিছুই না থাকিলেও লেখক লেখে, বলিবার কিছুই না থাকিলেও বক্তা বক্তৃতা করিতে উঠে! এ বিড়ম্বনা, এ বেহায়াপনা এদেশে ইংরেজী বিদ্যার বীভৎস বিস্তারেই আসিয়া জুটিয়াছে।

দিন দিন এ বিড়ম্বনা বাড়িয়া চলিয়াছে। এখনকার লেখক ও বক্তা-দিগের ধৃষ্টতা ও অজ্ঞতা দেখিয়া বস্তুতই অবাক হইতে হয়। লজ্জা বলিয়া একটা বস্তু, ইহাদের আদৌ নাই। ইহারা আত্মাভিমানে আপাদমস্তকপূর্ণ; কিন্তু আত্মসম্ভ্রমজ্ঞান-বিবর্জ্জিত। ইহাদের কথা বলিতে বসাই বৃথা কর্ম্ম-ভোগ। ইহারা সমালোচনা ও সদুপদেশের অতীত।

পাঠ ও পাঠক।

দেবীবর ঘটক কুলীন-সম্প্রদায়ের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মেল বাঁধিয়াছিলেন। কোনও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত-সাহেব, পাঠক-সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক মেল বাঁধিয়া গিয়াছেন। কুলীনকুলের কৌলীন্যানুসারে দেবীবর ঘটক তাঁহাদের মেল বাঁধিয়া দিয়াছিলেন; পাঠককুলের পাঠের প্রকৃতি-অনুসারে পণ্ডিত তাঁহাদের 'থাক' স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন। ইনি অদ্বিতীয় দেবীবর ঘটক।

থাকবন্দির এই দ্বিতীয় দেবীবর,—ইংরেজ কবি কোলরিজ। ইঁহার বিবেচনায় বা বিধানে পাঠক-সাধারণ প্রধান চারি মেলে বিভক্ত। তাহার উপর আরও অনেক মেল আছে, কিন্তু সে সব মেলের পাঠকেরা ছোট কুলীন।

দেবীবরের বাঁধন অনুসারে কুলীনদের প্রধান চারি মেল,—ফুলে, খড়দহ, সর্ব্বানন্দী, বল্লভী। কুলীনদের এই প্রধান চারি মেলের মত, পাঠকদেরও চারিটা প্রধান 'থাক'। প্রথম থাক "বালি-ঘড়ি"; দ্বিতীয়,—স্পঞ্জ; তৃতীয়,—জেলী; চতুর্থ,—রাজহাঁস। পাঠকদের প্রধান চারি মেল হইল এই কয়টা; ইহার উপর ভ্রমরা মেল, প্রজাপতি মেল প্রভৃতি আরও অনেক আছে।

'বালি-ঘড়ি' মেলের পাঠকদের পড়া শুনা, বালি-ঘড়ির বালুকারাশির মত। বালুকা উড়িয়া দৌড়িয়া চলে, কিন্তু পশ্চাতে কিছুমাত্র চিহ্ন রাখিয়া যায় না।

কাগজপত্র, কেতাব, কোরাণ, শ্লোকশাস্ত্র, পাঠক কত পড়াই পড়িতেছেন, পুস্তকের পর পুস্তক সার হইয়া যাইতেছে। একত্র পাঁচ সাত খানা করিয়া পুস্তকও পাঠক পেটে পুরিতেছেন;—লাইব্রেরিকে লাইব্রেরি কাবার! কিন্তু, ঐ পর্য্যন্তই!

এ মেলের পাঠকের পড়াই মাত্র সার; পুস্তকের পাতা উল্‌টান পর্য্যন্তই সম্বন্ধ; পরক্ষণে তাহার কিছুমাত্র সম্বন্ধ থাকে না;—পুস্তকের পাতা উল্‌টানের সঙ্গে সঙ্গে, যুগপৎ পাঠও ওলোট-পালট হয়;—পেটে কিছু যায় না, থাকেও না। চিনির বলদ চিনি বয়, কিন্তু চিনির আস্বাদ পায় না। বিদ্যার বলদ পঞ্চানন বিদ্যার বোঝা বহন করেন, কিন্তু তাহা আস্বাদনে আদৌ বঞ্চিত। বলদ মেলের পণ্ডিত বা পাঠক কেবল বহনই করেন। কিন্তু বালুকা মেলের পাঠকেরা বহনও করেন না; তাঁহারা শূন্যের উপরে, কেবল সন্তরণই দেন। সন্তরণের সীমা-মুড়া নাই; কিন্তু কেবল সন্তরণই সার, তাহার সার্থকতা কিছুই আদায় হয় না, এপার ওপার কোনও পারেই পাড়ি জমে না।

স্পঞ্জী মেলের পাঠক স্পঞ্জের মত। জলীয় পদার্থ যাহাই দাও, আর যতই দাও, স্পঞ্জ তাহার ছিদ্রে ছিদ্রে, পরতে পরতে তাহা গ্রহণ ও ধারণ করে; স্পঞ্জ নিঙড়াইলে কিন্তু আবার তাহাই ঠিক "বজনিস্" পড়ে, একটুকুও এদিক ওদিক হয় না; স্পঞ্জ-পরিধৃত ও প্রত্যর্পিত পদার্থের প্রায়ই কোনও পরিবর্ত্তন ঘটে না। স্পঞ্জী মেলের পাঠক যাহা কিছু পড়ুন না, তাহা স্পঞ্জের মত অবিকল উদ্গার করিয়া দেন।—একটুও এদিক ওদিক হয় না; যেমনটী পড়িয়াছিলেন, ঠিক তেমনটীই উগরাইয়া দিলেন,—পাঠক ত নয়, যেন তোতা পাখীটি! পাখীকে যাহা পড়াও তাহাই পড়ে, যাহা বলাও তাহাই বলে; কিন্তু কি যে পড়ে আর কি যে বলে, তাহা বড় বোঝে না; পাঠ পড়িতে আর পুনরুক্তি করিতেই তাহারা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পেশো ছেলে' স্পঞ্জী পাঠক। ইউনির্ভাসিটীতে আজকাল এই মেলের লোকই অধিক। 'ভাত খাই, কাঁশি বাজাই, রগড়ের ধার ধারি না।' পাঠ ঠোঁট দিয়া যায়, ঠোঁট দিয়া আসে; মনে বা মস্তিষ্কে কোথায়ও তাহা ঠেকে না; অতএব নিজের নিজস্ব কিছুই তাহাতে অঙ্কিত হয় না। এই শ্রেণীর পাঠকের গঠন ও লিখন চঞ্চুপুট-গত,—চিন্তার সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই! মাষ্টার মহাশয় নিজে যেমন পড়িয়াছেন, Veda is a book; ভিলেজ স্কুলের বালককেও বজনিস তেমনি উগরাইয়া পাঠ দিলেন, "ভেদা হয় এক বই।"

বার্ণাকুলার সম্পাদকরূপ স্পঞ্জ হইতে বিলাতি প্রবন্ধ ও প্যারারূপ পীযূষ নিঙ্গড়াইয়া এদেশীয় অনেক সংবাদপত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। বার্ণাকুলার সম্পাদক বিলাতি স্পঞ্জ। সাহেবী স্বেদ-সলিলাদি অনেক সামগ্রীই ইনি ধারণ ও উদ্গীরণ করিয়া থাকেন।

'জেলি' মানে এক রকম অকথ্য বিলাতী জলখাবার। জেলি মেলের পাঠক জেলি ব্যাগ অর্থাৎ জেলির বস্তার মত। জেলির বস্তা যেমন জেলির যত মধু, মিছরি, চিনি, শর্করা সব ভাল সামগ্রী প্রাণপণে 'পশরাইয়া" ফেলিয়া রাখে কেবল শিটে আর ছোবড়া, এই মেলের পাঠকও তেমনি পঠিত বিষয়ের যাহা কিছু উত্তম, উপাদেয় ও সদুপদেশপ্রদ, তাহা দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত পরিত্যাগ করতঃ পেটে পূরিয়া রাখেন কেবল তাহার শিটে আর ছোবড়া, ছাই আর পাঁস। জেলি মেলের পাঠকেরা মহাভারত পড়িয়া মহাভারত হইতে কৃষ্ণকে প্রাণপণে পশরাইয়া ফেলিয়া কৃষ্ণবিহীন মহাভারতের বিরাট বৃত্তান্ত লিখিতে বসেন; ইহা কেমন, না যেমন বরবিহীন বিবাহ, বৃক্ষবিহীন বাগান,—রাম বিনা রামায়ণ; "The play of Hamlet without Hamlet." অথচ ইহাই ইতিহাসের উচ্চাদর্শ।

বিলাতী পণ্ডিতদের বেদানুবাদও জেলিবস্তা-জাত বিদ্যার দৌড়। কাজেই তাহাতে আর কি পাওয়া যাইবে? পাওয়া যায় কেবল শিটে আর ছোবড়া, মুষল আর উদখল, কুষ্মাণ্ড আর কৃষকের গান।

হংসমেলের পাঠক, হংসবৎ নীর ত্যজিয়া পঠিত বিষয়ের কেবল ক্ষীর গ্রহণ করেন; আস্বাদন ও সুরক্ষণ করেন। বলা বাহুল্য, ইঁহারাই উৎকৃষ্ট মেলের লোক,—ফুটফুটে ফুলে নিখুঁত সর্ব্বানন্দী। ইঁহারা গোলকুণ্ডার মণি খনি-খোদকের ন্যায় পঠিত পুস্তকের ময়লা মাটি আবর্জ্জনা অপসৃত করিয়া, তাহা হইতে কেবল হীরা, মতি, চুনি, পান্না বাছিয়া লন।

ভ্রমরা-মেলের পাঠক ভ্রমরবৎ সাহিত্য-উদ্যানে ফুলে ফুলে মধু চাখিয়া বেড়ান। ইঁহারা কোনও ফুলেই স্থির হইয়া দুদণ্ড বসেন না;—একখান পুস্তকও কখন আগাগোড়া পড়িয়াছেন কি না সন্দেহ। এ জাতীয় পাঠক পল্লবগ্রাহীর চূড়ান্ত। কখনও কোনও বিষয়ে আমূল প্রবেশ করিতে অক্ষম, অসম্মত। মনুর একটা বচন, কালিদাসের দুইটা শ্লোক, সেক্সপিয়রের আধখানা সনেট,—শেলির একটা তুক্কো, নিধুবাবুর একটা টপ্পা, ইহা লইয়াই ইঁহাদের কাজকারবার। ইঁহারা এক রকমের পড়াই পড়েন ও পড়িতে পছন্দ করেন।

বই-লেখা ব্যবসায়।

বহুদিন হইতে বই-লেখা একটা বৃহৎ ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাতী ও মার্কিণী মাটীই ব্যবসাদারীর আকর-স্থান। বই-লেখা ব্যবসা, বিলাতে মার্কিণেই সর্ব্বপ্রথমে সজোরে প্রচলিত হয়। আরও কতকগুলি ব্যবসায়ের ন্যায় বই লেখা ব্যবসায় এদেশে বিলাত হইতেই আমদানি হইয়াছে।

সংসারে থাকিতে হইলে অন্ন-বস্ত্র উপার্জ্জন সকলেরই করা চাই। ভদ্র-সন্তানমাত্রেই সদুপায়ে সে কার্য্যটা করিতে অভিলাষী। অতএব ন্যায়সঙ্গত নূতন ব্যবসায়ের বিস্তারে, মোটামুটী মঙ্গলই ধরিয়া লওয়া ভাল। বই-লেখা ব্যবসায়ের আমরা নেহাত নিন্দা করিতেছি না। ব্যবসায়টা যে বাঙ্গালার বাজারে বেগে চলিতেছে, তাহাই কেবল বলিতেছি।

আগুণের উত্তাপের মত, ব্যবসায় ব্যবসাদারী না-ছোড় নিয়ম। ব্যবসার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবসাদারী জোটে। পেসার পিছু পিছু পেসাদার ছোটে। পুস্তক প্রণয়ন পেসা হওয়া অবধি, পেসাদার পুস্তক-প্রণেতাও অনেক হইয়াছেন এবং হইতেছেন। ব্যবসাদার নহিলে ব্যবসায় করিবে কে?

পুস্তক-প্রণয়ন যখন পেসায় পরিণত হইয়াছে, পেসাদারের পেসার যত কিছু দোষ-গুণ উহাতে বর্ত্তিয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। ইহা কেবল ব্যবসা-বিজ্ঞানের তথ্য নয়,—সাহিত্যের হাটের প্রত্যক্ষ সত্য। কেবল আমাদের দেশে নয়; সর্ব্বত্র।

এদেশে বই-লেখার ব্যবসায় বেগে চলিয়াছে, প্রধান দুই বিভাগে। প্রথম বিভাগে স্কুলের বই-লেখা ব্যবসায়; দ্বিতীয় বিভাগে উপন্যাসের বই-লেখা ব্যবসায়। প্রথম বিভাগেই ব্যবসায় বিস্তৃত ও বেচা-কেনা তেজ; লভ্যও উহার লোভনীয়। দ্বিতীয় বিভাগের ক্রয়-বিক্রয় প্রথমের পাঁচ সাত পরদা নিয়ে।

স্কুলের বই-লেখা ব্যবসায় বহতা হইয়াছে, ইংরেজী বাঙ্গালা স্কুল ও পাঠশালার প্রসাদাৎ। উপন্যাসের বই-লেখা ব্যবসায় হইতে পাইয়াছে, বালিকা-বিদ্যালয়গুলির প্রসাদাৎ। স্কুলের বই যেমন স্কুলে, উপন্যাসের বই প্রায় তেমনি অন্দরমহলে, একান্ত প্রয়োজনীয়। উপন্যাস, নবন্যাস ও রসোন্যাস, স্কুলে পড়া অকর্ম্মা মেয়েদের মৌতাত। খুঁট-আখুরে ছেলেদেরও আলস্য অবসানের একটা অতি বড় অবলম্বন।

খুঁট আখুরেরাই খুঁট আখুরেদের খোরাক যোগাইতে পারে ভাল;

কাজেই আশ্চর্য্য নহে যে ... খুঁচ খাবুদে লোকে উপন্যাস লেখে। ইউরোপের কথা ছাড়িয়া দিয়া এদেশের কথাই ধর। অবস্থাটা এখন যেমনতর দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালা ছাপার অক্ষরে, দু-দশখানি পুরাণ উপন্যাস কোনও রকমে পড়িয়া উদরস্থ করিতে পারিলেই, দু-দশখানা নূতন উপন্যাস লিখিয়া উদ্গার করা যাইতে পারে। ছাপার অক্ষর পড়িবার উপযুক্ত, অক্ষরপরিচয় হইলেই হইল; উপন্যাসের বই লিখিতে আর বেশী কিছু লাগে না। খর-মাট রকমে ধীকি ধীকি ব্যবসায় চালান যাইতে পারে।

স্কুলের বই-লেখা ব্যবসায় চালাইতে, উপন্যাস-ওয়ালা অপেক্ষা যে বড় বেশী পুঁজি চাই, তা নয়। খুঁজিয়া পাতিয়া, লুকাইয়া চোরাইয়া, গোছাইয়া গাছাইয়া বসাইয়া দিতে পারিলেই স্কুলে পড়ার বই হয়। বই হয় বটে; কিন্তু ব্যবসায় চলে না। যেহেতু বে-ওয়ারিশ বই বিদ্যালয়ে অচল।

লবণ, অহিফেন, গাঁজা, ভাঙের কারবার যেমন গবর্ণমেণ্টের একচেটে; স্কুলের বই-লেখা ব্যবসায় তেমনি একশ্রেণীর লোকের একচেটে। সেই শ্রেণীর সহিত সুদৃঢ় সংস্রব থাকা অথবা সেই শ্রেণীর ওয়ারেশা-আনি স্বত্বে স্বত্ববান হওয়া ব্যতীত স্কুলের বই-লেখা ব্যবসায় চলিতে পারে না; তাহা খুব স্বল্প রকমে চালাইতে হইলেও একচেটেওয়ালাদের লাইসেন চাই; নহিলে স্কুলের বই স্কুলে অচল; সুতরাং সমগ্র সংসারেই অচল। কিন্তু এ লাইসেন পাইতে যাহা লাগে, তাহার তুলনায় আবগারী আফিসারের নিকট হইতে চরস বা চণ্ডু বেচিবার লাইসেন লওয়া অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কাজেই বই-লেখার এ বিভাগের ব্যবসায় করিবার জন্য, গণ্ডির বাহিরের যে সব গ্রন্থকার ব্যস্ত, তাহারা স্বভাবতঃই একচেটেওয়ালাদের উপর মহাচটা। ইহা অবশ্য ব্যবসাদারীর আক্রোশ ব্যবসাদারের উপর।

স্কুলের বই দরে বিকায়; বিকায়ও বেশী; স্কুলের বালক পড়ুক না পড়ুক, বাধা দরে বই কিনিতে বাধ্য। উপন্যাস আলস্য-পরতন্ত্রের সহায় বটে; এবং আলস্য-পরতন্ত্রের সংখ্যাও সংসারে বেশী; তবুও কিন্তু এদেশে উপন্যাস বিকায় কম; কারণ এই যে, একখানা বই কিনিয়া এক শত জন অকর্ম্মার কালক্ষেপ হইয়া থাকে। সময়ে সহস্র জনেরও সাহিত্য-পিপাসা নিবারণ করিয়া পুস্তকখানা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উত্তরাধিকারি-স্বত্বের কিঞ্চিৎস্থিতভুক্ত হয়।

পুস্তক-প্রণয়ন-পেশার সঙ্গে, পুস্তক-প্রকাশ ও পুস্তক-বিক্রয়-ব্যবসায়

অতিশয় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। পুস্তক-প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতার হাতে পুস্তক-প্রণেতাকে কার্য্যগতিকেই যাইতে হয়; নহিলে ব্যবসায় চলে না।

গ্রন্থকারেরা প্রায়ই গরীব; প্রকাশকেরা প্রায়ই পুঁজিওয়ালা লোক। বই-লেখা ব্যবসায়ের নূতন ব্রতীদিগকে প্রকাশকের হাতে প্রায়ই ঠকিতে হয়। ঠকার কারণ—কেবল পয়সার অভাব নয়; গ্রন্থকারদের মধ্যে অহম্মুখ অনেক। প্রকাশক প্রায়ই অহম্মুক হয় না। বিলাতে প্রকাশক কোম্পানীর আশ্রয় নহিলে পুস্তক প্রকাশিতই হয় না; বিশিষ্ট প্রকাশকদিগের বড় বড় কারখানার ন্যায় প্রকাশক-নামধারী জুয়াচোর কোম্পানীর আড্ডাও তথায় বিস্তর। এই আড্ডাওয়ালারা সাহিত্য-প্রকাশের চার ফেলিয়া, সাহিত্য-পাগলা "হবু" গ্রন্থকারদের নিকট চাঁদা আদায় করিয়া চম্পট দেয়। এমনতর কোম্পানী আজও এদেশে মাথা উঁচু ততটা করে নাই। কিন্তু ক্রমেই করিবে, কেন না বই-লেখার ঝোঁক, বিলাতের মত এদেশেও বাড়িয়া উঠিতেছে। কবি-যশঃপ্রার্থী কাণ্ডজ্ঞানশূন্য লোকের সংখ্যা এ সংসারে ত বড় কম নয়।

বই-লেখা ব্যবসায়ের সহিত আর এক সম্প্রদায়ের সংস্রব আছে। তাঁহারা সম্পাদক ও সমালোচক! এখানকার মত বিলাতেও গ্রন্থকারগণ সম্পাদক ও সমালোচকদের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া আসেন। অবশ্য তাঁরা তেমনিতর গ্রন্থেরই গ্রন্থকার; নহিলে সমালোচনা ও সার্টিফিকিটের জন্য লালায়িত হইবেন কেন? সমালোচনা ও সার্টিফিকিটের জন্যও কোথাও টাকা, কোথাও বা তৈল খরচ হইয়া থাকে।

অন্ধভক্তি।

[শ্রীমনীষিমোহন রায়]

গত শ্রাবণের "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত অজিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বি-এ মহাশয়ের বৈষ্ণব কবিদের সমালোচনা এবং তৎসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের অবতারণা পড়িয়া হাসিও পাইল, দুঃখও হইল। ভক্তি জিনিষটা ভাল, সুতরাং রবি-ভক্তিও দোষের নহে; কিন্তু তাই বলিয়া অন্ধভক্তি জিনিষটা মোটেই ভাল

নয়। সূর্য্যদেব সুন্দর বলিয়া যদি অনিমেষ-নয়নে তাঁহার দিকেই চাহিয়া থাকি, তাহা হইলে চক্ষুর অবস্থা এরূপ ঘটিবে যে, চতুর্দ্দিকস্থ অন্যান্য দ্রব্যসমূহ অন্ধকার হইয়া অদৃশ্য বোধ হইবে। সুতরাং এক জনের প্রশংসা করিতে হইলে তাহা যাহাতে মাত্রা ছাড়াইয়া না যায়, তজ্জন্য ন্যায়ের তুলাদণ্ডে তাহাকে উচিতরূপে ওজন করিয়া লইয়া তবে লোকচক্ষুর সম্মুখে ধরা কর্ত্তব্য। নতুবা সেই মাত্রাতিরিক্ত বিচারশক্তিবিহীন অন্ধভাবকতা সাধারণের হাস্যোদ্রেক করে মাত্র। শ্রীযুক্ত অজিতচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নানা বাক্যে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিয়া বৈষ্ণব-কবিতার নিকৃষ্টতা প্রতিপাদন-পূর্ব্বক শেষে রবীন্দ্রনাথের একটী কবিতার দুই ছত্র তুলিয়া দিয়া বলিতেছেন,—"বৈষ্ণব-কবিগণ রচিত হৃদয়ের এত প্রেমাকুলতা শুধু শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মধ্যেই আবদ্ধ, তৃষিত মানব-মানবীর ভালবাসার প্রতিবিম্ব বৈষ্ণব-পদাবলী নহে—সে শুধু দেবতাদেরই লীলা-বর্ণনা, মানুষের খেলার স্থান তাহার মধ্যে নাই। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই সর্ব্বপ্রথম তৃষ্ণাকুলিত নরনারীর সম্মুখে এই আদিরস-সুধাভাণ্ড ধরিয়াছেন।" কিন্তু ইহা কি ঠিক? রবীন্দ্রনাথ গাহিয়াছেন—

"——আমাদেরি কুটীর কাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে
কেহ রাখে প্রিয় জন তরে—তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতিহার
গাঁথা হয় নর-নারী মিলন-মেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে, কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।"

কিন্তু এ-কথা হিন্দুর নিকট বহু পুরাতন। রবীন্দ্রনাথই তো এ ভাবের প্রথম ভাবুক নহেন। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জয়দেব প্রভৃতি প্রত্যেকেরই পদাবলী মধ্যে একটী নরদেহধারিণী সজীব নায়িকা বর্ত্তমান; তাহা কি লেখক অবগত নহেন? পদ্মাবতী, রামী রজকিনী প্রভৃতি যে সকল পুষ্প তাঁহাদের কুটীরোদ্যানে প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহাই তাঁহারা দেবতার চরণে অঞ্জলি দিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহী আমরাও; কিন্তু অন্ধ হীন স্তাবক নাই। এই কবিতাটী উৎকৃষ্ট; কিন্তু তাহার এইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যা দেখিয়াই বাধ্য হইয়া এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

বিবেকানন্দের উপদেশ।

মুক্তি।

ব্রহ্মদৃষ্টি ছাড়া কোন ভাবে কোন বস্তুর দিকে অগ্রসর হয়ো না, তা যদি কর, তা হলে অন্যায় বা মন্দ দেখবে; কারণ, আমরা যে বস্তু দেখতে যাই, তার উপর একটা ভ্রমাত্মক আবরণ প্রক্ষেপ করি, তাই মন্দ দেখতে পাই। এই সব ভ্রম হতে মুক্ত হও, এবং পরমানন্দ লাভ কর। সর্ব্ব প্রকার ভ্রমমুক্ত হওয়াই মুক্তি।

ব্রহ্ম।

যেমন দুধের ভিতর সর্ব্বত্র ঘি রয়েছে, ব্রহ্মও তদ্রূপ জগতের সর্ব্বত্র রয়েছেন। কিন্তু মন্থন দ্বারা তিনি এক বিশেষ স্থানে প্রকাশ পান। যেমন মন্থন করলে দুধের মাখন উঠে পড়ে, তেমনি ধ্যানের দ্বারা আত্মার মধ্যে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়।

জড় ও চিৎ।

জগতের কোন কিছু সম্পূর্ণ জড়ও নয়, আবার সম্পূর্ণ চিৎও নয়। জড় ও চিৎ পরস্পর-সাপেক্ষ—একটার দ্বারায় অপরটার ব্যাখ্যা হয়।

শিবোঽহম্।

আমরাই শিবস্বরূপ, অতীন্দ্রিয়, অবিনাশী জ্ঞানস্বরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তির পশ্চাতে অনন্ত শক্তি রয়েছে; জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করিলে ঐ শক্তি তোমাতে আসিবে।

পাপের ফল।

ধন্য তারা, যারা শীঘ্র শীঘ্র পাপের ফল ভোগ করে—তাদের হিসাব শীঘ্র শীঘ্র মিটে গেল। যাদের পাপের প্রতিফল বিলম্বে আসে তাদের মহাদুর্দ্দৈব—তাদের বেশী বেশী ভুগতে হবে।

সমাধি।

সমাধি অর্থে জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ ভাব, অথবা সমত্বভাব লাভ করা।

সংস্কার।

জোর ক'রে সংস্কারের চেষ্টার ফল এই যে, তা'তে সংস্কার বা উন্নতির গতিরোধ হয়। কাউকে বলো না 'তুমি মন্দ'। বরং তাকে বল—'তুমি ভালই আছ, আরও ভাল হও'।

তুমি কে?

সকলের চেয়ে বেশী পাপ হচ্ছে, নিজেকে দুর্ব্বল ভাবা। তোমার চেয়ে বড় আর কেউ নেই; উপলব্ধি কর যে, তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। যে কোন বস্তুতে তুমি শক্তির বিকাশ দেখ সে শক্তি তোমারই দেওয়া। আমরা সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, এমন কি, সমগ্র জগৎপ্রপঞ্চের উপরে। শিক্ষা দাও যে, মানুষ ব্রহ্মস্বরূপ। মন্দ বলে কিছু আছে এটা স্বীকার করোনা, যা নেই তাকে আর নূতন করে সৃষ্টি করোনা। সদর্পে বল, আমি প্রভু, আমি সকলের প্রভু।

ঈশ্বর ও সয়তান।

জগতে একটা মাত্র শক্তিই রয়েছে——সেইটেই কখনও মন্দ, কখনও বা ভাল ভাবে অভিব্যক্ত হচ্ছে। ঈশ্বর আর সয়তান একই নদী—কেবল স্রোতটা বিপরীতদিক্‌গামী।

শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীকৃষ্ণ সব কাজই করেছিলন, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার আসক্তিবর্জ্জিত হয়ে। তিনি সংসারে ছিলেন বটে, কিন্তু কখনও সংসারী হয়ে যান নি। সকল কাজ কর, কিন্তু অনাসক্ত হয়ে কাজ কর; কাজের জন্যই কাজ কর, নিজের জন্য কখনও করো না।

প্রতিমা-পূজা।

বুদ্ধের সগুণ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ক্রমাগত তর্ক করার ফলে ভারতে প্রতিমা-পূজার সূত্রপাত হল। বৈদিক যুগে প্রতিমার অস্তিত্ব ছিল না, তখন লোকে সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন করত। কিন্তু বুদ্ধের প্রচারের ফলে জগৎস্রষ্টা ও আমাদের সখাস্বরূপ ঈশ্বরকে হারিয়ে তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রতিমা-পূজার উৎপত্তি হ'ল। লোকে বুদ্ধের মূর্ত্তি গড়ে পূজা করতে আরম্ভ করলে। যীশুখ্রীষ্ট সম্বন্ধেও

তাই হয়েছে। কাঠপাথরে পূজা থেকে যীশু বুদ্ধের পূজা পর্য্যন্ত সমুদয়ই প্রতিমা-পূজা, কিন্তু কোন না কোনরূপ মূর্ত্তি ব্যতীত আমাদের চল্‌তে পারে না।

দেহ।

আমাদের দেহ যেন লৌহপিণ্ডের মত, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন তার উপর আস্তে আস্তে হাতুড়ের ঘা মারা,—তাই দিয়ে আমরা দেহটাকে যে ভাবে ইচ্ছা, গঠন করি।

ঈশ্বর।

জগতে যত প্রকার ভাব বা ধারণা আছে, তার যে সূক্ষ্ম সার নিষ্কর্ষ, তাকেই আমরা ঈশ্বর বলি।

সিংহ ও শৃগাল।

যদি তুমি কাউকে সিংহ হতে না দাও, তা হলে সে ধূর্ত্ত শৃগাল হয়ে দাঁড়াবে। স্ত্রীজাতি শক্তি-স্বরূপিণী, কিন্তু এখন ঐ শক্তি কেবল মন্দ বিষয়ে প্রযুক্ত হচ্ছে, তার কারণ, পুরুষে তার উপর অত্যাচার কর্‌ছে। এখন সে শৃগালীর মত; কিন্তু যখন তার উপর আর অত্যাচার হবে না, তখন সে সিংহী হয়ে দাঁড়াবে।

গীতা।

গীতায় কৃষ্ণ যা বলে গেছেন, তার মত মহান্ উপদেশ জগতে আর নেই। যিনি সেই অদ্ভুত কাব্য রচনা করেছিলেন, তিনি সেই সকল বিরল মহাত্মাদের মধ্যে এক জন, যাঁদের জীবন দ্বারা সমগ্র জগতে এক এক নবজীবনের স্রোত বয়ে যায়। যিনি গীতা লিখেছেন, তাঁর মত আশ্চর্য্য মাথা মনুষ্যজাতি আর কখনও দেখ্‌তে পাবে না।

প্রার্থনা।

হে ওজঃস্বরূপ, আমাদিগকে ওজস্বী কর; হে বীর্য্যস্বরূপ, আমাদিগকে বীর্য্যবান কর; হে বলস্বরূপ, আমাদিগকে বলবান কর।

নির্ব্বাণ।

তোমার তখনই নির্ব্বাণ অবস্থা লাভ হবে, যখন তোমার 'তুমিত্ব' একেবারে উড়ে যাবে। বুদ্ধ বলেছিলেন—"যখন 'তুমি' থাকবে না, (অর্থাৎ যখন কাঁচা আমিটা চলে যাবে) তখনই তোমার যথার্থ অবস্থা—তখনই তোমার সর্ব্বোচ্চ অবস্থা।

পাহারাওয়ালা।

[শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র পালিত, বি-এল্]

(১)

মহাবীর সিং পুলিশের পাহারাওয়ালা। সে দশ বৎসর এই কার্য্য সুখ্যাতির সহিত করিতেছে। পুলিশের বড় সাহেব হইতে থানার দারোগা পর্য্যন্ত মহাবীর সিংহের উপর সন্তুষ্ট। থানার লোকেরা বলিত,—লেখাপড়া জানিলে মহাবীর আজ সব ইন্‌স্পেক্টর পর্য্যন্ত হইতে পারিত। একথা বলিবারও তাহাদের কারণ ছিল। মহাবীরের দেহে অসাধারণ শক্তি ছিল। ভয় কাহাকে বলে সে তাহা জানিত না। দয়া-মায়ার ধার সে ধারিত না। কাজেই সহরের বদমায়েসেরা তাহাকে যমের মত ভয় করিত। পুলিশের কর্ত্তব্য সে জবরদস্তভাবে পালন করিত বলিয়া তাহাকে ইদানীং আর কেহ মহাবীর সিং বলিত না; সকলেই জবরদস্ত সিং বলিয়া ডাকিত।

জবরদস্ত সিংয়ের জীবনে উপরওয়ালার হুকুম তামিল করা ব্যতীত অন্য কোনও কর্ত্তব্য ছিল না। সে কলের মত দৈনিক কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া যাইত। মানব-জীবনের হাসি-কান্না, সুখ-দুঃখের সহিত তাহার কোনও পরিচয়ই ছিল না।

(২)

পৌষ মাসের গভীর রাত্রি। অন্য বৎসরের চেয়ে এ বৎসর শীত বেশী। রাস্তায় লোক চলাচল অনেক ক্ষণ হইল বন্ধ হইয়াছে। একটা বড় বাড়ীর সম্মুখে জবরদস্ত সিং একাকী পাহারায় নিযুক্ত। সে পায়চারি করিতেছে এবং তাহার পায়ের নাগরা জুতার শব্দ অনেক দূর পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছে। এমন সময়ে হঠাৎ সে দেখিতে পাইল যে, রাস্তার এপার হইতে ওপারে কি একটা জিনিষ চলিয়া গেল। জিনিষটা কি জবরদস্ত সিং ঠিক করিতে পারিল না। তাহার মনে খট্‌কা লাগিল, চোর ত নয়? সে তাড়াতাড়ি সেইদিকে চলিল।

রাস্তার ধারে একটা খোলার বাড়ী। তাহার এক পাশে কতকগুলা আবর্জ্জনার স্তূপ। জবরদস্ত সিংয়ের হাতে 'আঁধারে' আলো ছিল, সেই আলোর সাহায্যে জবরদস্ত সিং দেখিল যে, সেই আবর্জ্জনারাশির মধ্যে একটী তিন চারি বৎসরের ছেলে গুড়ি মারিয়া লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে।

জবরদস্ত সিং ছেলেটীকে বাহির করিয়া দেখিল, তাহার গায়ে এক টুকরা ছেঁড়া ন্যাকড়া পর্য্যন্ত নাই। এই দারুণ শীতে ছেলেটী মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। সে ভয়-কাতর নয়নে জবরদস্ত সিংয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আজ দশ বৎসর পুলিশে কার্য্য করিয়া জবরদস্ত সিং দয়ামায়া বিসর্জ্জন দিয়াছিল। শিশুর সে কাতর দৃষ্টিতে তাহার সেই কঠিন প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। কি এক অব্যক্ত করুণায় সে বিচলিত হইয়া পড়িল। জবরদস্ত সিং আজ যেন আর পুলিসের লোক নয়। ছেলেটীকে থানায় লইয়া জিম্মা দিলে তাহার সব কর্ত্তব্য নিঃশেষ হইবে, এ কথা জবরদস্ত সিংয়ের মনে হইল না। সে ভাবিল, আজ তাহার প্রথম কর্ত্তব্য নিজের হাতে ছেলেটীর প্রাণরক্ষা করা। দুরন্ত শীত নিবারণ করিবার জন্য সে তাহার গরম জামাটী খুলিয়া ছেলেটীকে আবৃত করিল। ইহাতেও তাহার তৃপ্তি হইল না। তাহার বোধ হইল, ছেলেটী এখনও শীতে কাঁপিতেছে। ছেলেটী কতক্ষণ অনাহারে আছে তাহা বলা যায় না। আগে তাহাকে কিছু খাইতে দেওয়া উচিত। রাত্রি গভীর। দোকান-পাট সব বন্ধ। খাবার জিনিষ কোথায় পাওয়া যায়, এই চিন্তায় জবরদস্ত সিং অস্থির হইয়া উঠিল। নিকটে কতকগুলি খোলার ঘর। সেখানে দুধ পাওয়া যাইতে পারে। এই মনে করিয়া জবরদস্ত সিং ছেলেটীকে কোলে লইয়া সেইদিকে যাইল।

(৩)

রাস্তার ধারে সবে মাত্র আগুন জ্বালাইয়া জবরদস্ত সিংহ দুধ গরম করিতে সুরু করিয়াছে, এমন সময়ে দূরে একটা সোরগোল উঠিল। পুলিস সাহেব নিজে রোঁদে বাহির হইয়াছেন। ঘাঁটিতে পাহারাওয়ালা নাই দেখিয়া এই গোলমাল। জবরদস্ত সিংয়ের কিন্তু সে দিকে নজর নাই। আজ সে প্রাণ ঢালিয়া নূতন কর্ত্তব্য-পালনে প্রবৃত্ত হইয়াছে। মুমূর্ষু শিশুর প্রাণ-রক্ষার কাছে সে চাকুরীকে তুচ্ছ মনে করিয়াছে।

এদিক খোঁজ করিতে করিতে পুলিস সাহেব জবরদস্ত সিংকে দেখিতে পাইলেন। ব্যাপার দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইলেন। তিনি জবরদস্ত সিংকে বলিলেন,—'তুমি পাহারাওয়ালার কর্ত্তব্য অবহেলা করিয়াছ। তোমায় গ্রেপ্তার করিলাম'। ছেলেটীকে কোলে করিয়া জবরদস্ত সিং সাহেবের অনুসরণ করিল। থানায় আসিয়া সাহেব তাহার নামে মামলা রুজু করিবার হুকুম দিয়া চলিয়া গেলেন।

পুলিসের কার্য্যে অবহেলা করার অপরাধে জবরদস্ত সিং আদালতে অভিযুক্ত হইয়াছে। পুলিস সাহেবের এজাহারের পর হাকিম জবরদস্ত সিংয়ের জবানবন্দী লইলেন। আদালত নিস্তব্ধ। ছেলেটীকে কোলে করিয়া জবরদস্ত সিং ধীরে ধীরে দোষ স্বীকার করিল। হাকিম দয়া করিয়া তাহার ২০৲ টাকা জরিমানা করিলেন। জবরদস্ত সিংকে এই জরিমানা দিতে হইল না; আদালতের পাহারাওয়ালারা চাঁদা তুলিয়া জরিমানার টাকা দিল।

জবরদস্ত সিং পুলিশের চাকরী হইতে বরখাস্ত হইল। ছেলেটীকে কোলে করিয়া সে আদালতের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে আসিয়া এমন এক আনন্দের আস্বাদ পাইল যাহা সে ইহার পূর্ব্বে আর কখনও পায় নাই।

সঙ্কলন ও আলোচন।

নিধু গুপ্ত।—

গত ভাদ্র মাসের 'নারায়ণে' শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ রায়ের নিধু গুপ্তের তৃতীয় স্তবক পাঠ করিলাম। ইহাতে জানিবার কথা অনেক আছে। বাস্তবিক অমরেন্দ্রবাবুর সংগ্রহশক্তি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। টপ্পার সৃষ্টিকর্ত্তা নিধু গুপ্ত বাঙ্গালার প্রেম-সঙ্গীতে নূতন ধারা আনিয়া দিয়াছেন। তিনি শুধু প্রেম-সঙ্গীতের রচয়িতা নহেন; পরন্তু কবিও বটেন। এমন কবিত্বময় সহজ সুন্দর প্রেম-গানের তুলনা বাঙ্গালা সাহিত্যে নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এত বড় কবির উল্লেখযোগ্য জীবনী বাঙ্গালা ভাষায় নাই। অমরেন্দ্রবাবু কবির জীবন-চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহা আনন্দের কথা সন্দেহ নাই। এবার অমরেন্দ্রবাবু নিধু গুপ্তের সম্পর্কীয় কয়েকটী আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলিতে কবির স্বরূপ অনেকটা বুঝিতে পারা যাইবে বলিয়া আমরা সেগুলি উদ্ধৃত করিলাম :—

চণ্ডীদাসের কবিত্বের উৎস যেমন রজকিনী রামীর প্রেম, নিধুবাবুর গানের উৎসও তেমনই এই বাগানবাড়ীর (মুর্শিদাবাদের মহারাজ মহানন্দ

রায়ের বাগান-বাটীর) শ্রীমতীর প্রেম। শ্রীমতী নিধুবাবুকে যেরূপ ভালবাসিত, নিধুবাবুও তাহাকে সেইরূপ ভালবাসিতেন। এই দু'জনের সম্বন্ধে যে দুই একটী গল্প প্রচলিত আছে, পাঠকবর্গের কৌতূহল চরিতার্থের জন্য এখানে তাহা বিবৃত করিতেছি।

নিধুবাবুর উপর শ্রীমতী এমন একটা দাবী করিত যে, তিনি যদি দুই চারি দিন তাহার কাছে না যাইতেন, তাহা হইলে সেটা যেন তাঁহার এক মস্ত অপরাধ বলিয়া শ্রীমতীর মনে হইত। একবার দুই চারি দিন অনুপস্থিতির পর হঠাৎ এক দিন নিধুবাবুর ইচ্ছা হইল, শ্রীমতীকে গিয়া দেখিয়া আসি। ইচ্ছা হইবামাত্র তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই দিনই—দুপুর বেলায় শ্রীমতীর বাটীতে তিনি উপস্থিত হইলেন। এ দিকে, শ্রীমতীও তাঁহার জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় নিধুবাবুকে সহসা আসিতে দেখিয়া শ্রীমতী বলিল,—"অসময়ে বন্ধু যে, কি মনে ক'রে—দেখা দিতে নাকি ?" নিধুবাবু তাহার কথার মধ্যে, কথার সুরে, তাহার দুই চোখে একটা চাপা ভৎ'সনা লক্ষ্য করিলেন। তিনি কোনও কথা না বলিয়া, নিকটবর্ত্তী আসনে উপবিষ্ট হইয়া গান ধরিলেন,—

"ভালবাসিবে ব'লে ভালবাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।
শ্রীমুখে মধুর হাসি, আমি বড় ভালবাসি,
তাই দেখিবারে আসি, 'দেখা দিতে' আসিনে॥"

শ্রীমতী নিধুবাবুর চাতুরী বুঝিতে পারিয়া একটু রাগ ও দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিল,—"দেখ, আমরা অবলা, বুদ্ধিহীনা। আমাদের প্রবঞ্চনা করাটা বিশেষ বাহাদুরী নয়।" ইহাতেও নিধুবাবু কোনও কথা না কহিয়া আবার গান ধরিলেন,

"কে বলে 'অবলা' তোমায় মহাবল ধর প্রিয়ে,
ধরাধর ধর হৃদে, ঢেকেছ বসন দিয়ে।
স্মরহর শর সম, কটাক্ষ তব বিষম,
নিরুপমা নিগুণ, নর বধ নারী হ'য়ে।"

এই গানটি শুনিবামাত্র শ্রীমতী হাসিয়া ফেলিল। বলিল,—"মনে করিয়াছিলাম, তোমার সঙ্গে আজ ঝগড়া করিব। কিন্তু কি যে তোমার গানের

গুণ—শুনিলেই সব ভুলিয়া যাই।" উভয়ের চক্ষে তখন প্রীতির হাসি ফুটিয়া উঠিল। নিধুবাবু পুনরায় গাহিতে আরম্ভ করিলেন,—

"এমন নয়ন-বাণ কে তোমায় করেছে দান,
দর্পণে হেরিলে আঁখি আপনি হবে সন্ধান।
নয়ন অক্ষয় তূণ, তাহে কটাক্ষ নিপুণ
বিধি যদি দিত গুণ, বধিতে অনেকেরই প্রাণ।"

নিধুবাবুর অধিকাংশ সঙ্গীতই এই ভাবে রচিত। মনে ভাব উদয় হইলেই তিনি তাহা গানে প্রকাশ করিতেন। এ সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি গল্প প্রচলিত আছে। আমরা যাহা জানি, একে একে তাহা পাঠকবর্গকে এখানে উপঢৌকন দিতেছি।

এক দিন নিধুবাবু দুই-একটি বন্ধুর সহিত গঙ্গাস্নান করিতেছেন, এমন সময় পাশের ঘাট হইতে তাঁহাদের কানে আসিয়া পৌঁছিল যে, একটি স্ত্রীলোক আর একটি স্ত্রীলোককে বলিতেছেন, "দেখ ভাই, চোখই যত অনর্থের মূল।" কথাটা শুনিবামাত্র নিধুর এক বন্ধু বলিলেন, "কথাটা ঠিক বটে।" নিধুবাবু বলিলেন,—"কথাটা খুবই ভুল।" বন্ধু ইহার উত্তরে বলিলেন, "তবে ঠিক কথা কি শুনি!" নিধুবাবু তখন অতি চাপা কণ্ঠে বন্ধুর কানের কাছে গাহিলেন,—

"নয়নেরে দোষ কেন,
মনেরে বুঝায়ে বল, নয়নেরে দোষ কেন!
আঁখি কি মজাতে পারে না হোলে মন মিলন।
আঁখিতে যে যত হেরে, সকলই কি মনে ধরে,
যে যাকে মনে করে, সেই তার মনোরঞ্জন।"

"বঙ্গীয় সঙ্গীত-রত্নমালা" নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ছিল, বাজারে এখন তাহা পাওয়া যায় না, তাহারই এক স্থানে নিধুবাবু-সংক্রান্ত এই গল্পটি আছে যে, "একদিন নিধুবাবু বাটীতে বসিয়া মৃদুস্বরে গান করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁরে রাম, তুই নাকি বড় গায়ক হয়েছিস্? আমরা সে দিন রাজবাটীতে (শোভাবাজার) কথা শুনিতে গিয়াছিলাম, কথকের গান শুনিয়া আপোষের মধ্যে বলিলাম,—কথকটি

বেশ গান গায়। একটী সুন্দর বউ, কাহাদের জানি না, যেন ভগবতী, আমার পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল—'আপনি কি আপনার ছেলের গান কখনও শুনেন নাই ?' আমি বলিলাম,—'কৈ না।' সেই বউটি বলিল—'তবে একবার শুনিবেন।' এমন সময় কথা সাঙ্গ হইল আর সেই বউটির পরিচয় লওয়া হইল না। তা বাছা, তুই আজ একটা গান গা—আমি শুনি। নিধুবাবুর একজন প্রতিবেশিনী ঠাকরুন-দিদি সেই সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি রহস্য করিয়া বলিলেন, "দেখ ভাই, নাত্‌বউএর্ পায়ে ধরার গানটা যেন হয়।" নিধুবাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"আপনার আজ্ঞাই শিরোধার্য্য।"—এই বলিয়া নিম্নলিখিত গানটি গাহিলেন —

"আমি সাধ ক'রে কি ধরি তারই পায়।
সে ধন সহজে কি পাওয়া যায়।
সে যে জগদ্‌গুরু কল্পতরু,—মন দিতে হয় যে তারই পায়,
সে যে সাধনের ধন অমূল্য রতন, তারে সাধন বিনা কেবা পায়!
সে যে অধম-তারিণী, দুঃখ-নিস্তারিণী, তারে প্রেম বিনা বাঁধা দায়॥"

এই পুস্তকেই আর একটি গল্প আছে যে, একদিন নিধুবাবুর কোনও এক বন্ধু তাঁহাকে রহস্য করিয়া বলেন—"নিধু! প্রেম, পীরিতি, গেয়ে-গেয়েই ত দিন কাটালে—ভাব কিছু বুঝিতে পারিলে ?"—নিধুবাবু ইহার উত্তরে তখন তাঁহাকে এই গানটি শুনাইলেন,—

"প্রেম-সিন্ধুনীরে—বহে নানা তরঙ্গ,
রসিকে পার হ'তে পারে—অরসিকের আতঙ্ক।
চাতুরী-তরী একে, তাহে কর্ণধার অনঙ্গ,
বিচ্ছেদ প্রবল বায়ু, কখন্ করে কি রঙ্গ॥"

তাঁহার সম্বন্ধে আর একটি গল্প আছে যে, একবার তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাকে দুঃখ করিয়া বলেন,—"নিধু, চিরকালটাই একভাবে কাটাইলে—আর ভাল দেখায় না! আড্ডা দেওয়া বন্ধ কর!"—নিধু ইহাতে হাসিয়া এই গানটী বলেন—

"কা'র দোষ দিব বল, দোষী কব কায়।
আমার মন, আমার নয়ন, আমারে মজাতে চায়।

মন যদি হতো মনের মতন, তবে কি দুঃখ পেতাম এমন ;—
আমি মনেরে বুঝাব কত,—সতত বিপথে ধায়॥"

নিধুবাবুর যে সঙ্গীতটী সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত, তাহার সম্বন্ধেও একটি গল্প প্রচলিত আছে। সে গল্পটি এই যে, নিধুবাবু দুই দিন বাটী আসেন নাই। তৃতীয় দিবসে বাটী আসিলে তাঁহার সহধর্ম্মিণী অভিমান করিয়া বলেন, "কাল-কুৎসিত ব'লে কি আমাকে এতই ঘৃণা করিতে হয়?"—নিধুবাবু এই কথার উত্তরে তখন এই গানটি রচনা করেন,—

"তোমারই উপমা তুমি প্রাণ এ মহীমণ্ডলে,
আকাশের পূর্ণশশী সেও কাঁদে কলঙ্ক-ছলে।
সৌরভে গৌরবে, কে তব তুলনা হবে
আপনি আপন সম্ভবে,
যেমন গঙ্গা-পূজা গঙ্গাজলে।"

উপরি-উক্ত গল্পগুলির যথার্থ্য সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলিতে পারি না; তবে কথাগুলা যখন চলিয়া আসিতেছে, তখন উহা চাপিয়া রাখাটা ঠিক মনে করি না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় আর কিছু না হউক, তাহা হইতে মানুষটা যে কেমন, তাহা বুঝা যায়। উপরের গল্পগুলিতেও আর কিছু না হউক, উহার দ্বারা কিন্তু আমরা নিধুবাবুর কবি-প্রকৃতি দেখিতে পাই।

সাধু ও চলিত ভাষা।—

সাধু ও চলিত ভাষা লইয়া এখন যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তাহার সম্বন্ধে ভাদ্র মাসের 'নারায়ণে' শ্রীযুত নলিনীকান্ত গুপ্ত 'বঙ্গভাষা ও বাংলা ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে নিজ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহাতে দুই কুলই রক্ষা পাইয়াছে। সাধু ও চলিত ভাষার ভক্তেরা ইহা পড়িয়া তাঁহার উপর রাগ করিবেন না বটে, কিন্তু তাঁহাদের কোনও পক্ষই যেন ইহাতে সন্তোষ লাভ করিবেন না, ইহা ঠিক। তথাপি তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রণিধান-যোগ্য মনে করিয়া তাহার কিয়দংশ আমাদের পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এখানে তুলিয়া দিলাম :—

"থিওরি হিসাবে সাধুপন্থী ও চলিতপন্থীদের মধ্যে যতই মতভেদ

থাকুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে দেখিতেছি, সব প্রভেদ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামগুলি ও আর দুই চারিটি কথা লইয়া। সাধুপন্থীদের মধ্যে যেমন সংস্কৃতশব্দ, সংস্কৃত syntax অথবা ইংরাজীভঙ্গিমা দেখা যায়, চলিতপন্থীদের মধ্যে যে তাহার নিতান্ত অভাব, এমন বলা যায় না। কলহ কেবল "করিতেছি", "হইয়া" "ইহারা" "নহে" লিখিব, না লিখিব, "কচ্ছি", "হয়ে", "এরা", "নয়"। "কচ্ছি" "হয়ে" প্রভৃতি যদি সাহিত্যে স্থান পায়, তাহাতে আঁপত্তি করিবার কিছু নাই। কিন্তু সে জন্য সাধু কথাগুলি যে অবাংলা বলিয়া নির্ব্বাসন করিতে হইবে, এমন প্রয়োজন দেখি না। মুখে আমরা "করিতেছি" "হইয়া" বলি না বটে, কিন্তু মুখে "নূতন"ও বলা হয় না, "চলিত"ও বলা হয় না—বলা হয় "নতুন" "চল্‌তি"। তবুও ত চলিতপন্থীদের লেখায় এ সব "অ-মৌখিক" শব্দ যথাতথা দেখিতে পাই। আর "নূতন" বা "চলিত" লিখিলে ভাষার যে জীবনহানি হয়, এমনও তাঁহারা স্বীকার করেন না। সুতরাং "করিতেছি", "ইহারা" লিখিলেই যে সব যজ্ঞ পণ্ড হইবে, এমন আশঙ্কা করিবার কিছু নাই। ছন্দের জন্য যদি কোথাও লিখিতে পারি "নূতন", কোথাও লিখিতে পারি "নতুন", তবে শুধু ছন্দ নয় ভাবের—অর্থের একটা বিশেষত্ব ফুটাইয়া তুলিবার জন্যই লিখিতে পারি "করিতেছি", "হইয়া", "ইহারা", "নহে"।

"সে যাহাই হউক, বঙ্গভাষা ও বাংলা ভাষার একটীকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করা ও অপরটীকে বিদেশী বলিয়া বিতাড়িত করা সমীচীন হইবে না। বাংলার হৃদয়ে এতখানি উদারতা বোধ হয় আছে—যাহাতে দুইটিই সেখানে স্থান পায়। অবশ্য, কোন ভঙ্গিমার সামর্থ্য কতখানি ও কোন দিকে সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু তাহার নিরসন তর্কে হইবে না। সে সমস্যা-পূরণ হইবে সৃজনের দ্বারা, সাহিত্য-রচনার দ্বারা। চলিতপন্থীরা যে সত্যটুকুকে কার্য্যে পরিণত করিতে চাহিতেছেন, তাহা যে আমরা দেখিতেছি না, তাহা নয়। সেটা হইতেছে আধুনিক যুগের ধর্ম্ম। বর্ত্তমান যুগের গতি হইতেছে বিশ্লেষণের দিকে, জিনিষকে কাটিয়া ভাঙ্গিয়া পৃথক্ পৃথক্ করিয়া দেখান। সকল ভাষাতেও দেখি, এই বিশ্লেষণময়ী প্রকৃতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। সে চায় ভাবকে, অর্থকে, কথাকে টুকুরা টুকুরা করিয়া, সরল সহজ মিহি করিয়া, বলয়িত ভঙ্গিমায় সাজাইয়া তুলা। বাংলার চলিতভঙ্গিমা এই আদর্শটিকে কতখানি প্রতিফলিত

করিতেছে বা করিতে পারে, সে প্রশ্ন আমরা করিব না। কিন্তু এই আদর্শ একটা পদ্ধতিমাত্র। ইহারই মধ্যে যে সাহিত্যিক প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ বা চরম পরিণতি, তাহা কে বলিতে পারে? আর বর্ত্তমান যুগেও আর কোন ভঙ্গিমায় খেলা হইতে পারে না, এমন নিয়মই বা কে করিয়া দিতে পারে?"

প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি :—

প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্বন্ধে ইদানীং বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাঁহারা এখন এ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া অনেক নূতন তথ্যের প্রচার করিতেছেন। সম্প্রতি 'সাহিত্য-সংহিতা'য় শ্রীযুত জগদানন্দ রায় 'প্রাণী ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি' শীর্ষক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য কথা আমাদিগকে জানাইয়াছেন। তিনি বলেন :—

"সূর্য্যালোক নানা জড় পদার্থে পতিত হইয়া নানাপ্রকার রাসায়নিক কার্য্য দেখায়, কিন্তু উদ্ভিদদেহে পতিত হইয়া উহা যে কার্য্য করে, তাহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। কার্ব্বন্ অর্থাৎ অঙ্গার দেহের প্রধান উপাদান। উদ্ভিদ্‌গণ বায়ু হইতে অঙ্গারক বাষ্প শোষণ করিয়া দেহস্থ করে, কিন্তু এ বাষ্পস্থিত অঙ্গারেরই সাহায্যে নূতন পদার্থ উৎপন্ন করিয়া দেহবৃদ্ধি করার শক্তি তাহাদের বৃদ্ধির উপযোগী নানা উপাদান প্রস্তুতের সাহায্য করে। কিন্তু তাহাদের থাকে না। সূর্য্যালোকই উদ্ভিদের দেহে পতিত হইয়া সর্ব্বদাই সূর্য্যালোক পাইলে উদ্ভিদ্ বৃদ্ধি পায় না, দিবা রাত্রির বিভাগ অনুসারে একবার সূর্য্যালোক পাওয়ার পরে দীর্ঘকাল গভীর অন্ধকারে থাকাই তাহাদের বৃদ্ধির অনুকূল। সূর্য্যালোক যে সাত প্রকার মূল বর্ণের মিশ্রণে প্রস্তুত, সেগুলির মধ্যে বেগুনিয়া প্রভৃতি বর্ণগুলি উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে বাধা দেয়। এই কারণে সূর্য্যালোকের সংযোগে উদ্ভিদদেহে বৃদ্ধির উপাদান প্রস্তুত হইলেও উক্ত রশ্মিগুলির প্রতিকূলতায় দিনের বেলায় উদ্ভিদ্‌গণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে না; তাহারা দিনের আলোকে প্রস্তুত উপাদান লইয়া রাত্রির অন্ধকারেই অধিক বাড়ে।

* * * *

"জীবের দেহ কখনই বিশৃঙ্খলভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না; প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এক একটা নিয়ম মানিয়া বাড়িতে আরম্ভ করে। সকল অঙ্গ

প্রত্যঙ্গের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া প্রাণী ও উদ্ভিদ্গণের বৃদ্ধি বড়ই আশ্চর্য্যজনক। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই বিষয়টি লইয়াও গবেষণা করিয়াছেন, এবং ইহা হইতে যাহা জানা গিয়াছে তাহা অতীব বিস্ময়কর। প্রাণিদেহের নানাস্থানে gland নামে যে বিশেষ মাংসপিণ্ড থাকে পাঠক হয়ত তাহার কথা শুনিয়াছেন। আমাদের কর্ণমূলে, গণ্ডের নিম্নে, কুঁচকিতে, বাহু ও দেহের সংযোগস্থলে এই প্রকার মাংসপিণ্ড আছে, কখনও কখনও এগুলি ফুলিয়া উঠিয়া কি প্রকার পীড়াদায়ক হয় তাহা আমরা সকলেই জানি। শারীরতত্ত্ববিদ্গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, ঐ সকল মাংসপিণ্ড বৃথা দেহে সংযোজিত হয় নাই; এগুলির প্রত্যেকটি হইতে এক এক প্রকার রস নির্গত হয়, এবং তাহা দেহের নানা কার্য্যে লাগে। এই রসগুলির মধ্যেরই কয়েকটি প্রাণিদেহের বৃদ্ধিকে নিয়মিত করে এবং প্রয়োজন অনুসারে সংযত রাখে। মাংসপিণ্ড হইতে ঐ শ্রেণীর রস নিয়ত নির্গত হইয়া প্রথমে রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং রক্তপ্রবাহ তাহাই বহন করিয়া প্রাণীর সর্ব্বাঙ্গে চালনা করে। এই প্রকারে রসগুলি নানা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রয়োজন অনুসারে তাহাদের কোনটীর বৃদ্ধির সহায়তা করে এবং কোনটির বৃদ্ধি রোধ করে।

"শারীরতত্ত্ববিদ্গণ এই আবিষ্কার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; দেহস্থ কোন মাংসপিণ্ডের রস কি ভাবে কোন্ অঙ্গের বৃদ্ধি নিয়মিত করে, ইহারা ক্রমে তাহারও সন্ধান পাইতেছেন। আমাদের কণ্ঠনালীতে যে পিণ্ডাকার হাড় (Adam's apple) আছে তাহার দুই দিকের মাংসপিণ্ড হইতে এক প্রকার রস নির্গত হয়। শারীরতত্ত্ববিদ্গণ ইহারও কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহারা দেখিয়াছেন, এই রস সর্ব্বাঙ্গেই বিস্তৃত হইয়া প্রাণীর অস্থি ও মস্তিষ্কের বৃদ্ধির সহায়তা করে। মস্তিষ্কের তলদেশে এক প্রকার অদ্ভুত পদার্থ আছে,—শারীরবিদ্গণ ইহাকে ইংরাজীতে Pituitary Body বলেন। মস্তিষ্কের এই অংশটি হইতেও এক প্রকার রস নির্গত হয়, পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে, ইহাও প্রাণীর অস্থি বৃদ্ধি করায়। এই রসের কার্য্য সম্বন্ধে সম্প্রতি যে সকল পরীক্ষা হইয়াছে, তাহা বড়ই বিস্ময়কর। সৈনিক হইয়া কোনও পল্টনে প্রবেশ করিতে হইলে পদপ্রার্থীর দৈহিক উচ্চতা কত তাহা সর্ব্বাগ্রে পরীক্ষা করা হয়। যে সকল প্রার্থীর উচ্চতা অল্প তাহাদিগকে সৈনিক-পদে নিযুক্ত করা হয় না। কিছু দিন পূর্ব্বে জনৈক যুবক খর্ব্বকায় বলিয়া নানা চেষ্টাতেও

সেনাদলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। দৈহিক উচ্চতার বৃদ্ধি করিবার কোনও উপায় না পাইয়া যুবকটি একজন সুচিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়াছিল। চিকিৎসক বুঝিয়াছিলেন, মস্তিষ্কের রস (Pituitary hormones) প্রচুর নির্গত না হওয়ায় যুবক খর্ব্বাকৃতি হইয়াছে। তিনি কয়েক মাস ধরিয়া গরু ও ভেড়ার মস্তিষ্ক-জাত ঐ রস যুবকের দেহের রক্তের সহিত মিশাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; সে এই চিকিৎসায় শীঘ্রই দীর্ঘাকৃতি লাভ করে। ইহা দ্বারা কেন কত লোক আজীবন খর্ব্বকায় থাকিয়া যায়, তাহা বুঝা যায়। বামনাকৃতি লোকদের মস্তিষ্ক-রস অতি অল্পই নির্গত হয়, তাই তাহারা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও উচ্চতায় বাড়ে না। দীর্ঘাবয়ব ব্যক্তির মস্তিষ্ক-রস প্রচুর নির্গত হয়; এই কারণে তাহার অস্থি অত্যন্ত পুষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার উচ্চতাও বাড়িতে থাকে।

প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদ্‌ও নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এ সম্বন্ধে গবেষণা করিতে গিয়া বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদের দেহেও বিশেষ বিশেষ গুণসম্পন্ন রসের পরিচয় পাইয়াছেন এবং এই সকল রসই যে দেহের নানা অংশে বিস্তৃত হইয়া বৃক্ষাদির বৃদ্ধি নিয়মিত করে, তাহা বুঝা যাইতেছে। উদ্ভিদের মূল অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, স্বভাবতঃই তাহাতে এক প্রকার রস উৎপন্ন হইতে আরম্ভ করে। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এই রস মূলের অযথা বৃদ্ধি রোধ করে।

আমরা প্রায়ই বৃক্ষের পত্রে, শাখা প্রশাখায় এবং কাণ্ডাদিতে ক্ষুদ্র বা বৃহৎ গোলাকার অংশ দেখিতে পাই। প্রাণীদিগের দেহের স্থানে স্থানে যেমন কখন কখন অনাবশ্যক মাংসপিণ্ড উৎপন্ন হইয়া "আভে"র সৃষ্টি করে, বৃক্ষদেহেও সে প্রকার "আভ" উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত গোলাকার অংশ-গুলিই বৃক্ষের "আভ"। এগুলির উৎপত্তিতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া, জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ উদ্ভিদের দেহে আর এক প্রকার রসের কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। এই রস উদ্ভিদের দেহ হইতে নির্গত হয় না; বাহির হইতে দেহে প্রবেশ করিয়া তাহা দেহের অযথা বৃদ্ধি করায়। পতঙ্গদিগের মধ্যে এক জাতি বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বা পত্রের ত্বক ভেদ করিয়া তাহাতে ডিম্ব প্রসব করে। এই সকল স্থানে থাকিয়া পরিণত হইলে সুঁয়ো পোকার আকারের কীট বহির্গত হয় এবং সেগুলি নিজেদের দেহ হইতে এক প্রকার লালা নির্গত করিতে আরম্ভ করে। এই লালা বৃক্ষের যে অংশ স্পর্শ করে, তাহা

অপর অংশের তুলনায় দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পতঙ্গ-বিশেষের দেহের রসই বৃক্ষের "আভে"র উৎপাদক।

* * *

ইতর প্রাণীর দেহ-বৃদ্ধিতে আরও বিচিত্রতা দেখা যায়। পতঙ্গ-জাতীয় প্রাণীদের দেহে পাখা উঠিলে তাহারা আর বাড়ে না। ডিম্ব হইতে বহির্গত হইয়া যখন ইহারা সুঁয়ো পোকার আকারে থাকে, সেই সময়েই ইহাদের বৃদ্ধির কাল। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, প্রজাপতি পিপীলিকা মক্ষিকা উই এবং ভ্রমর প্রভৃতি প্রাণী যতই আহার করুক না কেন, আহারে তাহাদের দেহের বৃদ্ধি হয় না; যখন সুঁয়ো পোকার আকারে থাকে, তখনই তাহাদের দেহের চরম বৃদ্ধি হয়।

মৎস্য বড়ই অদ্ভুত প্রাণী। জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ ইহাদের বৃদ্ধির সীমা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই; যত দিন পর্য্যন্ত ইহারা আহার করে এবং জীবিত থাকে, তত দিন ধরিয়াই ইহাদের দেহের বৃদ্ধি চলে। সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণীরও বৃদ্ধির সীমা নাই। কুম্ভীর সরীসৃপ-জাতিভুক্ত; দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে ইহারা প্রকাণ্ড আকার প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পক্ষী স্তন্যপায়ী প্রাণী; সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিলেও নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। কাঠবিড়াল স্তন্যপায়ী প্রাণী, তাহা কখনই বিড়ালের ন্যায় বৃহদাকার পায় না। কিন্তু পুঁটি মাছ দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া যদি পোনা মৎস্যের ন্যায় বৃহৎ হইয়া দাঁড়ায়, তাহাতে বিস্ময়ের কারণ থাকে না।

পরাজয়।

[শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

(১৬)

অনেকেই ভাবিয়াছিল, পৃথক্ হইলে মুরলীর বুকে বড় একটা আঘাত লাগিবে। কিন্তু পৃথক্ হইবার পর তাহার আঘাত লাগিবার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। সে যেমন ছিল ঠিক তেমনই রহিল; তাহার মুখে বিপদ্‌ বা শোকের সামান্যমাত্র চিহ্নও কেহ দেখিতে পাইল না।

সে চিহ্ন দেখা গেল শুধু গণেশের মুখে। গণেশ ভাবে নাই যে, এত সহজে পৃথক্ হওয়া যায়। পৃথক্ হইবার পর সে এ কথাটা বুঝিতে পারিল। যখন বুঝিল, তখন তাহার মনে হইল, সে নিজের মাথায় মুগুর মারে, অথবা মুগুর মারিয়া নিস্তারিণীর মাথাটা ভাঙ্গিয়া দেয়। কেন কি দোষে বড় বৌ তাহাকে পৃথক্ করিয়া দিল? কোন্ পাপে দাদার সহিত, বৌ দিদির সহিত তাহার সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল? গণেশের বুকটা যেন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু মনের এ ভাব সে মুখে প্রকাশ করিল না। মনে মনে সঙ্কল্প করিল, এই ঘর-ভাঙ্গান মেয়ে মানুষটাকে যদি জব্দ করিতে না পারি, তবে আমার নাম গণেশ হাজরাই নয়। পৃথক্ হইয়া অবধি সে নিস্তারিণীর সহিত কথাবার্ত্তা ছাড়িয়া দিল। সম্মুখে পড়িলে মুখ ফিরাইয়া লইয়া চলিয়া যাইত।

নিস্তারিণী এক দিন ছোট বৌকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা ছোট বৌ, গণশার কি হ'য়েছে?"

মহামায়া গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "হবে আবার কি?"

নিস্তারিণী বলিল, "কিছু হয় না তো ওর খাওয়ার অমন ছিরি হ'য়েছে কেন?"

মহা। কি ছিরি হ'য়েছে?

নিস্তা। তোদের কি চোখ নাই? পাতের কাছে বসে এই মাত্র, অর্দ্ধেক ভাত পাতে ফেলে উঠে যায়?

মহা। ক্ষিদে থাকে না।

নিস্তা। রোজ দু'বেলাই ক্ষিদে থাকে না?

মহা। কি জানি।

নিস্তারিণী একটু রাগিয়া বলিল, "মর্ ছুড়ী, তোরা জানবি না তো জানবে কি ও পাড়ার ক্ষান্তর পিসী? কিছু জিজ্ঞাসা করিস্ না?

তাচ্ছিল্যের সহিত মহামায়া বলিল, "না।"

নিস্তারিণী গালে হাত দিয়া বলিল, "ধন্যি মেয়ে তুই যা হোক! তা ঠাকুরঝিও কিছু বলে না?

মহা। কৈ, না।

মাতঙ্গিনী গা ধুইয়া বাড়ীতে ঢুকিতেছিল। এমন সময় বড় বোয়ের মুখে তাহার নাম শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে গা? ঠাকুরঝি কি ক'রেছে?"

মহামায়া বলিল, "দিদি বলছে—"

তাহাকে বলিবার অবসর না দিয়াই নিস্তারিণী বলিল, "বলছি, গণশা ভাল খায় না কেন? তোমরা কিছু জিজ্ঞাসা কর না?"

ঝঙ্কার দিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, "খেতে পারে না তাই খায় না। তার আবার জিজ্ঞাসা করবো কি?"

রাগতস্বরে নিস্তারিণী বলিল, "জিজ্ঞাসা করবে আমার মাথা! ছোট বৌই না হয় জানে না, কিন্তু তুমি তো জান ঠাকুরঝি, চিরকাল ওর অভ্যাস ধ'রে বেঁধে না খাওয়ালে পেট ভ'রে খায় না।"

পরুষকণ্ঠে মাতঙ্গিনী বলিল, "তোমার এত দরদ থাকে, তুমি এসে ধ'রে বেঁধে খাইও, আমার দ্বারা তা হবে না।"

মাতঙ্গিনী কাপড় ছাড়িতে ঘরে ঢুকিল। নিস্তারিণী একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

সেই দিন মহামায়া স্বামীকে বলিল, "দেখ রান্নাঘরের দাওয়াটা ঘিরে দিতে হবে।"

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

মহামায়া বলিল, "দাওয়ায় ব'সে খেতে হয়, পাঁচ জনের নজর পড়ে।"

গণেশ একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিল, "নজর দেবার মধ্যে তো আছ তুমি আর দিদি।"

মহা। বাড়ীতে কি আর কেউ নাই?

গণেশ। বৌদি আছে, তা তারও নজর পড়ে নাকি?

মহা। পড়ে ব'লেই তো বলছি।

ভ্রূভঙ্গী করিয়া গণেশ বলিল, "বড় খারাপ নজর। তোমার পেটের অসুখ হয়নি তো?"

মুখ ভার করিয়া মহামায়া বলিল, "আমার উপর নজর পড়তে যাবে কেন? যার উপর বেশী দরদ তার উপরেই নজর পড়ে।"

গণেশ বলিল, "ঠিক, তোমার উপর তার একটুও দরদ নাই বটে! তা আমার উপর নজর পড়েছে নাকি?"

মহা। তোমার খাওয়ার উপর পড়েছে।

গণেশ। কি রকম?

মহা। তুমি কতগুলি ভাত খাও, কম খাও কি বেশী খাও, এই সব লক্ষ্য করে।

গণেশ। কে বল্‌লে?

মহা। নিজেই আজ আমাকে বল্‌ছিলেন।

গণেশ। কি বল্‌ছিলেন?

মহা। বলছিলেন, তুমি এত কম ভাত খাও কেন, কোনও অসুখ হ'য়েছে নাকি।

গণেশ মাথাটা নীচু করিয়া গম্ভীরস্বরে উত্তর দিল, "হু।"

মহামায়া বলিল, "তাই বলছি, দাওয়াটা ঘিরে দাও।"

মুখ তুলিয়া গণেশ তীব্রকণ্ঠে বলিল, "শুধু দাওয়াটা ঘিরে দিলেই হবে? আর কিছু কর্‌তে হবে না?"

মহামায়া জিজ্ঞাসা করিল, "আর কি?"

মুখ বিকৃত করিয়া গণেশ রূঢ়স্বরে বলিল, "উঠানের মাঝে পাচিল?"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া মহামায়া বলিল, "তাই কি হবে না নাকি? যখন পৃথক্ হ'য়েছে—"

গণেশ পত্নীর মুখের উপর এমন একটা জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল যে, মহামায়া আর কথা শেষ করিতে পারিল না।

ইহার পর এক দিন গণেশ খাইতে বসিয়া পাতে মৎস্যের প্রাচুর্য্য দেখিয়া মাতঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, "এত মাছ কোথা হ'তে এল দিদি? কিনেছ নাকি?'

মাতঙ্গিনী বলিল, "না, দাদা একটা বড় রুই মাছ এনেছিল, তাই বড় বৌ দিয়ে গিয়েছে। তুই মুড়ো খেতে ভালবাসিস্ ব'লে মুড়োটা তোকে দিয়েছে।"

গণেশ অন্য তরকারী দিয়া আহার শেষ করিয়া উঠিল, মাছে হাতও দিল না। মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "মাছ খেলি না যে?"

রুক্ষস্বরে গণেশ বলিল, "তোমাদের দিয়ে গেছে তোমরা খাও, আমার এত দরদের দরকার নাই।"

মহামায়া বলিল, "আমি তো জানি ঠাকুরঝি, ও মাছ খাবে না। কেন বাবু এত দরদ দেখিয়ে দু'খানা মাছ দেওয়া? পোড়া মাছের তরে ভাত পর্য্যন্ত খাওয়া হ'লো না!"

মুরলীও তখন আপনার ঘরে খাইতে বসিয়াছিল। সে বড় বৌকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি মাছ দিয়ে এসেছিলে বড় বৌ?"

নিস্তারিণী আপনার লজ্জা ঢাকিবার অভিপ্রায়ে ঈষৎ স্বাগতভাবে বলিল,

"তা কি করি বল, এক রাশ মাছ এনেছ, কে খাবে? ফেলে দেব, তাই দিয়ে এসেছি। আর এক ঘর এক দোরে এমন দিতেও হয়।

মৃদু হাসিয়া মুরলী বলিল, "দিতে হ'লেও আর কখনো দিও না।"

গণেশ বড় বোয়ের দেওয়া মাছ খাইল না, বিশু কিন্তু কাকাবাবুর প্রদত্ত খাবার অসঙ্কুচিতচিত্তে উদ সাং করিত, বরং সময়ে সময়ে এজন্য কাকা বাবুকে এবং কাকী মাকে উত্যক্ত করিয়া তুলিত। নিস্তারিণী ইহা দেখিয়াও ছেলেকে নিষেধ করিত না। মহামায়ার কিন্তু ইহা অসহ্য বোধ হইত, মাঝে মাঝে দুই একটা টীপ্পনী কাটিতে ছাড়িত না। নিস্তারিণী তাহা শুনিয়াও শুনিত না।

সে দিন গণেশ স্কুল হইতে আসিয়া জল খাইতে বসিয়াছিল। এমন সময় বিশু আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং হাত পাতিয়া নাকি সুরে বলিতে লাগিল, "সন্দেশ, আমি সন্দেশ খাব কাকাবাবু।"

গণেশ সন্দেশটা লইয়া বিশুর হাতে দিতে যাইতেছিল। মহামায়া পান সাজিতেছিল। সে ফিরিয়া তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মাগো মা, এমন হ্যাংলা ছেলেও দেখি নি। কেবল হাঁ হাঁ খাই খাই, মানুষের একটু কিছু মুখে দেবারও যো নাই। কেন, গিন্নীর এত লম্বাচওড়া কথা, আর ছেলে ধ'রে রাখতে পারেন না।"

বিশু কিন্তু কাকীমার কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না; সে পূর্ব্ববৎ পা দুইটা নাচাইতে নাচাইতে হাত পাতিয়া বলিতে লাগিল, "সন্দেশ, ও "কাকাবাবু সন্দেশ।"

গণেশ রুক্ষদৃষ্টিতে একবার পত্নীর মুখের দিকে আর বার বিশুর মুখের দিকে চাহিল। তার পর হাতের সন্দেশটা নামাইয়া রাখিয়া বিশুর গালে ঠাস্ করিয়া এক চড় বসাইয়া দিল এবং গর্জ্জন করিয়া বলিল, "হতভাগা ছেলে, ঘরে খেতে পাস্ না? যা ঘরে যা।"

কাকা বাবুর নিকট এরূপ অপ্রত্যাশিত প্রহার লাভ করিয়া বিশু মুহূর্ত্তকাল হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল; তার পর সে দুই হাত দিয়া চোখ রগরাইতে রগরাইতে চলিয়া গেল। গণেশ এক নিঃশ্বাসে গ্লাসের জলটা গলায় ঢালিয়া দিয়া উঠিয়া পড়িল।

নিস্তারিণী ডাকিয়া বলিল, "তুমি বিশেকে মারলে ঠাকুরপো?"

গণেশ উগ্রস্বরে বলিল, "হাঁ, মেরেছি, বেশ করেছি। আমার কাছে আসে কেন? ধ'রে রাখতে পার না?"

নিস্তারিণী স্থিরস্বরে বলিল, "তোমার কাছে যেতে ধ'রে রাখবো? তুমি এতই পর ঠাকুরপো?"

চীৎকার করিয়া গণেশ বলিল, "একশো বার পর। এই আমি ব'লে রাখছি, আমি সকলের পর, আমার সঙ্গে কারো কোন সম্বন্ধ নাই।"

চীৎকার করিতে করিতে গণেশ বাড়ীর বাহির হইয়া গেল। নিস্তারিণী হাত দুইটা কোলের কাছে জড় করিয়া স্তম্ভিত নিস্পন্দ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

তুমি আর আমি।

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

হৃদয়-মাঝারে থাক তুমি মোর 'আমি,'
অনুপম চিরদিন প্রিয়তম স্বামী।
যাহা কিছু মিষ্ট হেথা—যা কিছু সুন্দর,
নয়নাভিরাম বিশ্বে চির-মনোহর,
বসন্ত-শরৎ-ঋতু নদ-নদী মাঝে,
শশি-সূর্য্য-তারকায় যত দীপ্তি রাজে,
সপ্তর্ষিমণ্ডলে আর রামধেনু বেশে,
বিহগ-কূজনে কিবা সঙ্গীতের রেশে,
মধুমত্ত পুষ্পগন্ধে;—ভোগ-বাসনায়,
জ্ঞানে কর্ম্মে জপে তপে দেবের পূজায়,
যাহা কিছু নিত্য সত্য ধ্রুব সনাতন,
সকলের প্রাণ তুমি—আমারো জীবন।
তা'র চেয়ে আরো মিষ্ট এই মোর 'আমি'
সকলের প্রিয়তম তুমি মোর স্বামী।
তাই ত ভেটিতে তোমা করিয়াছি মনে,
'তুমি-আমি' যোগাযোগ করি সঙ্গোপনে।
মিলিয়া তোমার সনে ওগো মোর স্বামী,
'আমি' হ'ব 'তুমি', আর 'তুমি' হবে 'আমি'।
তোমাতে আমাতে রব মরমে মরমে
জীবন-মরণ ভ'রে জনমে-জনমে।

পুস্তক-পরিচয়।

বিন্দুর বিয়ে।—(সচিত্র সামাজিক উপন্যাস)। শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত। প্রকাশক শ্রীবরেন্দ্রনাথ ঘোষ, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। রেশমী বাঁধাই; মূল্য দেড় টাকা।

গ্রন্থকার ভূমিকায় তিনটী কথা লিখিয়াছেন,—(১) 'বিন্দুর বিয়ে' সামাজিক উপন্যাস। সমাজে দোষ আছে, গুণও আছে। আমি কিন্তু গুণ অপেক্ষা দোষের ভাগটাই বেশী দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। (২) বাঙ্গালার সংক্রামক ব্যাধি ম্যালেরিয়া দূরীভূত না হইলেও তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে কমিশন বসে, অনুসন্ধান চলে, দূর করিবার চেষ্টাও হয়। কন্যাদায়ও এদেশের সংক্রামক সামাজিক ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহা যে কখনও দূরীভূত হইবে এমত বোধ হয় না। তথাপি তাহার সম্বন্ধে আলোচনা আবশ্যক। (৩) হিন্দু-সমাজে নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও যে মানুষ আছে, গোলাম বাগ্দীর দ্বারা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

গ্রন্থকার ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন,—তাহা অতি প্রয়োজনীয় কথা। আমাদের সমাজে যেরূপ দোষ ও ভণ্ডামি প্রবেশ করিয়াছে, তাহার মুখোস উন্মোচন করিয়া না দেখাইলে কোনও কালে উহার প্রতিকার হইবে না। সে ভার আমরা উপন্যাস ও নাটককারগণের হস্তে দিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারি। নারায়ণবাবু এ পোড়া দেশের কন্যাদায় দূরীভূত হইবার আশা অনেকটা ছাড়িয়া দিয়াছেন। কিন্তু ছাড়িলে চলিবে কেন? ইহার প্রতিকার-চেষ্টা তাঁহার মত উৎকৃষ্ট উপন্যাস-লেখককেই করিতে হইবে। ইদানীং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধারণা,—বাঙ্গালার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে মনুষ্যত্ব নাই; কারণ তাহারা অশিক্ষিত। যাহারা একথা বলেন, তাঁহারা বাঙ্গালার পল্লীসমাজের নিম্নশ্রেণীর প্রকৃত পরিচয় অবগত নহেন। নারায়ণবাবু কৌশলে আলোচ্য গ্রন্থখানির মধ্যে দেখাইয়াছেন,—তথা-কথিত শিক্ষার অভাবে মানুষ হৃদয়-হীন হয় না। গোলাম বাগ্দী নিরক্ষর, অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দু। কিন্তু তাহার যেরূপ হৃদয় আছে, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির তেমন নাই।

'বিন্দুর বিয়ে' আমাদের সমাজের নিখুঁত ছবি। এ ছবি আঁকায় বাহাদুরী আছে; মুন্সিয়ানা আছে। সূক্ষ্ম দৃষ্টি না থাকিলে এমন ছবি আঁকিতে পারা যায় না। আমরা ইহা পাঠ করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি।

কমলে কামিনী।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম-এ, বি-এল্।]

কবিত্ব-হিসাবে মুকুন্দরামের 'চণ্ডী' বঙ্গভাষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য না হইলেও দামুন্যার ব্রাহ্মণ কবি যে একজন প্রতিষ্ঠাবান কাব্য-প্রণেতা, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের 'চণ্ডী' বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র তিন চারি শত বৎসর যাবৎ গীত হইয়া সাধারণের মনোরঞ্জন ও লোকশিক্ষার সহায়তা করিয়াছে। গত ত্রিশ চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী সমাজে নব যুগের প্রভাব প্রকাশ পাওয়াতে চণ্ডীর গান ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছে সত্য; কিন্তু চণ্ডীকাব্য হইতে অনেকগুলি নাটকীয় বিষয় সংগৃহীত হইয়া যাত্রার আসর ও রঙ্গমঞ্চের জন্য কয়েকখানি দৃশ্যকাব্য রচিত হইয়াছে ও উহাদের অভিনয় এখনও পর্য্যন্ত চলিতেছে। কালকেতু, ফুল্লরা, খুল্লনা, শ্রীমন্তের মশান, কমলে কামিনী প্রভৃতি বাঙ্গালা নাটকের সহিত নাট্যামোদী বাঙ্গালী শ্রোতা ও দর্শক সুপরিচিত। মুকুন্দরাম সৌন্দর্য্য-বর্ণনার কৌশলে যে অদ্বিতীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সৌন্দর্য্যের উপর কবিত্বের ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়া তিনি চিত্র রচনা করিতে জানেন না, কিন্তু ঘটনাবলীর যথাযথ-বর্ণনে, সূক্ষ্ম চরিত্রাঙ্কণে তাঁহার কাব্য অননুকরণীয়। কল্পনা ও ভাবের আধিক্য যে কবির রচনায় বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয় না, সে কবির চিত্র যাহা সত্য তাহা সুস্পষ্টভাবে দেখাইতে পারে। মুকুন্দরামের চিত্রগুলি চারিশত বৎসরেও মলিন হয় নাই। তাঁহার চণ্ডীকাব্য পাঠ করিতে করিতে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালীর আকার, অবয়ব, হাব-ভাব, কথাবার্ত্তা পাঠককে জীবন্ত ভাবের উত্তেজনায় মুগ্ধ করে। অতিরঞ্জন বলিয়া যে জিনিষের প্রতি কবিরা পক্ষপাতী, মুকুন্দরামে তাহার অভাব পরিলক্ষিত হয়। স্বাভাবিকতা নষ্ট করিয়া মুকুন্দরাম তাঁহার চিত্র অঙ্কিত করেন নাই। দেশকালপাত্রভেদে চিত্র যেরূপ হওয়া উচিত, মুকুন্দরামের শিল্প-নৈপুণ্য সেইরূপ চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে।

যে সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে কবি বাহ্যবস্তুর যথাযথ বর্ণনে, সমসাময়িক ঘটনাবলীর সুস্পষ্ট বিকাশে সমর্থ হইয়াছেন, সে দৃষ্টি কি "কমলে কামিনী" অঙ্কিত করিবার সময় তমসাচ্ছন্ন হইয়াছিল? এই চিত্রের সমালোচকগণ একবাক্যে কবির সৌন্দর্য্যদৃষ্টির উপর তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যে লেখনী ঐতিহাসিক ও সাময়িক ঘটনা-বর্ণনে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, সে লেখনী কি "কমলে কামিনী"র সৌন্দর্য্য-রচনায় যথার্থই অপকৃষ্টতা প্রাপ্ত হইয়াছিল? আমাদের বোধ হয়, মুকুন্দরামের সমালোচকগণ তাঁহার প্রতি যে দোষারোপ করেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত নয়। কবি একটী অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্যময়ী পদ্মাসনা কামিনীকে গজোদ্গীরণ ও গজাহার করিতে দেখিয়াছেন, এই কথা বলিয়া সকলেই তাঁহার রুচির নিন্দা করিয়া থাকেন। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য হইতে আমরা এত অধিক প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের সমাচার প্রাপ্ত হই যে, একটু স্থির হইয়া "কমলে কামিনী"র বর্ণনীয় বিষয়টি পাঠ করিলে মনে হয় যে, তিনি এই কাল্পনিক চিত্র নিজে রচনা করেন নাই।

ধনপতি ওরফে শ্রীপতি সওদাগর ও তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত সিংহলের নিকটবর্ত্তী কালীদহে উপনীত হইয়া যে অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, তাঁহারাই নিজমুখে তাহা বর্ণন করিয়াছেন। কবি কেবল তাঁহার কাব্যের পাত্রের নিকট উক্ত দৃশ্যের বিবরণ শুনিয়া তাহার বিষয় কাব্যের মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দৃশ্য দেখিয়া আমরাও যেমন বিস্মিত হই, শ্রীপতি ও শ্রীমন্তও সেইরূপ বা তদধিক বিস্মিত হইয়াছিলেন। বণিকদ্বয়ের সমভিব্যাহারী নাবিকগণ এই দৃশ্য দেখিতে পায় নাই। সিংহলের রাজা শালিবাহন এই অদ্ভুত দৃশ্যের কথা শুনিয়া আদৌ তাহার সত্যতা সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন নাই। প্রমাণাভাবে শেষে পিতাপুত্রের যৎপরোনাস্তি নিগ্রহ হইয়াছিল। নাটকীয় ঘটনার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়া কবি যে নাটকের উদ্দেশ্য সফল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। এই ঘটনার প্রথমে কবি বলিয়া রাখিয়াছেন যে, দেবী মায়া প্রকাশ করিয়া শ্রীপতি ও শ্রীমন্তকে অভিভূত করিবার মানসে এই অদ্ভুত দৃশ্যের রচনা করিয়াছিলেন।

"রাত্রিদিন বায় ডিঙ্গা তিলেক নাহি রয়।
উপনীত সদাগর হৈল কালীদয়॥
পদ্মাবতী সঙ্গে যুক্তি করিয়া অভয়া।
শ্রীমন্তের ছলিবারে পাতিলেন মায়া॥

আপনি করিল মায়া হরের বনিতা।
চৌষট্টি যোগিনী হৈল কমলের পাতা॥
অমলা কমল হৈল পদ্মা করিবর।
হাসিতে লাগিল শতদলের উপর॥"

ধনপতির সিংহল-যাত্রার বর্ণনায় "হাসিতে" এই কথার পরিবর্ত্তে "ভাসিতে" দেখা যায়। এই পাঠান্তর ছাড়া দুইটী বর্ণনাই এক। মহামায়ার অদ্ভুত মায়াসৃষ্টির শক্তি সম্বন্ধে হিন্দু চিরকার বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। কোটী কোটী বঙ্গবাসী চণ্ডীর গান শুনিয়া "কমলে কামিনী"তে এই মায়ার প্রমাণ উপলব্ধি করিয়া কবির প্রতি কটাক্ষপাত করা দূরে থাকুক, বোধ হয় তাঁহার রচনা-কৌশলের সুখ্যাতি করিয়া দেবীর পাদপদ্মে ভক্তিপ্লুত হৃদয়ে আকৃষ্ট হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, মুকুন্দরাম এই অপূর্ব্ব দৃশ্যের সন্ধান কোথায় পাইলেন।

কুমার অনাথকৃষ্ণ দেব 'সাহিত্য-সভা' হইতে প্রকাশিত "বঙ্গের কবিতা" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে একটি শ্লোকে কালকেতু—গোধিকারূপে দেবীর ছলনা এবং সপুত্র সদাগর, শালিবাহন রাজা ও সমুদ্রে হস্তীগ্রাস-উদ্গীরণের কথা আছে। শ্লোকটি এই—

ত্বং কালকেতু বরদাচ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহননৃপাদ বণিজঃ সসূনো
রক্ষোঽম্বুজে করিচয়ং গ্রসন্তী বমন্তী॥"

তিনি বলেন, "এই উপপুরাণখানি কতদিনকার স্থিরতা নাই।" তাহা হইলেও, ইহা যে মুকুন্দরামের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে লিখিত তাহা সুনিশ্চিত। পণ্ডিতবর পঞ্চানন তর্করত্ন শ্লোকটির এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—"আপনি, কালকেতু ব্যাধকে বরদান করিয়াছেন, আপনি ছলে সুবর্ণগোধিকামূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছেন, আপনিই শুভা মঙ্গলচণ্ডিকা, আপনি মাতঙ্গ ভোজন ও উদ্গীরণ করতঃ কমলে-কামিনীরূপে শ্রীমন্ত সদাগর ও তৎপিতাকে শ্রীশালিবাহন রাজার হস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন।" শালিবাহন যদি শকাব্দা-প্রবর্ত্তক নরপতি হন, তাহা হইলে এই উপপুরাণখানি প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। মুকুন্দরাম তাঁহার সতীকাব্যে কালকেতু ও সপুত্র বণিকের যে উপাখ্যান লিখিয়াছেন তাহার মূলসূত্র উল্লিখিত শ্লোক হইতে তিনি নিঃসন্দেহ

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শালিবাহনের রাজ্য সিংহলে কোনও কালে ছিল কি না আমরা জানি না। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে তিনি যে প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন, তাহা ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। বণিকদ্বয়ের সমুদ্রযাত্রার বর্ণনায় মুকুন্দরাম যে কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মুকুন্দরাম কিন্তু গজগ্রাস ও গজবমন-বর্ণনায় বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণকে অনুসরণ করিয়াছেন। ধনপতি ও তাঁহার পুত্র যাহা দেখিয়াছিলেন মুকুন্দরাম তাহা বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন—

"কমলে কামিনী দেখি সুখে সাধু মুদে আঁখি কুসুম-নিকরোপরি পড়ে।
পুন সাধু মেলি আঁখি শতদলে শশীমুখী উগাড়িয়া গিলে করিবরে॥"

কর্ণধারকে সাক্ষী করিয়া বণিক বলিলেন—

"অপরূপ দেখ আর হের ভাই কর্ণধার কামিনী কমলে অবতার।
ধরি রামা বামকরে সংহারয়ে করিবরে উগারয়ে করয়ে সংহার॥"

কর্ণধার কিছুই দেখিতে পাইল না। বণিক আবার তাহাকে বলিলেন—

"হেলায় কমলিনী উগারে যূথনাথে।
পলাইতে চাহে গজ ধরে বামহাতে॥
পুনরপি রামা তায় করয়ে গরাস।
দেখিয়া আমার হৃদে লাগয়ে তরাস॥
পুরুষ দেখিয়া বামা নাহি বাসে লাজ।
বামকরে ধরিয়া গিলয়ে গজরাজ॥
খদির তাম্বুলরাগ ওষ্ঠেতে না ছাড়ে।
গজ গিলে কামিনী চুহাল নাহি নাড়ে॥
অগাধ সলিলে ভাসে বিচিত্র কানন।
পঞ্চম গায়েন অলি নাচে পিকগণ॥"

যখন "অন্য কেহ নাহি দেখে নায়ের নফর," তখন বণিক বুঝিলেন যে, এই অদ্ভুত ব্যাপার দেবতার কার্য্য ছাড়া আর কিছুই নয়। বালক কৃষ্ণের মুখের ভিতর যশোদা যেমন "সলিল পর্ব্বত সিন্ধু ধরণীমণ্ডল" দেখিয়াছিলেন,

"তেন মতে ছলে মোরে কেমন দেবতা।
নহে কি কামিনী হৈয়া গিলে গজ মাতা॥"

এই "কমলে কামিনী"-দর্শনের সমস্ত ঘটনা বণিকদ্বয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

"রাজার সভায় থাকে যত সভাজন।
অবশ্য জানিবে তারা এসব কথন॥
পত্রে তুলি নিল সাধু করিয়া লিখন।
কহিব রাজার আগে সব বিবরণ॥"

ধনপতি ও তাঁহার পুত্র রাজার নিকট এই "কমলে কামিনী"র ব্যাপার সপ্রমাণ করিতে অসমর্থ হওয়ায় উভয়েই কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। শেষে কিন্তু তাঁহারা মহামায়ার কৃপায় সকল বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে, চণ্ডীর কৃপায় শালিবাহন রাজাও "কমলে কামিনী" দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। সিংহলদ্বীপের মধ্যেই মাতা চণ্ডিকা "কমলে কামিনী" সৃজন করিয়া মায়ার প্রভাব দেখাইয়াছিলেন।

"মায়াময় হৈল নদ তথি বহে কালীহ্রদ দুকূল হানিয়া বহে জল।
ভুবনমোহন নারী উগারিয়া গিলে করী, অধিষ্ঠান হৈল কমল॥"

দেবীর মায়ার কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের শ্লোকের সহিত মুকুন্দরামের বর্ণনার যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে, সে কথাও বলা হইয়াছে। এখন দেখা যাউক, উক্ত পুরাণের ও মুকুন্দরামের বর্ণনার সহিত আরও কোনও বিষয়ের ঐক্য সংস্থাপন করা যায় কি না। প্রাচীন বঙ্গীয় সাহিত্যে সমুদ্রযাত্রার বর্ণনা মুকুন্দরাম ব্যতীত আর কোনও কবি করেন নাই। চণ্ডী কাব্যে জলদস্যু, হার্ম্মদ (armada) ও অন্যান্য নানা তথ্য অবগত হওয়া যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে সমুদ্রযাত্রা যে বাঙ্গালীর পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল, ইহা এক্ষণে কেহই স্বীকার করেন না। বর্ত্তমান সময়ে সাহিত্যিক ও সমালোচক উভয়েই মুকুন্দরামের দোহাই দিয়া প্রাচীন কালে বাঙ্গালীর বাণিজ্য-বিস্তারের কথা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া গৌরব প্রকাশ করেন। বাঙ্গালীরা যে য়ুরোপীয়গণের এদেশে আগমনের সমকালে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সুদূর সিংহলে বাণিজ্যার্থ গমন করিতেন, একথা যদি অবিসম্বাদী হয়, তাহা হইলে তৎকালীন য়ুরোপীয় বণিকগণের সহিত তাঁহাদের যে কতকটা ঘনিষ্ঠতা ছিল তাহাও অনুমান করা যায়। সমুদ্র-যাত্রীর যে সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া স্বাভাবিক তাহাও যে তখনকার বাঙ্গালী বণিকগণ জানিতেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। অধিকন্তু, সমুদ্র সম্বন্ধে নানা-বিষয়ক জ্ঞান কিম্বদন্তীর সাহায্যে পুষ্টি লাভ করিয়া বাঙ্গালীর জ্ঞানভাণ্ডার যে পূর্ণতর করিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য হইতে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের প্রাচীন ইতিহাস হইতে বর্ত্তমান যুগে

ঐতিহাসিকগণ অবগত হইয়াছেন যে, অতি পূর্ব্বকালেও ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গপ্রদেশের পাশ্চাত্যদিগের সহিত বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। লোকপরম্পরায় সেইজন্য সামুদ্রিক নানা ব্যাপার যে এদেশে সুধীসমাজে অপরিজ্ঞাত ছিল না তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। "ফাটা মর্গনা" (Fata Margana) ও অন্যান্য অলৌকিক জলদৃশ্যের কথা যে মুকুন্দরাম শুনেন নাই, তাহা কে বলিতে পারে? প্রসিদ্ধ সমুদ্রতত্ত্ববিৎ য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা নাবিকগণের নিকট সমুদ্রের স্থানবিশেষের অদ্ভুত দৃশ্যের কথা ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্রাণ্ড (Brande), জার্ডিন (Jardine) ও অন্যান্য লেখকগণ ফাটা মর্গানার যে বিবরণ লিখিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভূমধ্য সাগরে সিসিলি নামক দ্বীপের নিকট মেসিনা উপসাগরে নাবিকগণ তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপর মনোহর মায়াপুরী দর্শন করিয়া বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। পদার্থতত্ত্ববিৎ বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, সূর্য্যরশ্মির উত্তাপে সমুদ্রজলের উপর স্থানবিশেষে বাষ্প উত্থিত হইয়া দূরবর্ত্তী উপকূলস্থিত নগর, উদ্যান ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতিবিম্বন হয়; তাহাতেই উক্তরূপ ভ্রান্তিজনক মায়াপুরীর সৃজন হয়। মরুভূমিতে মৃগতৃষার ন্যায় সমুদ্রেও এইরূপে নাবিকের ভ্রান্তিবিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। অনেক সময়ে প্রবল বায়ুর প্রভাব হইতে অর্ণবপোতকে রক্ষা করিবার জন্য উল্লিখিত মায়াদৃশ্যের দিকে অগ্রসর হইয়া নাবিকগণ বিপদে পড়িয়া থাকে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সকল যথার্থ ঘটনার মূলে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহার উপর নির্ভর করিয়া মুকুন্দরাম কি বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণোক্ত "কমলে কামিনী"র চিত্র ও আনুসঙ্গিক ঘটনা কল্পনা করিতে পারেন নাই? সমুদ্রতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পাঠকগণ জানেন যে, য়ুরোপীয় বণিকজাতিমাত্রেরই অভিধানে হস্তী, অশ্ব, বৃষ প্রভৃতি বৃহদাকার পশুগণের নামোল্লেখে নানা জাতীয় সমুদ্রচর প্রাণীর বিবরণ পাওয়া যায়। এই সকল জীব বাস্তবিক সীল (Seal) ও বিবিধ প্রকার মৎস্যজাতীয়। মারমেড্ (Mermaid) নামে এক প্রকার অর্দ্ধনারী ও অর্দ্ধমৎস্যদেহবিশিষ্ট প্রাণীর কথা পুরাবৃত্তে পাঠ করা যায়। প্রাচীন গ্রীক কাব্যে এই প্রকার কিন্নরীর কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। সমুদ্রচর দানবের কথাও কোনও ইতিহাসে লেখা আছে। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মুকুন্দরামের "কমলে কামিনী" উদ্ভট রচনা বলিয়া বোধ হয় না। হয়ত কবি তাঁহার কাব্য-রচনাকালে পুরাণোক্ত বহু পুরাতন একটি প্রচলিত কিম্বদন্তী তাঁহার কাব্যের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। যখন বহুদিন ধরিয়া এই চিত্র অসংখ্য নর-নারীর

চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে, তখন ইহা যে একেবারে অপদার্থ তাহা হইতেই পারে না। কবির জীবন-কালে ইহার প্রতিবাদ হইলে মুকুন্দরাম বোধ হয় এই অদ্ভুত দৃশ্যে গজাহার ও গজবমন ব্যাপার পরিত্যাগ করিয়া অত্যুজ্জ্বল চিত্রে তাঁহার সুবিখ্যাত কাব্যের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতেন। আধুনিক যুগের ইংরেজি আদর্শে শিক্ষিত হিন্দু বা ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান সমালোচকদিগের রুচির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মুকুন্দরাম "কমলে কামিনী" রচনা করেন নাই বলিয়া তাঁহার দোষ দেওয়া যায় না। ইংরেজ কবি সেক্সপীয়র ও জারমান কবি গেটে তাঁহাদের কাব্যে অনেক অলৌকিক ঘটনা ও দৃশ্যের অবতারণা করিয়াছেন। কবিরা বাস্তবিক তাঁহাদের সমসাময়িক আদর্শে চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে মুদ্রাঙ্কণশিল্প যখন এদেশে সর্ব্বপ্রথম আমদানি হয়, তখনও পাঠক "কমলে কামিনী"তে বিকৃত রুচির পরিচয় পান নাই। এই সময়কার চিত্রসম্বলিত মুদ্রিত চণ্ডীকাব্যে "কমলে কামিনী"র যে চিত্র দেখা যায় তাহাতে শিল্পী পদ্মাসনা গণেশ-জননীর কল্পনা করিয়াছেন। দেবীর বামাঙ্কে উপবিষ্ট গজানানের চিত্র দেখিলে বুঝা যায় যে, মুকুন্দরামের দুই তিন শত বৎসর পরে যখন বাঙ্গালীর পক্ষে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, সে সময়ে তাহাদের আদর্শের কতকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত "কমলে কামিনী"তে হিন্দু মহাশক্তির যতটা শক্তি নিজের আদর্শে কল্পনা করিয়াছে, তদ্বিষয়ে ভাবিয়া দেখিলে আমাদের সামাজিক অবস্থা ও ধর্ম্মজীবনের একটা ধারাবাহিক সমাচার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস্ ভারতের যে বিবরণ লিখিয়াছিলেন তাহাতে সিংহল দ্বীপের উল্লেখ আছে এবং উক্ত দ্বীপ যে অসংখ্য হস্তীর জন্মস্থান তাহাও স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। চতুর্থ খৃষ্টাব্দের শেষে চীন পরিব্রাজক ফা হিন্ তাম্রলিপ্ত বা বর্ত্তমান তমলুক হইতে নৌকায় আরোহণ করিয়া সিংহলে গিয়াছিলেন। এদেশীয় নাবিকগণ তাঁহাকে সিংহলে লইয়া গিয়াছিল। উক্তদ্বীপে দুই বৎসর অবস্থান করিবার পর তিনি হিন্দু নাবিকদিগের দ্বারা চালিত নৌকায় আরোহণ করিয়া যাভা (Java) দ্বীপ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, যবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী বালি ও লম্বক দ্বীপে বর্ত্তমান কালে প্রায় দশ লক্ষ হিন্দু বাস করিতেছে। তাঁহার মতে দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে হিন্দুগণ পৃথিবীর নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন রোমান

ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, সেই সময়ে হিন্দুগণ জার্ম্মানি ও য়ুরোপের অন্যান্য স্থানে নৌকাযোগে গমন করিতেন। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বঙ্গাধিপ সিংহবাহুর পুত্র বিজয়সিংহ ৫৩৪ খৃষ্ট-পূর্ব্বে লঙ্কাদ্বীপ জয় করিয়া তথায় হিন্দু সভ্যতা স্থাপন করেন। এইসকল বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণোক্ত শ্লোকে গজাহার ও গজবমনের যে ব্যাপার লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার সহিত প্রাচীন-কালের সমুদ্রযাত্রা-বিষয়ক কোনও ঘটনার বা কিম্বদন্তীর যে একেবারে কোনও রূপ সম্বন্ধ নাই তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যায়? উপপুরাণগুলিতে ঐতিহাসিক-কিম্বদন্তীমূলক অনেক কথা প্রচ্ছন্নভাবে স্থান পাইয়াছে। সমুদ্রে মায়া-দৃশ্যের ব্যাপার যে অতি প্রাচীনকালে পুরাণ-রচয়িতার অবিদিত ছিল তাহাই বা কিরূপে বলা যাইতে পারে? মুকুন্দরাম যদি মহামায়ার মায়া বর্ণন করিবার জন্য এরূপ একটী পুরাণোক্ত মায়া-দৃশ্যের চিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি হিন্দু কবির পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া সঙ্গত কার্য্যই করিয়াছেন।

অনুপমার আবদার।

[লেখক—নিমচাঁদ]

অনুপমা রূপে গুণে অনুপমা। সদানন্দ বাবুর বড় মেয়ে প্রমীলা অনেকটা হাব্‌লা গোছের, হাও হাও করিয়া বকে, সামান্য কথায় কাঁদিতে থাকে; আর তার আবদারের সময় অসময় নাই। অনুপমা চুপ করিয়া আপন মনে বই পড়ে, ঘরের কাজ-কর্ম্ম করে; কিন্তু যখন সে আবদার ধরে তখন সদানন্দবাবু বুঝিতে পারেন যে, মা সরস্বতী তাহার জিহ্বায় আসন পাতিয়াছেন। অনুপমার বয়স যখন চারি বৎসর মাত্র, তখন সদানন্দ বাবুর অবস্থা এত মন্দ যে, তাহা লিখিয়া বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার সেই দুরবস্থার সময় একখানা নূতন গামছা বাড়ি থেকে চুরী যায়। গৃহস্বামীর মনের শান্তি তাহাতে যে কতটা কমিয়া গিয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। অনুপমা বলিল, "বাবা, রোজ দাড়ি কাট কেন? তাই ত গামছা চুরী গেছে।"

সদানন্দ বাবু মেয়ের কথা শুনিয়া একটু চুপ করিয়া রহিলেন; তার পর বলিলেন, "আচ্ছা মা, আর দাড়ি কাটব না।" ক্ষৌরকার্য্য বন্ধ করিয়া সদানন্দবাবু ছুরীর সাহায্যে হাতের পায়ের নখ কাটিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দুই মাসের মধ্যে বেশ মানানসই দাড়ি গজাইল, গামছার দাম উঠিয়া গেল। তবে একটা নিয়মের অধীন হওয়াতে সদানন্দ বাবুর স্বভাবে যেন একটু কৃপণতার ভাব দেখা দিল। তিনি কাহারও দাড়ি দেখিলেই মনে করিতেন যে, বুঝি তাহার গামছা না হয় আর কিছু চুরী গিয়াছে। একদিন ট্রাম গাড়ীতে এক ভদ্র লোকের আবক্ষ দাড়ি দেখিয়া তাঁহাকে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "মহাশয় আপনার আলোয়ানের দাম কি এতদিনেও আদায় হয় নাই?" অপরিচিত ব্যক্তি সদানন্দ বাবুর কথায় অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। সদানন্দ বাবু ছাড়িবার পাত্র নন। তিনি বলিলেন, "মহাশয় ইহাতে লজ্জা কি! ভাঙ্গিয়া বলুন না যদি গামছার দাম তুলিতে দুই ইঞ্চি দাড়ি রাখিবার দরকার হয়, তা হ'লে আলোয়ান কি শালের দাম তুলিতে নিশ্চয়ই এত লম্বা চওড়া দাড়ি রাখিতে হয়।"

প্রমীলার বিয়ের সময় সদানন্দ বাবু অনুপমার সুবুদ্ধির আর একটু পরিচয় পাইয়াছিলেন। সম্বন্ধ ত অনেক আসিতে লাগিল; কিন্তু দেনা-পাওনার কথা উঠিলেই সদানন্দ বাবুর মাথা ঘুরিয়া যাইত। কলিকাতায় একখানি ছোট দোতলা বাড়ী, পঞ্চাশ টাকা মাহিনার চাকরি আর তাহার উপর দুইটি অবিবাহিতা কন্যা থাকিলে যা' হয় সদানন্দ বাবুর তাহাই হইল। তিনি গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিলেন যে, বাড়ী ত বন্ধক পড়িবেই; কিন্তু উপযুক্ত পাত্র না জুটিলে প্রমীলার বিয়ে দেওয়া হইবে না। প্রমীলার বর খুঁজিতে খুঁজিতে দু' বছর কাটিয়া গেল। বিয়ের বাজার ক্রমে গরম হইতে লাগিল। শেষে সদানন্দ বাবুর এমন অবস্থা হইল যে, আসল ও মেকি চিনিবার ক্ষমতা লোপ পাইল। একবার একটা সম্বন্ধ আসিল ফেলওয়ালা ছেলে। সদানন্দ বাবু মনে করিলেন যে কমে হইবে। বরের পণের কথা জিজ্ঞাসা করাতে ঘটক মহাশয় রজনীকান্ত সেনের "বাণী" নামক গানের বইখানি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন যে, ইহার মধ্যে ফর্দ্দ ছাপা আছে। সদানন্দ বাবু এই নূতন ফ্যাসানের প্রস্তাবে কতকটা বিস্মিত হইয়া পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া দেখিলেন যে, একটী গানের কয়েক ছত্র লাল-নীল পেন্সিলে দাগ দেওয়া। চিহ্নিত লাইনগুলি সদানন্দ বাবু পড়িতে লাগিলেন—

"কন্যাদায়ে বিব্রত হয়েছ বিলক্ষণ;
তাই বুঝে সংক্ষেপে করছি ফর্দ্দ সমাপন।
নগদে চাই তিনটি হাজার,
তাতেই আবার গিন্নি ব্যাজার—
বলেন, এবার বরের বাজার কমা কি রকম!

*　　*　　*

আর পড়ার খরচ মাসে তিরিশ,
হয় না কমে, বলে হরিশ,
কাজেই সেটা, হ্যা হ্যা, বেশী বলা অকারণ।
সোণার চেন ঘড়ি, আইভরি ছড়ি,
ডায়মণ্ড কাটা সোণার বোতাম,
দিও এক সেট কতই বা দাম,
হ্যাদ্দ্যাখো, ধরনি চশমা, কেমন ভুলো মন—

*　　*　　*

ছাতি বুরুশ আয়না চিরুণ,
ফুলকাটা সার্ট, কোট পেণ্টুলন,
দুজোড়া শাল, সার্জের চাদর, গরদ, সুচিকণ।
জমকাল র‍্যাপার, আতর ল্যাভেণ্ডার,
থান পনের দিশি ধুতি, রেশমি না হয় দিও সূতী,
ফুল এষ্টাকিং রেশমি রুমাল দিও দু' ডজন,
টেবিল চেয়ার আলনা ডেক্‌স,
হাতির দাঁতের হাত বাক্‌স,
আর ষ্টীল ট্রাঙ্ক খুব বড় দুটো যা' দেশেরি চলন,
আর তারি সঙ্গে পূরো এক সেট রূপোরি বাসন।

*　　*　　*

আর গিন্নি বলেন বাউটী সুটে,
রূপলাবণ্য উঠে ফুটে,
একশ ভরি হ'লেই হবে—

যেন আপনার দেখে,
নিন্দে করে না লোকে,
দিও বেনারশী বোম্বাই,
ফর্দ্দ কিছু হ'ল লম্বাই,
তা, তোমার মেয়ে, তোমার জামাই, তোমার আকিঞ্চন।
আমার কি ভাই, আজ বাদে কাল মুদবো দু' নয়ন॥

* * *

আবার আসবে কুলীন দল,
তাদের চাই বিলাতী জল,
ডজন বিশেক হুইস্কি রেখো,
নইলে বড় প্রমাদ দেখো,
কি ক'রব ভাই দেশের আজকাল এমনি চাল চালন।
কিন্তু চক্ষুলজ্জায় বাধ বাধ লাগ্‌ছে যে কেমন!"

ফর্দ্দ পড়িয়া সদানন্দ বাবুর হাড় জ্বলিয়া উঠিল। অনুপমা বলিল, "বাবা, বরের দাঁতগুলো যেন সিন্ধুঘোটকের মত, দিদির সঙ্গে বিয়ে দিও না।" সদানন্দ বাবু ঘটককে বলিলেন, "না, আমি সিন্ধুঘোটকের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেব না।" পরে জানা গেল যে, একজন ধনী সেই সিন্ধুঘোটকটি দশ হাজার টাকায় খরিদ করিয়াছেন! প্রমীলার বিয়ের আর একটা সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল; কিন্তু অনুপমা বলিল, "বাবা, বরের গায়ে এত লোম যে দেখ্‌লে ভয় করে।" সে সম্বন্ধও ভাঙ্গিয়া গেল। এই ভাবে অনুপমা অনেকগুলি ঘাড়ে-গর্দ্দানে, মাকুন্দে, কোটর-চোখো, ভুঁড়িয়াল, তিনটে পাশে দুবার ফেল ইত্যাদি বরের রূপ-গুণের নানা রকম দোষ দেখাইয়া প্রমীলার বিয়ের ফুল ফুটিতে দিল না। বাজারে এমন একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল যে, সদানন্দ বাবুর মেয়ের বিয়ে দেওয়া দায় হইয়া উঠিল। ঘটক-ঘটকীরা তাঁহাকে বয়কট্ করিবার মতলব করিল। এক দিন সত্য সত্যই তাহাদের সঙ্গে সদানন্দ বাবুর ভয়ানক বাক-বিতণ্ডা হইয়া শেষে হাতা-হাতি হইবার উপক্রম হয়। সদানন্দ বাবু বলেন, "কেন, টাকা দিয়ে কি উট, বাঁদর, শজারু কিন্‌তে হবে; ক'নেদের বুঝি একটা ভাল-মন্দ বিচার করবার এক্তিয়ার নাই? সুরূপা মেয়ে কি কুৎসিত বরের যুগ্যি?" ঘটকীরা এই কথায় সদানন্দ বাবুর পক্ষ সমর্থন করাতে ঘটকের দল হটিয়া গেল। অতঃপর ঘটকীর দল একজোট হইয়া

সদানন্দ বাবুকে কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করিল। রোক পাঁচ হাজার টাকা ; কিন্তু হাল ফ্যাশনে সেই টাকাটা অগ্রিম দেয়, এইরূপ স্থির হইল। সদানন্দবাবু প্রথমে আপত্তি করিয়া বলেন যে, এই ফ্যাশন এখনও সকল শ্রেণীর মধ্যে চল্‌তি হয় নাই। শেষে দুই চারিটা কলিকাতার বড় ঘরের নজির দেখাইয়া তাঁহাকে বর পক্ষেরা রাজি হইতে বাধ্য করিলেন। সালিশীরা সব গোলমাল মীমাংসা করিয়া দিলে উকিলের বাড়িতে লেখাপড়া হইয়া গেল। টাকাটা এক জন মাতব্বরের কাছে জমা রহিল, বিয়ের রাত্রে নামমাত্র আসরে দেখাইয়া বরের বাপকে দেওয়া হইবে স্থির হইল। সদানন্দ বাবু অনেক কান্না-কাটা করাতে বরকর্ত্তা কুড়িজন মাত্র বরযাত্রীর ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। গায়ে হলুদের আড়ম্বর হইবে না। ফুলসজ্জার তত্ত্বের মূল্য বরের বাপ উক্ত পাঁচ হাজার টাকার সঙ্গে ধরিয়া লওয়াতে সদানন্দ বাবু এক দফা ঝঞ্ঝাটের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

যেদিন গায়ে হলুদ, সেদিন সকাল বেলা সদানন্দ বাবুর বৈবাহিক খবর পাঠাইলেন যে, বরের মায়ের জেদ রক্ষা করিতে নিয়মমত গায়ে হলুদের তত্ত্বের বন্দোবস্ত করিতে তিনি বাধ্য হইয়া পড়িয়াছেন আর সেই জন্য কুড়ি জন বরযাত্রীর পরিবর্ত্তে তিনি এক শত কুড়ি জনকে লইয়া যাইতে চাহেন। সদানন্দবাবু চুক্তি খেলাপের উল্লেখ করাতে তাঁহার বৈবাহিক উকিলের চিঠি দিতে বাধ্য হন এবং আইনের কথা তুলিয়া খেসারত দাবী করিবার ভয় দেখাইতেও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সদানন্দ বাবু মহাবিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি কাবুলির নিকট হ্যাণ্ডনোটে টাকা ধার করিবার মতলব করিলেন। অনুপমা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া আবদার করিয়া বলিল, "বাবা, আমার পুতুলের সঙ্গে স'য়ের পুতুলের বিয়ে দেবেন?" সদানন্দবাবু মেয়ের আবদার শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। একটু চুপ করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন, তার পর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ, ভাল কথা, দুপুর বেলা প্রমীলার বিয়ের গায়ে হলুদের তত্ত্ব আস্‌বে, বিকেল বেলা তোমার পুতুল ছেলে বিয়ে কর্‌তে যাবে।"

অনুপমা বরকে সাজাইয়া টিনের পাল্কির ভিতর বসাইয়া রাখিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক জন বেহারা বর-সমেত সেই পাল্কিখানা একটা ট্রের উপর বসাইয়া মাথায় করিয়া ক'নের বাড়িতে চলিল। এক ঢোল ও এক কাঁসি লইয়া এক জন সানায়ে শোভা-যাত্রায় যোগ দিয়াছিল। বরযাত্রী

কেহ ছিল না। শুনা যায়, এত তাড়াতাড়ি বিয়ের কথা পাকিয়া উঠিলেও অনুপমার পুতুলের বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়াছিল। অনুপমার সই মিত্তিরদের সেজবাবুর বড় মেয়ে। দুজনে এক স্কুলে পড়িত, গলায় গলায় ভাব, তাই না কি অনুপমা হঠাৎ এই বিবাহের প্রস্তাব করিয়া সৌহার্দ্দ্যের সহিত কুটুম্বিতার মিলন ঘটাইয়াছিল। বিয়ের পরদিন সকালে বর ক'নে যখন মিত্তিরদের বাড়ী থেকে আসে, তখন রাস্তার দুধারে হাজার হাজার লোকের ভিড় জমিয়া গিয়াছিল। বর রাত্রের মধ্যেই চেহারা বদলাইয়া ফেলিয়াছিল। অনুপমার ছোট মাটির পুতুলটি বিয়ে করিয়াই সাহেব বাড়ির ফরমাশি প্রকাণ্ড এক কাচের পুতুলে পরিণত হইয়াছিল। বড় মানুষের বাড়িতে বিয়ে করিলে এ রকম পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক। রোগা লোক পুলিশ মিউনিসিপ্যালিটি নিমকি ও আবগারি বিভাগে বড় চাকরি পাইলে তবু মোটা হইতে দেরী হয়, কিন্তু অনেক গরীবের বাছা পয়সাওয়ালা শ্বশুরের আদরে অনতিবিলম্বে কৃশতার অভিশাপ হইতে মুক্তি লাভ করে।

সদানন্দ বাবু সকাল বেলা দেখিলেন যে, পাড়ার লোক বড় রাস্তার দিকে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, মোটর গাড়ীতে একজনদের পুতুল বর ও পুতুল ক'নে আসছে, সঙ্গে মাদ্রাজি বাজনা, গোরার বাজনা, পুতুলনাচ ইত্যাদি। তিনি অনুপমাকে লইয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, গুজব মিথ্যা নয়। অনুপমা স'য়ের বাড়ির লাল পাগড়ি ও আশাসোঁটাধারী দরওয়ান ও বেহারাদিগকে দেখিয়াই বুঝিল যে, তাহারই পুতুল ছেলে নববধূকে হাওয়া গাড়িতে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছে। সে ছুটিয়া বাড়ির দরজায় ফিরিয়া আসিয়া বৌ-বেটাকে কোলে করিবার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। কলিকাতায় এ রকম দৃশ্য কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই। রাস্তায় স্থানে স্থানে লোক জমাট বাঁধিয়া নানা প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতেছিল। এক জন বলিল, "বোধ হয় বাল্যবিবাহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পুতুলের বিবাহ দিয়াছে।" আর এক জন বলিল, "তা নয়, পুতুলের মত সাজাইয়া রঙ্গ-বেরঙ্গের বর ক'নেকে রাস্তা দিয়ে খোলা গাড়িতে নিয়ে যাবার নূতন ফ্যাশনকে লক্ষ্য করিয়া এই বিবাহের কল্পনা হয়েছে।" দুচার জন বলিতেছিল যে, বর ত দিন কতক পরে কলম পিশিয়া বিশ চল্লিশ কি পঞ্চাশ একশ টাকা রোজগার করবে, তাই নবাবী ধরণের শোভাযাত্রার প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া পুতুলের জাতি বাঙ্গালীকে বিদ্রূপ করিয়া এই

বিবাহের কল্পনা হয়েছে।" যাহার যাহা মনে আসিতেছিল, সে তাই বলিয়া অনুপমার পুতুল বৌ ও পুতুল ছেলের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। লোকে যাহাই বলুক, প্রমীলার যেদিন বিয়ে, সে দিন সকালে অনুপমার বিয়ান ফুলসজ্জার যে তত্ত্ব পাঠাইয়াছিল তাহাতে একশ লোক খাওয়ান চলে। সদানন্দ বাবুকে সেই জন্য কাবুলির নিকট দুই আনা সুদে টাকা ধার করিতে হইল না।

সদানন্দ বাবু বাড়ি বন্দক দিয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইলেন বটে, কিন্তু দুমাস পরে পূজার তত্ত্বের টাকা যোগাড় করিয়া উঠিতে পারিলেন না। পিতৃমাতৃদায়ে বরং বাৎসরিক শ্রাদ্ধের জন্য লোকে এক বৎসর সময় পায়; কিন্তু কন্যার বিবাহের পর নূতন জামাইকে পূজার ও শীতের তত্ত্ব করিবার জন্য মেয়ের বাপকে এক বৎসরের মধ্যে দুইবার নিজের আদ্য শ্রাদ্ধের যোগাড় করিতে হয়। সদানন্দ বাবু জারমান আপিসে চাকরি করিতেন। যুদ্ধঘোষণা হওয়াতে আপিস উঠিয়া যায়। সদানন্দ বাবু দেনার জ্বালায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। প্রমীলার যখন বিয়ে হয়, তখন তার বর ডিম্ব প্রসব করে নাই। বিয়ের পর যখন পাশের ফল বাহির হইল, তখন গেজেটে তাহার নাম খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। এমন অবস্থায় জাঁকাল গোছের পূজার তত্ত্ব না করিলে শ্বশুর-বাড়িতে প্রমীলার যে দুর্দ্দশা হইবে, তাহা সদানন্দ বাবু ও তাঁহার স্ত্রী বেশ বুঝিয়াছিলেন। বিয়ের পরে যেমন কুটুম চেনা যায়, বিয়ের আগে যদি সে রকম চেনা যাইত, তাহা হইলে সদানন্দবাবু কখনও ভাঁড়ু দত্তের ছেলের সঙ্গে প্রমীলার বিয়ে দিতেন না। প্রমীলার শ্বশুর-শাশুড়ী যখন জানিতে পারিলেন যে, সদানন্দ বাবু বাড়ি বন্দক দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, তখন তাঁহারা বলিয়া পাঠান যে, একথা আগে টের পাইলে তাঁহারা প্রমীলার সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতেন না। যে দেউলিয়া তার মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিবাহ দিলে যে সে ছেলে ফেল হইবে, তার আর আশ্চর্য্য কি! সেই অবধি প্রমীলার উপর তার শাশুড়ীর সুনজর পড়িল! ছেলে ফেল হইবার পর যখন নানা রকম কথা চালাচালি হইতে লাগিল, আর সদানন্দ বাবু যখন বৈবাহিককে ভাঁড়ু দত্ত বলিয়া বিদ্রূপ করিলেন, তখন হইতে প্রমীলার শ্বশুর-শাশুড়ী, ননদ ও স্বামী সকলেই তাহাকে দাঁতে কাটিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা পূজার তত্ত্ব না দেখিয়া বৌকে বাপের বাড়ি পাঠাইতে রাজি হইলেন না। পূজার দিন যত অগ্রসর হইতে লাগিল,

প্রমীলার উপর অত্যাচারের মাত্রা ততই বাড়িতে আরম্ভ হইল। বালিকা পঞ্চমীর দিন ননদকে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "বাবার সময় এখন মন্দ, তাই আমাকে তোমরা কথা শুনাচ্ছ"। প্রমীলার শ্বাশুড়ী ও ননদ তাহার বাপকে গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। ফেলওয়ালা স্বামীও তাহাতে যোগদান করিল। প্রমীলা সে দিন জলগ্রহণ করিল না।

সদানন্দ বাবু এ সব ব্যাপার কিছুই জানিতে পারিলেন না। অনুপমা পঞ্চমীর দিন আবদার করিয়া বলিল, "বাবা, আমায় একখানা নীলাম্বরী শাড়ী কিনে দেবেন?" সদানন্দ বাবু নিজের ও স্ত্রী কন্যার পেটের যোগাড় করিতে অসমর্থ, প্রমীলার শ্বশুরবাড়ী পূজার তত্ত্বের জন্য টাকার এখনও কোনও যোগাড় হয় নাই, বাড়িখানা দ্বিতীয় বন্দক দিবেন কি না ভাবিতেছেন, এমন অবায় অনুপমার আবদার শুনিয়া তিনি উন্মনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাপড় কি হবে?" অনুপমা বলিল, "তা হ'লে এবার পূজোয় সইকে তত্ত্ব পাঠাই।" সদানন্দবাবু অনুপমার মাকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুনেছ, এবার পূজোয় তোমার মেয়ে সইকে তত্ত্ব পাঠাবে। ভালই হয়েছে, আমার যে রকম টানাটানি, অনুপমার স'য়ের জন্যে একখানা নীলাম্বরী শাড়ী ধার করে কিনে দেব, আর কারেও কিছু দিতে পারব না।" সদানন্দ বাবুর গৃহিণী স্বামীর কথায় মুখ ভার করিয়া প্রমীলার নাম লইয়া আপন মনে গজ গজ করিতে লাগিলেন।

অনুপমার সই পুতুল জামাই ও পুতুল মেয়ের জন্য যে তত্ত্ব পাঠাইল তাহাতে স'য়ের ব'য়ের বকুল ফুলের বোনপো ব'য়ের বোনঝি জামায়ের কাপড় জামা, সেমিজ প্রভৃতির কিছুই বাদ যায় নাই। আর মিষ্টান্ন ও সুগন্ধি দ্রব্যের ত কথাই নাই। ষষ্ঠীর দিন বিকালে অনুপমার মা যখন সাত জন চাকর চাকরাণীকে বিদায় করিয়া তত্ত্বের জিনিষপত্র তুলিতেছে ও স্বামীর সহিত পরামর্শ করিতেছে যে, সেই সব জিনিষ কাল সকালে প্রমীলার শ্বশুরবাড়ি চালান দিতে হইবে; তখন যদি কেহ প্রমীলার শ্বশুরবাড়ি উপস্থিত থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে প্রমীলাকে একলা বাড়িতে রাখিয়া তার শ্বশুরগোষ্ঠী গাড়ী করিয়া থিয়েটার দেখিতে যাইতেছে। প্রমীলার শ্বাশুড়ী প্রমীলাকে ডাকিয়া বলিলেন, "আমরা সদর দরজায় চাবি দিয়ে যাচ্ছি, বাড়ি আগলে জেগে থেকো।" প্রমীলা জাগিয়া রহিল। সে নীচের একটা খালি ঘরে এক বোতল কেরোসিন তেল ও কয়েকখানা কাপড় জামা সেমিজ ও একটা দিয়াশলাইয়ের

বাক্স গুছাইয়া রাখিল। রাত্রি দুইটার পর সকলে বাড়ি ফিরিয়া যখন নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতেছে, তখন সে সেই খালি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সপ্তমীর দিন সকালে বেলা সাতটার সময় সদর দরজার কড়া নাড়ার শব্দ শুনিয়া প্রমীলার শাশুড়ির ও ননদের ঘুম ভাঙ্গিল। বিয়ান বাড়ি থেকে পূজার প্রকাণ্ড তত্ত্ব আসিয়াছে দেখিয়া প্রমীলার শাশুড়ী আহ্লাদে আটখানা হইলেন। তত্ত্বের জিনিষপত্র একে একে বুঝিয়া লইয়া শ্যামা ঝিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ছেলের জুতার টাকা কৈ?" শ্যামা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া উত্তর দিল, "বাবুকে ব'লে ও বেলা দিয়ে যাব।" প্রমীলার শাশুড়ী ভয়ানক গরম হইয়া উঠিলেন। তিনি মেয়েকে ডাকিয়া বলিলেন, "দ্যাখ্‌ ত বৌ এখনও ঘুমুচ্চে কি মরেছে?"

এই ঘটনার এক মাস পরে করোনারের নিকট যে মোকদ্দমা হয় তাহাতে এইরূপ প্রকাশ পায় যে, প্রমীলা থিয়েটার দেখিতে লইয়া না যাওয়াতে সে আত্মহত্যা করিয়াছে। শ্যামা ঝিকে এজাহার দিতে হইয়াছিল। সে প্রমীলার শাশুড়ী ও ননদকে পূজার তত্ত্বের কাপড় পরিয়া সাক্ষীদের বিশ্রাম-ঘরে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তাহাদের মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলে, "বিয়ান-বাড়ী পূজার তত্ত্বের কাপড়-চোপরে তোমাদেরকে মানিয়েছে; কিন্তু গলায় নেকলেসের বদলে যদি দড়ি হত, তা হলে আরও ভাল রকম মানাত।"

পরাজয়।

[শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।]

(১৭)

পূজার এক মাস ছুটী এবং দুই মাসের মাহিনা লইয়া গণেশ যেদিন ঘরে আসিল, সেইদিন মহামায়া স্বামীকে ধরিয়া বসিল, "পুজোয় আমাকে কি দিবে?"

গণেশ বলিল, "যা পারি।"

মহামায়া ঠোঁটের কোলে মৃদু হাসির তরঙ্গ, এবং চোখের কোণে বিদ্যুৎ খেলাইয়া সোহাগের স্বরে বলিল, "ইস্, তা হবে না, আমি যা চাই তা দিতে হবে।"

ঈষৎ হাসিয়া গণেশ বলিল, "তুমি যদি রাজার রাজত্ব চাও ?"

মহামায়া ঠোঁট ফুলাইয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "আহা, আমাকে এমনি ছেলেমানুষ পেয়েছ না কি, যে আমি রাজার রাজত্ব চাইব ? রাজত্বে আমার দরকার কি, আমার রাজত্বই বল, যাই বল, সবই তো তুমি।"

মহামায়ার কণ্ঠটা যেন ভক্তিতে প্রেমে গদ্গদ হইয়া আসিল। গণেশ মুগ্ধ-দৃষ্টিতে তাহার প্রেম-প্রফুল্ল মুখখানির দিকে চাহিয়া বলিল, "তবে তুমি কি চাও ছোট বৌ ?"

মহামায়া বলিল, "যা চাই তা দেবে বল ?"

গণে। যদি অসাধ্য না হয়, দেব।

মহা। দেবে ?

গণে। দেব।

মহামায়া তখন বাক্স খুলিয়া একছড়া হার বাহির করিয়া স্বামীর হাতে দিল। গণেশ জিজ্ঞাসা করিল, "এ কা'র হার ?"

মহামায়া বলিল, "সত্যর মা বিক্রী করবে। গিনি সোণা, পুরাণো দরে, বাণী লাগবে না। পাঁচ ভরি আছে, একশো দশ টাকা চাই।"

গণেশ হারটা নাড়িতে চাড়িতে লাগিল। মহামায়া বলিল, "পুরাণো হ'লেও নূতনের মতই আছে। গড়নটীও বেশ, না ?"

গণেশ বলিল, "হাঁ, কিন্তু ছোট বৌ—

মহামায়া বলিল, "আমি তোমার ও কিন্তু মিন্তু শুনবো না, আমাকে দিতেই হবে। দেবে কি না বল।"

মহামায়া সরিয়া আসিয়া স্বামীর কাঁধের উপর একটা হাত রাখিল। গণেশ বলিল, "টাকা কোথায় ?"

মহা। কেন, তুমি তো দু' মাসের মাইনে পেয়েছ !

গণে। সে আর কত, পঞ্চাশ টাকা বৈ তো নয়। দু'মাসের সংসার-খরচ আছে।

মহামায়ার মুখখানা ম্লান হইয়া গেল ; সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। গণেশ হারছড়া তাহার হাতে ফিরাইয়া দিল। মহামায়া হারটা হাতে

ঝুলাইয়া বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিল, "এমন জান্‌লে তার সঙ্গে পাকা কথা কইতাম না। এখন কি ব'লে ফিরিয়ে দেব!"

গণেশও পত্নীর দুঃখে একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিঃশ্বাস না ফেলিয়া থাকিতে পারিল না।

মহামায়া একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "কোন উপায়ে কি টাকাটার যোগাড় হয় না?"

গণেশ বলিল, "উপায় থাক্‌লে নিশ্চয়ই দিতাম।"

মহামায়া বলিল, "তা তো ঠিক। তা হ'লে ফিরিয়ে দিই?"

গণেশ বলিল, "কাজেই।"

মহামায়া একটু ভাবিয়া বলিল, "আচ্ছা, বড় ঠাকুরের কাছে তোমার না কত পাওনা ছিল?"

গণেশ চমকিয়া উঠিল; বলিল, "আছে, কিন্তু সে দিদির টাকা।"

মহা। দিদির টাকা তো জানি। তবে ঠাকুরঝির তো আজই কোন দরকার নাই। এখন টাকাটা নিয়ে এর পর মাস মাস দশ টাকা ক'রে দিলে চলে না?"

গণে। চলবে না কেন? কিন্তু দাদাকে কি ব'লে তাগাদা ক'রব?

মহা। তা বটে, হাজার হোক্ বড় ভাই। কিন্তু ওঁর ছ'মাসের ভিতর দেবার কথা ছিল না? ছ'মাস তো হ'য়ে গেছে।

গণেশ মুখ নীচু করিয়া বলিল, "আট মাস হ'য়েছে। বোধ হয় যোগাড় হ'য়ে ওঠেনি।"

মহামায়া আর কিছু বলিল না; সে হারছড়াকে দুই চারিবার নাড়িয়া চাড়িয়া তাহাকে পুনরায় বাক্সে তুলিয়া রাখিল। গণেশ বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মহামায়া তামাক সাজিয়া স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, "আবার ভাবছ কি?"

গণেশ বলিল, "ভাবছি, দাদাকে তাগাদা করবো কি না।"

মহা। যদি তাগাদা করা অন্যায় মনে কর, তবে তাগাদায় কাজ কি?

গণে। অন্যায়ই এমন কি? পাওনা টাকা তো বটে।"

মহামায়া পান সাজিতে লাগিল।

পর দিন মুরলী আহারান্তে যখন দোকানে যাইতেছিল, তখন গণেশ তাহার সম্মুখে গিয়া বলিল, "দাদা, সেই টাকাটা; ছ'মাসের কড়ার ছিল।"

মুরলী ব্যস্তভাবে বলিল, "হাঁ, হাঁ, মাতুর টাকাটা তো। তা যোগাড় হ'য়ে উঠছে না ভাই; কাজেই—"

গণেশ বলিল, "সব না যোগাড় হয় হয়, আপাততঃ একশো টাকা চাই।"

মুরলী হাঁ করিয়া গণেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গণেশ মুখটা নীচু করিয়া ঈষৎ রুক্ষকণ্ঠে বলিল, "পূজার মধ্যেই টাকাটা চাই, আমার বিশেষ দরকার। যদি না পাওয়া যায় সে কথাটাও বল্‌বেন।"

গণেশ দ্রুতপদে বাড়ীতে ঢুকিল। মুরলী ভাবিতে ভাবিতে ধীর-মন্থর-পদে দোকানের দিকে চলিল।

সেদিন মুরলী একটু বেশী রাত্রে দোকান হইতে ফিরিল। নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিল, "এত রাত হ'লো যে?"

মুরলী বলিল, "তাগাদায় গিয়েছিলাম।"

নিস্তারিণী ভাত বাড়িয়া দিল। মুরলী ভাত খাইয়া শুইতে গেল। নিস্তারিণী আহার শেষ করিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, স্বামী তখনও শয়ন করে নাই, বিছানায় বসিয়া হুঁকাটা হাতে ধরিয়া ভাবিতেছে। নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিল, "এখনো শোও নাই যে?"

মুরলী বলিল, "ভাবছি।"

নিস্তা। এত কি ভাবছ?

মুর। গণশাকে টাকাটা কোথা হ'তে দেব তাই ভাবছি।

নিস্তা। গণশাকে আবার কি টাকা দেবে?"

মুর। মাতুর টাকা। সে টাকা এখন গণশারই প্রাপ্য। আপাততঃ একশো টাকা দিতে হবে। শ'দেড়েক টাকা আদায়-উসুল হ'তে পারে। দেড় শো টাকায় মহাজনেরই তো কুলাবে না। চুলোয় যাক্ মহাজন, ঐ এক শো টাকা গণশাকে ফেলে দেব।

নিস্তারিণী বলিল, "মহাজন চুলোয় যাবে তো দোকান চল্‌বে কিসে?"

মুরলী গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "দোকানও চুলোয় যাক্।"

নিস্তারিণী আশ্চর্য্যান্বিতভাবে বলিল, "তুমি কি পাগল হ'লে?"

মুরলী মুখ তুলিয়া অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিল, "আমি চিরদিনের পাগল বড় বৌ, কিন্তু গণশা আজ আমায় টাকার তাগাদা ক'রেছে!"

মুরলীর গলার স্বরটা যেন রুদ্ধ বাষ্পে গাঢ় হইয়া আসিল। নিস্তারিণী এতক্ষণে দোকান ও মহাজনকে চুলোয় পাঠাইবার কারণ বুঝিতে পারিল।

বুঝিয়া সে আর কোন উত্তর করিল না। স্বামীর হাত হইতে হুঁকাটা লইয়া এক পাশে রাখিয়া দিল। মুরলী অবসন্নভাবে শুইয়া পড়িল। নিস্তারিণী পাশে দাঁড়াইয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিল।

পর দিন মুরলী মহাজনের টাকা ভাঙ্গিয়া গণেশকে একশত টাকা ফেলিয়া দিল। মাতঙ্গিনী শুনিয়া গণেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে গণশা, তুই দাদাকে টাকার তাগাদা ক'রেছিলি ?"

গণেশ গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, "হাঁ ক'রেছি।"

মাতঙ্গিনী বিস্মিতদৃষ্টিতে কিয়ৎকাল গণেশের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "ক'রেছি ? তাগাদা ক'রতে কি তোর একটু লজ্জাও হ'লো না ?"

কঠোরস্বরে গণেশ বলিল, "নাঃ।"

ক্রোধে ক্ষোভে মাতঙ্গিনীর কণ্ঠটা যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল ; সে শুধু তীব্র-দৃষ্টিতে গণেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গণেশ বলিল, "আমার তো লজ্জা নাই, কিন্তু যারা পরের টাকা নিয়ে ব'সে থাকে, তাদের তো লজ্জা আছে ?"

মাতঙ্গিনী বলিল, "টাকাটা কি তোর ?"

গণেশ বলিল, "আমার না হয় তোমার। কিন্তু যাদের তাগাদা ক'রেছি, তাদের নিশ্চয়ই নয়।"

ঘর হইতে বাহির হইয়া মহামায়া তীব্রকণ্ঠে বলিল, "ওগো ঠাকুরঝি, টাকা তোমারই বটে, তা এ টাকা তোমায় কড়ায় গণ্ডায় ফেলে দেব। তখন তোমার যাকে ইচ্ছা হয় দিতে পার। আমরা তোমার টাকার পিত্যেশ রাখি না।"

মাতঙ্গিনী রোষক্ষুব্ধ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "দেখ ছোট বৌ, তোমার সঙ্গে কথা হয় নি, তুমি মাঝে প'ড়ে ঝগড়া করতে এসো না বলছি।"

নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া মহামায়া বলিল, "আমার সঙ্গে হবে কেন, আমি কার কথার ধার ধারি ! যার সঙ্গে কথা হ'চ্চে তার হ'য়েই বলছি, তোমার টাকা মাস মাস শোধ দেওয়া যাবে। তোমাকে খয়রাত করতে হবে না।"

মহামায়া মুখ ঘুরাইয়া ঘরে ঢুকিল। মাতঙ্গিনী উঠান হইতে কলসীটা তুলিয়া লইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। গণেশ গুম হইয়া দাবার উপর বসিয়া রহিল।

এমন সময় বিশু আসিয়া ডাকিল, "কাকাবাবু !"

গণেশ মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল। বিশু আসিয়া তাহার একটা হাত ধরিয়া বলিল, "আমায় একটা নোতুন জামা দেবে কাকাবাবু !"

গণেশ গম্ভীরভাবে বলিল, "কেন ?"

বিশু মুখখানাকে ম্লান করিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "ওদের ক্ষুদে নোতুন জামা গায়ে দিয়েছে; আমাকে অমনি একটা নোতুন ভালো জামা দেবে কাকাবাবু!"

তীব্রস্বরে গণেশ বলিল, "আচ্ছা আচ্ছা, জামা দেবে। এখন যা।"

বালক ভয়ে ভয়ে পিছাইয়া দাঁড়াইল। গণেশ উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

অপরাহ্ণে গণেশ যখন কাগজে মোড়া জামা হাতে বাড়ীতে ঢুকিল, তখন নিস্তারিণী নিজের ঘরের দাবা হইতে ডাকিয়া বলিল, "ঠাকুরপো, বিশের একখানা জামা কিনে এনে দিতে পার? আমি লুকিয়ে তোমাকে দাম দেব।"

গণেশ গম্ভীরস্বরে বলিল, "দাম দিলে আমি ছাড়া কি আন্‌বার লোক নাই?"

নিস্তারিণী বলিল, "তোমার ভাইকে বলতে পারি না। নানান ঝঞ্ঝাটে ঘুরে বেড়াচ্চে, টাকার জন্য মাথার ঠিক নাই। তাকে বলতে ভয় হয়।"

গণেশ বলিল, "তাকে বলতে ভয় হয়, আরও অনেক লোক আছে। কুকুরের ল্যাজে টাকা বেঁধে দিলে জিনিষ আসে।"

বিশু ততক্ষণ কাকাবাবুর হাতে কাগজের মোড়ক দেখিয়া "ও কি কাকাবাবু, ও কি" বলিয়া ছুটিয়া গিয়াছিল, এবং গণেশের হাত হইতে মোড়কটা লইয়া কাগজ ছিঁড়িয়া একখানা জামা বাহির করিয়াছিল। জামা পাইয়া সে "আমার জামা, আমার জামা" বলিয়া নাচিতে নাচিতে জামাটা গায়ে দিবার চেষ্টা করিতেছিল। নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিল, "ওটা কার জামা?"

গণেশ মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ও এক জন কিনতে দিয়েছিল।"

নিস্তা। কত দাম!

গণে। দু' টাকা দশ আনা।

নিস্তা। বেশ জামাটী। তা ওটা যদি ওর গায়ে হয় তবে ওকে দাও না। আমি এখন দু'টো টাকা দিচ্চি, দশ আনা দিনকতক পরে দেব।

গণেশ তাহার মুখের উপর একটা তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কঠোরস্বরে বলিল, "নাঃ।"

তার পর বিশুর হাত হইতে জামাখানা কাড়িয়া লইয়া সে আপনার ঘরে চলিয়া গেল। বিশু "আমার জামা, ও কাকাবাবু আমার জামা" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কাকাবাবুর পশ্চাৎ ছুটিল। গণেশ পশ্চাৎ ফিরিয়া তাহাকে একটা জোর ধমক দিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। বিশু থমকিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

নিস্তারিণী গিয়া ছেলেকে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিল। ছেলে কিন্তু আসিতে চাহিল না, সে "জামা জামা" বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে হাত পা ছুড়িতে লাগিল। নিস্তারিণী তাহাকে ভুলাইতে চেষ্টা করিল, ভয় দেখাইয়া ধমক দিল। ছেলের তাহাতে ক্রন্দনের নিবৃত্তি হইল না; মায়ের কোলের উপর এমন জোরে হাত পা আছড়াইতে লাগিল যে, তাহাকে কোলে রাখা অসাধ্য হইল। ঘরের ভিতর মহামায়া স্বামীকে বলিল, "দাওনা বাবু জামাটা ফেলে। ওর জন্যেই তো এনেছ?"

গণেশ উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, "কে বললে ওর জন্যে এনেছি!"

মহামায়া মুখখানাকে একটু বিকৃত করিয়া শ্লেষের স্বরে বলিল, "তা নয় তো ওই জামা কি আমার জন্যে এনেছ? দাও, আমি দিয়ে আসছি। বাবা চেঁচিয়ে বাড়ী ফাটিয়ে দিলে যে!"

গণেশের হাত হইতে জামাটা লইয়া মহামায়া বিশুকে দিতে চলিল। কিন্তু সে দরজার বাহিরে আসিবামাত্র গণেশ ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত হইতে জামাখানা ছিনাইয়া লইল, এবং সেইখানে দাঁড়াইয়াই দুই হাতে ধরিয়া জামাখানাকে টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। জামা ছিঁড়িতে দেখিয়া ছেলে আরও জোরে কাঁদিয়া উঠিল। নিস্তারিণীর আর সহ্য হইল না; সে ছেলের পিঠে একটা চড় বসাইয়া দিয়া তাহাকে উঠানে আছড়াইয়া দিল। ছেলে উঠানের ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। গণেশ দাঁতে দাঁত চাপিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

মুরলী বাড়ীতে ঢুকিয়া নিস্তারিণীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, ধীর গম্ভীরকণ্ঠে বলিল, "ছেলেটাকে মারলে বড় বৌ?"

নিস্তারিণী তখন ক্ষোভে দুঃখে ফুলিতেছিল। সে পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া স্বামীর পায়ের কাছে মাথা কুটিতে কুটিতে শোকরুদ্ধ কণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "হাঁ, মেরেছি; আমায় মারবে? মার, যদি না মার—"

মুরলী ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়া গায়ের ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে বাহিরে চলিয়া গেল।

(১৮)

গিরিশ মনে করিয়াছিল, ধার কর্জ্জ করিয়া যেরূপে হউক মেয়েটিকে পার করিয়া দিতে পারিলেই সে নিশ্চিন্ত হইবে। দেনা শোধ করিতে পারে ভালই, না পারে মহাজনে জমি-জায়গা বেচিয়া লইবে। তার পর দাঁড়াইবে কোথায়?

গাছতলা তো আছে। এ সকল অনেক দূর ভবিষ্যতের কথা। যাহার কাল খাইবার সংস্থান নাই, তাহার এতদূর ভবিষ্যতের চিন্তা করা বৃথা, সে চিন্তার ভার ভগবানের উপর। এখন আপাততঃ সে নিশ্চিন্ত!

কিন্তু মানুষ যাহা ভাবিয়া রাখে, কার্য্যক্ষেত্রে ঘটনাচক্র প্রায়ই তাহার বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়। গিরিশ জ্যেষ্ঠের নিকট ঘর-ভিটা-জমি-জায়গা বন্ধক রাখিয়া তিন শত টাকা কর্জ্জ লইল, এবং সেই টাকার মেয়ের বিবাহ দিল। মেয়ের বিবাহ হইল, কিন্তু সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। হঠাৎ স্ত্রী অসুখে পড়িল। ভাদ্রের শেষ হইতে প্রায় প্রত্যহই একটু একটু জ্বর হইতে লাগিল। কিন্তু সে জ্বর আমলেই আনিল না। একে গরীবের ঘর, তাহার উপর মেয়েমানুষের অসুখ, সুতরাং সে অসুখের কথা কেহ জানিতেই পারিল না। যখন জানিতে পারিল, তখন জ্বর বেশ প্রবলভাব ধারণ করিয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের উপর স্নানাহারের ফলে উদরাময়ও দেখা দিয়াছে। গিরিশ শুনিয়া চিন্তিত হইল। বড় ডাক্তার ডাকিবার ক্ষমতা নাই, সে একজন হাতুড়ে ডাক্তার ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার ঔষধ দিল, কিন্তু রোগ কমিল না। সংসারের খাটুনি, আহারের অনিয়ম, সুপথ্যের অভাব; এতগুলো অসুবিধার মধ্যে হাতুড়ে ডাক্তারের এক বিন্দু ঔষধে কি উপকার হইবে?

শেষে আশ্বিনের শেষাশেষি যখন পূজার ঢাকের শব্দে দিকে দিকে পূজার আনন্দোৎসবের বার্ত্তা ছড়াইয়া পড়িল, তখন ছোট বৌ শয্যায় আশ্রয় লইয়া শুধু গিরিশের হৃদয়ে একটা ঘোরতর নিরানন্দের ভীষণ দুশ্চিন্তা জাগাইয়া দিল। পাড়ার লোকে তাহার অবস্থা দেখিয়া গিরিশকে বলিল, "গিরিশ ঠাকুর, দেখছ কি, বৌটা যে যেতে ব'সেছে, এক জন ভাল ডাক্তার দেখাও।"

প্রতিবাসীদের উপদেশ শুনিয়া গিরিশ চারিদিক্ শূন্য দেখিল। হায়! ছোট বৌ যায়! তাহার দুঃখময় জীবনপথের একমাত্র সঙ্গিনী, শোকে সান্ত্বনা, দরিদ্রের গৃহলক্ষ্মী, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি ছোট বৌ যায়! গিরিশ বালকের মত হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ছোট বৌ রোগশীর্ণ পাণ্ডুর মুখে কষ্টে হাসি আনিয়া, স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, "ছি, ছি, তুমি কাঁদ কেন? তোমাকে এই দুঃখকষ্টের মধ্যে ফেলে আমি কোথায় যাব?"

পত্নীর সে সান্ত্বনা-বাণীতে গিরিশ কিন্তু শান্ত হইতে পারিল না। সে হরিশের পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দাদা গো, দশটী টাকা দাও, রসুলপুরের সুবোধ ডাক্তারকে এনে একবার ছোট বৌকে দেখাব।"

হরিশ পা ছাড়াইয়া বিরক্তভাবে বলিলেন, "তোমার মত বেহায়া তো আর দু'টী নাই? এই সেদিন তিনশো টাকা ধার নিয়েছ, তিন মাসে তো এগারো টাকার উপর সুদ হ'য়ে গিয়েছে। কিন্তু তার একটী পয়সা দাও নাই। মাসকাবারে করকরে টাকাগুলি আনছো, আর দিব্যি মচ্ছিমুলোয় খাচ্চ। আবার টাকা চাইতে লজ্জা ক'রে না?"

গিরিশ তথাপি ছাড়িল না। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আর দশটী টাকা দাও দাদা, আসছে মাসকাবারে না খেয়ে ফেলে দেব। নয় তো ছোট বৌ মারা যায়।"

হরিশ হাসিয়া বলিলেন, "একটী পয়সাও হ'বে না। আমার হাতে এখন কিছুই নাই।"

বড় বৌ পাশে দাঁড়াইয়াছিল। সে তীব্রকণ্ঠে বলিল, "হাতে থাকলেই বা কে এমন দেয়? টাকা কি গাছের ফল!"

গিরিশ একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। বড় বৌ বলিল, "আগে থাকতে তো দেখালে না, তখন পয়সার মমতা ছাড়তে পারলে না। এখন আর ওতে আছে কি যে দেখাবে? এখন মিছে টাকা খরচ, হাতী আড় ক'র্‌লেও বাঁচবে না?"

বজ্রের আঘাতও কি এত ভীষণ! সত্যই কি বাঁচবে না? ভগবান্! তুমি দয়াময়; দয়া ক'রে ছোট বৌকে বাঁচাও। নতুবা তোমার এমন সুন্দর সৃষ্টি যে এক মুহূর্ত্তে মরুভূমি হ'য়ে যাবে!

গিরিশ পাগলের মত ছুটিয়া ঘরে গেল। ছোট বোয়ের তখন জ্বর আসিয়াছিল। সে কাঁথায় পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া পড়িয়া ছিল। গিরিশ ছুটিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি তাহার মুখ হইতে কাঁথা সরাইয়া দিল; তাহার মুখের কাছে মুখ রাখিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ছোট বৌ! ছোট বৌ"!

ছোট বৌ কষ্টে চোখ মেলিয়া চাহিল; শুষ্ক অধরে হাসির ক্ষীণ বিদ্যুৎ খেলাইয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিল, "ডাকচো!"

এই যে ছোট বৌ বাঁচিয়া আছে! কে বলে সে বাঁচিবে না। যে বলে সে মিথ্যাবাদী। ছোট বৌ বাঁচিবে, নিশ্চয় বাঁচিবে। মানুষের চেষ্টায় না বাঁচুক, ভগবানের দয়ায় বাঁচিবে। ভগবান যে দয়াময়, আর সে যে অতি বড় দুঃখী!

গিরিশ দাবার উপর বসিয়া মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে লাগিল। হায়,

হাতে যে একটী টাকাও নাই। পূজার যে মাহিনা পাইয়াছে, তাহাতে দোকানের দেনা কতক মিটাইয়াছে, বাকী টাকায় জামাতার পূজার তত্ত্ব করিয়াছে। না খাইয়া মরিলেও চলিতে পারে, কিন্তু জামাতার পূজার তত্ত্ব বাদ দিলে চলে না। সে তত্ত্ব জামাই-বাড়ীর কাহারও মনোমত না হইলেও তাহাতেই হাতের সব টাকা ফুরাইয়া গিয়াছে। পূজার ছুটীতে আফিস বন্ধ। আফিসে যে কোন বন্ধুবান্ধবের নিকট দুই এক টাকা ধার করিবে তাহারও উপায় নাই। গিরিশ শুধু ভাবিতে লাগিল, কিন্তু কোন কূল কিনারা দেখিতে পাইল না। সন্ধ্যা হইয়া আসিল; সপ্তমীর চাঁদ মাথার উপর বসিয়া হাসিতে লাগিল; গিরিশ দাবার উপর স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

হায় দরিদ্র! তুমি বিবাহ করিলে কেন? বিবাহ করিলে তো এমন সাক্ষাৎ লক্ষ্মীরূপিণী স্ত্রী চাহিলে কেন? সে যে আজীবন সংসারের দুঃখ-কষ্টের সহিত সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে; দারিদ্র্যের কঠোর পীড়নেও কোন দিন ধৈর্য্যচ্যুত হয় নাই; মুখ তুলিয়া একটা কথা কহে নাই! সে সব কষ্ট হাসিমুখে মাথা পাতিয়া লইয়াছে; উপবাস দিয়াছে তাহাও হাসি মুখে; স্বামীর অভাব জন্য তিরস্কার সহ্য করিয়াছে তাহাও হাসি মুখে; আবার আজ মরিতে যাইতেছে তাহাও হাসিমুখে! ভগবান! দরিদ্রের উপর এ তোমার কি নিষ্ঠুর উপহাস!

বড় বোয়ের ঘরের জানালা খুলিয়া গেল। জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বড় বৌ যেন কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আহা, মেয়েটাকে বিঘোড়ে মেরে মেরে ফেললে গো, বিঘোড়ে মেরে ফেললে, তিকিচ্ছে করালে না। পয়সা কি সকলেরেই থাকে? ঘরের ঘটী বাটী বেচেও তো লোকে তিকিচ্ছে করায়!"

গিরিশ একবার তীব্রদৃষ্টিতে জানালার দিকে চাহিয়াই ধড়মর করিয়া উঠিয়া পড়িল। সত্যই তো ঘটী-বাটী বেচিয়াও চিকিৎসা করান যাইতে পারে। কিন্তু ঘটী-বাটীই বা তেমন কি আছে! গিরিশ উন্মত্ত ভাবে ঘরে ঢুকিয়া যাহা পাইল, তাহাই লইয়া বেচিতে ছুটিল। কিন্তু উঠান পার না হইতেই ঘরের ভিতর হইতে অনুপমা আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, "বাবা গো শিগ্‌গীর এসো গো, মা কেন এমন করছে গো!"

গিরিশের হাত হইতে বাসনগুলা ঝন্ ঝন্ শব্দে উঠানে পড়িয়া গেল। সে ছুটিয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, আর বাসন বিক্রয়ের প্রয়োজন নাই। ছোট বৌ চলিয়া গিয়াছে, শুধু তাহার জীবনের একমাত্র সম্বল হাসিটুকু ঠোঁটের কোণে

লাগিয়া রহিয়াছে। গিরিশ উন্মাদ-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া ডাকিল, "ছোট বৌ! ছোট বৌ!"

তাহার আকুল প্রাণের সে চীৎকার ছোট বৌ শুনিতে পাইল কি না জানি না, কিন্তু বড় বৌ তাহা শুনিতে পাইয়া জানালার ধারে আসিয়া বলিল, "হায় হায়, হয়ে গেছে গো। ও যে চৌধুরীদের বাড়ী পূজায় বৃতী আছে, তার কি হবে? অভাগী ম'রেও গেল, আমাদের মেরেও গেল। কম লোকসান কি হবে? মাগী কি আর মরবার দিন পেলে না গা।"

বড় বোয়ের সে আপত্তি কাহারও কাণে গেল না। অনুপমা তখন "মা মা" শব্দে চীৎকার করিয়া ঘর ফাটাইতেছিল। অদূরে চৌধুরীদের বাড়ীতে সপ্তমীর সান্ধ্য আরতির বাজনা বাজিতেছিল। নহবতের সানাই সুরতরঙ্গে শারদ সপ্তমীর জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশ কম্পিত করিয়া ইমন কল্যাণে গাহিতেছিল, "এস মা আনন্দময়ী আনন্দ-ভবনে।"

ভারতে স্ত্রীলোকের অবরোধ-প্রথা।

[পণ্ডিত শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাঙ্খ্যতীর্থ]

ভারত-ভূমে হিন্দুসমাজে অন্তঃপুর-প্রথা নূতন নহে, যুগ-যুগান্ত হইতে প্রচলিত। কুলরমণীগণের প্রকাশ্যভাবে বিচরণ হিন্দুসমাজে সকল কাজেই নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয় ছিল। স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, কাব্য, নাটক ও ইতিহাস যাহাই আলোচনা করিতে যাইবেন, কুলকামিনীবৃন্দের অবরোধপ্রথার বিবরণ তাহাতেই উজ্জ্বলভাবে দেখিতে পাইবেন।

অধুনা কোনও কোনও পুরাতত্ত্বানুসন্ধানশীল বলেন যে, ভারতে অন্তঃপুরপ্রথা মুসলমান রাজাদের সময় হইতে প্রচলিত; পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। এই অনুসন্ধিৎসু মহাত্মগণ যদি তাঁহাদের অনুসন্ধানক্রিয়া স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণ, তন্ত্র, কাব্য, নাটকাদিতে বিনিয়োগ করিতেন, তাহা হইলে কখনই এইরূপ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইত না।

ভগবান্ বিষ্ণু, স্ত্রীধর্ম্ম ব্যাখাবসরে বলেন, "ভর্ত্তরি প্রবসিতেঽ প্রতিকর্ম্ম ক্রিয়া।৯। পরগৃহে ষ্বনভি গমনম্ ১০। দ্বারদেশ গবাক্ষকেষ্বনবস্থানং ।১১। সর্ব্বকর্ম্ম স্ব-স্বতন্ত্রতা।১২। বিষ্ণুসংহিতা ২৫ অধ্যায়। ভর্ত্তা প্রবাসে থাকিলে কুলস্ত্রীগণ অঙ্গের বেশভূষা করিবে না। পরগৃহে গমন করিবে না। যে স্থানে দাঁড়াইলে সাধারণে দেখিতে পায় এমন স্থানে, অর্থাৎ ঘরের দরজায় বা জানালায় দাঁড়াইবে না, সর্ব্বদা পরাধীনা থাকিবে। স্ত্রীলোক কখন স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবে না।

এই বিষ্ণু-সূত্র হইতে কি অন্তঃপুর-প্রথার আভাস পাওয়া যায় না?

গার্গ্য ঋষি বলেন, পুত্র যখন পিতার সহিত মাতার সপিণ্ডীকরণ করিবে, তখন মাতার শ্বশুর ও আর্য্য শ্বশুরের পিণ্ড কুশের দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক বলিতেছেন;

শ্বশুরস্যাগ্রতো যস্মাচ্ছিরঃ প্রচ্ছাদন ক্রিয়া।
পুত্রৈ দর্ভেন সা কার্য্যা মাতুরভ্যুদয়ার্থিভিঃ॥

যে হেতু শ্বশুরের সাক্ষাৎ ঘোমটা টানিয়া শির আচ্ছাদন করিতে হয়, এই নিমিত্ত সপিণ্ডনকালেও মাতার অভ্যুদয়-কামী পুত্র কুশের দ্বারা সেই অবগুণ্ঠন-ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। এই প্রমাণেও কি পূর্ব্বকালে অবগুণ্ঠনপ্রথার কথা জানা যায় না?

সাঙ্খ্যদর্শনে লিখিত আছে—

দোষ বোধেঽপি নোপ সর্পণং প্রধানস্য কুলবধূবৎ।
সাংখ্য দর্শন তৃতীয় অধ্যায়।

যেমন স্বকীয় অনবধানতা বশতঃ কুলবধূকে যদি কেহ দেখিয়া ফেলে, তাহার পর সেই কুলবধূ এরূপ ভাবে চেষ্টা করেন যে, আর যাহাতে কেহ তাহাকে দেখিতে না পায়; তেমনি প্রকৃতিও পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্টা হইলে, আর তাহাকে নিজরূপ দেখান না। এই সকল কথা হইতে সাঙ্খ্য-সূত্রকারের সম-কালেও কুলকামিনীগণের লোকদৃষ্টির বহির্ভূতভাবে থাকার কথা প্রমাণিত হয়। অর্থাৎ ইহা দ্বারা পূর্ব্ব সমাজের অন্তঃপুরপ্রথা জানা যায়।

বাচস্পতি মিশ্র, সাঙ্খ্যতত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে লিখিয়াছেন "যথা হি কুলবধূ, রতি মন্দাক্ষ মন্থরা, প্রমদাদ্বিগলিত শিরোঽঞ্চলা চে দালোক্যতে পরপুরুষেণ। ইত্যাদি। যেমন কোনও লজ্জাশীলা কুলবধূকে প্রমাদবশতঃ মাথার ঘোমটা পড়িয়া যাওয়ায় পরপুরুষ দেখিতে পায় ইত্যাদি।

ইহা দ্বারাও মিশ্রের সমকালেও যে অবগুণ্ঠনপ্রথা ছিল, ইহা প্রমাণিত হইতেছে।

তন্ত্রশাস্ত্র লিখিয়াছেন—

বেদশাস্ত্র পুরাণানি সামান্য গণিকা ইব।
ইয়ন্তু শাম্ভবী বিদ্যা গুপ্তা কুলবধূরিব॥

বেদ, পুরাণ প্রভৃতি সাধারণী বেশ্যার ন্যায় সকলের নিকটেই প্রকাশ্য; কিন্তু এই শাম্ভবী বিদ্যা (তন্ত্রশাস্ত্র) কুলবধূর ন্যায় অপ্রকাশ্যা। ইহা হইতেও তন্ত্রের সময়েও যে রমণীগণের অবরোধ-প্রথা ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়।

পুরাণাদির মধ্যে অতি প্রাচীন রামায়ণ; রামায়ণেও স্ত্রীলোকের অবরোধ-প্রথার ভূরি ভূরি নিদর্শন রহিয়াছে। বাল্মীকি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ১১৩ সর্গে বর্ণিত আছে, রাবণবধের পর মন্দোদরী রণস্থলে আসিয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতেছেন;—

দৃষ্টা ন খল্বসি ক্রুদ্ধো মামিহানবগুণ্ঠিতাং।
নির্গতাং নগরদ্বারাৎ পদ্ভ্যা মেবাগতাং প্রভো।৬১।
পশ্যেষ্টদার, দারাংস্তে ভ্রষ্ট লজ্জা বগুণ্ঠনান্।
বহি র্নিষ্পতিতান্ সর্ব্বান্ কথং দৃষ্ট্বা ন কুপ্যসি।৬২॥

হে প্রভো! এই যে আমি অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ পূর্ব্বক নগর-দ্বার হইতে নির্গত হইয়া পাদচারে এস্থলে উপস্থিত হইয়াছি, ইহা দেখিয়া কি ক্রুদ্ধ হইতেছ না?

হে প্রণয়িনিবল্লভ! এই দেখ তোমার সকল গৃহিণীই লজ্জা ও অবগুণ্ঠন পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুরী হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়াছে, ইহা দেখিয়া কেন তোমার ক্রোধের উদয় হইতেছে না?

ইহা হইতে প্রাচীনকালে অনার্য্য রাক্ষসাদি জাতিতেও অন্তঃপুর-ব্যবস্থা ও অবগুণ্ঠন-প্রথা থাকার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

উক্ত লঙ্কাকাণ্ডের ১১৬ সর্গে বর্ণিত আছে, রাবণবধের পর বিভীষণ সীতাদেবীকে মহামূল্য বিবিধ বসন ভূষণে সুসজ্জিতা করিয়া, শিবিকা দ্বারা রাম-সমীপে লইয়া আসিতেছেন, এমন সময়ে বিভীষণের আদেশে উষ্ণীষধারী কঞ্চুকিগণ বেত্র হস্তে শিবিকার চতুর্দ্দিক হইতে সীতা-সন্দর্শন-লোলুপ বানর ও ভল্লুকগণকে উৎসারিত করিতেছে, সেই তীব্র উৎসারণা ও বেত্রাঘাতাদি

জনিত বানর সৈন্যগণের মহাকোলাহল-শ্রবণে রামচন্দ্র দয়াপরবশ হইয়া বিভীষণকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন ;—

কিমর্থং মা মনাদৃত্য কিশ্যতেঽয়ংজনস্তরা।
নিবর্ত্তয়ৈন মুদ্‌বেগং জনোঽয়ং স্বজনো মম॥ ২৬।

আমাকে অবজ্ঞা করিয়া কেন এই সকল সৈন্যকে তুমি ক্লেশ দিতেছ? ইহাদের এই উদ্বেগ (সীতাদর্শনের উৎকণ্ঠা) দূর কর। ইহারা সকলেই আমার স্বজন।

ব্যসনেষু নরচ্ছেষু ন যুদ্ধেষু স্বয়ম্বরে।
ন ক্রতৌ ন বিবাহে বা দর্শনং দুষ্যতে স্ত্রিয়ঃ। ২৮
সৈষা বিপদ্‌গতা চৈব কৃচ্ছে মহতিচ স্থিতা।
দর্শনে নাস্তি দোষোঽস্যা মৎ সমীপে বিশেষতঃ।
বিসৃজ্য শিবিকাং তস্মাৎ পদ্ভ্যা মেবাত্র গচ্ছতু।
সমীপে মম বৈদেহীং পশ্যন্তেতে বনৌকসঃ॥ ৩০॥

ব্যসন, পীড়া, যুদ্ধ, স্বয়ম্বর যজ্ঞ ও বিবাহ এই সকল ব্যাপারে রমণীগণের দর্শন দূষণীয় নহে। ইনি এক্ষণে বিপদ্গতা এবং মহাকষ্টে নিপতিতা হইয়াছেন, এ অবস্থায় ইহার দর্শনে কোনও দোষ হইবে না। বিশেষতঃ আমার সমীপে উপস্থিত আছেন। অতএব শিবিকা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈদেহী পদব্রজেই আমার নিকটে আসুন। এই সকল বানরগণ ইহাকে দর্শন করুক।

রামচন্দ্রের এবম্বিধ উক্তি দ্বারাই বুঝিতে পারেন যে, পূর্ব্বকালে অবরোধ-প্রথা কিরূপ প্রবল ছিল। অন্তঃপুরপ্রথা সম্বন্ধে সংহিতা, স্মৃতি, দর্শন, তন্ত্র ও পুরাণের প্রমাণ আলোচনা করিলাম। অধুনা ভারতীয় প্রাচীন কাব্য ও নাটকের আলোচনা করিব। নৈষধচরিত প্রভৃতি কাব্যের অন্তঃপুর-বর্ণনা পাঠ করিলে ভারতে অবরোধপ্রথা পুরাকালে ছিল না এমন উক্তি কেহই করিবেন না।

অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটকের পঞ্চম অঙ্কে, যখন শকুন্তলাকে লইয়া গোতমী ও কণ্বশিষ্য শার্ঙ্গরব শারদ্বত হস্তিনাপুরে দুষ্মন্ত রাজার অগ্নিশরণ গৃহে উপস্থিত হন, তখন শকুন্তলা অবগুণ্ঠনমুক্তা ছিলেন। শকুন্তলাবিবাহ যখন দুর্ব্বাসার শাপপ্রভাবে দুষ্মন্তের স্মৃতিপথে আসিতেছে না, তখন গোতমী শকুন্তলাকে বলিলেন,—

"জাদে! মূহুত্তং মালজ্জ অবগুণ্টনংদে অবনয়িস্মং" বৎসে! ক্ষণকাল লজ্জা ত্যাগ কর, তোমার ঘোমটা খুলিয়া দেই, তাহা হইলে ইনি তোমাকে চিনিতে পারিবেন।

রাজা দুষ্মন্তও শকুন্তলাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—

কেয় মবগুণ্ঠনবতী, পরিস্ফুট শরীরলাবণ্যা। মধ্যে তপোধনানাং কিসলয় মিব পাণ্ডুপত্রানাম্॥

পাণ্ডুপত্র-মধ্যস্থিত কিসলয়ের ন্যায় তপস্বিজনের মধ্যবর্ত্তিনী এই অবগুণ্ঠনবতী রমণী কে? ইহার শরীর-লাবণ্য (অবগুণ্ঠনহেতু) অতি পরিস্ফুট হইতেছে না।

মৃচ্ছকটিক নাটকে মদনিকা সর্ব্বালোক প্রকরণে এবং মালতীমাধব প্রভৃতি নাটকের স্থানে স্থানে অবগুণ্ঠন-প্রথা ও অন্তঃপুর-ব্যবহার-বর্ণনা আছে। অতএব অন্তঃপুর-প্রথা মুসলমান হইতে আগত একথা বলা সঙ্গত নহে।

যদিও মাঘকবি শিশুপালবধ কাব্যে, শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণকে প্রকাশ্য রাজপথে দিবালোকে অশ্বে আরোহণ করাইয়া সৈন্যসামন্ত ও পটমণ্ডপাদি সমভিব্যাহারে ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে পাঠাইয়াছেন, ইহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত বা সংশয়িত হইবার কারণ নাই; কেন না মাঘ দাক্ষিণাত্যের কবি; দাক্ষিণাত্যে অবরোধপ্রথা শিথিল। কারণ সেখানে রাক্ষসভীতি-প্রযুক্ত পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগকে একাকিনী রাখিয়া কোথাও গমনাগমন করিতেন না। সভাসমিতি প্রভৃতিতেও স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিতেন। রামচন্দ্র রাক্ষসভয় দূরীকৃত করিলেও পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ অন্তঃপুর-প্রথা তথায় শিথিল রহিয়াছে, তাহাতেই কবি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

অথবা দক্ষিণাপথবাসী দ্বারকা-নিবাসী শ্রীকৃষ্ণের শোভাযাত্রা বর্ণনাদি কবি দাক্ষিণাত্যের সমুচিত ভাবেই করিয়া থাকিবেন তাহাতে আশ্চর্য্যের হেতু নাই। অন্য কোনও প্রবন্ধেও এইরূপ বৈপরীত্য থাকিলে তাহাতেও কোনও বিশিষ্ট কারণ আছে বুঝিতে হইবে। অতএব ভারতে হিন্দুজাতি মধ্যেও অবরোধপ্রথা অনাদিকাল হইতে বা সমাজবন্ধনের মূল হইতে প্রচলিত; স্মৃতি, সংহিতা, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতি তাহার নিদর্শন।

"কপালকুণ্ডলা"র কাব্য-সৌন্দর্য্য।

[শ্রীগোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্-এ, বি-এল্]।

'কপালকুণ্ডলা' বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস, কিন্তু উপন্যাস হইলেও গ্রন্থকারের অন্যান্য উপন্যাসের সঙ্গে ইহার একটী প্রকৃতিগত পার্থক্য রহিয়াছে। সেজন্যই এই বইখানি লেখকের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় সর্ব্বজনপ্রিয় নহে, আর তাহা না হইবারই কথা। এ উপন্যাসে না আছে প্রেমের উচ্ছ্বাস, না আছে বিরহের হা-হুতাশ; না আছে মিলনের আনন্দ। এ ক্ষেত্রে সকলই যেন ব্যর্থ চেষ্টা আর নিরর্থক আয়োজনের দুঃখ-স্মৃতি বহন করিয়া প্রলয়ের পানে ছুটিয়া চলিয়াছে। ফলাহারভোজী ব্রাহ্মণের ন্যায় যাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে স্পৃহণীয় সবই পরে আছে, তাঁহাদের আশাও সম্যক ব্যর্থ বলিয়াই বিবেচিত হয়। এ গ্রন্থের শেষ ত শুধু সর্ব্বনাশ! লেখক মহাশয় যদি কোথাও ইষ্টসিদ্ধির একটুকু ইঙ্গিতেও করিয়া যাইতেন, "তার পরে তাঁহারা মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন" জাতীয় একটা মাঙ্গলিক আভাসমাত্রও দিয়া রাখিতেন, তবে না হয় আমরা পাঁচ জনে পাঁচ রকমে সে বিচ্ছেদকে পূর্ণ করিয়া, সে আভাষকে পরিণতি দিয়া কবির ত্রুটী সংশোধন করিয়া পরিতোষ লাভ করিতাম; কিন্তু গ্রন্থকার সেরূপ কোনও চেষ্টা করা ত দূরের কথা, সেরূপ সুযোগেরও কোনও অবসর দেন নাই। তিনি স্বীয় মানস-মূর্ত্তি দুইটীকে অকম্পিতহৃদয়ে এক প্রকার বোধনের পূর্ব্বেই বিসর্জ্জন দিয়াছেন, বিসর্জ্জনান্তে তিনি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল?" এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পূর্ব্বে আর একটী প্রশ্ন অনিবার্য্য হইয়া পড়ে যে, যদি এরূপ ভাবেই যাইবেন ত তাহারা আসিলেন কেন?

আমাদের দেশে নানাভাবে এ প্রশ্নের উত্থাপন হইয়াছে। অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন যে, বঙ্কিম বাবু কি উদ্দেশ্যে এ উপন্যাস লিখিয়াছেন এবং ইহার সার্থকতাই বা কোথায়? 'অন্যে পরে কা কথা'। বহুগ্রন্থপ্রণেতা দামোদর বাবু পর্য্যন্ত এ উপন্যাসের আর কোনও বিশেষ সার্থকতা না দেখিয়া বহু আয়াসে নবকুমার-কপালকুণ্ডলাকে গঙ্গা-প্রবাহ হইতে তুলিয়া

তাহাদিগকে রীতিমত গৃহস্থ করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছেন। দামোদর বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মীয় হইলেও তিনি সৌন্দর্য্যের এ অবমাননা, অপরূপ চিত্রের এ উদ্ভট কলঙ্ক উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি পরবর্ত্তী সংস্করণে কপালকুণ্ডলা-নবকুমারের স্পষ্ট মৃত্যু-সংবাদ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যাঁহারা মনে করেন গ্রন্থমাত্রেরই একটা বিশেষ অর্থ থাকা প্রয়োজন, তাঁহাদের নিকট বঙ্কিম বাবুর এ চেষ্টা যে সম্যক্ ব্যর্থ হইয়াছে তাহা সাড়ম্বরে বলিবার প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু বঙ্কিমবাবু নিজে এরূপ মনে করিতেন না; তিনি বলিয়াছেন যে যদি লোকশিক্ষাই গ্রন্থ লেখার প্রধান উদ্দেশ্য হইত তবে এত দিনে "হিতোপদেশই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইত।" কবির কাব্যই সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, সৌন্দর্য্যই কাব্যের প্রাণ, উদ্দেশ্যমূলক গ্রন্থনিচয় সময়বিশেষে জাতিবিশেষের আদরণীয় হইতে পারে; কিন্তু সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি দেশকালপাত্রের উর্দ্ধে। সৌন্দর্য্য কোনও জাতিবিশেষের সম্পত্তি নহে। এ জন্যই সৌন্দর্য্যমূলক কাব্যগ্রন্থগুলি বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্গত। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা একখানি পরম উপাদেয় কাব্যগ্রন্থ। উপন্যাসকে কাব্য বলিলাম, আশা করি রসজ্ঞ পাঠকের চক্ষে এ ব্যভিচার অমার্জ্জনীয় হইবে না। বঙ্কিমচন্দ্র 'কপালকুণ্ডলা'র সৌন্দর্য্যসৃষ্টিতে কিরূপ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার কথঞ্চিৎ আলোচনা করিবার জন্যই এ প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম।

গ্রন্থ-সূচনায় আমরা দেখিতে পাইলাম, একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর তীর্থ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল। নাবিকগণ কুজ্ঝটিকায় দিক্ নির্ণয় করিতে না পারায় নৌকা স্রোতের বেগে সমুদ্রের দিকে মরণের মুখে ছুটিয়া চলিল। যাত্রিগণ মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া কেহ বা ইষ্টমন্ত্র জপিতে লাগিল, আর কেহ বা ক্রন্দনের রোল তুলিয়া দিল, কিন্তু এবারে কাহাকেও মরিতে হইল না। ঈশ্বরেচ্ছায় এ যাত্রা তাহারা রক্ষা পাইল, কিন্তু যখন তাহারা রক্ষা পাইল বলিয়া আশ্বস্ত হইল, তখনই তাহাদের একজন সহযাত্রীর মৃত্যুপথ প্রশস্ত হইল। যাত্রিগণের মধ্যে এক জন যুবক ছিলেন, তিনিই এ উপন্যাসের নায়ক। তিনি সঙ্গিগণের অনশনক্লেশ দূর করিবার জন্য একাকী কাষ্ঠাহরণে তীরে অবতরণ করিলেন। ইতিমধ্যে জোয়ার আসিয়া নৌকা ভাসাইয়া লইয়া গেল। স্রোতোবেগে নৌকা বহুদূরে চলিয়া যাওয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করা

অসুবিধাজনক বুঝিয়া যাত্রিগণ স্বদেশে চলিয়া গেলেন। নবকুমার নির্জ্জন সমুদ্রতীরে নির্ব্বাসিত হইলেন।

গ্রন্থকার গ্রন্থারম্ভেই যে সমুদ্র-স্রোতের উল্লেখ করিলেন গ্রন্থমধ্যে আমরা ঘটনার সেরূপ বহু প্রবল স্রোত দেখিতে পাইব। সংসারে আমরা যতটুকু চলি, ঘটনাস্রোতে তার চেয়ে অনেক বেশী চালিত হই। এ সংসার-সমুদ্রে যাহারা দিক্‌ভ্রান্ত তাহারাই যে এই স্রোতের টানে মরণের পানে ছুটিয়া যায়, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা এ গ্রন্থ মধ্যে দেখিতে পাই।

গ্রন্থকার সূচনাতেই আমাদের সম্মুখে দুই চারি কথায় যে চিত্রের অবতারণা করিয়াছেন তাহাতেই আমাদের হৃদয় পূর্ব্বাহ্লেই কাব্যের সমগ্র চিত্রটি গ্রহণ করিবার জন্য অলক্ষিতে প্রস্তুত হইতে থাকে।

নাবিকগণ কুজ্ঝটিকায় দিঙ্‌নির্ণয় করিতে না পারায় এতগুলি যাত্রী স্রোতের মুখে বসিয়া মরিতে বসিয়াছিল। দেখিলে অবশ্যই দুঃখ হয়, কিন্তু যে যাত্রিগণ পরকালের কর্ম্ম করিবার জন্য এত ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া গঙ্গাসাগরে ছুটিয়া আসিয়াছিল, তাহারাই অনায়াসে উপকারীকে নির্জ্জনে বিসর্জ্জন করিয়া হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিয়া গেল। বুঝিলাম—দিগ্বিদিকজ্ঞানসমন্বিত লোকের সংখ্যা সংসারে বড় বেশী নয়। এই ধর্ম্মের পথে অধর্ম্মাচারীর মূর্ত্তি কাপালিকে পূর্ণ প্রকটিত।

আবার নাবিকগণ যেরূপ দিক্‌ভ্রান্ত হইয়া ঘটনাস্রোতে রক্ষক হইয়াও ভক্ষক হইতে বসিয়াছিল, নবকুমারও সেইরূপ কপালকুণ্ডলার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়াও কেমন করিয়া ঘটনাস্রোতে পড়িয়া তাহার সাধকের অহিত সাধন করিয়াছিলেন তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব।

নবকুমারের সহযাত্রিগণ যেস্থানে তাহাকে পরিত্যাগ করিল সেখানে আহার্য্য নাই, পেয় নাই, জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল। দারুণ শীত নিবারণ জন্য গাত্রবস্ত্র পর্য্যাপ্ত নাই। রাত্রিমধ্যে ব্যাঘ্রভল্লুকের সাক্ষাৎ পাইবার সম্ভাবনা, তিনি এ অবস্থায় প্রাণনাশ নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করিলেন।

তখন নবকুমারের হৃদয়মধ্যে মৃত্যুর করাল ছায়া ঘনীভূত হইতে লাগিল। বাহিরেও তখন আমরা দেখিতে পাই, রাত্রির অন্ধকার ক্রমে ক্রমে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, সেই অন্ধকারের ভিতর দিয়া একটি একটি করিয়া নক্ষত্র ফুটিতে লাগিল। নবকুমারের হৃদয় মধ্যেও গত জীবনের কত সুখস্মৃতি তাহার হৃদয়ের দুঃখান্ধকার ভেদ করিয়া একটি একটি করিয়া জাগিতে লাগিল।

ক্রমে শোকাভিভূত নবকুমারের তন্দ্রাকর্ষণ হইল। তিনি জাগ্রত হইয়া দেখিলেন, বহুদূরে নৈশান্ধকার ভেদ করিয়া একটা ক্রমবর্দ্ধমান আলোকরশ্মি দেখা যাইতেছে। আলোক-সংস্পর্শেই যেন তাহার হৃদয়েও এত নৈরাশ্যের মধ্যে আবার আশার আলো জ্বলিয়া উঠিল। নবকুমারের জীবনাশা পুনরুদ্দীপ্ত হইল। অন্তরে বাহিরে কি সুন্দর সুর মিলিল। এইরূপ অন্তরে বাহিরে সুসামঞ্জস্যও গ্রন্থের এক বিশেষত্ব।

নবকুমার সেই জনহীন সমুদ্র-সৈকতে হিংস্রজন্তু ভিন্ন অন্য কোন জীবের সঙ্গলাভ কল্পনাও করিতে পারেন নাই, আলোক-দর্শনে মনুষ্যসমাগম প্রতীতি হওয়ায় তাহার অবসন্ন হৃদয়ে আবার নববলের সঞ্চার হইল। তিনি সোৎসাহে আলোক লক্ষ্য করিয়া ছুটিলেন, সম্মুখীন হইয়া ভীতিবিহ্বল চিত্তে দেখিলেন—এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া ধ্যানরত এক রুদ্রমূর্ত্তি কাপালিক। কাপালিকের সম্মুখে নরকপালে রক্তবর্ণ দ্রবপদার্থ। তাহার কণ্ঠের রুদ্রাক্ষমালা মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। একটা বিকট দুর্গন্ধে গগন পবন সমাচ্ছন্ন। এক অত্যুচ্চ বালুকা-স্তূপের শিরোভাগে অগ্নি জ্বলিতেছিল। তৎপ্রভায় শিখরাসীন মনুষ্যমূর্ত্তি আকাশ-পটস্থ চিত্রের ন্যায় দেখা যাইতেছিল।

নির্জ্জনে নির্ব্বাসিত নবকুমার মনুষ্যসমাগমসম্ভাবনায় অতীব উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালীন মানসিক অবস্থাতে মনুষ্যমাত্রকেই তিনি ভূতলাগত দেবতা বলিয়া অভিনন্দন করিতে পারিতেন। কবি এখানে তাহাকে যে মানবের সম্মুখীন করিয়াছেন, তাহাকে নবকুমার সমজাতীয় জীব ভাবিতেও ভীত কুণ্ঠিত হইতেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের এ কাপালিক-প্রদর্শনের কারুসৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। এ শুধু অনুভব করিবার বিষয়। কবি সুকৌশলে কাপালিকের ভিতর বাহির একেবারে জ্বলন্ত জীবন্তভাবে আঁকিয়া দেখাইয়াছেন। কাপালিক যে কোন জগতের জীব, তাহা স্থান-কাল-পাত্রের সুসামঞ্জস্যে সম্যক্ প্রকটিত হইয়াছে। বালিরাশি-শীর্ষে গলিত-শবাসীন কাপালিক-মূর্ত্তি গভীর রাত্রে কাষ্ঠাগ্নিতে না দেখিলে আমরা কখনও তাহার এমন সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতাম না।

অনন্যোপায় নবকুমার অপ্রিয় হইলেও অবস্থাবশে এ হেন কাপালিকের সঙ্গ লইতে বাধ্য হইলেন। সে দিনের মত ক্ষুৎপিপাসা নিবারিত হইল। নবকুমার পর দিন আর কাপালিকের দর্শন পাইলেন না। ক্ষুধায় কাতর হইয়া ফলান্বেষণে বাহির হইলেন। অপূর্ব্ব-পরিচিত পথমধ্যে ভ্রমণ করিতে

করিতে করিতে পথভ্রান্ত হইয়া তিনি একেবারে সমুদ্রতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুরাশি সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে তাঁহার হৃদয় পরিপ্লুত হইল। তিনি সৈকতে উপবেশন করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, নবকুমার পরকালের কর্ম্ম করিবার জন্য গঙ্গাসাগর যান নাই, তিনি গিয়াছিলেন সমুদ্র-দর্শনে। সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার হৃদয়ের স্বাভাবিক আকর্ষণেই তিনি পথক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়া তীর্থদর্শনে গিয়াছিলেন।

ইহা ভিন্ন মনুষ্যমাত্রেরই জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন সৌন্দর্য্যের অভাব নিতান্ত অসহনীয় হইয়া উঠে। নবকুমারের একটী সৌন্দর্য্যশালিনী অঙ্কলক্ষ্মী জুটিয়াছিল; তাহাকে আশ্রয় করিয়া তাহার এ সৌন্দর্য্যপিপাসা প্রশমিত হইত। কিন্তু ঘটনাচক্রে পড়িয়া তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। বিরাগবশতঃ দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন না, কিন্তু এ আকস্মিক অভাবে তাহার হৃদয়ের ক্ষুধা বৃদ্ধি বৈ হ্রাস পাইতে পারে না। তাই বোধ হয় তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া প্রাণের পিপাসা দূর করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকিবেন। অভাবের টানে স্বভাবের টান বাড়িয়া গেল। তিনি মনে প্রাণে সৌন্দর্য্যের উপাসক হইলেন।

তাই এ বিপদকালেও সমুদ্র দর্শন করিয়াই নবকুমারের হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল, অনন্তবিস্তার নীলসমুদ্রের অগণিত তরঙ্গভঙ্গ নবকুমারের হৃদয়-মধ্যেও কত অগণিত আলোড়ন-বিলোড়নের সৃষ্টি করিল। গায়কের কণ্ঠস্বরের প্রতি কম্পন যেমন সুরজ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হৃদয়ে হৃদয়ে লয় হইতে থাকে, আজ ঐ সাগর-সঙ্গীতের প্রত্যেক প্রবাহও তাহার সৌন্দর্য্যমগ্ন হৃদয়ের স্তরে স্তরে লয় পাইতেছিল। নবকুমারের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব একাকার হইয়া গেল। সমুদ্রে যেমন তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেণার রাশি কুসুমদাম-গ্রথিত মালার ন্যায় ভাসিয়া উঠিতেছিল। নবকুমারের হৃদয় মথিত করিয়াও আজি অতীতের কত সুখ-দুঃখের স্মৃতি পরম্পরাক্রমে জাগিতে-ছিল। অদূরে ইউরোপীয় বণিক জাতির সমুদ্রপোত শ্বেতপক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধিহৃদয়ে উড়িতেছিল। এ দৃশ্য দেখিয়া নির্ব্বাসিত নবকুমারের হৃদয়ে এক মহাবিপ্লবের উদ্ভব হইল। বাস্তব জীবনেও মানুষ কেবল অনায়াসে দুর্লঙ্ঘ্য সাগর অতিক্রম করিয়া স্বকার্য্য-সাধনে চলিয়া যায়। সে স্থানে সে কালে তাহার সজীব অনুভূতি তাহার মর্ম্মগ্রন্থি পর্য্যন্ত স্পর্শ

করিল। তখন মানুষের সুখ-দুঃখের কথা, মনুষ্য-সমাজের সুখ-সুবিধার কথা, স্বদেশের কথা, আত্মীয়স্বজনপরিপূর্ণ নিজ পরিবারের কথা তাহার মনে হইতে লাগিল। অমনি যে মুখখানা ভুলিতে তিনি বহু সৌন্দর্য্যের মধ্যে আত্মস্থ হইয়াছেন সেই মুখখানি আজ নবকুমারের অনুভূতপূর্ব্ব সমস্ত সৌন্দর্য্যের ঐশ্বর্য্যে সমাচ্ছন্ন হইয়া হৃদয় মধ্যে জ্বল্ জ্বল্ করিয়া ভাসিয়া উঠিল। নবকুমার স্মৃতিসুখে তন্ময় হইলেন। ইতিমধ্যে প্রদোষ-তিমিরে সমুদ্রজল আবরিত হইল, পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনে নবকুমারের চৈতন্য হইল। তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন; গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন—সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! তাহার নিগূঢ়তম অন্তর আজি কেমন করিয়া এভাবে বাহিরে হইয়া প্রকাশিত হইল তিনি ভাবিয়া অবাক হইলেন। এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি বনমাঝে কি মনোমাঝে তিনি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না।

কাব্য-উপাখ্যানে নায়ক-নায়িকার মিলন অহরহঃ ঘটিতেছে। কিন্তু নবকুমার-কপালকুণ্ডলার মিলন-মাধুর্য্য বর্ণনাতীত।

কবি প্রথমতঃ নায়ককে নির্জ্জনে নির্ব্বাসিত করিয়া মানব-সাহচর্য্যের মূল্য নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাহাকে মানব-সমাগমের জন্য ব্যাকুল করিয়াছেন। তার পরে নায়কের হৃদয়-মন অনন্ত সমুদ্র-সৌন্দর্য্যে সুসংস্কৃত করিয়া তথায় এক মানসী মূর্ত্তির উদ্ভব করিয়াছেন। তার পরে সে মূর্ত্তিকে বাহিরে সজীব সৌন্দর্য্যে দাঁড় করাইয়াছেন। পূর্ব্বে রুদ্রদর্শন কাপালিকের নির্ম্মম মূর্ত্তি দেখাইয়া গ্রন্থকার একেবারে লাবণ্যললামভূতা কমনীয়া রমণীর অবতারণা করিয়া যে সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই অতুলনীয়।

বঙ্কিম বাবু কপালকুণ্ডলাকে আগুল্ফ-লম্বিত রাশিকৃত কেশভারে সুশোভিত করিয়া সৌন্দর্য্যের এক বিরাট উৎস খুলিয়া রাখিয়াছেন।

আপনারা জীবনে কম বেশী বোধ হয় সকলেই উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন যে, পরম প্রিয়জনের মানসমূর্ত্তি আমরা যখন কল্পনা-নয়নে অবলোকন করিবার প্রয়াস পাই, তখন সে মূর্ত্তি কখনই পূর্ণাবয়বে ফুটিয়া উঠে না, আমরা শুধু খণ্ডভাবেই তাহা অনুভব করিতে পারি। নবকুমার যখন সমুদ্র-সৈকতে বসিয়া মানস-নয়নে তাহার অতীত সুখের স্মৃতি তন্ময়চিত্তে দেখিতেছিলেন, তখন সে মুখের সঙ্গেও অন্যান্য অবয়বের কোনও স্পষ্ট সংস্রব থাকিতে পারে না।

তাই নবকুমার যখন তাহার অন্তরের মুখখানা বাহিরে দেখিলেন, তখন তৎসংশ্লিষ্ট অবেণীসংবদ্ধ সংসর্পিত আগুল্ফ-লম্বিত কেশরাশি, দৃষ্টপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যসম্ভারের অপ্রাপ্ত-রূপ স্মৃতি-প্রবাহের ন্যায় সে মুখখানা ঘিরিয়া রহিয়াছে বলিয়াই তাহার নিকট প্রতিভাত হইল। বিশেষতঃ মেঘবিচ্ছেদ-নিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত এই বাস্তব মূর্ত্তি অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে কাল্পনিক মূর্ত্তির ন্যায় ছায়াময়ী হওয়ায় অন্তরে বাহিরে আর কোনও প্রভেদ রহিল না, নবকুমার একবারে স্তম্ভিত বিমোহিত হইয়া পড়িলেন।

বঙ্কিমবাবু অধিকারী মহাশয়ের ঘটকালির তারিফ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি যে মায়াজালের সৃষ্টি করিয়া কন্যা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহাতে আর ঘটকালির কোনও প্রয়োজন হয় না।

কপালকুণ্ডলা কাপালিক-পালিতা সন্ন্যাসিনী; কাজেই তাহার অঙ্গে কোনও অলঙ্কার ছিল না। কিন্তু প্রকৃতি-মাতার প্রিয়দুহিতা যে কেশরাশির বাহুল্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাই তাহার অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের নিয়ামক হইয়াছিল। রূপসী সন্ন্যাসিনী যখন বন্য কুরঙ্গিনীর ন্যায় আনন্দ-আবেগে চঞ্চল চরণে বনে বনে ছুটিয়া বেড়াইত, তখন তাহার আলুলায়িত কেশকলাপ বায়ুবেগে উড়িয়া তাহার প্রতি অঙ্গে ছড়াইয়া পড়িত। তাহাতে তরঙ্গভঙ্গ-প্রক্ষিপ্ত সাগরের ন্যায় সেই স্থির সৌন্দর্য্যের মধ্যেও রূপের কত বিচিত্র লহর উত্থিত হইত।

অজ্ঞাতকুলশীলা কপাল-কুণ্ডলার উৎপত্তি-প্রকৃতি আদিও যেরূপ রহস্য-বিজড়িত, কপালকুণ্ডলার আগুলফলম্বিত কেশরাশি তাহার দেহখানিকে পর্য্যন্ত সেরূপ রহস্যজালের ন্যায় বেড়িয়া রাখিত। কপালকুণ্ডলার কেশকলাপ মনুষ্যসাধারণ হইতে স্পষ্ট পার্থক্যের একটা রহস্য জটিল সীমারেখার ন্যায় বিরাজ করিত।

এই ছায়াময়ী রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া নবকুমার একেবারে বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পরে মূর্ত্তি যখন করুণ কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ'?—নবকুমার তখন রমণীর বাস্তবতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। এই কণ্ঠস্বরে তাহার হৃদয়যন্ত্রের লয়হীন তন্ত্রীনিচয় আবার লয়বিশিষ্ট হইল। সংসার-যাত্রা সুখময় সঙ্গীতপ্রবাহ বলিয়া বোধ হইল। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় রমণীর অনুসরণ করিলেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল মানুষের নির্দ্দয়তা, মানুষের প্রতি মানুষের নিয়মনিষ্ঠ

অবহেলা দেখিয়া আসিতেছিলাম। সংসারটাও সিকতাময় মরুভূমির ন্যায় ভয়াবহ স্থান বলিয়া বোধ হইতেছিল। কিন্তু রমণীর এই রমণীয়তায়, করুণায় এই উদার উচ্ছ্বাসে আমাদেরও নবকুমারের ন্যায় সংসারযাত্রা একটা সুখময় সঙ্গীতপ্রবাহ বলিয়া প্রতীত হইল।

কপালকুণ্ডলার প্রথম বাণী 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ" এক অনাবিল সৌন্দর্য্যের মহাপ্রস্রবণ। পরদুঃখকাতর রমণী-হৃদয়েরও করুণ উৎস যেন আকাশে বাতাসে ছড়াইয়া পড়িল। সাগরবসনা সুন্দরী পৃথিবীর সৌন্দর্য্য বুঝি বাড়িয়া গেল!

যেখানে কপালকুণ্ডলা তাহার করুণ-কোমল হৃদয়ের সহানুভূতি লইয়া পথভ্রান্ত নবকুমারকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইলেন, সেখানেই নবকুমারের ভবিষ্যৎ পথভ্রান্তির প্রথম সূত্রপাত হইল। কবির এ কৌশল অনুধাবন-যোগ্য।

কপালকুণ্ডলা বাল্যকালে দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত সমুদ্র-তীরে নিক্ষিপ্ত হন; তদবধি কাপালিকই তাহাকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। মনুষ্য-সমাজ হইতে বহুদূরে অবস্থিত নিবিড় বনে সন্ন্যাসী-পালিতা কপালকুণ্ডলার সমাজের সঙ্গে কোনও সংস্রবমাত্র ছিল না, তিনি সামাজিক ধর্ম্ম-কর্ম্ম নীতি-পদ্ধতির কোনও ধারই ধরিতেন না। তাই তাঁহার হৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলি নিতান্ত নিরপেক্ষভাবেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। আমাদের প্রত্যেকেরই চরিত্রের গুণ এবং দোষ সবগুলিই কতক আমাদের প্রকৃতিগত আর কতক আমাদের পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল। সামাজিক জীবের প্রাকৃতিক বৃত্তিগুলিও সম্যক্ সামাজিক প্রভাব-বর্জ্জিত হইতে পারে না। কিন্তু বঙ্কিমবাবু কপালকুণ্ডলাকে সম্পূর্ণ সামাজিক প্রভাব-বর্জ্জিত করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। সেই জন্য কপালকুণ্ডলা সমাজের বাহ্যিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধেও যেমন উদাসীন ছিলেন, তাহার হৃদয়ে সামাজিক গুণেরও তেমন সম্পূর্ণ অভাব ছিল। কপালকুণ্ডলার দয়া ছিল, ধর্ম্মে বিশ্বাস ছিল, একাগ্রতা ছিল। তিনি হৃদয়ের টানে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কার্য্য করিয়া যাইতেন; কিন্তু তাহাতে অন্যের কি দশা হইল বা হইতে পারে, তাহা তাহার মনে আসিত না। তিনি যাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহার কার্য্য করিতেন, তিনি তাহাকে ভিন্ন কাহাকেও দেখিতে পাইতেন না। সমস্ত সুখ-সুবিধারই যে একটা মূল্য দিতে হয়,

সমাজ-সংশ্রবশূন্যা কপালকুণ্ডলার স্বাধীন হৃদয় কিছুতেই তাহা স্বীকার করিতে পারিত না।

কপালকুণ্ডলার চরিত্রে লজ্জা-সঙ্কোচ কিছুই ছিল না, তিনি যুবতী হইয়াও অনায়াসে বিদ্যুদ্বেগে ছুটিতে পারিতেন। অপরিচিত যুবকের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে কথা বলিতে পারিতেন। বিবাহ যে কি তাহাও তিনি কিছুই বুঝিতেন না। অধিকারী মহাশয় যখন নবকুমারের সঙ্গে তাহার বিবাহের কথা তুলিলেন, তখন কপালকুণ্ডলার তাহা বোধগম্য হইল না; কাজেই অধিকারী মহাশয় ইহা স্ত্রীলোকের একটা অতি অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তার পরে যখন তিনি কাপালিকের অসদভিপ্রায়ে তাহাকে প্রতিপালনের কথা বুঝাইবার প্রয়াস পাইলেন, কপালকুণ্ডলা তখন তাহাও কিছুই বুঝিলেন না; কিন্তু ভীত হইলেন। গত্যন্তর দেখিয়া বলিলেন, "তবে বিবাহই হউক"। কপালকুণ্ডলার এ সরলতা অতীব প্রীতিপ্রদ।

বঙ্কিমবাবু সংসার-অনভিজ্ঞা কপালকুণ্ডলার যে সহজ সরল চরিত্র-চিত্রণ করিয়াছেন তাহা বঙ্গসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। যে শক্তি, যে সংযম লইয়া এরূপ চিত্র অঙ্কিত করিতে হয় তাহা অসাধারণ।

মানবের মন এমন ভাবে গঠিত যে, পরকেও আমাদের নিজের মাপ-কাঠিতে ওজন করিয়া বুঝিতে হয়। আমাদের প্রকৃতি হইতে যাহার স্বাতন্ত্র্য যত অধিক, আমরা তাহাকে তত কম বুঝিতে পারি। মানুষের এ অক্ষমতা সংসারে বহু দুঃখের নিদান। যে বস্তু আমাদের নিকট একটা নূতনত্ব লইয়া দেখা দেয়, আমরা তাহাকে পরিচিতপূর্ব্ব আকার না দিয়া সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না।

এই জন্যই কাপালিক নবকুমারের মাংসপিণ্ড দেবীর পদে বলি দেওয়াটাই মানব-জীবনের চরম চরিতার্থতা বলিয়া মনে করিত। নবকুমার সন্ন্যাসিনীকেও বিবাহ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। অধিকারী মহাশয় ঘটকালি করিয়াই তাহার কপালিনীর গতি করিলেন। একবার সোণার পুত্তলি ছেলে কোলে ফেলিয়া দিলে কপালকুণ্ডলা সুখী না হইয়া পারে না, ইহাই শ্যামাসুন্দরীর স্থির সিদ্ধান্ত।

কপালকুণ্ডলা তাহার নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক করুণাপ্রেরণায় নিজের বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া বিপন্ন নবকুমারের প্রাণরক্ষা করিলেন। ক্রূরকর্ম্মা কাপালিকের এতাদৃশ অনভিপ্রেত কার্য্য করিয়া তাঁহার নিকট ফিরিয়া গেলে

কিছুতেই তাহার নিস্তার নাই। স্থির জানিয়া, অধিকারী মহাশয় কপালকুণ্ডলাকে কাপালিকের নিকট ফিরিয়া না যাইয়া নবকুমারের সঙ্গে পলায়ন করিবার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলেন। পরপুরুষের সঙ্গে যুবতী স্ত্রীলোকের গমন অবিধেয় বিবেচনায় তিনি নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কপালকুণ্ডলা এ বিষয়ের মাথামুণ্ড কিছুই বুঝিলেন না। কিন্তু কাপালিকের অসদভিপ্রায়ের কথা শুনিয়া বিশেষ ভীত হইয়া "তবে তাহাই হউক" বলিয়া বিবাহে সম্মতি দিলেন। অধিকারী মহাশয় যথারীতি কুলপরিচয়াদি গ্রহণান্তর কপালকুণ্ডলার হিতার্থে নবকুমারের যে একটুকু ত্যাগস্বীকার করিয়া তাহাকে বিবাহ করা ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই,— 'অকাট্য' প্রমাণ দিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিলেন। নবকুমারও ত্যাগ-স্বীকারে স্বীকৃত হইলেন। গোধূলি-লগ্নে কাপালিক-পালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।

অধিকারী মহাশয় কপালকুণ্ডলার পরম হিতকাঙ্ক্ষী ছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি কপালকুণ্ডলাকে সম্পূর্ণ সংসার-অনভিজ্ঞা বলিয়া জানিতেন। এদিকে বিষয়ী লোকের রীতিচরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার সম্যক্ জ্ঞান আছে বলিয়াও তাঁহার একটুকু অহঙ্কার ছিল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার সহিত সংসারের যে বাস্তবিক কি সম্বন্ধ তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। সাংসারিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতেই আবার বহুদিন পরে তাঁহার ঘটকবৃত্তির কণ্ডুয়ন উপস্থিত হইল। স্ত্রী-চরিত্রের যাবতীয় ত্রুটীই যে বিবাহান্তে সংশোধিত হইয়া যায়, কুলাচার্য্যগণের এক কৌলিক সংস্কার তিনি হিজলীর বনেও বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। তাই তিনি সন্ন্যাসিনীকে বিবাহ দিয়া তাহার গতি করিলেন মনে করিয়া পরম আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন।

আর নবকুমার—তিনি ত কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া অবধিই তাহার রূপ-সাগরে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। তার পরে যখন সেই সুন্দরী একপ্রকার প্রাণ দিয়া তাঁহার প্রাণ বাঁচাইল, তখন অন্তর-বাহির তুলামূল্য হইল। উজ্জ্বলে মধুরে মিশিল। নবকুমার একেবারে তন্ময় হইলেন। যখন নবকুমার ভিতরে বাহিরে সেই মনোহর রূপ দেখিতেছিলেন, তখনই অধিকারী মহাশয় কপালকুণ্ডলার সহিত তাঁহার বিবাহের অতি-প্রয়োজনীয়তা প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হইলেন।

বিবাহ-পক্ষে ঘটক-চূড়ামণির যুক্তি শুধু তাহার বিবাহ সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহ

মাত্র প্রকাশ করিতেছিল, কিন্তু নবকুমার অধিকারীর কথায় যে উত্তর দিতেছিলেন তাহাতে আন্তরিকতার সবিশেষ অভাব ছিল। যখন অধিকারী মহাশয় স্পষ্ট বিবাহের প্রস্তাব করিলেন, তখন নবকুমার হৃদয়-আবেগের অত্যধিক আতিশয্যে একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিয়া দ্রুতপাদবিক্ষেপে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি এভাবে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ধর্ম্মপত্নী করিতে স্বীকৃত হইলেন।

যে কপালকুণ্ডলাকে এ কয়দিনে একেবারে রূপে গুণে অনুপম তুলনা-রহিত বলিয়া নবকুমারের নিশ্চিত প্রতীতি হইতেছিল, তিনি কেবলমাত্র ইচ্ছা করিলেই আজ যে কপালকুণ্ডলা এক মুহূর্ত্তেই তাহার হইতে পারে, পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্যের সারে যে রমণীদেহ গঠিত, হৃদয়ে যিনি দেবী, তিনি কি তবে নির্ব্বাসিত নবকুমারের মৃত্যু-মথিত অমৃত ?

তখন তাঁহার নির্ব্বাসন একটা দৈব-বিধানের সৌন্দর্য্য পাইল। কাপালিকের তাঁহাকে ভৈরবী-প্রেরিত বলার সুন্দর অর্থসঙ্গতি হইল। সেই বনদেবী যে তাহারই হৃদয়দেবী হইবার সুযোগমাত্রের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র রহিল না। অস্পষ্ট বিধিলিপি যেন তিনি স্পষ্ট পড়িতে পারিতেছিলেন। নবকুমার বিবাহে স্বীকৃত হইলেন।

বিগতপত্নীক নবকুমার কপাল-কুণ্ডলাকে দেখিয়াই যে একটা আবেগময় স্বপ্ন-সুখে নিমগ্ন হইবেন তাহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু এ পর্য্যন্ত কপাল-কুণ্ডলাতে তিনি কোনও প্রণয়-লক্ষণ দেখিতে পান নাই। কপালকুণ্ডলা মানববেশী দেবতার ন্যায় অযাচিত ভাবে নবকুমারকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি প্রয়োজনানুরোধে সরলা বালিকার ন্যায় তাহার নিকট নিঃসঙ্কোচে যাতায়াত করিতেন। কপালকুণ্ডলা কিছুমাত্র প্রত্যাশা না রাখিয়া নানাভাবে কেবলই নবকুমারকে অনুগৃহীত করিতেছিলেন। নবকুমারের হৃদয় যদি উচ্চসুরে বাঁধা থাকিত, তবে তিনি কপালকুণ্ডলাকে আর একটু উর্দ্ধ জগতে তুলিয়া ধরিতে প্রয়াস পাইতেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের যুবজনসুলভ রূপোন্মত্ততার প্রভাবে তাহার কৃতজ্ঞতা আরও উচ্চগ্রামে উঠিতে পারে নাই।

তিনি যেন তাঁহার হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার সঠিক স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিতেছিলেন না। তার পর যখন বিবাহের প্রস্তাব হইল, বিবাহই কপাল-কুণ্ডলার একমাত্র হিতকর বলিয়া তাঁহার সন্তানকল্প শুভানুধ্যায়ী অধিকারী

কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইল, তখন নবকুমারের দুর্ব্বল হৃদয় দুর্ব্বলতর হইল; তিনি লোভ সামলাইতে পারিলেন না। রমণী যে স্ত্রী হইয়াই জন্মগ্রহণ করে না, সৌন্দর্য্য-মাত্রই যে কেবল মানুষের প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য সৃষ্ট হয় নাই, শিক্ষায় যে লোকের প্রকৃতির আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভবে না, এসব কথা তাহার মনে হইল না। বালক যেমন দ্রব্যমাত্রকেই খাদ্য বলিয়া মুখে তুলিয়া দেয় নবকুমারও তেমন কপালকুণ্ডলাকে স্ত্রীলোক জানিয়াই বিবাহ করিতে স্বীকৃত হইলেন। বিশেষতঃ হৃদয়বেগের মাত্রাধিক্যে বুদ্ধিশক্তি উপেক্ষিত হইল। নবকুমার যুবকের মত, রূপোন্মত্তের মত, সুখান্বেষীর মত সিদ্ধান্ত করিলেন। কপালকুণ্ডলার কথা তেমন বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিলেন না। ফলে কপালকুণ্ডলা বিসর্জ্জিত হইলেন, তদেকগতপ্রাণ নবকুমারেরও আর মৃত্যু ভিন্ন পথ রহিল না।

নবকুমার সমাজ হইতে বিসর্জ্জিত হইয়াও কপালকুণ্ডলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে একমাত্র সমাজেরই ভয় করিতেন। সামাজিক জীবের পক্ষে সমাজ তাঁহার নিজের চেয়েও বেশী সত্য। কিন্তু কপালকুণ্ডলার সে উপদ্রব ছিল না। তিনি সমাজের অসংখ্য নিয়ম-শৃঙ্খলে ব্যাহতগতি হইয়া বড়ই দুর্ব্বিষহ জীবন যাপন করিতেছিলেন। সমাজের সমস্ত নিয়মগুলিই তাঁহার নিকট নির্ম্মম নিষেধ বলিয়া মনে হইত। সমাজের সুখ-সুবিধা যাহার নিকট অর্থহীন, সমাজহিতে স্বার্থসঙ্কোচ তাঁহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ মাত্র। তাই শ্যামাসুন্দরীর সুখের এমন রসাল ফর্দ্দটিও কপালকুণ্ডলার নিকট নিরর্থক। তিনি যখন বিবাহে স্বীকৃত হন, তখন সংসারটা কি যে বিষম ঠাঁই তাহা তিনি আদৌ জানিতেন না। তবে সেটা হিজলী বনেরই যে একটা রূপান্তর হইবে তাহাতে তাঁহার মনে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু পরে বুঝিলেন, এ এক কারাগার। সকলের তাঁহাকে সুখী করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইল, বনবিহঙ্গিনী সংসার-পিঞ্জরে ম্রিয়মানা হইতেছিলেন। বনলতা উদ্যানের আওতায় বিশুষ্ক হইতে লাগিল। কপালকুণ্ডলার জীবন-ভার অসহনীয় হইল।

একদিকে কপালকুণ্ডলা যেমন সামাজিক নিয়মপদ্ধতিকে অগ্রাহ্য করিতে-ছিলেন, অন্যদিকে সমাজেরও যত উদ্যত শাসন অহর্নিশ তাহাকে নিপীড়িত করিত। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যাহার সঙ্গতি হইবে না জগতে তাহার বিলোপ অনিবার্য্য।

কপালকুণ্ডলা স্বেচ্ছানুযায়ী যথা-তথা গমন করিতেন। নিষেধ সত্ত্বেও যাহার-তাহার সঙ্গে কথা কহিতেন। এই যথেচ্ছ ব্যবহারে নবকুমারের

যে কি দশা ঘটিতেছিল, কপালকুণ্ডলার তাহা বিশেষ করিয়া কিছুই মনে হইত না। তিনি আত্মছন্দানুবর্ত্তিনী হইয়া একটা দুর্নিবার স্রোতের ন্যায় বহিয়া চলিতেছিলেন। সে স্রোতে যে নবকুমারের হৃদয়ের কূলে কূলে আঘাত লাগিতেছিল কপালকুণ্ডলা তাহা বুঝিতেন না। নবকুমার যেমন নিজের কথা ভাবিয়াই বিবাহ করিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলাও তেমন নিজেকে লইয়াই বিব্রত রহিলেন। প্রকৃতির প্রতিশোধ পূর্ণবেগে চলিতে লাগিল।

কপালকুণ্ডলার সংসার-জ্ঞানে বিবাহ তাঁহার নিকট দাসীত্বমাত্র বলিয়া বোধ হইল। বিবাহ সম্বন্ধে যাহার এইরূপ ধারণা তাহার নিকট হইতে দাম্পত্যপ্রেমের আশা দুরাশা মাত্র।

শ্যামাসুন্দরীর জন্য ঔষধ আনিতে যাইয়া কপালকুণ্ডলার ব্রাহ্মণবেশী মতি বিবির সঙ্গে দেখা হইল। কপালকুণ্ডলা তাহার সম্বন্ধীয় কু-অভিসন্ধির কথা অবগত হইলেন। ভয়ে দৌড়িয়া বাড়ী ফিরিলেন। প্রাঙ্গণে বিদ্যুতালোকে দেখিলেন —সেই সাগরতীরবাসী কাপালিক।

কপালকুণ্ডলা যখন পরহিতব্রতে নৈশভ্রমণে বাহির হইলেন, তখন তাঁহার পূর্ব্বসংস্কারবশে মনে এক প্রকার আনন্দ জন্মিল। যদি খাঁচার পাখী শিকল কাটিয়া মনের সুখে একবার অনন্ত আকাশে উড়িতে পারে, তবে যেমন পরম পুলকিত হয়, আজ কপালকুণ্ডলার হৃদয়েও তেমন মুক্তির আনন্দ উথলিয়া উঠিল। তাহার গত জীবনের সুখ-নিবাস হিজলি বনের কথা মনে হইল। উপরে সাদা মেঘের ভিতর দিয়া চন্দ্র হাসিয়া ভাসিয়া ছুটিতেছিল, নিম্নে বনমধ্যে চন্দ্রকরোজ্জ্বলা হাস্যময়ী রমণী আনন্দ-উদ্বেগে অধীর হইয়া বৃক্ষনিম্ন দিয়া চলিতেছিলেন। হঠাৎ আকাশে মেঘ উঠিল, বনান্ধকার গাঢ়তর হইল। ভীতা কপালকুণ্ডলা দৌড়িতে লাগিলেন। প্রবল ঝটিকাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। চতুর্দ্দিকে ঘনগম্ভীর মেঘগর্জ্জন এবং অশনিসম্পাত হইতেছিল। কপালকুণ্ডলা দৌড়িয়া প্রকোষ্ঠ মধ্যে উঠিলেন।

কপালকুণ্ডলা তাঁহার সম্বন্ধীয় কুপরামর্শের কথা অবগত হইয়া অবধিই নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি যেমন দ্রুতপদক্ষেপে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, অমনি এ প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ আরম্ভ হইল।

কপালকুণ্ডলা সংসারে আসিয়া অবধি এক দিনও শান্তি পান নাই। কিন্তু যে প্রকৃতি-মাতার কোমল কক্ষে উদার বক্ষে তিনি পালিতা বর্দ্ধিতা হইয়াছিলেন, তিনি যেন কখনও তাঁহার অভাগিনী কন্যাকে ভুলিতে

পারেন নাই। তাই বুঝি কপালকুণ্ডলার আনন্দে প্রকৃতি-মাতা হাসিয়া উঠিতেন। তাঁহার আনন্দ-উচ্ছ্বাস গগনে পবনে জাগিয়া উঠিত। আবার বিপদ-সূচনায় মাতৃহৃদয়ের বিলাপ-ব্যাকুলতা বুঝি উদাসিনী কন্যার ধ্যান ভাঙ্গিয়া তাহাকে নিরাপদ করিবার জন্য ঝড়ের বেগে, বজ্রের রাগে, প্রলয়ের সুরে ফুটিয়া উঠিত। এমন বাহিরের ভাষায় অন্তরের কথা, এমন জড়ের ভাষায় চৈতন্যের কথা, এখন জড়ের জীবের একাত্মতা বাঙ্গালা ভাষার কোনও কাব্যে দেখা যায় না। সৌন্দর্য্যের স্রোত যেন বর্ণনার ছত্রে ছত্রে উছলিয়া উথলিয়া বহিয়া যায়।

কপালকুণ্ডলা ব্রাহ্মণবেশীর নিকট কাপালিকের স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া একেবারে আত্মবিসর্জ্জনের জন্য অধীরা হইলেন। কাপালিক অধিকারী-পালিতা সন্ন্যাসিনীর ধর্ম্মবিশ্বাস প্রবল ছিল। স্বভাবতঃই রমণীহৃদয় বিশ্বাসের নিগূঢ় নিকেতন। বিশেষতঃ কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে দ্বিধার কোন স্থান ছিল না। স্রোতস্বিনীর ন্যায় সকলই সে হৃদয়ে একটানা। তাই যখন তিনি শুনিলেন ভবানী তাঁহাকে বলি চাহিয়াছেন, তখন পথ-নির্ব্বাচনে তাঁহার আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী নিজেই তাঁহাকে বলি চাহিতেছেন। ইহার উপর আর ভাবিবার বুঝিবার কি থাকিতে পারে ?

ভাবিতে ভাবিতে কপালকুণ্ডলা ভবানীগতপ্রাণা হইলেন। দেখিলেন, কালিকা অঙ্গুলিনির্দ্দেশে তাঁহাকে পথ দেখাইতেছেন। তিনি বিশ্বমাতার বাঁশীর স্বরে আকুল হইয়া মৃত্যুর পথে অমৃতের সন্ধানে ছুটিয়া চলিলেন। স্রোতস্বিনী এবারে দ্রুত ছুটিয়া বাঁধন টুটিয়া প্রাণের সাগরে প্রেমের সাগরে মিশিতে চলিলেন। তাপক্লিষ্টা বিরহিণী তাঁহার চিত্তশান্তি খুঁজিতে চলিলেন।

তাই করুণারূপিণী জননী অনন্ত বাহু উদ্যত করিয়া কন্যা কপালকুণ্ডলাকে তাঁহার শান্ত-শীতল স্নেহময় বক্ষে গ্রহণ করিলেন। কপালকুণ্ডলা দেবপূজার পবিত্র পুষ্পের মত পবিত্র সৌন্দর্য্যে অনন্তের পানে ভাসিয়া চলিলেন।

কি সুন্দর পরিণতি! দেবপূজার অঞ্জলি হইয়া যে কুসুম সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে মহাসমারোহে বিকশিত হইতেছিল, রূপমুগ্ধ বালক তাহা ছিঁড়িয়া আনিয়া নিজ প্রয়োজন লাগাইতে চাহিল; কিন্তু সৌন্দর্য্য কোনও ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনীয় নহে। বিশেষ প্রয়োজনহীনতাই সুন্দরের সৌন্দর্য্য। স্বার্থাম্বু-প্রেরিত সৌন্দর্য্য-ভোগ সৌন্দর্য্যের অবমাননা মাত্র।

দেবতার অঞ্জলি দেবতা গ্রহণ করিয়া পুষ্পের জন্ম সার্থক করিলেন। পুষ্প

গঙ্গাস্রোতে ভাসিয়া চলিল। নবকুমারের মোহবন্ধন কাটিল না; বড় জোরে টান পড়িল। তিনি অস্থির হইয়া বালকের ন্যায় ফুলের জন্য গঙ্গাস্রোতে প্রাণ হারাইলেন।

ক্রূরকর্ম্মা কাপালিকের আড়ম্বরবহুল ধর্ম্মসাধন যেখানে নরহত্যায় পর্য্যবসিত, সরলপ্রাণ বালিকার নিঃসঙ্কোচ আত্মদান সেখানে পুণ্যপ্রভায় সমুদ্ভাসিত।

স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

বাঙ্গালার সাহিত্য-সায়রের শতদল শুকাইল! প্রবীণ সাহিত্যাচার্য্য, বঙ্কিম-যুগের অন্যতম মনস্বী সাহিত্যরথী স্বনামধন্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার আর নাই! গত ১৬ই আশ্বিন রাত্রি অনুমান ১২॥০টার সময়ে ৭১ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

অক্ষয়চন্দ্রের চিরজীবনের সাধ ছিল—বাঙ্গলার চির-শ্যামায়মান পল্লীর স্নিগ্ধ শান্ত ক্রোড়েই যেন তিনি জীবনের খেলা শেষ করেন। শুধু সাধ বলিলে ঠিক হইবে না, ইহাই তাঁহার সংকল্প ছিল, জীবনের অতি বড় প্রতিজ্ঞা ছিল। এ প্রতিজ্ঞা তিনি অটুট রাখিয়াছিলেন। যে চুঁচুড়ায় অক্ষয়চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন, সেই চুঁচুড়াতেই তিনি দেহ রাখিয়াছেন। তিনি পুনঃ পুনঃ বাঙ্গালী জাতিকে সম্বোধন করিয়া এই ভাবের কথা বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী আমরা, পল্লীবাস আমাদিগকে বজায় রাখিতেই হইবে। কারণ, বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি পল্লীতেই অবস্থিত। পল্লীকেই কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালীর জীবন-পরিধির বিস্তার ঘটে। নগরবাসী হইয়া আমরা উৎসন্ন হইতে বসিয়াছি। আর নয়। আর পল্লীবাসকে উপেক্ষা করা আমাদের উচিত নহে। আমাদের সকলেরই পল্লীতে বাস করা কর্ত্তব্য। এ কথা তিনি বাক্যবীরগণের মত কেবল মুখে বলিয়াই আত্মকর্ত্তব্য শেষ করেন নাই; তিনি আপনার আদর্শ আপনিই কার্য্যে দেখাইয়া গিয়াছেন। অক্ষয়চন্দ্র মনে করিলে সহরে নগরে যেখানে ইচ্ছা বাস করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। পল্লীগতপ্রাণ অক্ষয়চন্দ্র আজীবন পল্লীতেই জীবন অতিবাহিত করিয়া গেলেন! ম্যালেরিয়ার সহিত যুঝিতে যুঝিতে, দেশবাসীকে স্বাস্থ্যের মহিমা ও স্বাস্থ্যনীতি-পালনের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইতে বুঝাইতে, এই মহাপ্রাণ সাহিত্যিক পল্লীবাস হইতে অনন্তধামে মহাপ্রয়াণ করিলেন। কথায় ও কার্য্যে এমন সামঞ্জস্য রাখিতে ইদানীং আর কোনও বাঙ্গালীকে

দেখিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না। অক্ষয়চন্দ্র প্রায়ই বলিতেন—আগে স্বাস্থ্যরক্ষার ও দারিদ্র্য-নিবারণের উপায় কর; তার পর সাহিত্য-চর্চ্চা করিবে। অসুস্থ দেহ ও অভাব লইয়া সাহিত্যের আলোচনা চলে না।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে চুঁচুড়ায় অক্ষয়চন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। অক্ষয়চন্দ্র পিতামাতার একমাত্র পুত্র। ইহার পিতার নাম স্বর্গীয় গঙ্গাচরণ সরকার। ইনি সেকালের একজন বিখ্যাত সদরালা এবং কবি ছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র মেধাবী ছাত্র ছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বিচারপতি মাননীয় আমীর আলি ইহার সহপাঠী। বি-এ পরীক্ষাতেও অক্ষয়চন্দ্র উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাহার পর বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ইনি কিছু দিন মুর্শিদাবাদ-বহরমপুরে ওকালতীও করিয়াছিলেন। কিন্তু সাহিত্যগতপ্রাণ অক্ষয়চন্দ্র আইন-ব্যবসায়ে বেশী দিন লিপ্ত থাকিতে পারেন নাই। সাহিত্যের খাতিরে এ পেশা তাঁহাকে ছাড়িতে হইয়াছিল।

স্কুল-কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির মারফতে অক্ষয়চন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু খাঁটী শিক্ষা পাইয়াছিলেন তিনি পিতার নিকটে। বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার যে অকপট অনুরাগ জন্মিয়াছিল, তাহার মূলে এই পিতৃদত্ত শিক্ষা। তাঁহার পিতৃদেবই তাঁহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া 'মানুষ' করিয়াছিলেন। নহিলে ইংরেজীনবীশ অক্ষয়চন্দ্র যুবা বয়সে দেশের প্রাচীন সাহিত্যের এমন অনুরাগী ভক্ত হইয়া পড়িতেন না। স্বধর্ম্মের প্রতি এই যে ঐকান্তিক ভক্তি ও নিষ্ঠা, ইহাও তিনি পিতার নিকট হইতেই শিখিয়াছিলেন। ইংরেজী শিক্ষায় কি তাঁহার তবে কিছু উপকার হয় নাই? হইয়াছিল বৈ কি। যে 'পেটরিয়টিজম্' বা দেশাত্মবোধ বঙ্কিমচন্দ্রের শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল, অক্ষয়চন্দ্রের হৃদয়ও সেই দেশাত্মবোধে পরিপূর্ণ ছিল। 'সাধারণী' তাহারই ফল। এই পেটরিয়টিজম্ 'সাধারণী'তে ষোল কলায় ফুলিয়া উঠিত।

অক্ষয়চন্দ্র বড় অকপট দেশভক্ত ছিলেন। আত্মমত নির্ভীকভাবে প্রচার করিবার তাঁহার সাহস ছিল। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পরে অক্ষয়চন্দ্রের সাহিত্যিক বন্ধুবর্গের অনেকেই কংগ্রেসের উপর ব্যঙ্গবিদ্রূপের শাণিত শায়ক নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র, ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর এই রাজনীতি-চর্চ্চাকে অনুকূল দৃষ্টিতে দেখিতেন না। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র অটল অচল। তিনি

কংগ্রেসের পক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। এমন কি প্রথম যখন কলিকাতায় কংগ্রেস হয়, তখন অক্ষয়চন্দ্র কংগ্রেসের জন্য যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র খাঁটি সাহিত্যিক ছিলেন। সাহিত্য-সেবায় তিনি আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। পাছে সাহিত্য-সেবার অপহ্নব ঘটে, এই জন্য তিনি ওকালতি ব্যবসায় ত্যাগ করিয়াছিলেন। অক্ষয়চন্দ্রের বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে কেহ ডেপুটী ছিলেন, কেহ উকীল ছিলেন, কেহ বা অপর কোনও উচ্চ রাজকর্ম্ম করিতেন এবং অবসর-সময়ে সাহিত্যের আলোচনায় ব্যাপৃত হইতেন। কিন্তু অক্ষয়চন্দ্রের জীবনে সকল সময়েই অবসর—সকল সময়েই সাহিত্য-সেবা। মাতৃভাষার এমন একনিষ্ঠ সেবক অক্ষয়চন্দ্রকে হারাইয়া সত্যই আমরা দুঃখিত!

অক্ষয়চন্দ্র যখন সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের যশঃসূর্য্য ধীরে ধীরে মধ্যগগনের দিকে অগ্রসর হইতেছিল। এই সময়ে তিনি বঙ্কিম-চন্দ্রের সহিত পরিচিত হন। তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' তিনি লিখিতে আরম্ভ করেন। 'বঙ্গদর্শনে' তিনি যে "গ্রাবু" নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার সুখ্যাতি এখনও লোকে করিয়া থাকে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' তাঁহার 'চন্দ্রালোকে' নামক একটী উপাদেয় প্রবন্ধ আছে। এ প্রবন্ধ অতুলনীয়। অক্ষয়চন্দ্র যে কত বড় লেখক ছিলেন, এ প্রবন্ধে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয়চন্দ্র নিরপেক্ষ সমালোচক ছিলেন। তাঁহার ভাষা সহজ সরল; উহার মধ্যে ঘোর-প্যাঁচ নাই। সকলে যাহাতে লেখা বুঝিতে পারে, এই জন্য তাঁহার ভাষায় আড়ম্বর থাকিত না। অথচ উহা বেশ ঝরঝরে তর্‌তরে ছিল। অক্ষয়চন্দ্র যত বড় সাহিত্যিক ছিলেন, সেই হিসাবে সাহিত্যে তাঁহার দান যেরূপ হওয়া উচিত ছিল, দুঃখের বিষয় তাহা হয় নাই। স্থায়ীভাবে সাহিত্যে তিনি তেমন কিছু দিয়া যাইতে পারেন নাই। 'সমালোচনা' 'সনাতনী' ও 'কবি হেমচন্দ্র' নামক পুস্তক তিনখানি তাঁহার লেখনী-প্রসূত।

অক্ষয়চন্দ্রের সম্পাদিত 'নবজীবন' মাসিক পত্র এককালে বাঙ্গালার মাসিক-জগতে বরেণ্য আসন অধিকার করিয়াছিল। ইহার পরিচালনায় তিনি যথেষ্ট গুণপণা দেখাইয়াছিলেন। আর তাঁহার সম্পাদিত সাপ্তাহিক "সাধারণী" সেকালে অতুলনীয় ছিল। তাঁহারই অনুকরণে মোটামুটি এখনকার বাঙ্গালা সংবাদপত্রগুলি চলিতেছে। অক্ষয়চন্দ্র বৈষ্ণব-সাহিত্যের

খুবই অনুরাগী ছিলেন। এই জন্য তিনি স্বর্গীয় সারদাচরণ মিত্রের সহযোগিতায় প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলীর কিয়দংশ সম্পাদন করিয়াছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্রের মৃত্যুতে আমরা অতীব দুঃখিত। ইঁহার শোকার্ত্ত পরিজনবর্গের দুঃখে আমরা গভীর সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি।

নিমিষে।

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

একটী নিমিষে মোরে মনোমত করি
হে চিরসুন্দর!
দাও মোরে রূপ তব প্রতি অঙ্গ ভরি
হ'ব মনোহর।
মোহন মূরতি ধরি ছলিব তোমায়
চতুর নবীন!
তোমারি সে প্রতিবিম্ব মজা'বে তোমায়
জেনো সমীচীন!
অমনি নিমিষে তুমি হিয়া'পরি আসি
হে মানসচারী!
নাচিবে নূপুর-রোলে—বাজাইবে বাঁশী
বিমোহনকারী!
একটী নিমিষে তাই বারেকের তরে
এসো প্রাণধন!
মর্ম্মের বন্ধনে প্রিয়! গাঁথিব অন্তরে
সারাটি জীবন
সেই সে নিমেষ দেখা—সেই একবার
হ'লে নিরদয়!
সহস্রবিরহশোক মুছা'বে আমার
নিশ্চয় নিশ্চয়।
নিমিষে ভুলাবে মোরে—নিমিষের দেখা
—বিরহের দুখ,
চির-নিমিষের সে যে মিলনের রেখা
সে যে চির-সুখ!

৮ম বর্ষ, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ও পৌষ, ১৩২৪।

অধ্যাপক ডাক্তার শীল।

[স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়]

বহু ক্ষেত্রে একই বিষয়ের পুনঃ পুনঃ প্রকাশ দেখিয়া মানুষের মনে এক একটা বিষয়ে এক একটা সংস্কার জন্মিয়া থাকে। এইরূপ সংস্কারের ফলে মানব-সমাজ নানা ভাব নানা আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিধাতার সৃষ্টিরাজ্যে কোনও ক্ষণ, দণ্ড, বা পল কখনও অমঙ্গল আনয়ন করিতে পারে, এ বিশ্বাস সহজে হৃদয়ে স্থান পায় না। কিন্তু তথাপি স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলালের "পার যদি ভাই জন্মনা ক বিষ্যুদ বারের বারবেলা" সঙ্গীতে সত্যই সংস্কারগত একটা আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দেয়। ঠিক সেইরূপে সংস্কারের ফলে আমাদের দেশে "ক্ষণজন্মা" বলিয়া একটা প্রবাদ মানবমুখে বিচরণ করিয়া লোক-হৃদয়ে সংস্কারকে বদ্ধমূল করিয়া রাখিতেছে।

কোনও কোনও ব্যক্তির জন্মগ্রহণে লোকের মনে এই "ক্ষণজন্মা" কথাটার উদ্রেক হয়। সে ক্ষেত্রে অবশ্যই ঐ শব্দদ্বয়ের অন্তরালে লুক্কায়িত ভাব অনুভব করিবার কারণসকল শিশুবিশেষের প্রাথমিক জীবনাভিনয়ে প্রকাশমান হইয়া পড়ে। যে যে স্থলে সাধারণ বাল্য জীবনের ব্যতিক্রম ঘটে, সাধারণের ভিতর বিশেষ কিছু, অসাধারণ কিছু প্রকাশ পায়, মানুষ সেই সকল স্থলেই "ক্ষণজন্মা" কথাটার আরোপ করিয়া থাকে। আর অনেক স্থলে সেই সকল বালকের ভাবী জীবনাভিনয়েই ভাবের সার্থকতা-সন্দর্শনে মানুষের মন সহজেই সংস্কারে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া পড়ে।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের বাল্যজীবনেও ক্রমে ক্রমে এমন কতকগুলি বিশেষ ঘটনা ঘটিয়াছিল, যে জন্য ব্রজেন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজন ব্রজেন্দ্রনাথকে "ক্ষণজন্মা" বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহার হাতে খড়ি হইলে পর তাঁহার পিতা পল্লীর ব্রাহ্মণ গুরুমহাশয়কে ডাকাইয়া পুত্রের বর্ণপরিচয় ও বাঙ্গালা শিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। ভারার্পণের সময়ে গুরুমহাশয়কে বলিয়া দিলেন, ইহার এক একটা বিষয় শিক্ষা হইলেই

আপনি একটী করিয়া টাকা পাইবেন। গুরুমহাশয় "তথাস্তু" বলিয়া বালককে লইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে গুরুমহাশয় মহেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের সদনে শিশু শিষ্য লইয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "আপনার ছেলে স্বরবর্ণ শিক্ষা করিয়াছে, আমায় পুরস্কার দিন।" মহেন্দ্রনাথ পুত্রের স্বরবর্ণের জ্ঞান পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়া গুরুমহাশয়কে একটী টাকা পুরস্কার দিলেন। দ্বিতীয় দিবসের প্রাতঃকালে ব্রজেন্দ্রনাথকে লইয়া গুরু মহাশয় পুনরায় মহেন্দ্রবাবুর নিকট দেখা দিলেন এবং বলিলেন "আমার পুরস্কার দিন"। মহেন্দ্রনাথ নানা প্রকারে উল্টা পাল্টা করিয়া ব্যঞ্জনবর্ণগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া গুরুমহাশয়কে হারাইতে পারিলেন না। তখন নীরবে টাকাটি গুরুমহাশয়ের হাতে দিলেন। কিন্তু এ নীরবতা ত্বরায় ভঙ্গ হইল। লোক জানিতে পারিল যে, মহেন্দ্র বাবুর ছোট ছেলে "ক্ষণজন্মা"।

গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় সপ্তাহ মধ্যে প্রতিদিন এক একটা নূতন শিক্ষার জন্য গুরু মহাশয় প্রত্যহ পুরস্কার পাইতে লাগিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথেরও যুক্তাক্ষর, পরে শতকিয়া কড়ানিয়া প্রভৃতি অঙ্কবিষয়ক বাঙ্গালা পাঠশালার রীতি-অনুযায়ী পাঠ এক এক দিনে এক একটা শেষ হইতে লাগিল। এইরূপে বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় ১ম ভাগ, ২য় ভাগ, কথামালা ইত্যাদি পুস্তকসকলও অতি অল্প সময় মধ্যে শেষ হইয়া গেল। গুরুও সৌভাগ্যবশে অল্পদিনের মধ্যে অনেকগুলি টাকা পুরস্কার পাইলেন।

অল্প দিনের মধ্যেই জ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্রনাথ ও কনিষ্ঠ ব্রজেন্দ্রনাথ উভয় ভ্রাতার ইংরাজী শিক্ষায় আয়োজন হইল। রাজেন্দ্র বাবুর ইংরাজী শিক্ষা একটু পূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। যখন রাজেন্দ্রনাথ চতুর্থ শ্রেণীতে, ব্রজেন্দ্রনাথ তখন ষষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। বনওয়ারীলাল দাস নামক এক আত্মীয়ের সদর বাটীতে সময়ে সময়ে উভয় ভ্রাতা বাল্যকালে বেড়াইতে যাইতেন। সেই বাটীর সম্মুখে পাঠশালার গুরু মহাশয় শুভঙ্করের শিক্ষাদানকালে যখন ছাত্রদিগকে অসঙ্গত পীড়ন করিতেন, তখন ব্রজেন্দ্রনাথের বিষণ্ণ মুখে ব্যগ্রতার লক্ষণ দেখিয়া বনওয়ারীবাবু ব্রজেন্দ্রবাবুকে বলিতেন, "তুমি কি ওগুলি কসিতে পার? তোমার মুখের ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে তুমি পারিলে পারিতে পার। কস দেখি।" তখন ব্রজেন্দ্রনাথ যেন কতকালের জানা অঙ্কের মত সেগুলির উত্তর করিতেন। জ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্রনাথ ও বনওয়ারী বাবু অবাক হইতেন।

কলিকাতার পৌষ-পার্ব্বণের সময়ে সংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান একটা বড় অনুষ্ঠান; আর গঙ্গাবন্দনা সেদিনকার অনুষ্ঠানের বিশেষ মন্ত্র। "বন্দমাতা"র স্তববন্দনা, শ্লোক-রচনা, ছড়া কাটান, এ সব সূত্রে দলে দলে পাল্লা দেওয়াও হইত। অনেক সময়ে জয়-পরাজয় লইয়া দলাদলিও হইত। "বন্দমাতা"র ব্যাপারে সেকালে ঠনঠনিয়ার কালীতলার অনুষ্ঠানই সর্ব্বাপেক্ষা সমারোহে সম্পন্ন হইত। গঙ্গা-বন্দনা হইতে আরম্ভ করিয়া নানা আকারে শ্লোক ও ছড়া রচনাটা পাঠশালের ছাত্রদের দ্বারা সূচিত হইত। পরে বয়স্কেরাও তাহাতে যোগ দিত। ব্রজেন্দ্রনাথের পাঠশালা-জীবনের প্রারম্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া দুই তিন বৎসর "বন্দমাতা"র সময়ে কালীতলায় লোক-সমারোহের মধ্যস্থলে ছোট ছেলে ব্রজেন্দ্রনাথ গুরু মহাশয়ের স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পরিষ্কার স্বরে গঙ্গার স্তব সুন্দর সুর করিয়া বলিয়া যাইতেন, লোকে শুনিয়া অবাক হইয়া যাইত। অত ছোট ছেলে অনর্গল বন্দনার পর বন্দনা সুস্বরে বলিয়া যাইতেছেন, উচ্চারণে যেখানে যেমনটি হইবে কোথাও তাহার ব্যতিক্রম নাই। তাই বহু বহু লোক ব্রজেন্দ্রনাথের বাল্যলীলা-সন্দর্শনে মুগ্ধ মনে বলিতেন, "এ ছেলে বাঁচ্‌লে বড় লোক হ'বে।" ঠিক কথা তিনি বড় লোকই হইয়াছেন।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠের সময়ে বার্‌নার্ড স এরিথমেটিক্‌ বঙ্গীয় বিদ্যালয়সমূহে পঠিত হইত। সেই সময়ে সে পুস্তকের সমস্ত নিয়ম-পদ্ধতি-অনুযায়ী সকল অঙ্কই তাঁহার কসা শেষ হইয়াছিল; সে পুস্তকের কোনও বিষয়ই জানিতে বাকি ছিল না। টড হণ্টরের জিওমেট্রীখানি সমস্ত বুঝা হইয়াছে; প্রতিজ্ঞাগুলি সব যেন কতকাল হইতে অধীত, অর্জ্জিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া তাঁহার বাল্যজীবনে বুদ্ধির প্রাঙ্গণে শ্রেণিবদ্ধ আকারে সুবিন্যস্ত হইয়াছে। ব্রজেন্দ্রনাথের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠকালে রাজেন্দ্রনাথ চতুর্থ শ্রেণীতে বীজগণিত অধ্যয়ন করিতেন। ব্রজেন্দ্রনাথ জ্যেষ্ঠকে বীজগণিত বুঝাইয়া দিতে বলায়, রাজেন্দ্রবাবু বলিয়াছিলেন, "আর বীজগণিত শিখিতে হইবে না, যা শিখেছ, তাই ভাল।" কাজেই বিনা সাহায্য জ্যেষ্ঠের শ্লেটে কসা অঙ্ক দেখিয়া বীজগণিতের নিয়ম-পদ্ধতি শিক্ষা করেন। সঙ্গে সঙ্গে উচ্চাঙ্গের অঙ্কসকল আপনাপনি কসিয়া ফেলিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্রবাবু কিছুদিন পরে জানিতে পারিয়া দেখিলেন, কনিষ্ঠ তাঁহার অপেক্ষা অনেক অধিক উন্নতি করিয়াছেন।

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আলোচিত উচ্চাঙ্গের গণিতবিদ্যায় কৃতকার্য্যতা-লাভের সময়ে তিনি এণ্টান্স স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠ করিতেন। ইংরাজী

গদ্য ও পদ্যসাহিত্যপাঠ এফ্-এ পরীক্ষার পূর্ব্বেই শেষ হইয়াছিল। এই সকল ঘটনা একত্র করিয়া বিচার করিলে ব্রজেন্দ্রনাথের বুদ্ধি ও স্মরণ-শক্তির অসাধারণত্ব অনুভব করিয়া বিস্মিত হইতে হয়। বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি যখন এম্-এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন, তাহার বহুপূর্ব্ব হইতে ব্রজেন্দ্রনাথের কাব্যানুরাগ বৃদ্ধি পায়। ইংরাজী কাব্যগ্রন্থসকল পাঠকালে সেই কিশোরবয়স্ক ছাত্র অসংখ্য কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলির অধিকাংশ এখনও যত্নে রক্ষিত, আর সেগুলি কণ্ঠস্থ বলিলেই চলে। আমরা সেগুলি দেখিয়াছি।

এখানেই বলা আবশ্যক, সাধারণ জনমণ্ডলীর রুচি-প্রবৃত্তির সঙ্গে তুলনায় ব্রজেন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ ভিন্ন রুচি-প্রবৃত্তির লোক। সাধারণতঃ লোক নিজ গুণপনার পরিচয় দিবার সুযোগ পাইলে আনন্দিত হয়। অনেকে সুযোগ অনুসন্ধান করে, অনেকে সুযোগ করিয়া লইয়া থাকে। এরূপ অসংখ্য কৃতী ও মর্য্যাদাশালী লোক সর্ব্বদাই আমাদের নয়ন-সমীপে বিচরণ করিতেছেন; কিন্তু এই লোকবিরলগুণসম্পন্ন মানবসন্তানের বিশেষত্বটা ঠিক ইহার বিপরীত। লোকে তাঁহাকে জানিতে পারিবে, লোকে তাঁহার বুদ্ধি, বিদ্যা ও তজ্জাত শতবিধ গুণপনার সমাদর ও আলোচনা করিবে,—তিনি এ বিষয়ে নিতান্ত নারাজ। তাঁহার জীবনগত এই সকল সাধনা সর্ব্বদা লোকচক্ষুর অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিলেই যেন ইঁহার হৃদয় শান্ত থাকে। আমরা কত সময়ে দেখিয়াছি, কোনও বিশেষ বিষয়ে বিশেষ গুণের পরিচয় প্রকাশ পাইলেই ব্যস্ততা ও চঞ্চলতা প্রকাশ পায়। তাহা অজ্ঞাত রাখিবার জন্য তিনি লালায়িত।

এক দিকে ইনি যেমন নিরীহ, আর এক দিকে তেমনি বেয়াড়া রকমের বিনয়ী। "বেয়াড়া বিনয়ী" কথাটার তাৎপর্য্য কেবল তাঁহারাই বুঝিবেন যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া মিশিয়া তাঁহাকে দেখিয়াছেন; অবশ্য জীবনের আদর্শ উচ্চ হইলে, মানুষ বিনয়ী না হইয়া পারে না। ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে আত্মপ্রাধান্যের স্থান নাই। স্যর আইজাক্ নিউটন বলিয়াছিলেন, "অনন্ত জ্ঞান-পারাবারের তীরে তিনি কেবল উপলখণ্ড সকল আহরণ করিয়াছেন।" অন্যের ইহা দৃষ্টিতে একটা বেয়াড়া বিনয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই অসীমশক্তি-সম্পন্ন ভগবানের অনন্ত লীলার মধ্যস্থলে ক্ষুদ্র বিন্দুবৎ মানবশিশুর অধীত বিদ্যা বা অর্জ্জিত জ্ঞানের মূল্য কতটুকু? ব্রজেন্দ্রনাথ তাই সেদিন দুঃখ ও

অভিমানভরে বলিয়াছিলেন, "নিজের অযোগ্যতা ও অনুপযুক্ততা স্মরণ হইলে, আপনি আপনাতে লুকাইতে ইচ্ছা হয়, এরূপ স্থলে আমার জীবনের কোনও আলোচনায় আমার লজ্জা ও ক্ষোভই হৃদয়ে জাগিয়া উঠে।"

এ কথা যতই সত্য হউক, তথাপি আমরা ডাক্তার শীলের সঙ্গসূত্রে যে সকল আশ্চর্য্য গুণের পরিচয় পাইয়াছি, সেগুলির আলোচনায় আমাদের এবং আমাদের মত অনেকের লাভের অঙ্ক বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাই লোভসম্বরণ অসম্ভব এবং সেগুলির বিশ্লেষণে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকি। কয়েকটি ঘটনার আলোচনা করিলেই আমাদের কথার যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ব্রজেন্দ্রনাথের বন্ধুদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী কয়েক জন তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইতে অনুরোধ করেন এবং সংবাদপত্রেও সে বিষয়ে একটু আলোচনাও হইয়াছিল। ভোট-সংগ্রহের উপর যে কাজের ফলাফল নির্ভর করে, সে কাজে ব্রজেন্দ্রনাথ স্বভাবতই অপটু। বেয়ড়া বিনয়ী ব্যক্তি কখনও আপনার দাবি-দাওয়ার ওকালতি করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে পারেন না। কাজেই তিনি আদৌ সে কাজে অগ্রসর হইতে সম্মত হইলেন না। সেনেটের সদস্যপদে তাঁহার মত ব্যক্তির সর্ব্বদা-উপস্থিতি যে বাঞ্ছনীয়, তাঁহার সাহায্যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, এ জ্ঞান দেশের শিক্ষিত সমাজ যতটা অনুভব করেন, এ দেশের বর্ত্তমান রাজকর্ম্মচারীরা তদপেক্ষা অনেক অধিক অনুভব করিয়া থাকেন; তাই ব্রজেন্দ্রনাথকে আমরা বৎসরের পর বৎসর সেনেটের সদস্যমণ্ডলী মধ্যে দেখিতে পাই। কিন্তু যদি দেশের লোকের নির্ব্বাচনের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইত, তাহা হইলে নির্ব্বাচন-অধিকার-লাভের পথপ্রদর্শক সুরেন্দ্রনাথের ন্যায় অনেক গুণবান্ ব্যক্তিকে নিয়ত ব্যর্থচেষ্ট হইয়া কালযাপন করিতে হইত। দীর্ঘকাল চেষ্টার পর এবার "বিড়ালের ভাগ্যে সিকা ছেঁড়া"র মত তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইলেও বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলী অবগত আছেন, সে "সিকা ছেঁড়া"তেও কত "আচড় কামড়" ভোগ করিতে হইয়াছে। প্রকৃতি-বিশেষের লোক যে আপন দাবি-দাওয়া প্রতিষ্ঠার জন্য এতটা করিতে সম্মত নহেন, বর্ত্তমান সময়ের সংগ্রামপটু মানবমণ্ডলী তাহা আদৌ অনুভব করিতে পারেন না। এইরূপ অবস্থায় নির্ব্বাচনের পথে অগ্রসর হইতে অসম্মত বলিয়া ডাক্তার শীল মহোদয়কে কোনও সংবাদপত্রে সামান্যাকারে

তিরস্কৃত হইতেও হইয়াছে। দেশের লোক বুঝেন না যে, সকলের পক্ষে সকল পন্থা সহজসাধ্য নহে।

ডাক্তার শীল দীর্ঘকাল কুচবিহারে অবস্থিতি করিয়াছেন। সেনেটের সভা-সমিতিতে উপস্থিত হইতে হইলে, মফঃস্বলের সদস্যগুলী সর্ব্বদাই যাতায়াতে প্রথম শ্রেণীর গাড়ী ভাড়া বারবরদারি পাইয়া থাকেন। ডাক্তার শীল মহোদয়ও তাহা পাইতেন, কিন্তু কখনই এই যাতায়াতের ব্যয় সেনেটের নিকট গ্রহণ করেন নাই। কুচবিহার হইতে কলিকাতা যাতায়াতের ব্যয়ও নিতান্ত অল্প নহে, এবং ডাক্তার শীল অবশ্যই ধনকুবের নহেন। কিন্তু এই ব্যয় গ্রহণ না করার যে কারণটী বর্ত্তমান ছিল, সেইটিই জানিবার বিষয়। কথাটা এই যে, তিনি সর্ব্বদা নিজের প্রয়োজনে কলিকাতায় আসিলে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে যাতায়াত করিয়াছেন। তিনি নিজের প্রয়োজনে দ্বিতীয় শ্রেণীতে আসিয়া সেনেটের কাজের বেলা প্রথম শ্রেণীতে আসা সঙ্গত বোধ করিতেন না। সেনেটের কর্ত্তৃপক্ষ প্রথম শ্রেণীর ভাড়া মঞ্জুর করিয়া রাখিয়াছেন, সেরূপ স্থলে দ্বিতীয় শ্রেণীর যাতায়াতের বিল পাস করায় একটা খাপছাড়া কু-দৃষ্টান্তের প্রশ্রয় দেওয়া হয় বলিয়া, তাঁহারা ডাক্তার শীল মহাশয়ের দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেণ-ভাড়ার বিল লইতে ইতস্ততঃ করায় ব্রজেন্দ্রবাবু আমাদের নিকট বহু বহু বার বলিয়াছেন, "সেনেটের জন্য আসিবার সময়ে প্রথম শ্রেণীতে আসা যাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। নিজের ব্যয়ে দ্বিতীয় শ্রেণী আর অন্যের ব্যয়ে বিশেষতঃ দেশের ব্যয়ে প্রথম শ্রেণীতে য়াওয়া আসা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি এরূপ আচার-বৈষম্যের পক্ষপাতী হইব না।" বহু বহু বার এরূপ যাতায়াতের ব্যয় গ্রহণ না করিয়া তিনি যে টাকাটা সেনেটকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, সে টাকার পরিমাণও নিতান্ত অল্প নহে। আমরা সময়ে সময়ে বলিয়াছি, সমস্ত প্রাপ্য টাকাটা এরূপভাবে ছাড়িয়া না দিয়া বরং সব টাকাটা লইয়া সেনেটেরই কোনও বিশেষ কাজে সেই টাকাটা দিলে ভাল হয়। উত্তরে ডাক্তার শীল মহাশয় বলিয়াছেন, "আমার অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধাচরণ করা একেবারেই অসম্ভব। আমি প্রথম শ্রেণীতে আসিব না, দ্বিতীয় শ্রেণীর বিলও করিব না। কারণ তাহাতে অন্যের অনিষ্ট হইলে হইতে পারে।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, সংসারে প্রবেশের সময়ে, কোমতের বিশ্বমানবসেবার ভাব আপনাকে দিয়া জনসাধারণের সেবার

চরিতার্থতার তৃপ্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার মনে প্রবল হয়। ক্রমে সেই নির্ম্মল চিত্তক্ষেত্রে ভগবৎ কৃপাগুণে বেদান্তধর্ম্ম স্থানলাভ করে। এখন সেই ভাব ক্রমে পূর্ণতালাভের পথে অগ্রসর হইতেছে; ইহার ভিতরে বৈষ্ণব সাধন-তত্ত্ব যে বিস্তৃতি লাভ করে নাই, এ কথাও বলিতে পারি না। উচ্চ ভাব সকলের আলোচনার সময়ে ভাবের রাজ্যে বেশ মাখামাখি ভাব দেখা যায়; আবার তাঁহাকে সমাধিস্থ ঋষির ন্যায় ধ্যানমগ্ন দেখিয়াও সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইতে হইয়াছে। সে ভাব, সে অবস্থাটা অতি সুন্দর। মানুষের হৃদয়ের পরিস্ফুটনকার্য্য গৃহেই সূচিত হইয়া থাকে, অনেকের জীবনে সূচনা ও পরিসমাপ্তি গৃহেই আবদ্ধ থাকে। গৃহের বাহিরে বড় বেশী দূর অগ্রসর হইতে পায় না, পারেও না। ব্রজেন্দ্রনাথের ভাগ্যবশে অল্প বয়সে মাতৃপিতৃ-বিয়োগ-সংঘটন-নিবন্ধন হৃদয়ের সমগ্র ভাবটা জ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্রনাথেই আশ্রয় লাভ করিয়া ফুটিতে থাকে। যদিও সে আশ্রয়-ত্যাগ তাঁহার পক্ষে কোনও দিন সম্ভবপর নহে, তথাপি সেই সূচিত প্রেমের প্রবাহ সহোদর-সেবায় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। তাহার পোষণ ও প্রসারণে এখন তিনি সমগ্র মানবসমাজের প্রতি একটা বিশাল বন্ধন অনুভব করিয়া থাকেন। এখন

"অয়ং নিজঃ পরোবেতি গণনা লঘুচেতসাম্"

এ ভাব অতিক্রম করিয়া—

"উদারচরিতানাস্তু বসুধৈব কুটম্বকম্"

এই উচ্চ উদারভাবে হৃদয় গড়িয়া উঠিতেছে। এখন মানুষটি এমনই উচ্চ ভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, সঙ্গ করিতে সুখ হয়, ভোগে আনন্দানুভূতি বৃদ্ধি পায়। মর্ত্ত্য জগতে লোকযাত্রানির্ব্বাহে যে সকল অন্তরায় নিবন্ধন মানুষ মানুষের হাতে সর্ব্বদাই নিপীড়িত হইতেছে, সে সকল নিবারণের পন্থাগুলি অতি সহজভাবে তাঁহার আলোচনায় স্থানলাভ করে। অনেক সময়ে কথাবার্ত্তা শুনিতে শুনিতে মনে হয়, চিন্তা ও ভাব বিষয়ে এই মানবসন্তানকে অপর দশজনের সঙ্গে তুলনায় অনেক উচ্চে বলিয়া অনুভব করিতে হয়। উচ্চ ও নিম্নগ্রাম হিসাবে মানুষে মানুষে কত প্রভেদ হইতে পারে, তাহার একটা ইঙ্গিত বেশ বুঝিতে পারা যায়।

দর্জ্জিপাড়া-নিবাসী ৺জয়গোপাল রক্ষিত মহাশয় একজন শিক্ষিত ব্যক্তি; পাবলিক্ ওয়ার্কস্ ডিপার্টমেণ্টে সেকালে সব-এঞ্জিনিয়ার ছিলেন। আমরা তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহার সহিত পরিচয়ও ছিল। তিনি অতি উদার

প্রকৃতির লোক ছিলেন। পুত্রকন্যাগুলিকে উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা করাইয়া ছিলেন। রক্ষিত মহাশয়ের কন্যা ইন্দুমতী বেথুন বিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। এই কন্যা রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ এই কন্যার বিবিধ গুণের সংবাদ অবগত হইয়া ইঁহারই পাণিগ্রহণে অগ্রসর হইলেন। রক্ষিত মহাশয় এই প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করিলে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। এই ভাগ্যবতী মহিলা অল্প কিছু দিনের জন্য ব্রজেন্দ্রনাথের মর্ত্ত্যযাত্রার সহযাত্রী হইয়া সংসার-জীবনের সামান্য কিছু চিহ্ন রাখিয়া লোকলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার লোকান্তর-গমনকালে ব্রজেন্দ্রনাথ নিকটে ছিলেন না, কুচবিহারে ছিলেন। আমি সপরিবারে সে সময়ে ব্রজেন্দ্রনাথের পল্লীতে বাস করিতাম। সুতরাং সে সময়ে জ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্রনাথের এই হৃদয়বিদারক পারিবারিক দুর্ঘটনার সময়ে আমাকে নিয়ত নিকটে থাকিতে হইয়াছিল। এই বহুগুণ-সম্পন্না রমণীর জীবনলীলা অত ত্বরায় সমাপ্ত হইবে, গৃহের কেহই তাহা বুঝিতে পারেন নাই! মৃত্যুর পরদিন ব্রজেন্দ্রনাথ কলিকাতার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। সেই সময়ের একটী ঘটনা বিশেষভাবে ব্রজেন্দ্রনাথের মহজ্জীবনের সাক্ষ্যদান করে ; তাই এই পারিবারিক ঘটনার আলোচনার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

ব্রজেন্দ্রনাথ যখন গৃহে পদার্পণ করেন, তখন পুত্রকন্যা ও পুরাঙ্গনাদের দারুণ আর্ত্তনাদের মধ্যস্থলে তাঁহাকে যেরূপ স্থির-গম্ভীর-ভাবাপন্ন দেখিয়াছিলাম, মানুষকে সচরাচর সেরূপ ধৈর্য্যধারণ করিতে দেখা যায় না। কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে আহারান্তে বিশ্রামের সময়ে আমি নিকটে বসিয়া তাহার পত্নীর লোকান্তর-গমন ব্যাপার বলিয়া যাইতেছি। জ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্রনাথ সে সময় বিষয়ান্তরে গৃহের অন্যত্র ব্যস্ত ছিলেন। দেখিলাম, তাঁহার লোকবিরল বৃহদায়তন নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইভেছে, সে জলরাশি ধারায় পরিণত হইবার উপক্রম করিয়াছে। এমন সময়ে স্বর-শ্রবণে সহোদরের সমাগম-সম্ভাবনায় সেই সঞ্চিত অশ্রু সহসা বিলুপ্ত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে দেখি, শুষ্ক চক্ষু লইয়া তিনি জ্যেষ্ঠের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিলেন। সেইদিন আমি বুঝিয়াছিলাম, নদীপ্রবাহ পুনরায় তাহার উৎপত্তিস্থানে ফিরিতে পারে। যে জল প্রবাহে পরিণত হইতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব নাই, সেই অশ্রুরাশি হৃদয়ের আবর্ত্তসহ তখনই লোপ পাইল! আশ্চর্য্য নহে কি? আমি ত এই দীর্ঘজীবনে এরূপ বিচিত্র আত্মশাসন কখন দেখি নাই। সেইদিন বুঝিলাম, এই মানবসন্তান অসঙ্গতরূপে আত্মশাসনে

সমর্থ হইয়াছেন। সেই দিনের দৃষ্ট ঘটনা এক অসামান্য শক্তির লীলা বলিয়া অনুভব করি, আর সঙ্গে সঙ্গে এই অসামান্য শক্তির আধার ব্রজেন্দ্রনাথকে অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা করি।

দুই এক দিন পরে পথে ব্রজেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় সেদিন চোখের জলটা কেমন করিয়া হজম করিলেন বলিতে পারেন?" তিনি একটু মৃদু হাসি হাসিয়া বলিলেন, "সেজদার ভয়ে।" "সে কি রকম?" উত্তরে বলিলেন, "সেজদা আমার চোখের জলে ভাসিয়া যাইবে, সেই ভয়ে জলটা আপনা আপনি লোপ পাইল।" পাঠক! এখন ভাবিয়া দেখ, বিরহবেদনাব্যথিত ব্রজেন্দ্রনাথের হৃদয়টা অশ্বত্থবৃক্ষের শিকড়ের ন্যায় কিরূপ ভাবে পরিজনসহ সেজদাদাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছে! সহোদরে শোকাবেগের প্রবাহ ছুটাইতে অথবা সে হৃদয়ে সঞ্চিত শোকাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়া দাবানলের সৃষ্টি করিতে তিনি কতটাই নারাজ! আমার নিকট এই উভয় সহোদরের হৃদয়ের আদানপ্রদান এক অমূল্য বস্তু বলিয়া মনে হয়।

পিতৃমাতৃহীন হইয়া যে মাতুল-গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, পত্নী-বিয়োগ ও ব্রজেন্দ্রনাথের কলিকাতা-আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া সেই বৃদ্ধ মাতুল তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি বহুবিধ শাস্ত্রবাক্য উল্লেখ করিয়া পরে ব্রজেন্দ্রনাথকে পুনরায় বিবাহ করিতে উপদেশ দিলেন এবং অনুরোধও করিলেন। তখন ব্রজেন্দ্রনাথের বয়স ৩৪।৩৫ হইবে। ভাগিনেয় নিরুত্তর। মাতুল পুনঃ পুনঃ উত্তরের প্রত্যাশা করিলেও ব্রজেন্দ্রনাথ নিরুত্তর। ইহার পর এক দিন পথে যাইতে যাইতে আমাকে বলিলেন, "মামার কথায় কি উত্তর দিব? জীবনে যাহা পাইয়াছিলাম তাহা আর পাইব না! সে মহামূল্য স্মৃতির অবমাননা করিয়া, তাহার বিলোপ সাধন করিয়া দারান্তর গ্রহণ আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি কি এমন কাজ করিতে পারি? কেবল এক অবস্থায় সেরূপ কাজ সম্ভব। সেটা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি হৃদয়ের আকর্ষণ অনুভব করিয়া তাহার অভাব অনুভব করা আর জনসমাজের সে সব ক্ষেত্রে বিচরণ করিলে সেরূপ হৃদয়-বিনিময় ও বিবাহের সম্ভাবনা আছে, আমি অতি সাবধানে সেই সকল Society হইতে সর্ব্বদাই দূরে থাকিব। আমার পুনরায় বিবাহ আমার জীবনের উদ্দেশ্যের বিরোধী।"

ডাক্তার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল প্রত্যেক বিষয়ে এইরূপ স্থিরপ্রতিজ্ঞ, দৃঢ়চেতা, আত্মস্থ পুরুষ। সুবিচার-সঙ্গত জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইতে এবং নিজ জীবনে

মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণের উচ্চ আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতেই সর্ব্বদা ব্যস্ত। আমরণ ছাত্রজীবন-যাপন এবং তদ্দ্বারা উচ্চ হইতে উচ্চতর তত্ত্বের অন্বেষণ করাই এই মানবসন্তানের প্রধান তপস্যা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভই জীবনের পরম সুখ—পরম শান্তি বলিয়া তিনি অনুভব করিয়া থাকেন।

পাটনী।

[শ্রীভূপেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী, এম্-এ]

সাতকড়ি জেলের পাগল নাম রটে নাই বটে, কিন্তু লোকে বলিত তাহার মাথার গোল আছে। সে ছিল পারঘাটের পাটনী। তিন বৎসর অন্তর সদরে গিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড আপিসে প্রতিদ্বন্দ্বী আর সকলের উপর চড়া দর হাঁকিয়া সে ঘাট ডাকিয়া লইত। খাজানাখানার পোদ্দারের হাতে ডাকের দরুণ আমানতি সিকি টাকা গণিয়া দিতে হইত। সব সময় তহবিলে অত টাকা মজুত থাকিত না, কিন্তু যেরূপেই হউক—ধার-কর্জ্জ করিয়াও—সাতকড়ি টাকার জোগাড় করিত।

নদীর এপারে রেলওয়ে ষ্টেশন, ওপারে মহকুমা। ভোর হইতে এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত খেয়ার আর বিরাম ছিল না। জনকয়েক চাকর রাখিয়া জোয়ান ছেলে ছকড়িকে লইয়া সাতকড়ি ঘাট চালাইত। কত রকমের লোক যে খেয়া পার হইত তাহার ইয়ত্তা নাই। দোকানের খরিদ্দার, মাঠের কৃষাণ, আপিসের বাবু, পুলিশের পাহারাওয়ালা, স্কুলের ছেলে, উকীলের মুহুরী, গদির মহাজন, আদালতের আমলা, ছাত্রশিক্ষক, উকীল-মোক্তার, পেয়াদা-হাকিম, কানাখোঁড়া, ধনিনির্ধন, ভদ্রাভদ্র—সকলকেই নদীর এপার ওপার করিতে হইত। নৌকায় কত না সুখ-দুঃখের কথা উঠিত! গেল হাটের পাটের দর, ব্যাপারওয়ালা কাবুলী ব্যাপারীর জুলুম, মামলাকারীদিগের সঙ্গে আমলাদের ব্যবহার, বারোয়ারী পূজার

যাত্রায় ভিড়ের মাত্রাধিক্য, খেজুর গুড়ের বাজারদর, কাঠের তুলনায় কয়লার মূল্য, গয়লার দুধের ময়লা জল, রক্ষাকর বৈরাগীর তৃতীয় পক্ষ—ইত্যাকার নানা প্রসঙ্গে যাত্রীদিগের সঙ্গে সাতকড়ি সাগ্রহে যোগদান করিত। নৌকা তীরে লাগিলেই পারাণি পয়সা আদায় করিবার জন্য ছকড়ি পথ আগলাইয়া দাঁড়াইত। অশক্ত আতুর লোকে ডাঙ্গায় নামিয়া নৌকার উপর পাটনীর দিকে দীননয়নে চাহিয়া মিনতি করিলেই সাতকড়ি হাত নাড়িয়া ছেলেকে আদেশ দিত, যাইতে দাও। তাহার দয়ার পাত্রাপাত্র বিচার ছিল না; অনেকেই নাচার সাজিয়া পয়সা না দিয়া সরিয়া পড়িত। এই অতিরিক্ত উদারতা সম্বন্ধে পুত্র অনুযোগ করিলে সাতকড়ি ঈষৎ হাসিয়া বলিত, "কেমন করে" জানবো কে দিতে পারে আর কে পারে না?—জীবের ক্লেশ দিলে শেষের দশা কি হ'বে?—ভবের কাণ্ডারী ভগবান্ত খেয়ার কড়ি লন না; আমি বদ্ধজীব, পেটের জ্বালায় কুকর্ম্ম করি; হরি হে, এ পারে খেয়া দিচ্ছি, ওপারে যেন খেয়া পাই!"

নৌকার খোলে প্রকাণ্ড মাটির গামলায় তামাক টিকা কলিকা আর চক্রাকারে সাজানো এক রাশ হুঁকা থাকিত। যাত্রীদিগকে যত ক্ষণ নৌকায় বসিতে হইত ততক্ষণ তাহাদের চিত্তরঞ্জনের জন্য সাতকড়ি জল-আচরণীয় ভৃত্য রাখিয়া ধূমপানের ব্যবস্থা করিয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন হুঁকা; ব্রাহ্মণেরটিতে কড়ি বাঁধা; কায়স্থের নলিচায় শাদা সূতা এবং অন্য বর্ণের গলায় দড়ি। মুসলমানের জন্য হুঁকা ছিল না, তাহারা রিক্ত কলিকা করপুটে ধরিয়া ফুৎকারে নাসারন্ধ্রপথে ধূমোদ্গার করিত। এ বিভাগের ভার ছিল চাকর ভিখনের উপর। সে গয়া জিলার কাহার, তাহার পূরা বোধ হয় বিভীষণ; সে নিজে বলিত 'বভিখন', আর বাঙ্গালার দুর্ব্বল লোকে ঘাড়ের বোঝা নামাইয়া তাহাকে সোজাসুজি ভিখন বলিয়া ডাকিত। ভিখনের নিপুণতায় তপ্ত কলিকা ঠাণ্ডা হইত না, হাতে হাতে অবিরাম হুঁকা ফিরিত, এদিকে নির্গত ধূমরাশি নদীবক্ষে ঘন ঘন কুয়াসার সৃষ্টি করিত।

জলযাত্রার সঙ্গে ধোঁয়াযাত্রার সুব্যবস্থায় অনেকেরই হিসাবে খরচের বদলে জমা পড়িত। লোকে দু'চার ছিলিম তামাক পোড়াইয়া পারাণি পয়সার বেশি উশুল করিয়া লইত। এ বন্দোবস্তের প্রতিবাদে কেহ কিছু কহিলে সাতকড়ি দাঁতে জিব কাটিয়া বলিত, "ও কথা মুখে আনতে আছে? আর

কিছু নয়—লোকে শুধু তামাক ইচ্ছে করে, তাও আমার জুটবে না? এ জন্মে খালি নিচ্ছি, দিচ্ছি কৈ? চৌরাশী নরককুণ্ডে পচে মর্‌ব যে!"

২

সাতকড়ি মাছধরা একেবারে ছাড়ে নাই। সুপ্তোত্থিত প্রভাত-বায়ু লীলারঙ্গে নদীহৃদয়ে তরঙ্গ তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে সাতকড়ির ছোট ডিঙ্গিখানি এধারে ওধারে নাচিয়া বেড়াইত। সে কিন্তু একবারের বেশি জাল ফেলিত না। তাহার বুলি ছিল,—"জাতব্যবসা কি ছাড়তে আছে?—বাপ নকড়ি, আমি সাতকড়ি, ছেলে ছকড়ি, নাতি তিনকড়ি—সবাই জেলে; চৌদ্দ পুরুষ জাল বয়ে খেয়েছে, ঘাটপাট ত আজ আছে কাল নেই।" মুখে যাহাই বলুক জীবহিংসায় সাতকড়ির রুচি ছিল না, তাই সে জাতব্যবসা নামমাত্র বজায় রাখিয়াছিল।

জালের সব চেয়ে বড় মাছটি হাতে লইয়া সাতকড়ি পাড়ার কোন বামণবাড়ী গিয়া দাঁড়াইত এবং মাছটি রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া গৃহস্বামীকে প্রণাম করিত। কচিৎ কেহ এ উপহারের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে সে যুক্ত করপুট বুকের উপর রাখিয়া ভক্তিগদ্গদকণ্ঠে বলিত, "আজ্ঞে, নামে সাতকড়ি, দামে কাণাকড়ি,—জীবহত্যার পাতক ঘুচ্‌বে কিসে? দধীচি মুনি পাঁজরার হাড় দেবতার কাজে দিয়েছিলেন; বামণের সেবায় মাছেরও স্বর্গলাভ, দাসেরও পাপক্ষয়; ভবনদীর চুনোপুঁটি আমি, জীবনজালে জড়ানো আছি, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন উদ্ধার হই।"

৩

সাতকড়ির মন শান্তিপূর্ণ, সংসারের কোন উদ্বেগ তাহাকে স্পর্শ করিত না। একমাত্র কন্যা এলোকেশীর বালবৈধব্যও তাহার হৃদয়ে স্থায়ী বিষাদের রেখাপাত করে নাই। সঙ্গিনীরা যখন মাটির ঘট ও নারিকেলের মালা লইয়া মিছামিছি রান্নাবাড়া খেলিত তখন নোলকপরা কচি মুখখানি ঘোমটায় ঢাকিয়া এলোকেশী শ্বশুরবাড়ীর সত্যকার হাঁড়িবেড়ির মধ্যে গিয়া পড়িল। কিন্তু এলোকেশীর কপালে সংসারসুখ লেখা ছিল না; সে যখন কিশোরী তখন হঠাৎ তাহার স্বামী মারা গেল। শ্বশুরবাড়ীর লোকেরা অনাবশ্যক বোধে তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইল, আর কোন খোঁজখবর করিল না। তদবধি সে এইখানেই বাস করিতেছে।

ভিখন সাতকড়িরই বাড়ীতে থাকে, বাহিরের একখানা ঘরে রাঁধিয়া খায়। তাহার বয়স বেশি নয়, চেহারাও মন্দ ছিল না। সে বাবরি চুল বেশ করিয়া আঁচড়াইত, নিয়মিতরূপে দাড়ি কামাইত এবং সর্ব্বদাই পরিষ্কার গেঞ্জি পরিত। নিজের দেহ নাই এই আক্রোশে যিনি নরনারীর দেহের উপর জুলুম করিয়া থাকেন সেই ঠাকুরটিই বলিতে পারেন কিসে কি হইল। রাত্রে যখন ভিখন রুটি কি ভাত পাকাইত তখন প্রায়ই এলোকেশী আলুটা মূলটা হাতে করিয়া তাহার ঘরের পাশে উঁকিঝুঁকি মারিত। সন্ধ্যার পর সাতকড়ি গোয়াল-ঘরে ঢুকিয়া গোরুর তদ্বির করিত, তাহার দৃষ্টি এড়াইবার জন্যই বিশেষ করিয়া সাবধান হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

পৌষ মাস, কন্‌কনে শীত পড়িয়াছে। ঘরে ঝাঁপ নাই, পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে টাঙ্গানো নৌকার পুরাণ পাল ভিখন রাত্রে ফেলিয়া দেয়। সেদিন আকাশ মেঘলা মেঘলা, মাঝে মাঝে তীব্র হাওয়া দিতেছে। সাতকড়ি মুড়িসুড়ি দিয়া গোয়াল-ঘরে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার কেরোসিনের ডিবিয়া কখন্ নিবিয়া গিয়াছে; সে অভ্যাসবশতঃ অন্ধকারেই বিচালি কাটিতেছিল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় ভিখনের ঘরের পর্দ্দা খুলিয়া পড়িয়া গেল; অমনি সাতকড়ি সেইদিকে চাহিয়া দেখিল, আলোকিত গৃহমধ্যে ভিখন ও এলোকেশী। ভিখন এলোকেশীর জানুতে মাথা রাখিয়া শুইয়াছে, এলোকেশীর অবনত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর। কোন কবির চক্ষে এ দৃশ্য মধুময় দেখাইতে পারিত, কিন্তু সাতকড়ি দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া ক্ষিপ্রবৎ এক লম্ফে ভিখনের ঘরের দাওয়ায় উঠিল এবং হাতের কাস্তে ভিখনের মস্তক লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল। ভিখন নিমেষমধ্যে বিপরীত দিকের পথে তীরবেগে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, নিক্ষিপ্ত অস্ত্র ব্যর্থ হইয়া দরমার বেড়ায় গিয়া বিঁধিল।

৪

পরদিন প্রত্যুষে ছকড়ি ঘাটে আসিল। মাল্লা দুই জন নৌকায় বসিয়া, কিন্তু ভিখন অনুপস্থিত। ছকড়ি কয়েকবার 'ভিখন' 'ভিখন' বলিয়া হাঁকিল, কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এদিকে দুখানি ট্রেণের যাত্রীরা খেয়ার জন্য ব্যস্ত; এক গাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে, আর একখানা শীঘ্রই আসিবে। লোকের তাড়াহুড়ায় ছকড়িকে নৌকা খুলিতে হইল।

খেয়া পরপারে ভিড়িতেই কয়েক জন যাত্রী ছকড়িকে জিজ্ঞাসা করিল,

ভিখনের ছুটি হইয়াছে কি না; কারণ তাহারা ভিখনের মত একটি মানুষকে কম্বল মুড়ি দিয়া কলিকাতার গাড়ীর এক কামরায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছে। শুনিয়া ছকড়ি বিস্মিত হইয়া ডাঙ্গায় নামিয়া ষ্টেশনের দিকে ছুটিল।

এ পারের যাত্রীদের রেলের তাড়া ছিল না, মাল্লারা তাই মন্থরগতিতে নৌকা লইয়া চলিল। তখন অল্প রৌদ্র উঠিয়াছে, সাতকড়ি ডিঙ্গি লইয়া ফিরিতেছে। সে দূর হইতে ভৃত্যচালিত খেয়ায় পুত্র নাই দেখিয়া ভীত হইয়া প্রশ্ন করিল, ছকড়ি কোথায়? ভিখনের পলায়ন-কাহিনী শুনিয়া সাতকড়িও ষ্টেশনের দিকে ডিঙ্গি চালাইল।

রেলষ্টেশনটি খুব বড় নয়। তবে কলিকাতার ট্রেণখানি বিপরীতগামী একখানি গাড়ীর প্রতীক্ষায় এখানে আধঘণ্টারও বেশি দাঁড়ায়। সাতকড়ি যখন প্ল্যাটফর্ম্মে পৌছিল, তখন তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরার সম্মুখে বেজায় ভিড় জমিয়া গিয়াছে। ছকড়ির বগলে দু'খানি বিলাতী কম্বল, সে ভিখনের এক হাত চাপিয়া ধরিয়াছে ও গর্জ্জন করিতে করিতে ঘন ঘন তাহার পৃষ্ঠে মুষ্টিপ্রয়োগ করিতেছে। "ব্যাটা তুই পালাবি ত পালা, তার সঙ্গে আবার দু' দু'খানা কম্বল চুরি! ঠেঙ্গিয়ে তোর হাড় ভেঙ্গে দেব রে ব্যাটা!" আরোহীরা টিট্‌কারী দিতেছে। কেহ বলিতেছে, "ঘরের শত্রু বিভীষণ লঙ্কায় ফিরে যাও বাবা;" কেহ ছকড়িকে অনুরোধ করিতেছে, "সন্ন্যাসীর কম্বল কেড়ে নিও না বাপু, আর লোটাও যদি নিয়ে থাক, ফিরিয়ে দাও।" এক ব্যক্তি বলিল, "ওর কি দোষ বাছা?—কম্‌লি নেহি ছোড়্‌তা হ্যায়!" প্ল্যাটফর্ম্মে হাসির হর্‌রা পড়িয়া গেল।

"আহা হা মেরে ফেল্লে রে!" চীৎকার করিয়া দুই হাতে ভিড় ঠেলিয়া সাতকড়ি একেবারে ভিখনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ছেলের বগলের কম্বল জোড়া টানিয়া লইয়া ভিখনের কাঁধের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এ কম্বল তোর, তুই নিয়ে যা।" ছকড়ি অবাক্ হইয়া বাপের মুখের দিকে চাহিল, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "দুখানাই?" দৃঢ়ভাবে সাতকড়ি কহিল, "দু'খানাই; একখানা ও পেতে শোবে, আর একখানা মুড়ি দেবে। এ দারুণ শীতে মানুষের নাকি গায়ের কাপড় কেড়ে নিতে আছে? নরকেও যে ঠাঁই হবে না।" "তা দাও, কাপড়চোপড় বিছানাপত্র সব বিলিয়ে দাও, শেষটা আমরা ত পথেই দাঁড়াব"—বলিয়া ছকড়ি রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

এই সময়ে গাড়ীর ঘণ্টা পড়িল। বিস্মিত আরোহীরা যে যার আসনে গিয়া বসিল; হতবুদ্ধি ভিখনকেও সাতকড়ি ঠেলিয়া তাহার কামরায় তুলিয়া দিল।

৫

নিত্যকর্ম্মে সাতকড়ির সে আগ্রহ আর নাই। সূর্য্যোদয় হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত সে তেমনি খাটে, কিন্তু সমস্ত কাজের সঙ্গে সঙ্গৎ করিয়া প্রাণ আর তালে তালে বাজে না। সাতকড়ি সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক। জাল ফেলিয়া টানিয়া তুলিতে সে ভুলিয়া যায়, হা'ল ধরিয়া খেয়া নৌকা বিপথে চালাইয়া দেয়। এলোকেশীর শূন্য জীবনের দৈন্য সে যেন অকস্মাৎ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছে।

পথে দাঁড়ানো সম্বন্ধে ছকড়ির আশঙ্কা নিতান্ত ভিত্তিহীন হয় নাই। ইদানীং সাতকড়ির আর্থিক অবস্থা ক্রমেই মন্দ হইতেছিল। ঘাটের আদায় অধিকাংশ তামাকে পুড়িত, না হয় খয়রাতে উড়িত, জাতব্যবসাও ছিল না বলিলেই হয়। চাকরবাকরের বেতন দিয়া যাহা থাকিত তাহাতে সংসার সচ্ছলভাবে চলিত না। মহাজনের খাতায় সাতকড়ির হিসাব দিনে দিনে স্ফীত হইয়া অবশেষে আর ধার পাওয়া অসম্ভব করিয়া তুলিল। অনেকেই তাহাকে ভালবাসিত এজন্য সে একেবারে দেউলিয়া হয় নাই, কিন্তু তাহার অর্থসংগ্রহের চেষ্টা বাতাহত দীপশিখার মত সহসা নিবিয়া গেল।

সেবারে পুনরায় ঘাট বন্দোবস্ত হইবে। সাতকড়ি বরাবর যেমন যায় তেমনই সদরে গিয়া ঘাট ডাকিল। ভাইস-চেয়ারম্যান বাবু তালিকায় তাহার নাম লিখিয়া লইলেন, পোদ্দার জামিনের টাকার জন্য হাত বাড়াইল। সাতকড়ি যুক্তকরপুটে ভাইস-চেয়ারম্যানকে মিনতি করিয়া বলিল, "ধর্ম্মাবতার, আজকার দিন এ গরীবকে মাপ করুন, আমি প্রথম কোয়াটারের কিস্তির সঙ্গে আমানতি টাকা খাজনাখানায় দাখিল করিব।" ভাইস-চেয়ারম্যান বাবু তর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "খামখা জালাতন কর কেন বাপু; এক কড়ার সঙ্গতি নাই, ঘাটের সখ তবু ছাড় না।" তৎক্ষণাৎ বারাণ্ডার দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরের ডাক কাহার?" ঘাট খোঁয়াড়ের কেরাণী হাঁক দিল, "এ—কলিমদ্দি সেখ!" সাতকড়ির প্রতিবেশী কলিমদ্দি ঘাটের মালিক হইল।

প্রত্যূষে একবার করিয়া মাছধরাও সাতকড়ি ছাড়িয়া দিল। সে আর

বাড়ীর বাহির হয় না। তাহার বয়স হইয়াছিল, কিন্তু এত দিন জরা তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। এখন মাসখানেকের মধ্যে সাতকড়ির কোমর ভাঙ্গিয়া পড়িল, চক্ষু কোটরে ঢুকিল, মাথার চুল শণের মত শাদা হইয়া গেল। সে একখানি বোঠে ভর দিয়া কোন মতে বাহিরের ঘরের দাওয়ায় আসিয়া বসে, আবার বোঠে ভর দিয়া কষ্টে নামিয়া যায়। বুঝি অস্তমিত মহিমার নিদর্শন ভাবিয়া বোঠেগাছটিকে সে সঙ্গী করিয়া লইয়াছিল।

ঘরের দাওয়ায় বসিয়া সাতকড়ি নদীর দিকে চাহিয়া থাকে। সম্মুখে ঝাউগাছের সারি; তাহার ফাঁকে ফাঁকে সে স্পষ্ট দেখিতে পায় মানুষে বোঝাই কলিমদ্দির খেয়া চলিতেছে। কিন্তু এখন আর নৌকা হইতে তামাকের ধোঁয়া উঠে না, যাত্রীদের মধ্যে হাস্যালাপেরও যেন কোন চিহ্ন নাই; মনে হয়, সকলেই নীরবে নৌকা তীরে ভিড়িবার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া বসিয়া থাকে।

এই হস্তচ্যুত খেয়ার করুণদীপালোকে বিধবা কন্যার ব্যর্থ জীবনের চিত্র সাতকড়ির মনের মধ্যে আরও উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিল। নিজের কাজ শেষ জীবনে ফুরাইল, কিন্তু এলোকেশীর আশালতা অঙ্কুরিত না হইতেই নিয়তির বজ্রাঘাতে তাহার সমস্ত হৃদয় মরুভূমি হইয়া গিয়াছে! এ মরুদেশের মৃগতৃষ্ণিকাও সে দিন ফুৎকারে লয় পাইয়াছে। ভাগ্যহীনা দুহিতা নরনারীর স্বাভাবিক অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছে, তাহার প্রাণের নিবিড় অন্ধকারে আর আনন্দের আলো জ্বলিবে না! সাতকড়ির বুক ভাঙ্গিয়া যেন নাই নাই ধ্বনি উঠিতে থাকে, সমস্ত হৃদয় মথিত করিয়া শব্দহীন হাহাকার শূন্যে মিলাইয়া যায়।

সেদিন সন্ধ্যাকালে রক্তমেঘের অন্তরালে দিনমণি বিরাম লাভ করিয়াছেন। অদূরে দেবালয়ে আরতির শঙ্খঘণ্টা বাজিতেছে এবং দিবসের কর্ম্ম-কোলাহল লুপ্ত করিয়া সুপ্তির অন্ধকার জলস্থল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেছে। ছকড়ি আসিয়া ডাকিল, "বাবা, রাত হয়েছে, ঘরে এস।" সাড়া না পাইয়া সে বাপের গায়ে হাত দিয়া ঠেলিল। সাতকড়ি বেড়ায় ঠেস দিয়া বসিয়া ছিল, তাহার নিস্পন্দ শরীর ভূতলে লুটাইয়া পড়িল। সে যেন পুত্রের আহ্বানের প্রতীক্ষা করে নাই,—রাত্রি দেখিয়া পারের যাত্রী যথাসময়ে স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে! দুই হাতের মুঠায় ধরা বোঠেগাছটি সাতকড়ির কোলের উপর দিয়া মাটিতে গিয়া ঠেকিয়াছিল,—সে যেন খেয়া দিতে দিতেই খেয়া পাইয়াছে!

বাপের বেটা বাহাদুর।*

[শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ]

"পরিহাস বিজল্পিতং সখে
পরমার্থেন ন গৃহ্যতাং বচঃ ॥"

আমারে চিন্‌তে পারা সহজ নয়। আমি যুগে যুগে নব নব বেশে ধরাতলে আবির্ভূত হই (অবতার স্বীকার করি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না)। ধরার ভার নাশ করিতেই আমার জন্ম। আমি এখন আত্ম-পরিচয় প্রদান করিব না; তবে যদি কেহ আমায় ডাকিতে ইচ্ছা করেন, "বাপের বেটা বাহাদুর" বলিয়া ডাকিলেই আমি সাড়া দিব।

'সতাং সঙ্গে'র সভ্যবৃন্দের মধ্যে অনেকেই হয় ত মনে করিতেছেন, আজ এই সুখের সান্ধ্য সম্মিলনে আমার ন্যায় অদ্ভুত জীবের আবির্ভাব কেন? কিন্তু মনে থাকে যেন, আমি এখানে উপযাচক হইয়া আসি নাই। তোমরা ডাকিয়াছ, তাই আসিয়াছি। দুই চারিটা কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছ, তাই বলিব।

এই মাত্র বলিয়াছি, আমি আত্মপরিচয় প্রদান করিব না। তবে যেখানে যেখানে আমার গতিবিধি আছে, সেই সব স্থানের যথাসাধ্য উল্লেখ করিব; ইহা হইতে বুঝিয়া লও, আমি কে? আর আমি ধরার ভার নাশ করিয়া ধরাকে হাল্‌কা করিতেছি কি না, তাহাও তোমরা ক্রমশঃ বুঝিতে পারিবে।

লোকে বলে, ধর্ম্মই জগতের মূল (যদিও আমি বুঝি, সেটা কুসংস্কার)। অতএব আমার কাহিনী ধর্ম্মের নামেই আরম্ভ করা যাউক। সেকালের লোক অলস ছিল, সময়ের মর্ম্ম বুঝিত না, তাই জপ তপঃ সন্ধ্যাবন্দনায় চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আঠার ঘণ্টাকাল কাটাইয়া দিত। তাহারা কুসংস্কারের ঝুড়ি মাথায় করিয়া জীবনযাপন করিত, গাছপাথর ও মাটির পুতুলের পূজাই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। ধর্ম্ম কি, তাহা তাহারা বুঝিত না, অথচ ধর্ম্মের নামে নানা প্রকার আচার-অনুষ্ঠানের বাহ্য আড়ম্বরে জীবনটাকে দারুণ ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিত। কিন্তু এখন দেখ দেখি, এ সব জিনিষ

---

* 'সতাং সঙ্গে'র তৃতীয় অধিবেশনে পঠিত।

কত সহজ, কত হাল্কা হইয়াছে! কষ্টকল্পিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের তাড়নে আড়ষ্ট হইয়া থাকিতে হয় না, মাঘের ভীষণ শীতে প্রত্যুয়ে স্নান করিয়া ফুরফুরে নামাবলী গায়ে দিয়া কালাপূজার পাঁঠার ন্যায় হি হি করিয়া কাঁপিতে হয় না, বৈশাখের প্রচণ্ড উত্তাপে 'ললাটন্তপ সপ্তসপ্তিঃ' হইয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রাণবিসর্জ্জন করিতে হয় না, অহোরাত্র উপবাস করিয়া পিত্তপাত করিতে হয় না, অথচ শুধু বক্তৃতার চোটে বা প্রবন্ধের মারফতে কেমন সুচারুভাবে ধর্ম্মচর্চ্চা হইতেছে, দেখ দেখি!

তাহার পর, সামাজিক আচার-ব্যবহারের কথা। সেকালের লোকগুলা কি কম আহাম্মক ছিল? কোন্ মুখে বসিয়া ভাত খাইতে নাই, কোন্ দিকে মুখ করিয়া আচমন করিতে নাই, কোন্ দিকে মাথা রাখিয়া শয়ন করিতে নাই, ইত্যাদি নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয় লইয়া মাথা ঘামাইয়া অমূল্য সময়টাকে নষ্ট করিত। দিনে তিন চারিবার স্নান, বস্ত্রপরিবর্ত্তন, দন্তধাবন ও যজ্ঞোপবীত-মার্জ্জন প্রভৃতি কার্য্যেও কি কম সময় যাইত? কোনও কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে যাইতে হইলে দিন দেখিতে দেখিতেই দিন ফুরাইয়া যাইত, কার্য্যের সময় অতিবাহিত হইয়া না যাইলে আর সেখানে যাওয়া হইত না। অশ্লেষা, মঘা, ত্র্যহস্পর্শ, বারবেলা কালবেলা, দিক্‌শূল-নক্ষত্রশূল ডাকিনী-যোগিনী, তিথিদোষ-নক্ষত্রদোষ, যাত্রানাস্তি-রিক্তাদোষ, অম্বুবাচী ও গ্রহণ, হাঁচি-টিক্‌টিকি-গিরগিটি পশ্চাদাহ্বান দুর্লক্ষণ-দর্শন প্রভৃতি সবগুলিকে একত্র করিলে আর ঘর হইতে বাহির হইবারও উপায় থাকিত না।

আবার এতগুলি বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কোনও রূপে গৃহ হইতে বহির্গত হইবার পর যদি পথিমধ্যে কোনও গুরুজনের সহিত সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলে আর রক্ষা ছিল না। তাঁহার সহিত সম্ভাষণেই ন্যূনকল্পে চারিদণ্ড সময় অতিবাহিত হইত। প্রথমেই (পুরাণ-পাঠারম্ভে জয়োচ্চারণের ন্যায়) স্বনাম উচ্চারণপূর্ব্বক আত্ম-পরিচয় প্রদান, তাহার পর অভিবাদন, তাহার পর হস্তদ্বয়কে বিপরীতভাবে সংস্থানপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তদ্বারা গুরুর দক্ষিণ পদের এবং বাম হস্তদ্বারা বামপদের ধূলিগ্রহণ—ইত্যাদি মাথার দিব্য দেওয়া কার্য্য-গুলি সম্পন্ন করিতে করিতে ভানু প্রায় অস্তাচলে গমন করিতেন। ফলতঃ রীতিমত কুস্তি না জানিলে তখন গুরুজনের পদধূলি তথা আশীর্ব্বাদ পাওয়া যাইত না। কিন্তু আজকাল আর এত গোলমাল নাই। এখন পথে পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তড়িতের ন্যায় দন্তবিকাশন,

অথবা বড় জোর হস্তোত্তোলনেই অভিবাদন বা অভিনন্দন-ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি হয়। কঠোর জীবন-সংগ্রাম (struggle for existence) ও যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের (survival of the fittest) দিনে ইহা অপেক্ষা সময়-সংক্ষেপের সুযোগ আর হইতে পারে কি? কিন্তু এই কৌশল তোমাদিগকে যে আমিই শিখাইয়াছি সে খবর তোমরা রাখ কি?

সেকালে এক জন কার্য্যোপলক্ষে আর এক জনের গৃহে গমন করিলে শেষোক্ত ব্যক্তির দুর্দ্দশার আর পরিসীমা থাকিত না। পা ধোয়ার জল রে, তামাক রে, জলখাবার রে, (পূর্ব্বাহ্ণে খাইলে) মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন রে, (অপরাহ্নে যাইলে) সন্ধ্যাহ্নিকের ঠাঁই রে, রাত্রিতে শয়নের সাজসরঞ্জাম রে, এই সকল ব্যাপার লইয়া বেচারী গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হইত। কিন্তু আজকাল আর কোন ঝঞ্ঝাট নাই। দু'খিলি পান, আর একটা সিগারেট,--ইহা হইলেই অভ্যর্থনার চূড়ান্ত হইল। সেকালের আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ অধিক মাত্রায় সেবন করিতে হইত, কিন্তু আধুনিক হোমিওপ্যাথিকে অল্পেই ফল দর্শে। এ ক্ষেত্রেও সেইরূপ। কিন্তু হায়! সামাজিক হানিম্যানের মাথায় এ বুদ্ধি যে আমিই যোগাইয়াছিলাম, অকৃতজ্ঞ তোমরা কি তাহা মনে রাখিয়াছ?

পারিবারিক জীবন লইয়াই দেখ না কেন, সেকালে কত গোলমাল ছিল। ভ্রাতা ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতির কথা ছাড়িয়াই দাও না কেন, কারণ তাহারা অকর্ম্মণ্য হইলেও গৃহস্বামীর অবশ্য-পোষ্য নিত্য-প্রতিপাল্য ছিল, (আজ্ঞাকারী ছিল কি না, সে বিষয়ে ঘোর সন্দেহ আছে); ইহা ছাড়া, পিস্‌তুত ভাজের মাস্‌তুত্‌ ননদ, খুড়তুত মেসোর মামাত ভগ্নীপতি প্রভৃতি 'যায়ের মায়ের পায়ের ঘায়ের তেলপড়া' গোছের কত অনাহত-রবাহূত কুটুম্ববর্গের কলরবে গৃহপ্রাঙ্গণ 'কাক-সমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায়' অবিরত মুখরিত থাকিত। এক জনের উপার্জ্জনে সকলে বসিয়া বসিয়া স্বচ্ছন্দে উদরসেবা করিত। কিন্তু এখন আর সেটি হইবার যো নাই। এখন নিজে উপার্জ্জন কর, নিজে সুখে থাক; উপার্জ্জন করিতে না পার, জাহান্নমে যাও, কেহ দেখিবে না। ইহাতে সমাজের দুইটী মহোপকার সাধিত হইয়াছে। প্রথমতঃ ইহা মানুষকে স্বাবলম্বী হইতে শিক্ষা দিতেছে; দ্বিতীয়তঃ, ইহা মোহান্ধ মানবের সম্মুখে 'একলা এসেছি ভবে, একলাই যেতে হবে', দর্শনের এই নিগূঢ় তত্ত্ব উপস্থাপিত করিতেছে।

কিন্তু জগতের এই কল্যাণকামনার মূলে কাহার কৃতিত্ব বিরাজ করিতেছে, তাহা তোমরা একবারও ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ?

সেকালের সবই অদ্ভুত ছিল। গৃহে অতিথি আসিলে, নিজে খাইতে পাও আর নাই পাও, তাহাকে খাওয়াইতেই হইবে, এই বিধান দিতে তখনকার অপরিণামদর্শী, অবিমৃশ্যকারী মুনিঋষিগণ কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। অতিথি যদি কোন গৃহস্থের গৃহ হইতে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়, তাহা হইলে সে নিজের সমস্ত পাপটুকু সেই গৃহস্থকে দিয়া তাহার সমস্ত পুণ্যটুকু লইয়া চলিয়া যায়, এই প্রকার উদ্ভট, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ অনুশাসন বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচায়ক নহে কি? তবে সুখের বিষয়, আমার কৃপায় লোকের জ্ঞানচক্ষুঃ ফুটিতেছে, তাহাদের হিতাহিত-বিবেক-শক্তি পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহারা সুখের পথে, মনুষ্যত্বের পথে, অগ্রসর হইতেছে।

তাহার পর, দাম্পত্য জীবনের কথা। সেকালের বিবাহ বিবাহই ছিল না। যাহার সহিত যাহার বিবাহ হইবে, তাহাদের পরস্পরের আলাপ এমন কি দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত নাই, এক জন আর এক জনের মনোমত হইবে কি না তাহারও ঠিক-ঠিকানা নাই, অথচ দুইটি নিরীহ প্রাণীকে ধরিয়া আনিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া গোটাকতক মন্ত্র আওড়াইয়া তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য রজ্জুবদ্ধ করিয়া অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হইত,—তাহাতে তাহারা বাঁচুক আর মরুক।* আবার যখন স্বামিস্ত্রীতে একত্র বাস করিত, তখনও কি তাহাদের জীবন সুখের ছিল? প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত বধূ গৃহকর্ম্মেই ব্যাপৃতা থাকিত, এই সময়ের মধ্যে স্বামীর সহিত মোটেই তাহার দেখা হইত না; সুতরাং তাহাদের প্রেমালাপের তথা পরস্পরের প্রতি প্রণয়-জ্ঞাপনের কোন উপায় ছিল না। দ্বিপ্রহর রজনীতে বালিকা বধূ সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর ক্লান্তিতে অবসন্না ও তন্দ্রায় আকুলা, তখন তাহার নিকট প্রণয়বচনের আশা করা মরুভূমিতে শীতল জল পাইবার আশা করার ন্যায়ই বাতুলতা। ফলতঃ 'প্রণয়' জিনিষটা কি, তখনকার লোকে তাহা আদৌ বুঝিত না।

"এখন সেদিন গিয়াছে রে চলি"। আমার মেহেরবানিতে বিবাহ

---

* 'Marriage without love' ভীষণ পদার্থ, তাহা শিক্ষিত (অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্যে অভিজ্ঞ) ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন।

কার্য্যটা এখন আর প্রজাপতির নির্ব্বন্ধের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চক্ষুঃ মুদ্রিত করিয়া গলায় কলসী বাঁধিয়া অতল জলে ঝাঁপ দেওয়া নহে। 'উদ্বাহ' বলিলে আজকাল আর 'উদ্বন্ধনে'র ভয় হইবার কোন কারণ নাই। আজকাল বিবাহের পূর্ব্বেই (একবার নয়, বহুবার) বর ও বধূর শুভদৃষ্টি সংঘটিত হইতেছে, বিবাহ হইলে তাহাদের মনের মিল হইবে কি না তাহার পরীক্ষা হইতেছে, চিঠিপত্রের (এবং তৎসঙ্গে আরও কত কি উপহার-উপঢৌকনের) আদান-প্রদান চলিতেছে, তবে বিবাহ হইতেছে। যাহাকে লইয়া চির-জীবন কাটাইতে হইবে, তাঁহাকে এই প্রকারে কষিয়া মাজিয়া না লইলে চলিবে কি করিয়া?

বিবাহের পরবর্ত্তী গার্হস্থ জীবনও আজকাল বেশ সুখের হইয়াছে। স্ত্রী নভেল পড়িয়া ও পিয়ানো সহযোগে গান করিয়া স্বামীর মনোরঞ্জন করিতেছে, স্বামী (অঙ্গভঙ্গীসহকারে) নাটকের বক্তৃতা আওড়াইয়া স্ত্রীর চিত্তরঞ্জন করিতেছে, উভয়েরই চিত্তবৃত্তির বিকাশ হইতেছে, রান্নাঘরের ময়লামাটি-ঝুল দূরে রাখিয়া খাসকামরায় বসিয়া অহোরাত্র প্রেমালাপ চলিতেছে। ফল কথা, আমার কৃপায় তোমাদের গৃহ আজকাল আদর্শ-প্রেমাগার,—ঠিক যেন প্রেমের একখানি নিখুঁত ছবি।

গার্হস্থ জীবনের কথা ছাড়িয়া দিয়া সামাজিক জীবনের ঘটনাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে, সেখানেও আমার প্রভাব কিরূপ প্রকট। অধিক আত্মপ্রশংসা করিয়া তোমাদের বিরক্তি উৎপাদন করিতে চাহি না, একটী উদাহরণ দিয়াই ক্ষান্ত হইব। সামান্য শিক্ষক-ছাত্র সম্বন্ধ লইয়াই দেখ না কেন, সেকালের ছাত্রে আর একালের ছাত্রে কত প্রভেদ। সেকালের ছেলেদের বুদ্ধি স্থূল ছিল, তাহারা ভালমন্দ কিছুই বুঝিত না, শিক্ষক যাহা বলিতেন তাহাই শুনিত, অন্ধের ন্যায় তাঁহার কথামতই কাজ করিত; তাহাদের আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল না, শিক্ষক তাহাদের অপমান করিলেও সে অপমান তাহারা অবলীলাক্রমে পরিপাক করিয়া ফেলিত। মোট কথা, মনুষ্যত্ব জিনিষটা তাহাদের মোটেই ছিল না। কিন্তু আজকাল আমার সংস্রবে আসিয়া তাহাদের দিব্য চক্ষুঃ ফুটিয়াছে, তাহারা আপন আপন ভালমন্দ বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছে; তাহারা এখন আত্ম-সম্মানের মর্য্যাদা বুঝিয়াছে, সুতরাং কোন প্রকারে সেই সম্মানের একটু হানি হইলে তাহারা সুদে আসলে তাহার প্রতিশোধ না লইয়া নিবৃত্ত হয় না। প্রভুত্ব-

প্রিয় শিক্ষকগণ আর নিরীহ ছাত্রগণের শরীর ও মনের উপর নিরাপদে আধিপত্য করিতে পারিবেন না, এ সমাচার পরম সুসমাচার নহে কি? আর এইরূপ 'অধিক্ষেপাপমানাদেঃ······প্রাণাত্যয়েইপ্যসহন'-রূপ তেজস্বিতা যে ছাত্রসমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির লক্ষণ, এ কথা অস্বীকার করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। কিন্তু এই উন্নতির মূলে আমি সশরীরে বিরাজমান রহিয়াছি, ইহা কি তোমরা বুঝিতে পারিতেছ না?

আর বেশী বকিয়া তোমাদের সময় নষ্ট করিতে চাহি না; তবে তোমরা সাহিত্য-সেবার জন্যই আজ এই 'সতাং সঙ্গে' সমবেত হইয়াছ, সুতরাং সাহিত্য সম্বন্ধে দু'একটা কথা না বলা ভাল দেখায় না। সেকালের সাহিত্যের এক কথায় সমালোচনা করিতে গেলে বলিতে হয়, উহার প্রাণ ছিল না। অভিধানের আঁটাআঁটি এবং ব্যাকরণের বাঁধাবাঁধি থাকিলেই যদি সাহিত্য হয়, তাহা হইলে আর ভাবনা কি? সেকালের সাহিত্যে এই দুইটি জিনিষ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আজকাল সাহিত্যে একটা নবজীবনের সাড়া পাওয়া গিয়াছে—উহার ভিতর একটা সরসতার সঞ্চার হইয়াছে। ভাষার স্বাধীনতা হইয়াছে, ভাবের স্বাধীনতা হইয়াছে। যে যাহা ইচ্ছা করিতেছে সে তাহাই লিখিতে পারিতেছে—কাহারও মুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকিতে হইতেছে না, কাহাকেও মানিয়া চলিতে হইতেছে না। বেশী কথায় কাজ কি, শুধু 'ভাবে'র কথাই ধর না কেন? আজকাল সাহিত্যে যেরূপ 'সাত্ত্বিকী ভাব' 'বৈষ্ণবী ভাব' 'অমানুষী ভাব' প্রভৃতি নব নব ভাবের আবির্ভাব হইতেছে, সেরূপ 'সুন্দরী' ও 'মনোহারিণী' ভাবোদয়ের 'মূর্ত্তিমতী সুযোগ' পূর্ব্বে ছিল কি? আর সেই সব ভাবের প্রভাবেই ত আজকাল সাহিত্যে একটা নূতন 'প্রাণতা' আসিয়াছে, সাহিত্যের 'প্রসারতা' বাড়িয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে 'সারতা'ও অবশ্যই বাড়িয়াছে! তোমরা ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক উন্নতির আশা করিতে পার?

* * * *

আপাততঃ আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিলাম। ভবিষ্যতে যদি আবার কখনও আমায় ডাক, তাহা হইলে আরও দু'চার কথা শুনিতে পাইবে।

তোমরা কেহ কিছু মনে করিও না—আজ এইখানেই বাহাদুরের বিদায়।

কাণ্ডারী ।

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

তোমার তরে ভবের ঘাটে
নিয়ে বেড়াই তরী ;
কোথায় তুমি ব'সে আছ
ভবের কাণ্ডারী !
একলা হেথা ভেবে ভেবে
ওগো মানসচোর !
দুকূল ব'য়ে ঝর্‌ছে দেখো
তপ্ত আঁখির লোর ।
সাঁজের আঁধার আস্‌চে নেমে
দিন ঘনিয়ে এলো ;
কেমন করে যাব একা
তাই আমারে বলো ।
ও'পারেতে যেতে হ'বে
বিষম জলের ঢেউ ;
ভয়-তরাসে কাঁপে হিয়া
কাণ্ডারী নাই কেউ ।
এসো তুমি বদর মাঝি
ভবের কর্ণধার !
আলোয় আলোয় হ'ব আমি
তোমায় নিয়ে পার ।

কৃত্তিবাস।

[স্বর্গীয় ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়)

কৃত্তিবাসের আর কি নূতন করিয়া পরিচয় দিব? কৃত্তিবাসকে কে না চিনেন? মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হইতে নিরক্ষর মূর্খ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কোন্ বাঙ্গালী কৃত্তিবাসের নিকট কৃতজ্ঞ নহেন? বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, ভদ্র, ইতর অসংখ্য শ্রেণীর এবং বিবিধ বর্ণের হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে এমন কি কেহ আছেন, যিনি স্বতঃ বা পরতঃ কৃত্তিবাস কর্ত্তৃক উপকৃত হয়েন নাই? বর্ত্তমান সমাজের বিকৃত অবস্থা সত্বেও আমরা বুক ঠুকিয়া বলিতে পারি, এখনও বাঙ্গালী মাতৃস্তন্যের সহিত কৃত্তিবাসের কীর্ত্তি-সুধা পান করে; তাহার মনে কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিমন্দির অজ্ঞাতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা আজ চারি শত বৎসর হইতে হইতেছে; যত কাল খাঁটী বাঙ্গালার বাঙ্গালী সমাজ ও বাঙ্গালা সাহিত্য থাকিবে তত কালই হইবে। যেমন কোকিলের কণ্ঠে স্বর, মাণিকের দেহে রশ্মি, তেমনি কৃত্তিবাসের কাব্যে কবিত্বের কীর্ত্তি-সৌরভ সতত স্বাভাবিক; আদৌ অবিভাজ্য। কৃত্তিবাস সম্বন্ধে দত্তজ কবি মধুসূদনের কথা একটীও অত্যুক্তি নহে;—

> "জনক জননী তব দিলা শুভক্ষণে
> কৃত্তিবাস নাম তোমা। কীর্ত্তির বসতি
> সতত তোমার নামে সুবঙ্গ ভবনে"—

নির্জ্জলা নীতি কথা অপেক্ষা নীতিমূলক কাব্য-কথা-প্রভাবে জন-সমাজে সন্নীতি অধিকতর স্ফূর্ত্তি পায়, বিস্তৃত ও বর্দ্ধিত হয়, ইহা সর্ব্ববাদি-স্বীকৃত সত্য; ইহার শত শত দৃষ্টান্ত থাকিতে পারে; কিন্তু কৃত্তিবাসের এবং তুলসী দাসের রামায়ণের মত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সুচির সজীব সাক্ষ্য উহার আর একটীও নাই। পৃথিবীতে বহু বড় বড় কবি জন্মিয়াছিলেন; অমর, অতুলনীয় কাব্যও রাখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু, (কেবল এক তুলসী দাস ব্যতীত) কৃত্তিবাসের ন্যায় এমন কোনও কবি, কোনও দেশে কোনও কালে কখনও জন্মেন নাই, যাঁহার কবিত্বশক্তি বা কাব্য-কথা মনুষ্য-সমাজের আপাদমস্তকে হাড়ে মজ্জায় প্রবেশিয়া প্রত্যেক

মনুষ্যের মনুষ্যত্ব গঠিত ও জীবন-কার্য্য নিয়মিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। বাঙ্গালী সাধারণের মধ্যে কৃত্তিবাসের এবং হিন্দুস্থানী সমাজে তুলসীদাসের রামায়ণ বস্তুতই বেদবৎ কার্য্য করিয়াছে। শাস্ত্রের শ্রুতি স্মৃতি সদুপদেশ বোধ হয় দেশের অধিকাংশ লোকেরই কর্ণকুহরে প্রবেশ করিত না, যদি কৃত্তিবাস ও তুলসী দাস না জন্মিতেন।

অস্মদ্দেশীয় অতি অন্ত্যজ শ্রেণীর অবস্থাও ইউরোপীয় ইতর সমাজের বিপরীত। আমাদের চোল্-চোয়াড়েরাও ধর্ম্মপ্রবণ। এদেশের অতি ইতর বর্ণও উগ্র, অবাধ্য অবিনীত নয়, নিষ্ঠুর নয়, কুনীতিপরায়ণ ও কর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিহীন নয়। কৃত্তিবাসাদির কৃপায় আমাদের মুদী পশারী, দ্বারবান দাসীরাও পুণ্যবান, পুণ্যবতী; দেব-দ্বিজে ভক্তিযুক্ত, শুদ্ধাচার, পবিত্রভাবত। তাহারা কৃত্তিবাসের বা তুলসী দাসের রামায়ণ হইতে মানবধর্ম্মের কি না শিখিয়াছে, কি না বুঝিয়াছে? তাহারা পিতৃ-ভক্তির পূজা করে, ভ্রাতৃস্নেহে উচ্ছ্বসিত হয়, সত্যপালনের মর্ম্ম বুঝে, সৎকার্য্যে অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বার্থত্যাগ করে, সন্তানপালনে আত্মসুখ বলিদান দেয়, সতীত্বের সম্মান জানে, পাতিব্রত্যে আত্মোৎসর্গ করে; তাহারা পাপের শাস্তি, পুণ্যের পুরস্কার এবং ধর্ম্মের মাহাত্ম্য সুন্দররূপেই অনুভব করিতে সমর্থ; সমাজের এ উপকার, এত উপকারের অনেকটাই কৃত্তিবাসাদি-কৃত।

কৃত্তিবাসের কীর্ত্তির ত কথাই নাই; কিন্তু তাঁহার কবিত্ব কিরূপ? কৃত্তিবাসের অক্ষয় কীর্ত্তিই তাঁহার কবিত্বের পরিচায়ক; উহার অপেক্ষা অধিক পরিচয় আর কি হইতে পারে? এক দিকে অশেষ-গুণগৌরবান্বিত চণ্ডীদাস, গোবিন্দ ও জ্ঞানদাসাদি মহাজন বৈষ্ণব কবিগণ, অপর দিকে কাশীদাস ও কবিকঙ্কণ হইতে কবিরঞ্জন ও রায়গুণাকর, কাব্যকথায় জন-সমাজের হিতসাধনকল্পে ইহারা কেহই কৃত্তিবাসের তুল্য নহেন; সকলেই তাঁহার নিম্নস্থানীয়। জন-সাধারণের নৈতিক জীবনগঠনকল্পে, বৈষ্ণব কবিকুল-তিলকদিগের সর্ব্বসমষ্টিবাদে, কৃত্তিবাসের পর কাশীদাস; কাশীদাসের পর কবিরঞ্জন প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাসাদি অত্যুৎকৃষ্ট, অতুলনীয় কবি; কিন্তু ইহারা সকলেই গীত-কবি। বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বপ্রথম মহাকাব্য কৃত্তিবাস কর্ত্তৃকই রচিত হয়। তাঁহার পূর্ব্বে সে পথে আর কেহ কখনও যাইতে সমর্থ বা সাহসী হন নাই।

কৃত্তিবাসের কবিত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গালীর বাঙ্গালা মত সর্ব্বত্র সুবিদিত। আমরা

নিজেও সেই মতাবলম্বী। অতএব ইংরেজী সমালোচনার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে কৃত্তিবাসের কবিত্ব কিরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাই কেবল দেখা যাউক। পাশ্চাত্য হিসাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করিয়া বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কৃত্তিবাসের কবিত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন ;—"It has the true poetic ring.

প্রাঞ্জল রচনা, অত্যুজ্জ্বল বর্ণনা ও সুগভীর করুণার কথা কহিয়া, কৃত্তিবাসের কবিতার অকৃত্রিম কবিত্ব-ঝঙ্কারের পরিচয় দিয়া দত্ত মহাশয় পুনশ্চ বলেন ;—কৃত্তিবাস জড়প্রকৃতি ও মনুষ্যস্বভাবের এমনি হৃদয়স্পর্শী আলেখ্য আঁকিয়াছেন যে, তাহাতে পাঠককে বিমোহিত হইতে হয়। তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করে।"

কৃত্তিবাস নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, তিনি "মুরারী ওঝার নাতি।" ওঝা আখ্যায় তিনি আপনিও অলঙ্কৃত। ওঝা অর্থে উপাধ্যায়, অতি বিশিষ্ট পদবী। কৃত্তিবাস ফুলে মেলের অত্যুচ্চ বংশোদ্ভব কুলীন ব্রাহ্মণ ;—নিবাস, জন্মস্থান ফুলিয়া গ্রাম।

"স্থানের প্রধান সেই ফুলিয়ায় নিবাস"

ফুলিয়া "স্থনের প্রধান"ই বটে। পরন্তু, তথা হইতে কুলীনের সর্ব্বপ্রধান মেল সৃষ্টি। ফুলিয়া গ্রাম রাণাঘাটের অদূরবর্ত্তী, শান্তিপুরের পথে। তথায় কৃত্তিবাসের বাস্তুভিটা এবং "দোল-পিঁড়া" অদ্যাপি বিদ্যমান আছে ; কৃত্তিবাসের অক্ষয়কীর্ত্তি অনন্তকাল স্থায়ী থাকিবে বটে ; কিন্তু কিছুকাল পরে ইহাদের আর চিহ্নমাত্রও থাকিবে না। কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চ এখনও আছে ; কিন্তু তাহাতে আর রামসীতার মূর্ত্তি নাই। মঞ্চোপরি সেই যুগলমূর্ত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও নিত্য পূজিত দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয় ? আর তাহাতে সহায়তা করিতে কাহারই বা অনুরাগ না জন্মে ?

পরাজয়।

[শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য]

(১৯)

হালদার মহাশয় বলিলেন, "হাঁ হে মুরলি, এসব শুনছি কি?"

মুরলী একটু কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি শুনছো খুড়োঠাকুর?"

হালদার মহাশয় হস্ত দ্বারা দেবদারু কাঠের বাক্সটার ধূলা ঝাড়িয়া তাহার উপর চাপিয়া বসিলেন এবং একটা দীর্ঘ জৃম্ভণ ত্যাগ করিয়া তারা ব্রহ্মময়ীকে স্মরণপূর্ব্বক বলিলেন, "ঘোর কলি হে মুরলি, ঘোর কলি। একালে কারো কি ভাল করতে আছে? যার ভাল করবে, সেই শেষে সর্ব্বনাশ না ক'রে ছাড়বে না। তারা শিবসুন্দরি, তুমিই সত্য মা!"

হালদার মহাশয় আবার একটা হাই তুলিয়া তুড়ি দিতে লাগিলেন। মুরলী ভীত বিস্মিত দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তুড়ি দেওয়া শেষ হইলে হালদার মহাশয় ধীরগম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তখনই ব'লেছিলাম, ওহে মুরুলি, সাবধান হও। একালে এক মায়ের পেটের ভাই আপনার হয় না, এতো সতাতো ভাই। তা তুমি তখন গরীব বামুনের কথাটা কানেই নিলে না। আমার ভায়ার অমন জলজ্যান্ত ব্যাভার দেখেও তো বুঝলে না। তারা, তারা, সকলই তোমার ইচ্ছা।"

মুরলী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "হয়েছে কি খুড়োঠাকুর?

হালদার মহাশয় বলিলেন, "হবে আর কি। তুমি কিছু শোন কি?"

শঙ্কাজড়িতকণ্ঠে মুরলী উত্তর দিল, "না।"

মৃদু হাসিয়া হালদার মহাশয় বলিলেন, "তুমিই বা শুনবে কোথা হ'তে বল। গোপনে গোপনেই পরামর্শ চলছে। তুমি গণেশের টাকাগুলা সব ফেলে দিয়েছ?"

মুরলি। না।

হাল। কত বাকী?

মুরলী। তিন শো।

হালদার মহাশয় একটু নীরব থাকিয়া গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "তবেই হয়েছে। তিন শো, আর তার সুদ এক শো। তোমার নামে যে চার শো টাকার নালিশ হবে।"

অতি মাত্র বিস্ময়ের সহিত মুরলী বলিয়া উঠিল, "নালিশ! কে নালিশ করবে?"

হালদার মহাশয় বলিলেন, "যে পাওনাদার। তোমার ছোট ভায়া গণেশচন্দ্র।"

মুরলী হাঁ করিয়া কিছুক্ষণ হালদার মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তার পর জড়িতকণ্ঠে বলিল, "গণশা—গণশা আমার নামে নালিশ করবে!"

ঈষৎ শ্লেষের হাসি হাসিতে হাসিতে হালদার মহাশয় বলিলেন, "তা নয়তো কি মনে করেছ টাকাগুলো ছেড়ে দেবে? সে পাত্রই ওরা নয়। এ কি তুমি আমি যে, ছোট ভাই ব'লে ক্ষেমা ঘেন্না করব?"

মুরলীর নিঃশ্বাসটা যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। হালদার মহাশয় বলিতে লাগিলেন, "ওরা তোমার আমার মত উদার নয় হে মুরলী, ওরা টাকাটা বেশ চেনে। এই আমার ভায়াকে দিয়েই দেখ না, বৌটাকে বেঘোরে মেরে ফেললে, তবু পয়সা খরচ হবে ব'লে একটা ভাল ডাক্তার এনে দেখালে না। যখন মর মর, নাভিশ্বাস হ'য়েছে, তখন এসে বললে, দাদা, গোটাকতক টাকা দিতে পার, এক জন ভাল ডাক্তার এনে দেখাই। কেন গো বাবু, তুমি দশ টাকা উপায় উপার্জ্জন করছো, তোমার স্ত্রীর ব্যারাম, আমি টাকা দিতে যাব কেন? পাবই বা কোথায়? আমার তো আকাশবৃত্তি, চাল কলা কুড়িয়ে বেড়াই। তাও ভাবলাম, দূর হোক্, বৌটা মারা যায়, না হয় ঘটী বাটী বাঁধা দিয়েই দেব। তারও কি ছাই সময় আছে? পরদিনই সন্ধ্যার সময় শেষ হ'য়ে গেল। আমারও কি ছাই কম লোকসান অশৌচ হ'লো। নগদ দশ টাকা দক্ষিণে, চাল কাপড় জিনিষ পত্তর সব পরে নিয়ে গেল।"

হালদার মহাশয় একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার এই দীর্ঘ আক্ষেপোক্তি মুরলীর কাণে গেল না; সে তখন বজ্রাহতের ন্যায় দেয়াল ঠেস দিয়া দোকান-চৌকীর উপর বসিয়াছিল। হালদার মহাশয় তাহার চিন্তিত ভাব লক্ষ্য করিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিলেন, "যাক্, আর ভেবেই বা কি করবে বল, তারার মনে যা আছে তাই হবে। সুরাহার মধ্যে এইটুকু, লেখা কিছুই নাই।"

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া মুরলী বলিল, "লেখাপড়া না থাকলেও ওর পাওনা টাকা তো ?"

হালদার মহাশয় বলিলেন, "পাওনা যে তার প্রমাণ কি ! তুমি যদি বল ধারি না।"

মুরলী দৃঢ়স্বরে বলিল, "তা আমি বল্‌তে পারব না।"

হালদার মহাশয় মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে বলিলেন, "আরে রামঃ, তুমি কি এতটা অধর্ম্ম করতে পার ? আমি ওটা প্রমাণের কথা বলছি ! যাক্, দেখি, কত দূর কি হয়। খুড়োঠাকুর থাকতে তোমার কোন চিন্তা নাই ! এখন পাঁচ পো নুন, এক সের তেল, এক সের গুড় দাও দেখি। গিন্নির আবার পিঠে খেতে সাধ গেছে। বল্লাম হাতে পয়সা নাই। তা বল্লে, পয়সা না থাকে, মুরলীর দোকান তো আছে। দশ টাকা ধার চাহিলে সে তৎক্ষণাৎ দেবে। আমি ও সব ধার ক'রে ঘি খাওয়া ভালবাসি না, কিন্তু মেয়ে মানুষে তো তা বোঝে না। বেলাটাও যায়, জিনিষগুলা দাও।"

মুরলী যন্ত্র-চালিতের ন্যায় সওদা মাপিয়া দিল। হালদার মহাশয় মুরলীকে নিশ্চিন্ত থাকিতে উপদেশ দিয়া সওদা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

মুরলী কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না; সে খাতা খুলিয়া দোকানের মজুদ মালের হিসাব দেখিতে লাগিল।

পথে গণেশের সহিত হালদার মহাশয়ের সাক্ষাৎ হইল। হালদার মহাশয় তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কি হে গণেশ, নালিশ ছাড়া কি টাকাটা আদায় হ'লো না ?"

গণেশ একটু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ টাকা ?"

হালদার মহাশয় বলিলেন, "মুরলীর কাছে পাওনা টাকা হে ! তা হ'লে নালিশ কচ্চো ?

গণেশ একটু বিরক্তভাবে বলিল, "কে বললে ?"

একটু গম্ভীর হাসি হাসিয়া হালদার মহাশয় বলিলেন, "কথা কি আর ছাপা থাকে ? মুরলীর মুখেই শুনলাম। এই মাত্র তার সঙ্গে এই নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল। মুরলী বলে কি জান, লেখাপড়া তো কিছু নাই। আমি বল্লাম, লেখাপড়া না থাকে, ধর্ম্ম তো আছে। আর আমি তো সব জানি, আমার কাছে স্পষ্ট স্বীকার ক'রেছে। আমি তো আর আদালতে হলপ

নিয়ে মিথ্যে বলতে পারবো না। তা বাপু, আমার কাছে এত লুকো-ছাপি কেন? তবে বেশ আটঘাট বেঁধে কাজ ক'রো, আজকাল বাপকে বিশ্বাস নাই, বুঝলে। তারা, তারা, ব্রহ্মময়ী মা!"

হালদার মহাশয় প্রস্থানোদ্যত হইলেন। গণেশ তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা বললে, লেখাপড়া কিছু নাই?"

হালদার মহাশয় পাছু ফিরিয়া বলিলেন, "কেন, তোমার দাদাকে কলির যুধিষ্ঠির মনে কর নাকি?"

শ্লেষের তীব্র হাসি হাসিয়া হালদার মহাশয় চলিয়া গেলেন। গণেশ তাঁহার দিকে চাহিয়া স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সেদিন খাতাপত্র দেখিয়া মুরলী অনেক রাত্রিতে বাড়ী ফিরিল। নিস্তারিণী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ এত রাত হ'লো যে?"

মুরলী কোন উত্তর না দিয়া হাত পা ধুইল। নিস্তারিণী ভাত বাড়িয়া দিল; মুরলী আহার শেষ করিয়া শুইয়া পড়িল। স্বামীর ভাব দেখিয়া নিস্তারিণী আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে ঘরে আসিয়া স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ রকম কি?"

মুরলী তাহার দিকে পিছন ফিরিয়া শুইয়া গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল, "খুব সুখবর।"

নিস্তারিণী স্বামীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুরলী সহসা পাশ ফিরিয়া উগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "টাকার জন্য গণশা আমার নামে নালিশ করবে বড় বৌ!"

নিস্তারিণী চমকিয়া উঠিল, কোন উত্তর করিতে পারিল না। মুরলী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল; কঠোর স্বরে বলিল, "গণশা নালিশ করবে, শুনতে পেয়েছ?"

নিস্তারিণী বলিল, "দূর! তাও কি হ'তে পারে? অসম্ভব!"

মুরলী বলিল, "গণেশ তোমার বাপ তুলতে পারে, এটা কি সম্ভব মনে হ'তো?"

নিস্তারিণী মাথা হেঁট করিল। তীব্রকণ্ঠে মুরলী বলিল, "ভাবচো কি? আর তোমার গয়না নাই।"

নতমুখে নিস্তারিণী বলিল, "তুমি এত রাগচো কেন? আমি গণেশকে ডেকে জিজ্ঞাসা করছি।

উচ্চকণ্ঠে মুরলী বলিল, "ঐটী হবে না বড় বৌ; অনেক ক'রেছ, কিন্তু মুরলী হাজরার মাথাটা আর এত ক'রে হেঁট ক'রে দিও না।"

মুরলী শুইয়া পড়িল। নিস্তারিণী তাহার পায়ের কাছে বসিয়া স্বামীর পায়ে হাত বুলাইতে লাগিল।

(২০)

গণেশের সংসারটী এখন আর তেমন ক্ষুদ্র ছিল না, আত্মীয়-স্বজনে বৃহত্তর হইয়া উঠিয়াছিল। আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে মহামায়ার মা, বাপ, ভাই, ভগ্নী, ভগ্নীপতি প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে কেহ যে গণেশের গৃহে স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে; কেহ দশ দিন, কেহ পনরো দিন, কেহ বা এক মাস থাকিয়া চলিয়া যাইতেন। তবে গড়পড়তায় হিসাব ধরিলে গণেশের দুই জন হিসাবে পোষ্য-সংখ্যা বাড়িয়াছিল।

ইহারা যে শুধু গণেশের অন্নধ্বংস করিতেন তাহা নহে, ইহাদের কাজও অনেক ছিল। ইহারা মহামায়াকে উপদেশ দিতেন, মাতঙ্গিনীর উপর কর্তৃত্ব করিতেন, গণেশের কাজ সমালোচনা করিয়া তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা দেখাইয়া দিতেন, মধ্যে মধ্যে নিস্তারিণীকেও দুই একটা স্পষ্ট কথা শুনাইতে ছাড়িতেন না। মাতঙ্গিনী ইহাদের কথার প্রায়ই উত্তর দিত না, নিতান্ত অসহ্য হইলে দুই এক কথা বলিত। তখন ঝগড়া বাধিয়া যাইত। সে ঝগড়া মিটাইতে গণেশকে বেশ একটু বেগ পাইতে হইত। এজন্য গণেশ আহার-নিদ্রার সময় ব্যতীত অবশিষ্ট সময়টুকু বাহিরে বাহিরেই কাটাইয়া দিত।

সেদিন খাদ্যদ্রব্য-বণ্টনের পক্ষপাতিত্ব লইয়া মাতঙ্গিনীর সহিত গণেশের শাশুড়ীর বেশ একটু ঝগড়া বাধিল। মহামায়া মাতার পক্ষ সমর্থন করিল। সুতরাং কলহটা বেশ একটু গুরুতর হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষ হইতেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ঘোষিত হইল, ইহার উপযুক্ত প্রতিকার না হইলে কেহই এ গৃহে জলগ্রহণ করিবে না।

প্রতিকারের কর্ত্তা গণেশ। গণেশ বাহিরে বেড়াইয়া রাত্রিতে বাড়ী ফিরিলে মহামায়া স্বামীর নিকট বিবাদকাহিনী সালঙ্কারে বিবৃত করিল, এবং যতটা সম্ভব মাতার নির্দ্দোষতা ও মাতঙ্গিনীর দোষ প্রমাণ করিয়া দিল। গণেশ শুনিয়া গুম হইয়া রহিল। মহামায়া বলিল, "এর না হয় একটা বিহিত কর, না হ'লে তো আর টেকা যায় না।"

গণেশ বলিল, "আমিও তা বুঝেছি, কালই এর প্রতিকার করবো।"

মহামায়া জিজ্ঞাসা করিল; "কি করবে?"

গণেশ বলিল, "যাঁদের জন্য এত কলহ-কিচকিচ, তাঁদের এ বাড়ীর দরজা মাড়াতে বারণ ক'রে দেব।"

মহামায়া তীব্র দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "সেই সঙ্গে আমাকেও বিদেয় ক'রে দেবে তো?"

গম্ভীরকণ্ঠে গণেশ বলিল, "তোমাকে বিবাহ ক'রে এনেছি, বিদায় করবার উপায় নাই।"

মহা। উপায় থাকলে করতে?

গণেশ। বোধ হয় করতাম।

রাগে ফুলিতে ফুলিতে মহামায়া বলিল, "তোমার বিদেয় করতে হবে না, আমি আপনিই বিদেয় হ'য়ে যাচ্চি।"

গণেশ। কোথায় যাবে?

মহা। আমার যাবার জায়গা অনেক আছে।

গণেশ। জায়গা থাকে যেতে পার।

ক্রোধস্ফুরিত কণ্ঠে মহামায়া বলিল, "আর তুমি বড় গিন্নীকে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে—"

গণেশ বিদ্যুদ্গতিতে উঠিয়া মহামায়ার পৃষ্ঠে সবলে পদাঘাত করিল। মহামায়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। তাহার নাক মুখ দিয়া রক্ত ছুটিতে লাগিল। গণেশ সবেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মহামায়ার চীৎকারে তাহার মাতা ছুটিয়া আসিলেন, মাতঙ্গিনী আসিল, নিস্তারিণী ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। শাশুড়ী ঠাকরুণ কন্যার অবস্থা দর্শনে মাথায় হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে খুনে জামাতার উদ্দেশে অভিসম্পাত প্রয়োগ করিতে লাগিলেন; মাতঙ্গিনী গালে হাত দিয়া এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল; নিস্তারিণী ছোট বৌকে তুলিয়া তাহার নাকে মুখে জলের ছাট দিয়া শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল। রক্ত বন্ধ হইলে নিস্তারিণী তাহাকে তুলিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। মহামায়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া নাকি সুরে, যাহাদের জন্য তাহার স্বামী পর হইয়াছে, তাহাদের উদ্দেশে অজস্র অভিসম্পাত বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল; নিস্তারিণী তাহার মাথার কাছে বসিয়া ধীরে ধীরে বাতাস করিতে লাগিল। আর মাতঙ্গিনী

দাঁতে ঠোঁট চাপিয়া জ্বলন্ত দৃষ্টিতে নিস্তারিণীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

পরদিন মাতঙ্গিনী গণেশকে বলিল, "দেখ্ গণেশ, আমার যা হয় একটা একটা ব্যবস্থা কর, রোজ রোজ এ সব কেলেঙ্কারী আর সহ্য হয় না।"

গণেশ বলিল, "সহ্য না হয়, অন্যত্র যেতে পার।"

মাতঙ্গিনী বলিল, "তুই বলিস্ কিরে গণশা, আমি আর কোথায় যাব?"

"চুলোয়, যমালয়ে" বলিয়া গণেশ দিদ্রির সম্মুখ হইতে সরিয়া গেল।

এমন এক আধ দিন নয়, প্রায় প্রত্যহই গণেশকে দুই একটা অভিযোগ শুনিতে হইত। শুনিতে শুনিতে সে যতই উত্যক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল, ততই বড় বোয়ের উপর তাহার রাগটা প্রবল হইতে থাকিল। তাহার এই অশান্তির জন্য সে বড় বৌকেই সম্পূর্ণ দোষী স্থির করিয়া লইয়াছিল। নিস্তারিণীই যেন তাহাকে এই বিষম ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া দূরে দাঁড়াইয়া মজা দেখিতেছে! কি ভয়ানক প্রকৃতির মেয়ে মানুষ এই বড় বৌটা! কিন্তু পুরুষ মানুষ হইয়াও তো গণেশ ইহার শোধ দিতে পারিল না! বড় বোয়ের উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্যস্ত হইলেও দাদার নামে নালিশ করিবার কল্পনাটা গণেশের মস্তিষ্কে আদৌ আসে নাই। মহামায়া মধ্যে মধ্যে পাওনা টাকাটার কথা স্বামীকে স্মরণ করাইয়া দিত, গণেশ কল্পিত কড়ারে পত্নীকে শান্ত করিয়া রাখিত। শেষে টাকাটার কথা শ্বশুর শ্রীনাথ পালের কাণে উঠিল। পাল মহাশয় একবার জামাতার নিকট কথাটা পাড়িলেন, কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর পাইলেন না। এদিকে মহামায়া স্বামীকে সম্পূর্ণ অপদার্থ বুঝিতে পারিয়া বাপকেই টাকাটা আদায় করিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। পাল মহাশয় বলিলেন, "নালিশ না করলে টাকা আদায় হবে না।"

মহামায়া বলিল, "না হয়, নালিশই কর।"

পাল মহাশয়ও নালিশ করিতে পশ্চাৎপদ ছিলেন না। নালিশ এক কথাতেই হইতে পারে, কিন্তু টাকাটার লেখাপড়া কিছুই নাই। পাল মহাশয় গ্রামের দুই একজন মাতব্বর লোকের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ক্রমে কথাটা পাঁচ কাণ হইয়া পড়িতে বিলম্ব হইল না। যাহাদের কাণে গেল, তাহারা ইহা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল। গণেশ কিন্তু হালদার মহাশয়ের মুখেই কথাটা প্রথম শুনিল। শুনিয়া যেমন বিস্মিত, তেমনই বিরক্ত হইল।

সেদিন গণেশের মনটা কেমন খারাপ হইয়া রহিল। কিছুই ভাল লাগিল না। স্কুল হইতে ফিরিবার পথে কথাটা শুনিয়াছিল। বাড়ী আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া শুইয়া পড়িল। বেড়াইতে বাহির হইল না, রাত্রিতে কিছুই খাইল না। মহামায়া জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাইল না। মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিলে সংক্ষেপে উত্তর দিল, "অসুখ।"

পরদিন গণেশ যখন আহারে বসিয়াছিল, তখন নিস্তারিণী রান্নাঘরের নীচে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ঠাকুরপো, তুমি নাকি তোমার দাদার নামে নালিশ করবে?"

গণেশ মুখ তুলিয়া কঠোর স্বরে উত্তর করিল, "হাঁ, করবো।"

নিস্তারিণী আর কিছু বলিতে পারিল না। স্বামীর নিষেধ সত্ত্বেও কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া সে কি অন্যায় কাজ করিয়াছে তাহা বুঝিতে পারিল। একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিস্তারিণী ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

মাতঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করিল, "কিসের নালিশ রে গণশা?"

গণেশ বলিল, "টাকার।"

মাতঙ্গিনী বলিল, "টাকার জন্য দাদার নামে নালিশ করবি?"

জোর গলায় গণেশ উত্তর করিল, "হাঁ, করবো?"

রাগে ভ্রূকুটি করিয়া মাতঙ্গিনী বলিল, "তুই কি একেবারে উচ্ছন্নে গিয়েছিস্?"

চীৎকার করিয়া গণেশ বলিল, "হাঁ, গিয়েছি। আমি উচ্ছন্নে গিয়েছি, এবার সকলকে উচ্ছন্নে দেব।"

হাতের ভাতগুলা থালার উপর আছাড়িয়া ফেলিয়া গণেশ উঠিয়া গেল। মহামায়া আপন মনে গর্জ্জন করিয়া বলিতে লাগিল, "মাগো মা, পোড়া লোকের জ্বালায় মানুষের একমুঠা খাবারও জো নাই! খাবার সময় সব সোহাগ জানাতে আসেন। একরাশ টাকা ধারেন, দেবার নামটী নাই। নালিশ করবে না তো কি করবে? ঘর ভিটে বেচে টাকা আদায় করবে।"

মাতঙ্গিনী রন্ধনশালা হইতে বাহিরে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল, "তা পারতে ছোট বৌ, যদি টাকাটা তোমার বাবার হ'তো, কিন্তু টাকা আমার। আমি সই না দিলে কার বাবার সাদ্দি দাদার ঘর ভিটে বেচে দেখি।"

মহামায়া হাত দুইটা নাড়িতে নাড়িতে ঝঙ্কার দিয়া বলিল, "আহা দরদী

গো, দাদার উপর যদি এত দরদ, তবে দাদাকে ছেড়ে আর এক জনের অন্ন ধ্বংস করছো কেন?"

মাতঙ্গিনী বলিল, "আমি পরের অন্ন ধ্বংস কচ্চি না ছোট বৌ, নিজের ভায়ের ভাত খাচ্চি। পরের অন্ন ধ্বংস করা আমাদের বংশে কোষ্ঠীতে লেখে নাই।"

কথাটা খুব জোরেই মহামায়াকে বিঁধিল। সে তখন মাতঙ্গিনীর সহিত রীতিমত ঝগড়া আরম্ভ করিয়া দিল। মাতঙ্গিনী তাহার কথার উত্তর না দিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

সাহিত্য ও সমাজ।

[শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়]

'সাহিত্যে হিন্দু ও মুসলমানের মিলনের অন্তরায়' বিষয়ে আজকাল অনেক লেখালেখি হইতেছে। বাদ-প্রতিবাদও যথেষ্ট হইতেছে। এ বিষয়ে আমার দু'একটী কথা নিবেদন করিবার আছে। বহু মুসলমান লেখকই বলিয়া থাকেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র বিনা ঐতিহাসিক ভিত্তিতে অনেক মুসলমান-চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিয়াছেন। কথাটা কত দূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না; অবশ্য বঙ্কিমবাবু জীবিত থাকিলে ইহার সদুত্তর দিতে পারিতেন। কিন্তু আমার মনে হয়, বঙ্কিমবাবুর সমস্ত মুসলমান-চরিত্রই কল্পনা-প্রভাবে চিত্রিত নহে,— পরন্তু উহাদের ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে। মনে করুন, রাজসিংহ উপন্যাসে তিনি জেবউন্নিসাকে যে মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন তাহার জন্য দায়ী কে? ইহার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র দায়ী নহেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কয়েক জন মুসলমান উর্দ্দূ গ্রন্থকারই সর্ব্বপ্রথমে জেবউন্নিসার নিষ্কলঙ্ক-চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। বঙ্কিমবাবু তাহারই অনুবাদ দিয়াছেন, নিজে কিছুই সৃষ্টি করেন নাই।

জেব-উন্নিসার প্রণয়-কাহিনী আধুনিক উর্দ্দূ নভেল লেখকদিগের (সম্ভবতঃ লক্ষ্ণৌ সহরের) উর্ব্বর মস্তিষ্ক-প্রসূত। লাহোরের মুন্সী আহমদুদ্দীন্, বি-এ মহাশয়ের তথাকথিত জেব-উন্নিসার জীবন-চরিত "দুর্‌রুই মক্‌তুম্" গ্রন্থ

বর্ত্তমানে প্রচলিত। এই গ্রন্থকার আবার পুস্তক-রচনাকালে মুন্সী মহম্মদ-উদ্দীন্ খালিফের "হাইয়াৎ-ই-জেবউন্নিসা" নামক কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ হইতে উপাদান আহরণ করিয়াছেন। বিবি Westbrookএর Diwan of Zeb-un-nissa (Wisdom of the East Series 1913) পুস্তকের ভূমিকায় জেবের প্রণয়-ব্যাপারের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টতঃ আহমদুদ্দীনের উর্দ্দূ গ্রন্থ হইতে গৃহীত। বঙ্কিমবাবু 'রাজসিংহে' জেব-উন্নিসাকে যে ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, আমার মনে হয়, এই উর্দ্দূ গ্রন্থকার তাহা অপেক্ষাও জঘন্যভাবে জেব-উন্নিসার চিত্র প্রদান করিয়াছেন। তাহার পর আর একটী কথা; বঙ্কিমবাবু ইতিহাস রচনা করিতে বসেন নাই, সুতরাং তাঁহার পক্ষে প্রামাণিক গ্রন্থ অনুসন্ধান করিয়া, জেবের যথার্থ চিত্র অঙ্কিত করা নিষ্প্রয়োজন; কারণ, তিনি স্পষ্ট স্বীয় গ্রন্থে লিখিয়াছেন; "উপন্যাস—উপন্যাসই, ইতিহাস নহে।"

এ অবস্থায় যাঁহারা জেব-উন্নিসার চরিত্রে কালিমা লেপন করায় বঙ্কিমবাবুকে দোষী করেন, আমার মনে হয়, তাঁহারা বঙ্কিমবাবুর প্রতি অবিচার করিয়া থাকেন; ইহার জন্য যদি কেহ দোষী হন, তবে সে মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা। সেই জন্য বলি, একটু দেখিয়া শুনিয়া, কথা বলিলে অনেক গোলেরই নিষ্পত্তি হইবে।

পরন্তু, মুসলমান-ইতিহাসলেখকেরা আমাদিগকে সময়ে সময়ে অযথা আক্রমণ করিয়া থাকেন; উদাহরণস্বরূপ, মৌলভী শেখ আবদুল জব্বারের নাম করা যাইতে পারে। তিনি তাঁহার 'নূরজহান্' পুস্তকে অপমানসূচক ভাষায় বাঙ্গালীকে আক্রমণ করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, এই পুস্তকের ভূমিকা-লেখক সুযোগ পাইয়া বাঙ্গালী-ঐতিহাসিকদিগের তথা বাঙ্গালী জাতির প্রতি, 'মিলনের অন্তরায়ে'র ধূয়া ধরিয়া, মধুবর্ষণ করিয়াছেন। নূরজহান্ সম্বন্ধে মৌলভী সাহেবের বক্তব্য :—"নূরজহানের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে বঙ্গীয় লেখকগণের মধ্যে বিস্তর মতভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই জন্য আমাকে ন্যায়ের অনুরোধে বাধ্য হইয়া কতিপয় অপ্রিয় কথার আলোচনা করিতে হইতেছে। * * * কল্পনাপ্রিয় বাঙ্গালী জাতি চর্ব্বিতচর্ব্বণ করিতে বড়ই পটু। গবেষণার ধার দিয়াও ঘেঁষিতে চায় না। অতএব নূরজহানের মোহিনী রূপেতে একজনের পর একজন রং ফলাইয়া জাহাঁগীরকে এক কিম্ভূতকিমাকার মূর্ত্তিতে দাঁড় করাইয়াছেন। আমি অকিঞ্চন অনেক

দিনের অনুসন্ধানের ফলে বহু যত্নের পর এই ইতিবৃত্ত প্রকাশ করিলাম।

দুঃখের বিষয়, মৌলভী সাহেবের 'বহুদিনের অনুসন্ধানের ফলে' যে 'নূরজহান' উদ্ভূত হইয়াছে, ইতিহাস হিসাবে তাহার কোনই মূল্য নাই। ইহাতে "গবেষণা"র 'গ'ও নাই; আছে কেবল বাঙ্গালীদের প্রতি বিষ-উদ্গীরণ। মৌলভী সাহেবের গবেষণার ২।১টি নমুনা দিতেছি:—

(১) নূরজহানের মৃত্যু-তারিখ ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দ (১০৫৫ হিঃ, ২৯ শওয়াল) See Ain-i-Akbari, i, 510; Badshanama in Elliot, vii, 69; কিন্তু মৌলভী সাহেবের মতে ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দ!

(২) মৌলভী সাহেবের মতে, 'জহাঙ্গীরের তিরোধানের পর শাহজাদা খুর্‌রম শাহজহান্ উপাধি ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।' ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে খুর্‌রম যখন দাক্ষিণাত্যে অভিযান করেন, সেই সময়ে সম্রাট্ তাঁহাকে 'শাহ' উপাধি-ভূষিত করেন। পরে জহাঙ্গীরের রাজত্বের দ্বাদশবর্ষে (১৬১৭ খ্রীঃ) শাহ সুলতান্ খুর্‌রম "শাহজহান্ উপাধি লাভ করেন। See Tuzuk-i-Jahangiri, Translated by Rogers & Beveridge, i, 395.

(৩) অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়, মৌলভী সাহেবের জাহাঙ্গীর ৬০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ১৬৬২ খৃষ্টাব্দের ২৮শে অক্টোবর বরাজুর নামকস্থানে মৃত্যুমুখে পতিত হন। জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয়—১৬২৭ খৃষ্টাব্দের, ২৮শে অক্টোবর (১০৩৭ হিঃ) কাশ্মীরের নিকটস্থ রাজাওর্ নামক স্থানে এবং তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৮ বৎসর। See Iqbalnama-i-Jahangiri in Elliot, Vol. VI. P. 435.

(৪) মৌলভী সাহেব বলেন, ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে নূরজহানের পিতা ঘিয়াস বেগের মৃত্যু হয় (পৃঃ ৭৭) ইহা একটী মারাত্মক ভুল। স্ত্রীর মৃত্যুর প্রায় চারি মাস পরেই ১৬২২ খৃষ্টাব্দে (১০৩১ হিঃ) ঘিয়াসবেগের মৃত্যু হয়। See Ain-i-Akbari, Vol. I, P. 509; Tuzuk-i-Jahangiri, Vol. II, P. 222.

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, খাফি খাঁর মতে শাহজহান সম্রাট্ হইয়া বিমাতা নূরজহানকে বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদান করেন। (পৃঃ ৮৩) গ্রন্থকার নিশ্চয়ই খাফি খাঁ দেখেন নাই। খাফি খাঁ (ফার্সী গ্রন্থ ৬১৮ পৃঃ) বলেন

যে, বেগম বার্ষিক দুই লক্ষ টাকা বৃত্তি পাইতেন। বাদশানামায় (Elliot, Vol. VII, P. 70) ও "আইন-ই-আকবরী"তে (Vol. I, P. 510) স্পষ্টই ২ লক্ষ টাকা বৃত্তির কথা আছে। তবে Dow সাহেব তাঁহার গ্রন্থে বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকা বৃত্তির কথা লিখিয়াছেন (See Dow's Indostan, III, 185) কিন্তু Dow কল্পনাপ্রিয় কাব্যরচয়িতা বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন।

এইরূপ পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে মৌলভী সাহেবের গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি যে গবেষণার ভাণ' করিয়া আমাদের গালি বর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই গবেষণার মূল্য কতটুকু, তাহারই একটু নমুনা দিয়াছি ;—তাঁহার গ্রন্থ-সমালোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

সমালোচনায় বিদ্বেষ।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বিদ্বেষাত্মক সমালোচনার ইদানীং খুবই আবির্ভাব হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই 'অর্ঘ্যে'রই পৃষ্ঠায় 'মানসী ও মর্ম্মবাণী'র 'ব্রজরাজ' স্বাক্ষরকারী জনৈক সমালোচকের সমালোচন-কীর্ত্তির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছিল। এবারও এই ব্রজরাজের সমালোচনার কেরামতি পাঠককে দেখাইলাম। সেবার 'ব্রজরাজ' উপন্যাসের সমালোচনা করিতে গিয়া লেখককে বিনা কারণে গালি দিয়াছিলেন, এবার ইতিহাসের সমালোচনা করিতে বসিয়া বিকট অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এরূপ সমালোচনার যে কোনও মূল্য নাই এবং ইহা সুধী সমাজে যে আদৌ গ্রাহ্য নহে, তাহা জানি ; তথাপি ইঁহাদিগকে সাহিত্য-সমাজে ধরাইয়া দেওয়া ভাল এই বিবেচনায় ইঁহার সমালোচনা সম্বন্ধে দু'এক কথা বলিতে হইল।

'ব্রজরাজ' 'বীরভূম বিবরণে'র সমালোচনায় শ্যামারূপা গড়ের উল্লেখ উক্ত গ্রন্থে অপ্রাসঙ্গিক বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই কথার কোনও মূল্যই নাই।

'লাউসেন তলাও' বীরভূমের অন্তর্গত ; (কেন্দুবিল্বের মাত্র মাইল খানেক পূর্ব্বে) অজয়ের উত্তর তটে অবস্থিত। এখন এই লাউসেন তলাওয়ের বিবরণ যদি লিখিতে হয়, তাহা হইলে শ্যামরূপা গড়ের কথা লেখা অবশ্যই উচিত। এই স্থান জয় করিতে আসিয়া লাউসেন অজয়ের (উত্তর) তটে শিবির সন্নিবেশ করায় স্থানটী লাউসেন তলাও নামে বিখ্যাত হইয়াছে। লাউসেন এই শ্যামারূপা গড় কেন জয় করিতে আসিয়াছিলেন, তখন গড়ের অধিস্বামী কে এবং অবস্থা কিরূপ ছিল ইত্যাদি পরিচয় প্রদান কি ঐতিহাসিকের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক ?

ব্রজরাজ লিখিয়াছেন, "ভদ্রপুর গ্রাম প্রথমে মুরশিদাবাদ জেলার অন্তর্গত ছিল, এখন বীরভূমের অন্তর্গত। সেই সূত্রে মহারাজ নন্দকুমারের বিবরণ বীরভূম অনুসন্ধান সমিতির স্বকীয় সম্পত্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।" লেখার ভাবে মনে হয়, কাজটা খুব অন্যায় হইয়া গিয়াছে ! অতঃপর তিনি চোখ রাঙ্গাইয়াছেন, "কিন্তু মুর্শিদাবাদ জেলার কুঞ্জঘাটার' রাজবংশের বিবরণ কোন্ অধিকারে 'বীরভূম বিবরণে' স্থান পায় ?" এই অধিকারে যে কুঞ্জঘাটা রাজবংশ মহারাজ নন্দকুমারের দৌহিত্র বংশ ; কুঞ্জঘাটা রাজবংশ মহারাজ নন্দকুমারের উত্তরাধিকারী ; শ্রীমন্মহাপ্রভুর তৈলচিত্র, সূর্য্যমুখী শালগ্রামশিলা প্রভৃতি মহারাজের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত সামগ্রীগুলি আজিও কুঞ্জঘাটা রাজবাটীতেই রক্ষিত হইতেছে ; কুঞ্জঘাটার বর্ত্তমান কুমার এখনও বৎসরে ২।৪ চারি মাস ভদ্রপুরে আসিয়া অবস্থিতি করেন। ভদ্রপুর তাঁহারই অধিকারভুক্ত, নন্দকুমারের কুলপ্রথানুযায়ী দোল, দুর্গোৎসবাদি এখনও তিনিই নির্ব্বাহিত করিয়া আসিতেছেন। কেন পোষ্য পুত্রকে বংশধর বলে না নাকি ? 'ব্রজরাজ' যাঁহার সম্পাদিত কাগজে সমালোচনা করিবার অধিকার পাইয়া করকণ্ডূতি নিবারণ করিতেছেন, সেই মহারাজ জগদীন্দ্রনাথকে লোকে প্রাতস্মরণীয় মহারাণী ভবানীর বংশধর বলে নাকি ?

হেতমপুর রাজবংশের উপর সমালোচকপ্রবরের উষ্মা কিছু অধিক। কেবল তাহাই নহে, রাজবংশকে হীন প্রতিপন্ন করিবার জন্য মিথ্যারও আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 'ব্রজরাজ' লিখিতেছেন—"হেতমপুর রাজবংশ-তালিকায় দেখিতে পাই মুরলীধরের ঊর্দ্ধতন অষ্টম পুরুষের নাম রুদাই বা রুদ্র। টীকায় আছে পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধনির্ণয়-ধৃত শ্লোক, 'রুদ্রস্তু পৃথিবীপালে রাজশ্লোকস্থিতে রতঃ'। সুতরাং রুদাই বা রুদ্র

রাজা ছিলেন। আমি সম্বন্ধনির্ণয় বা তাহার ক্রোড়পত্রে কোথাও এই শ্লোক খুঁজিয়া পাই নাই।" সমালোচক খুঁজিয়া পান নাই। কিন্তু আমরা তাহাকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি "বিদ্যানিধির তৃতীয় সংস্করণ সম্বন্ধ নির্ণয় বিশেষকাণ্ড ৪৭৮ পৃষ্ঠায়—(ছান্দড় বংশে শিবলাল (বাৎস্য গোত্র) কৃপাদৃষ্টিপাত করুন, ১ম ছত্রেই) উক্ত শ্লোকটী দেখিতে পাইবেন। এখন পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন যে, তিনি সম্বন্ধ নির্ণয় কিরূপ খুঁজিয়াছেন !

হেতমপুর রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ রাধানাথ চক্রবর্ত্তী ঋণ করিয়াও জমিদারী খরিদ করিয়াছিলেন। তৎসম্বন্ধে শ্লেষ করিয়া সমালোচক লিখিতেছেন—"আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এই ধার করিয়া জমিদারী খরিদ কার্য্য অতি কঠিন।" কঠিন কি সহজ সে কথা অনাবশ্যক ; তবে ইহা খাঁটি সত্য। 'বীরভূম বিবরণে' রাধানাথের ঋণের তালিকা এবং ঋণদাতাগণের নাম দেওয়া আছে। রাজবাটীতে সেই পুরাতন তমস্সুকগুলি আজিও রহিয়াছে। ঋণের দায়ে রাধানাথ বাঙ্গালা ১২০৭ সালে আট ধন্না ও জুলিদপুর বিক্রয় করেন, তাহার নিদর্শনও দেখাইতে পারা যায়।

এ সম্বন্ধে আর অধিক লিখিয়া 'অর্ঘ্যে'র অধিক স্থান অধিকার করিতে চাহিনা। পাচনী ও লেথনাতে প্রভূত প্রভেদ, 'ব্রজরাজ' এই সার কথা বুঝিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবেন এবং মনে রাখিবেন যে, বিদ্বেষ বুদ্ধি লইয়া সমালোচনা করিলে তাহা ব্যর্থই হইয়া থাকে।

অর্ঘ্য

৮ম বর্ষ, ১০ম, ১১শ ও ১২শ সংখ্যা, মাঘ-ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩২৪

মুসলমান বৈষ্ণব কবির ধর্ম্মমত।

[শ্রীপ্রিয়লাল দাস, এম্-এ, বি-এল্]

শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল করিম সাহেব বলেন,—"মুসলমান হইয়া আলিরাজা প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিতা লিখিলেন কিরূপে, বলা যায় না। এ রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা আবশ্যক।" একেশ্বরবাদী মুসলমান বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল মন্ত্র রাধাকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধে কবিতা রচনা করিয়াছেন, একথা শুনিলে বাস্তবিক প্রথমটা চমকিয়া উঠিতে হয়। আলিরাজা প্রভৃতি লেখকগণ স্বধর্ম্মনিরত মুসলমান হইয়া যে প্রেমধর্ম্মের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন তাহার একটি প্রধান কারণ, তাঁহাদের প্রেমপ্রবণ হৃদয়ে কবিত্ব ছিল এবং তাঁহারা কাব্যাকারে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন। প্রেমিক কবির হৃদয় যে স্বভাবতঃই প্রেমের পক্ষপাতী, ইহা স্বীকার না করিলে মুসলমান কবির বৈষ্ণব কবিতা-রচনার রহস্য উন্মোচন করা যায় না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত খ্রীষ্টান হইয়াও "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" লিখিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম হইয়াও "ভানুসিংহের পদাবলী" রচনা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে অনেক পুরুষ ও মহিলা কবি বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী না হইয়াও রাধা-কৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক এমন অনেক কবিতা লিখিয়াছেন যে, সেগুলি পাঠ করিলে মোহিত হইতে হয়। বাঙ্গালী শাক্ত কবিও ত অনেকবার কৃষ্ণ-প্রেমের গান গাহিয়াছেন। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বৈষ্ণব না হইয়াও কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়াছিলেন। শৈব, শাক্ত, খৃষ্টান ও ব্রাহ্ম "বৈষ্ণব কবি"র ন্যায় মুসলমান "বৈষ্ণব কবি"ও সেই জন্য প্রেমধর্ম্মের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম মুসলমান বৈষ্ণব কবির গীতি-কবিতার বিষয় হইল কেন, ইহার উত্তর সমসাময়িক বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাসে পাওয়া যায়। কবির কাব্য যদি জাতীয়তার দর্পণস্বরূপ হয়, তাহা হইলে মুসলমান কবির পদাবলী যে বৈষ্ণবধর্ম্মের মাধুর্য্য রসে সিক্ত হইবে, ইহা বড় বেশী আশ্চর্য্যের কথা নহে। চৈতন্য-

প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্ম হিন্দু বৈষ্ণব কবির পদাবলীর সাহায্যে বাঙ্গালীর ভাষা ধর্ম্ম সাহিত্য আচার-ব্যবহার প্রভৃতি জাতীয়-জীবনের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কৃষ্ণ-প্রেমের সঞ্জীবনী সুধা সঞ্চারিত করিয়া বাঙ্গালা দেশে একটি নূতন জাতি গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিল। সেই চেষ্টার ফলে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম-বৈষম্য ভুলিয়া গিয়া প্রেমালিঙ্গনে নূতন ধর্ম্মের একীকরণ-শক্তির পরিচয় দিয়াছিল। মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদাবলী-রচনাকালে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে সদ্ভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহা ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, বাঙ্গালী মুসলমানের কবি-হৃদয় রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক সঙ্গীতে বাহির না হইয়া অন্য কোনও রূপ গীতি-কবিতায় বাহির হইলে তাহার গতি স্রোতের বিরুদ্ধে অতি অল্পদূর অগ্রসর হইত। ইহার প্রমাণ মুসলমান বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যেই পাওয়া যায়। দুই এক জন মুসলমান কবি হিন্দু শাক্ত কবির অনুকরণে যদিও শাক্ত ধর্ম্মবিষয়ক কবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু এই সকল কবিতার সংখ্যা খুব কম। তাহাদের রচিত বৈষ্ণব পদাবলীর সংখ্যাই সমধিক।

আলিরাজা, সৈয়দ মর্ত্তুজা, আলাওল প্রভৃতি মুসলমান কবিগণের অভ্যুদয়-কালে বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্যের যুগ প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিল। শ্রীচৈতন্য-দেবের উপাসক বৈষ্ণবগণ চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি চৈতন্য-সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থাদি পাঠ করিতে যখন ব্যস্ত, তখন কৃষ্ণপ্রেমের তরঙ্গ বঙ্গদেশে কতকটা মন্দীভূত হইয়া প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের উপাসনা-প্রণালীতে প্রবিষ্ট হইয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের নানা শাখা-উপশাখায় কৃষ্ণপ্রেমের সঙ্কীর্ণ স্রোত প্রবাহিত করিতেছিল। এই সময়কার বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ ও কৃষ্ণাবতার শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা বর্ণন করিয়া দুই একজন কবি সময়ে সময়ে বৈষ্ণবধর্ম্মের সঞ্জীবতা রক্ষা করিতেছিলেন। শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণব কাব্য-সাহিত্য ও ভাগবতের আশ্রয় লইয়া আপন আপন ধর্ম্ম-মতের পরিপোষক ব্যাখ্যা ও অর্থ সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলে অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু বৈষ্ণবগণ অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত গুরুর উপদেশ গ্রহণ করিয়া প্রেমধর্ম্মের এক নূতন যুগের অবতারণ করিয়াছিলেন। এই অশিক্ষিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্য-ভক্ত শিক্ষিত বৈষ্ণব সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্রীচৈতন্যদেব যদিও "পাঁচ জন পাঠানকে মন্ত্র দিয়া বৈষ্ণব করিয়াছিলেন", আর সেই জন্য "পাঠান বৈষ্ণব বলি হইল তাঁর খ্যাতি" এবং যদিও তিনি "নিজ ভক্ত কৈল যত ম্লেচ্ছ কাজি", কিন্তু তাঁহার তিরোভাবের পর শিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর

চৈতন্য-ভক্তগণ পাঠানের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে বিশেষ যত্নবান হন নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের পরে বঙ্গীয় মুসলমানগণের মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের যে প্রভাব দেখা যায় তাহার কারণ অশিক্ষিত হিন্দু বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া নিরক্ষর নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করিতে যত্ন ও চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। মুসলমান কবিগণ যখন বৈষ্ণব পদাবলী লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন সমাজের নিম্ন স্তরে হিন্দু ও মুসলমান সাম্যভাবে মিশিয়া গিয়াছে। এই নূতন হিন্দু মুসলমান সমাজের উপাস্য দেবতা সাম্প্রদায়িক গুরু। শ্রীকৃষ্ণ ও চৈতন্য এই অশিক্ষিত সমাজের বৈষ্ণব বা মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণের উপাস্য দেবতার আসন অধিকার করেন নাই। মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদাবলীর উপর কিন্তু অশিক্ষিত নূতন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গুরুপূজার প্রভাব স্পষ্ট দেখা যায়। কোনও মুসলমান বৈষ্ণব কবির পদাবলীতে শ্রীচৈতন্যদেবের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই। মুসলমান বৈষ্ণব কবিরা কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হইলেও তাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত ছিলেন না। অশিক্ষিত নব-প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ন্যায় মুসলমান বৈষ্ণব কবি অন্তরের সহিত গুরুকে ভক্তি করিতেন।

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, "কোন কোন স্থানের মহাশয় (গোস্বামী বা কর্ত্তা) মুসলমান; পরম ভক্ত হিন্দু শিষ্যেরাও গোপনে গোপনে গিয়া তাঁহার প্রসাদ ভোজন করিয়া আইসেন।" শ্রীযুক্ত কুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় 'নদীয়া-কাহিনী'তে লিখিয়াছেন যে, এই সম্প্রদায়ের "প্রবর্ত্তক আউল চাঁদের আদেশ অতি জ্ঞানগর্ভ ও সদুপদেশপূর্ণ।.........এই সম্প্রদায়ের বীজমন্ত্রের মূল সূত্র "গুরু সত্য।" আউলচাঁদ-প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তাভজা সম্প্রদায় ব্যতীত আরও অনেকগুলি নূতন সম্প্রদায়ের কথা "ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়" নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। সাহেবধনী নামে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের যিনি প্রবর্ত্তক তাঁহার একজন মুসলমান শিষ্য ছিল। এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের উপাসনার স্থানের নাম আসন। "প্রতি বৃহস্পতিবারে এই সম্প্রদায়ী অনেক লোক ঐ আসন-স্থানে সমাগত হইয়া পরমার্থ সাধন করে। তথায় তাহারা আপনাদের প্রস্তুত করা পরমান্ন এবং যবনাদি নানা জাতি-প্রদত্ত মানসিক ভোগের সামগ্রী আসনের নিকট নিবেদন করিয়া দিয়া নিবেদিত দ্রব্য পরস্পরের মুখে অর্পণ করে। ইহাকেই পরমার্থ সাধন কহে। ইহারা জাতিভেদ স্বীকার করে না; কি হিন্দু,

কি মুসলমান সকল জাতিকেই স্ব সম্প্রদায়ে নিবিষ্ট করে। হিন্দুদিগকে 'ক্লীং দীননাথ দীনবন্ধু' এবং মুসলমানদিগকে 'দীনদয়াল দীনবন্ধু' এই মন্ত্রে উপদেশ দিয়া থাকে।" কবিবর নাছির মহম্মদের একটি পদের ভণিতা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, তিনি এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন।

"কহে নাছির মহম্মদ তরিতে ভব-সিন্ধু।
প্রভু বিনে নাই মোর দীনদয়াল বন্ধু॥"

সুপ্রসিদ্ধ আউলিয়া বদর আলাম যে তাঁহার গুরু ছিলেন, সে কথা তিনি একটি পদে স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছেন।

"করুণা সাগর পীর বদর আলাম।
তরাও সঙ্কট হতে চরণ ভজিলাম॥"

কবিবর আলাওলের একটি পদের ধুয়া পাঠ করিয়া সন্দেহ হয় যে, তিনিও এই অসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবশ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

"দীনবন্ধু! কর পরিত্রাণ,
তুমি বিনে দুর্গতির গতি নাহি আন॥" ধু।

কবি আলিমদ্দিনের রাধা কৃষ্ণ-বিরহে শোক প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—

"হাহা প্রভু দীননাথ,
তুমি বিনে পরমাদ,
তুমি বিনে আঁধার বৃন্দাবন।"

সৈয়দ আইনদ্দিনের রাধা শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন,—"আমার কপাল মন্দ, কি করিলা এই দীননাথে।"

মুসলমান কবি নিজে যখন ভগবানকে ডাকিতেছেন, তখন তিনি তাঁহাকে 'দীন দয়াল', 'দীনবন্ধু' বলিতেছেন, তাহার কারণ কবি মুসলমান বৈষ্ণব। কবির নায়িকা রাধা হিন্দু, সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণ 'দীননাথ'। উদ্ধৃত পদগুলিতে কবির কথা হইতে ও সমসাময়িক বৈষ্ণব সমাজের ইতিহাস হইতে বেশ বুঝা যায় যে, মুসলমান কবিগণের মধ্যে অনেকে অসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণবদিগের দলভুক্ত ছিলেন। মলূকদাস কৃত একটি বৈষ্ণব-সঙ্গীতে "দীনবন্ধু দীননাথ" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

"দীনবন্ধু দীননাথ মেরে তন্ হেরিয়ে।
সোনেকা সোনৈয়া নহিঁ, রূপেকা রূপৈয়া নহিঁ॥"

ইত্যাদি

(হে দীনবন্ধু দীননাথ, আমার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। আমার সোনার মোহর নাই, রূপার টাকাও নাই।) ইত্যাদি।

অনেক মুসলমান কবি ভগবানকে 'নাথ' এই শব্দে অভিহিত করিয়াছেন।

"কি বুদ্ধি করিমু নাথ, না দেখি উপায়!"

(সৈয়দ নাছিরদ্দিন)

"দিনে দিনে আইসে নাথ, আমার বাড়ীর খবর।
কি লৈয়া যাইমু আমি, আমার শূন্য দুটি কর॥"

(নাছির মহম্মদ)

এই পদটির প্রতিধ্বনি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'র কোনও কোনও গানে শুনা যায়। নাছির মহম্মদ 'নাথ' এই শব্দটি উদ্ধৃত ধুয়ার পর অনেকবার ব্যবহার করিয়াছেন।

"নাথ রে, বণিজ্জ কারণে আইলুম না বুঝিলুঁ ভাও।
শুকাইল যমুনার জল, চড়ে লাগিল নাও॥
নাথ রে, স্থল নাই, কূল নাই, ধরিবার ঠাঁই।
বল বুদ্ধি হারাই আমি ভাসিয়া বেড়াই॥"

কবির উক্তি ছাড়া মুসলমান বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধা অনেক স্থানে শ্রীকৃষ্ণকে 'নাথ' অর্থাৎ ঈশ্বর বলিয়া ডাকিয়াছেন। মুসলমান কবি নিজেও রাধার মুখ দিয়া ভগবানকে যে বার বার 'প্রভু' ও 'নাথ' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন তাহার কারণ বোধ হয় এই শব্দ দুইটিতে সাকার ঈশ্বরের ভাব মনোমধ্যে উদিত হয় না এবং সেই কারণে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী এই শব্দ দুইটি ব্যবহার করিলে তাঁহার সংস্কার বা ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালী খ্রীষ্টান ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বিগণ, এমন কি প্রায় সকল নিরাকার ঈশ্বরের উপাসকগণের ধর্ম্মসঙ্গীতে ভগবানকে 'প্রভু' ও 'নাথ' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়া থাকে। ইঁহারা সকলেই মূর্ত্তিপূজার বিরোধী। মুসলমান কবির 'নাথ' যে বৈষ্ণব-মন্ত্র 'দীননাথ' হইতে গৃহীত তাহা অনুমান করিবার আর একটি কারণ আছে। উক্ত মন্ত্রের 'দীননাথ' প্রভৃতি শব্দের 'দীন' এই বিশেষণের প্রতিশব্দ 'হীন' এই বিশেষণে প্রায় সকল মুসলমান কবিই নিজেকে বিশেষিত করিয়াছেন। কবিবর আলিরাজা নিজেকে "খাকী" অর্থাৎ "মৃত্তিকা-গঠিত" এই বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। রামানন্দ সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত "খাকী" নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা "গাত্রে বা পরিধেয় বস্ত্রে মৃত্তিকা ও

ভস্ম বিলেপন করে।" 'দীন দয়াল' শব্দের 'দয়া'র উল্লেখ সৈয়দ নছিরদ্দিন এক স্থানে করিয়াছেন।

"অন্তরে আগুণি, বাহিরে আগুণি,
আগুণি এ দশ দিশ।
নাছিরদ্দিনে এ, মিনতি ভণএ,
দয়া না ছাড়িও শেষ॥"

"নাথে"র ন্যায় 'প্রভু'ও অসাম্প্রদায়িক শব্দ এবং ইহার ব্যবহার মুসলমান কবি অনেক স্থানে করিয়াছেন। রাধাকে শান্ত করিবার জন্য সৈয়দ আইনদ্দিন বলিয়াছেন,—

"কহে সৈয়দ আইনদ্দিনে মন কর শান্ত।
এক চিত্তে প্রভু ভাব মিলাইব কান্ত॥"

অন্যত্র,

"বনবাসী পাখী সবে বিপিনে থাকিয়া।
জপএ প্রভুর নাম প্রভাতে জাগিয়া॥"

নাছির মহম্মদেরও ঐ কথা। "কে বুঝিতে পারে প্রভু তোমার মহিমা।"

"কহে নাছির মহম্মদে পিয়া নহে দূরে।
ভাব প্রভু পাইবা ধনি নিজ অন্তঃপুরে॥"

অন্যত্র,

"কহে নাছির মহম্মদে, ভজ ধনি প্রভু পদে,
তবে পাইবা কানুর উদ্দেশ।"

গুরুপূজা সম্বন্ধে, "এবাদুল্লা কহে ধনী ভজ গুরুপদ।" "গুরু" শব্দটি সকল মুসলমান কবি বারম্বার ব্যবহার করিয়াছেন। মুসলমান কবিরা বৈষ্ণব কবিতা লিখিলেন কিরূপে তাহার অনেকটা আভাস উপরোক্ত শব্দগুলির প্রয়োগ হইতে বুঝা যায়। তাঁহারা স্বধর্ম্মনিরত মুসলমান হইয়াও হিন্দু বৈষ্ণবগণের যে ধর্ম্ম-ভ্রাতা ছিলেন তাহার সন্দেহ নাই। দরবেশ নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্ম্ম-সঙ্গীতে প্রকাশ—,

"কেয়া হিন্দু কেয়া মুসলমান।
মিল্ জুলকে কর সাঁইজীকা কাম॥"

সাঁই নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায় "মুসলমান ম্লেচ্ছ প্রভৃতি সকলেরই অন্ন ভোজন করে।" সাধ্বনী নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায় "কি হিন্দু, কি ম্লেচ্ছ সকল জাতির

অন্ন গ্রহণ করে।" "খুশি বিশ্বাস নামে এক মুসলমান 'খুশি বিশ্বাসী' নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। ইহারা খুশি বিশ্বাসকে চৈতন্য প্রভুর অবতার-স্বরূপ জ্ঞান করে।" "হজরৎ, গোবরা, পাগলনাথ, এই তিন জন মুসলমান কর্ত্তৃক কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন তিনটি সম্প্রদায় সংস্থাপিত হয়। তাহাদেরই নাম হজরতী, গোবরাই ও পাগলনাথী।"

উপরোক্ত বৈষ্ণবধর্ম্মের শাখা উপশাখার কোনও সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ নাই। বিগ্রহ-সেবাও ইহারা করে না, কিন্তু সকলেই গুরুভক্ত। সাম্প্রদায়িক সঙ্গীত সকলে মিলিয়া করে। এই সকল জাতিভেদ-জ্ঞানবিবর্জ্জিত অসাম্প্রদায়িক হিন্দু বৈষ্ণবগণের সহিত মুসলমান বৈষ্ণব কবির সঙ্গীতপ্রিয়তা, গুরুভক্তি, নিরাকার ঈশ্বরে বিশ্বাস, সাকার পূজার বিরোধিতা, শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে নিস্তব্ধতা, এতগুলি বিষয়ে সম্পূর্ণ ঐক্য আছে দেখা যায়। হিন্দু গুরুর ন্যায় মুসলমান গুরুও যখন হিন্দু ও মুসলমান শিষ্যের মন্ত্রদাতা, তখন মুসলমান কবি যে কেবল বৈষ্ণব কবিতা লিখিয়া 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' হইয়াছেন, এঁকথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। মুসলমান কবিগণ যে প্রকাণ্ড বৈষ্ণব সমাজের একটি সুবিস্তীর্ণ আদর্শ প্রেমভাব তাহাদের রচিত পদাবলীতে প্রতিফলিত করিয়াছেন তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু এইখানেই তাঁহাদের কার্য্য শেষ হয় নাই। শ্রীচৈতন্যভক্ত উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত হিন্দু বৈষ্ণবগণের সহিত যেমন তাঁহাদের মেশামেশি ছিল না, তেমনি যে সকল বৈষ্ণব পদাবলী ও কাব্যগ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের নামোল্লেখ নাই, কেবল রাধা কৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলি তাঁহারা যে উত্তমরূপে অভ্যাস করিতেন তাহা তাঁহাদের রচিত পদাবলীর বাহ্যাবরণ, ভণিতা ও ভাষা এবং প্রেমভাব ও রাধা কৃষ্ণের লীলবর্ণনা হইতে সুস্পষ্ট বুঝা যায়। মুসলমান কবিগণ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যের উপাসনা-সংক্রান্ত যাহা কিছু তৎসমুদয় এবং চৈতন্য-সাহিত্য বাদ দিয়া বৈষ্ণব জগতের বাকী প্রায় সমস্তটা নিজেদের করিয়া লইয়াছিলেন। সেই জন্য এক দিকে যেমন সমাজের নিম্নস্তরে হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃত্বের পরিচয় তাহাদের পদাবলীতে পাওয়া যায়, তেমনি আবার রাধাকৃষ্ণের স্বর্গীয় প্রেমের আস্বাদও পাওয়া যায়। মুসলমান কবির সঙ্গীতপ্রিয়তা প্রভৃতি উল্লিখিত বিশেষত্বের কথা চিন্তা করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, সঙ্গীতপ্রিয় মুসলমান কবিরা স্বধর্ম্মে থাকিয়াও হিন্দু ও মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালায় রচিত বৈষ্ণব পদকর্ত্তাগণের গীতি-কবিতার গীতি-সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া হিন্দু-পাঠান-মিলনের সমকালে বঙ্গভাষার আলোচনা করিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক বৈষ্ণব কাব্যসাহিত্যের

দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমান বা অসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া তাঁহাদের রচিত পদাবলীতে গুরুর গুণকীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সংসারবিরাগী ছিলেন এবং তাঁহারা অপরকে উপদেশ দান করিয়া নিজেরাই গুরুর পদে আসীন ছিলেন। শ্রীচৈতন্যকে তাঁহারা উপাস্য দেবতা বলিয়া স্বীকার করেন নাই; কিন্তু প্রত্যক্ষ দেবতা ধর্ম্মোপদেষ্টা গুরুকেই উপাসনাক্ষেত্রে প্রাধান্য দিয়াছেন।

যদিও তর্কচ্ছলে বলা যায় যে, মুসলমান কবিরা বৈষ্ণব ছিলেন না, তাহা হইলেও উল্লিখিত হিন্দু মুসলমান বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অসাম্প্রদায়িকতা ও সাম্যভাব এত প্রবল ছিল যে, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, মুসলমান কবিরা তাঁহাদের দৃষ্টান্তে মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং শিক্ষার সাহায্যে বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল মন্ত্র প্রেমের বিশেষভাবে চর্চ্চা করিয়াছিলেন। ইহার ফলে তাঁহারা রাধাকৃষ্ণের স্বর্গীয় প্রেমের আদর্শ অনুসরণ করিয়া অসাম্প্রদায়িক প্রেমধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে সাম্প্রদায়িকতা নাই। ইহাতে শ্রীচৈতন্য বা অপর কোনও মহাপুরুষের উপাসনা আবশ্যক হয় না। এই প্রেমধর্ম্ম প্রাচীন বৈষ্ণব গীতি-কবিতায় মুখরিত। ইহার আদর্শে শ্রীচৈতন্যদেবের উদার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গঠিত। এই প্রেমধর্ম্ম হিন্দু ও মুসলমানকে দুইটি বিভিন্ন পর্য্যায়ে বসাইয়া দেয় না। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং এই উদার প্রেমধর্ম্ম প্রচার করিয়া হিন্দু মুসলমানকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমাজে যতটুকু সদ্ভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা এই প্রেমের আকর্ষণে। এই সকল কারণে মুসলমান কবিরা ভেদজ্ঞানশূন্য কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই প্রেমের মাধুর্য্যভাবে যে এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে তদ্দ্বারা তাঁহাদের হৃদয় মন উদার ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হইয়াছিল। এই প্রেমের চর্চ্চা করিয়া, ইহার দৃষ্টান্ত সমসাময়িক বৈষ্ণব সমাজে দেখিয়া তাঁহারা কৃষ্ণপ্রেমে মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্ম্মে প্রেমের উৎস শ্রীকৃষ্ণ। মুসলমান কবি-প্রতিভার বলে মূলের দিকে লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়াছেন। সৈয়দ মর্ত্তুজা বলেন, ভগবান এক। তিনি কৃষ্ণ রাধা মুরলীরূপে ব্যক্ত। সৈয়দ মর্ত্তুজা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই মোটামুটি সকল প্রেমিক মুসলমান কবির ধর্ম্মমত।

"সই, এক বিনে মাওলা, (১)
এক বিনে আর নাহি কোই। ধু।

---

(১) "মাওলা—ঈশ্বর।"

আপে হরে আপে রাখে সখি,
মাওলা আপে করে কেলি।
আনন্দমোহন মাওলা খেলএ ধামালী॥
আপে মন আপে তন আপে মন হরি।
আপে কানু আপে রাধা আপে সে মুররী॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে সখি, মাওলা গোপতের হীন। (২)
পুরান পিরীতখানি ভাবিলে নবীন॥"

বৈষ্ণবধর্ম্মের সার তত্ত্ব মুসলমান কবি কেমন সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছেন! মুসলমান কবি যথার্থ বৈষ্ণবধর্ম্মের উন্নত আদর্শ অনুসারে নিজের ধর্ম্মমত গঠিত করিয়াছিলেন। মুসলমান কবির ধর্ম্মমত সঙ্কীর্ণতা-দোষে দুষ্ট ছিল না। গোঁড়ামি এবং বিদ্বেষ বলিয়া কোনও জিনিষ আমরা মুসলমান কবিতে দেখিতে পাই না। প্রতিভা ও শিক্ষার সাহায্যে মুসলমান কবি বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও অসাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব সমাজের বিশুদ্ধ প্রেমভাব নিজের ধর্ম্ম ও গুরুর উপদেশের সহিত মিলাইয়া যে উদার ধর্ম্মমত গঠিত করিয়াছিলেন, তাহার সুস্পষ্ট আভাস তাঁহার রচিত পদাবলীতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে তখনও প্রেমধর্ম্মের সুবাতাস বহিতেছিল। মুসলমান কবির ধর্ম্মজীবন প্রেমের প্রভাব উপেক্ষা করিতে পারে নাই। সেই জন্য কৃষ্ণপ্রেমের সুমধুর আহ্বানে তাহার উদার কবি-হৃদয় পদাবলীর ভিতর দিয়া বাহির হইয়াছে।

(২) "গোপতের হীন—গোপন-হীন অর্থাৎ স্পষ্ট অভিব্যক্ত।"

হত্যাকারী।

[শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার]

(৫)

এখন আর কি কর্‌বার আছে?—হাঁ, আমার যা' কিছু নিদর্শন এখানে আছে তা' ত এখনই এখান থেকে সরা'তে হ'বে।—দেখি,—ঘরে যাই।

তখন দেওয়ালগিরির বাতিটা শেষ সীমায় এসে ঠেকেছিল। চাবিগুলো এখন কোথায় রাখত? আগে ত সেগুলো এই ছোট হাতবাক্সটায় থাকৃত—এখনও কি সেগুলো ঐ বাক্সতেই রাখত—কই দেখি—তাই ত বটে!—যাক্, বেশী আর খুঁজতে হ'ল না।

চাবির তোড়াটা বা'র করে সমস্ত দেরাজ, আলমারি, বাক্স, সিন্দুক খুলে তন্ন তন্ন করে দেখলাম, আমার যা কিছু নিদর্শন, যা কিছু আমার সন্ধানের সাহায্য কর্‌তে পারে তা ত সবই সংগ্রহ করে নিলাম—আংটি, চার্ম, ফোটো, চিঠি, আমার নামাঙ্কিত মাথার চিরুণী, লকেট, আমার নামের আদ্যক্ষর-খোদিত একছড়া নেকলেস—সবগুলি আমার কোটের বড় বড় পকেটগুলিতে বোঝাই কর্‌লাম। চিঠিগুলি মিলিয়ে দেখলাম—শেষ পত্রখানি পর্য্যন্ত মিলে গেল। তিন খানা ছোট বাংলা নবেল একখানা আমার অটোগ্রাফযুক্ত ফোটো—সবগুলি বেশ গুছিয়ে আমার পকেটগুলার মধ্যে পূরলাম, কোটটা বেশ দোরস্ত করে নিলাম যাতে কেউ যেন দেখে না বুঝতে পারে যে, আমার জামার পকেটগুলা একটুও অসাধারণভাবে স্ফীত হয়ে রয়েছে।

কিন্তু আর একটা কাজও কর্‌তে হবে। পুলিশ যেন না জান্‌তে পারে যে, এটা একটা তীব্র প্রতিহিংসার পূর্ণাহুতি।—তাদের মনে ধারণা করিয়ে দিতে হবে যে, এটা একটা ভয়ানক দস্যুবৃত্তির ফল ভিন্ন আর কিছুই নয়। সিন্দুকটা আবার খুলে ফেল্‌লাম। ভিতর থেকে ক্যাস বাক্সটা টেনে বার করে চাবি খুলে নোট, টাকা আর সিন্দুকের দেরাজটা খুলে তার ভিতর থেকে গহনাগুলি নিয়ে, আল্‌না থেকে একখানা কাপড় নিয়ে তার সাদা খুটে বেঁধে, কোটটা তুলে কাপড়খানা মাল সমেত আমার কোমরে জড়িয়ে নিলাম। বাক্স, দেরাজ, আল্‌মারি, সিন্দুক তেম্‌নিই খোলা পড়ে রইল। আর কিছু আছে কি? না—আর যা রইল তা'তে আমার সন্ধান হতে পারবে না। না—আর কিছু নেই। ধরা কি পড়ব? কি জানি? না, ধরা ত কখনও দেব না। যবনিকা তা'র

পূর্ব্বেই ফেলে দেব! কোটের ভিতরকার পকেটটায় হাত দিয়ে দেখলাম রিভলভারটা ঠিক আছে।

ততক্ষণ দেওয়ালগিরির বাতিটা শেষ হয়ে গেছে, শুধু আমার হাতের ইলেকৃট্রিক টর্চের আলোর অনুসন্ধান শেষ করে নিচ্চি। আর একবার সব তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম—আর কিছু বিশেষ প্রামাণ্য এখানে থাকৃতে পারে কি না তা স্মরণ করবার চেষ্টা করলাম—কই মনে ত কিছু হয় না—না—আর কিছু নেই। ওহো আর একটা কাজ বাকী আছে যে চুরি প্রমাণ করতে গেলে যে এর গায়ের গহনাগুলোও নিতে হবে—তাই ত ওদিকে যে চেয়ে দেখতে আর আমার সাহস হচ্চে না—ওঃ—কি রক্ত বেরুচ্চে—ঘর যে থই থই করচে—না গহনাগুলো খুলে নিতেই হবে—নইলে চুরির উদ্দেশ্যে যে খুন এটা প্রমাণ হবে কি করে? আর এটা হ'লে আমাকে কেউ সন্দেহ করতে পারবে না—সহরের একজন এত বড় ধনী যে চুরি বা ডাকাতির উদ্দেশ্য খুন করেছে একথা কে বলবে? বললেই বা বিশ্বাস করবে কে? প্রমাণ কি? যা হোক এর গা থেকে গহনাগুলো খুলে নিতেই হবে। কিন্তু গায়ে এমন গহনা আছে যাতে আমার সন্ধান বলে দিতে পারে? ক্লোরোফর্ম করে ত তাকে বেশ করে দেখেছিলাম। আঃ ভুলে যাচ্চি যে! এটা পুলিশের চোখে যে ধূলা দিতে হবে—তারা এই ডাকাত ধরবার জন্য ঘুরে মরুক না। কিন্তু তা না করলেও ত আমাকে ধরতে পারা সহজ হবে না। না এর ভিতর আর কিন্তু নেই—এটা করতেই হবে।

উপরের দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা চেপে ধরে বিছানার দিকে অগ্রসর হলাম। শবের আচ্ছাদনগুলো ধীরে ধীরে সরিয়ে ফেললাম। আস্তে আস্তে তার হাত দুটো থেকে তার চুড়ী, তাগা, বালা খুলে নিলাম, কান দুটা থেকে দুটো হীরে-বসান ইয়ারিং ছিঁড়ে নিলাম—মাথাটা বালিস থেকে গড়িয়ে এসে বিছানার উপুড় হয়ে পড়ল। আলোটা ধরে ছিন্নমস্তা দেহটা ও স্কন্ধবিচ্যুত মাথাটা ভাল করে একবার দেখে নিলুম। না আর কিছু নেই—দেখি দেখি ও দুটো আবার কি? মাথার কাঁটায় আমার নাম লেখা না? তাই ত ভাগ্যে দেখলাম! সোনার কাঁটা দুটো খুলে পকেটে রাখলাম—আর কিছু আছে কি? মনে ত হয় না! আর থাকলেই বা! আমার নাম অনেকের আছে। এ বাড়ীর এখনকার ঝি আমায় জানে না। আর তার পর যদি ধরা পড়বার সম্ভব দেখি, তা'হলে প্রদীপ নিভিয়ে দেব সে সাহস আছে—কিসেরই বা মায়া আমার

জীবনের উপর! এর ত চূড়ান্তই দেখে নিয়েছি; মানুষকে বেশ চিনেছি; স্বদেশে বিদেশে—সব জায়গায় মানুষের সঙ্গে প্রাণ ঢেলে মিশেছি—এমন করে পরকে আপন ক'রে মেশবার অবকাশ বোধ হয় অনেকের হয় নি। দেখেছি কি? নীচ স্বার্থপরতা—সঙ্কীর্ণ আত্মত্ব—নির্লজ্জ শঠতা—পশুপ্রবৃত্তির তাড়না এই সকল উপাদান দিয়ে মানুষ গঠিত হয়েছে। মানুষের উচ্চ প্রবৃত্তির কথা—প্রেম-দয়ার কথা স্নেহ-প্রীতির কথা পরার্থপরতার কথা—ত্যাগের কথা সব ভণ্ডামি—সব ধাপ্পাবাজী—সব জুয়াচুরি। আপনার বীভৎস নগ্নতা ঢাকা দেবার জন্য কেবল কতকগুলো বড় বড় শব্দের একটা স্বচ্ছ আবরণ প্রস্তুত করেছে মাত্র।

তখনও রক্ত বেরুচ্চে; বিছানা লাল হয়ে গেছে; ঘরের মেঝেতে পড়ে গড়িয়ে যাচ্চে। কি যেন অজানা ভয় আমার হৃদয়টাকে চেপে ধর্‌ল, আমি আর সে দিকে চেয়ে থাক্‌তে পার্‌লুম না, চোখ ফিরিয়ে নিলুম।

আমার হাত দুটোতে আবার খানিকটা রক্ত লেগে গিয়েছিল—যাই ধুয়ে নি। স্নানের ঘরে গিয়ে কলে হাত ধুয়ে বারেণ্ডার রেলিং থেকে তোয়ালেখানা নিয়ে হাত দুটো মুছে ফেল্‌লাম।

ওটা কিসের শব্দ হ'ল? কেউ আস্‌ছে না কি? ওই যে ওই খস্‌-খস্‌-খস্‌? তাই ত দেখতে হ'ল। পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে, ক্লিকটা খুলে হাতে করে ধরে প্রস্তুত হলাম। ওই যে—আবার সেই শব্দ—সেই খস্‌-খস্‌-খস্‌। দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম—বাঁ হাতের ল্যাম্পটা বন্ধ করতে সময় হ'ল না। বারাণ্ডায় এসে দেখলাম একটা বিড়াল পালিয়ে গেল। একটু সুস্থির হলাম। কিন্তু আর অপেক্ষা করা হবে না। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। নীচে এসে সদর দরজার পাশে এসে দাঁড়ালাম, রিভলভারে আবার ক্লিকটা এঁটে দিয়ে পকেটে রেখে হাতের টর্চের সুইচটা বন্ধ করে দিলাম। দরজা যেমন বন্ধ করা ছিল তেমনই আছে। নীচে পাশের ঘরটায় একবার গেলাম; ঐ সরু গলির দিকের যে জানালাটা দিয়ে আমি বাড়ীতে ঢুকেছিলাম সেটা একবার ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলাম—হাঁ বেশ বন্ধ আছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সদর দরজার চাবির ছেঁদা দিয়ে দেখলাম রাস্তায় বড় জনসমাগমের চিহ্ন নেই—না সদর দরজা দিয়ে বেরুতে আমার আপত্তি আছে; যদি কেউ এসে পড়ে—যদি দেখতে পায়—না এদিক দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বড় সুবিধা নয়। ওই জানালা দিয়েই বেরিয়ে যেতে হবে।

ঘরের ভিতর গিয়ে জানালাটা খুলতে অগ্রসর হলাম; রাস্তার গ্যাসের আলোয় ঘরের অন্ধকারটা একটু তরল করে তুলেছিল। একটা কাল বিড়াল আর্ত্তস্বরে মেও মেও করতে করতে বেরিয়ে গেল। জানোয়ারটা কখন এ ঘরে ঢুকেছিল? তার উজ্জ্বল তারার মত চোক দুটো অন্ধকারে আমার দিকে লক্ষ্য করে জ্বলছিল। যেন মৃতের প্রেতাত্মা তার সকল বিষাদ, আক্ষেপ, অনুযোগ ও তিরস্কার এই বিড়ালটার অগ্নিময় দৃষ্টিতে ও করুণ ক্রন্দনরোলে ব্যক্ত করছিল। প্রাণটা যেন একটু বিচলিত হল। বিড়ালটাকে একটা তাড়া দিলাম সে উপরের বারাণ্ডায় গিয়ে তেমনই আর্ত্তস্বরে চেঁচাতে লাগল।

জানালা খুলে হাতের আলো দিয়ে একবার গলিটা দেখে নিলাম—কেউ কোথায় নেই—কেবল একটা রাস্তার কুকুর বোধ হয় তার বিশ্রামের ব্যাঘাত অনুভব করে গোঁ গোঁ করতে করতে ছুটে গলি থেকে বেরিয়ে গেল, তার পরই বড় রাস্তায় সারমেয়-সঙ্ঘের কলরব শুনতে পেলাম. কেঁউ কেঁউ—খেঁউ খেঁউ—ঘেউ ঘেউ; ক্রমে স্বরগ্রাম নেবে গেল—ক্রমে আবার সব নীরব হইল।

আমি আলোটা নিভিয়ে জানালা দিয়ে গলির মধ্যে নেমে পড়লুম।

(ক্রমশঃ)

পৌরাণিক হেড়ম্বরাজ্য।

[শ্রীমহেন্দ্রনাথ কাব্যসাংখ্যতীর্থ]

মহাভারতের আদি পর্ব্বের ১৪১ অধ্যায় হইতে ১৫৬ অধ্যায় অর্থাৎ জতুগৃহ-দাহ পর্ব্ব ও হিড়িম্ব বধ পাঠে জানা যায় যে, কৌরববংশীয়দের রাজধানী হস্তিনার সম্ভবতঃ উত্তর-পূর্ব্বে ভাগীরথীর পূর্ব্বদিকে বারণাবত নগর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত বারণাবত নগরেই দুর্য্যোধন লাক্ষাময় গৃহে গোপনে পাণ্ডবগণকে দহন করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। বিদুরের প্রেরিত খনকের দ্বারা সুড়ঙ্গ পথ প্রস্তুত করাইয়া পাণ্ডবেরা তথা হইতে বাহির হইয়া বনপথে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হন। বিদুর গঙ্গায়ও তাঁহাদের জন্য একখানা নৌকা রাখিয়াছিলেন। পাণ্ডব-

গণ এই নৌকায় তাড়াতাড়ি গঙ্গা পার হইয়া নক্ষত্রদর্শনে দিঙ্‌নির্ণয়ক্রমে এই রাত্রেই দক্ষিণাভিমুখে বনপথে পলায়ন করেন। রাত্রি অতীত হইলেও অবি-শ্রান্ত ভাবে পথ চলিতে চলিতে পরদিন সন্ধ্যার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে হিড়িম্ব রাক্ষসের অধিকারভুক্ত বনে উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় হিড়িম্বের ভগিনী হিড়িম্বার সহিত ভীমসেনের দেখা হয়, এবং ভীমের রূপে মুগ্ধ হইয়া রাক্ষস-ভগিনী তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিতে অভিলাষিণী হইলেন। এদিকে ভগিনীর বিলম্ব দেখিয়া নরমাংসলোলুপ হিড়িম্ব রাক্ষস স্বয়ংই পাণ্ডবগণকে সংহার করিতে আসে, পরে ভীমের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

তাহার পর যুধিষ্ঠির ও কুন্তীর অনুজ্ঞায় ভীমসেন হিড়িম্বাকে বিবাহ করেন। বিবাহকালে হিড়িম্বার সহিত ভীমসেনের কথা হয় যে, পুত্র উৎপাদনের পর আর তিনি হিড়িম্বার সহিত কোনও সম্পর্ক রাখিবেন না।

হিড়িম্বা ভীমকে লইয়া ব্যোমপথে দিবাভাগে নানা দেশ, নানা বন-উপবন, হিমালয় পর্ব্বত, মানস সরোবর প্রভৃতি নানা স্থানে বিহার করিয়া রাত্রিকালে পুনর্ব্বার যুধিষ্ঠিরাদির নিকট উপস্থিত হইতেন। এইরূপ কিছুদিন অতিক্রান্ত হইলে হিড়িম্বা গর্ভিণী হইয়া পুত্র-প্রসব করিলেন। পুত্রটী সদ্যই বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

পুত্রের নাম ছিল ঘটোৎকচ। ঘটোৎকচ আসুর বল-প্রভাবে সদ্য বর্দ্ধিত হইয়া, পিতামহী কুন্তীদেবী ও জ্যেষ্ঠতাত যুধিষ্ঠিরের নিকট উপস্থিত হইলে কুন্তী বলিলেন, "যখন প্রয়োজন হইবে তখন তুমি পাণ্ডবগণের সাহায্য করিও।" ঘটোৎকচ কুন্তীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন। হিড়িম্বা রাক্ষসী "স্বাংগতিং প্রত্যপদ্যত" পুনর্ব্বার স্বকীয় স্থানে গমন করি-লেন।

বনপর্ব্বের ২৯ ও ৩০ অধ্যায়ে আর একবার ঘটোৎকচের বিবরণ পাওয়া যায়। পাণ্ডবগণ যখন তীর্থযাত্রা-ব্যপদেশে গন্ধমাদন পর্ব্বতে গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন; তৎকালে কোমলাঙ্গী পাঞ্চাল-নন্দিনী পাদচারে পর্ব্বতারোহণে অশক্তা; অমনি ভীমসেন ঘটোৎকচকে ডাকিলেন। ঘটোৎকচ অনেকগুলি অনুচর রাক্ষসসহ পাণ্ডবগণ ও তাহাদের সহযাত্রী ব্রাহ্মণগণকে স্কন্ধে করিয়া অতি দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে বহন করিয়া চলিলেন।

তৃতীয়বার ঘটোৎকচকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে দেখিতে পাওয়া যায়।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে, এই মহাভারত-প্রসিদ্ধ হিড়িম্ব রাক্ষস বা তদীয়

ভগিনী হিড়িম্বার সহিত যদি হেড়ম্ব রাজ্যের কোনও সংস্রব থাকে তবে সেই হেড়ম্ব রাজ্য কোন স্থানে অবস্থিত ?

হিড়িম্ব রাক্ষসের অধ্যুষিত স্থান যদি হেড়ম্ব রাজ্য হয় তবে তাহা হস্তিনা-নগরের অদূরে ভাগীরথীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত বুঝিতে হইবে। কেন না পাণ্ডবগণ জতুগৃহ হইতে নিশীথে বহির্গত হইয়া তাড়াতাড়ি গঙ্গা উত্তরণ পূর্ব্বক ঐ রাত্রিতেই নক্ষত্র-দর্শনে দিক্ নির্ণয় করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করেন এবং এই অজ্ঞাত অপরিচিত বনপথে পরদিন সায়াহ্নে হিড়িম্বের অধিকারে উপস্থিত হন।

হিড়িম্বা ভীমসেনকে তাহাদের বসতি স্থানের এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন—

যদেতৎ পশ্যসি বনং নীলমেঘনিভং মহৎ।
নিবাসো রাক্ষসস্যৈষ হিড়িম্বস্য মমৈবচ ॥

১৫৪ অঃ আদিপর্ব্ব।

এই যে অদূরে নীল মেঘ শ্যাম গহন বন দেখিতেছ ইহাই হিড়িম্ব রাক্ষস ও আমার বাসস্থান। বিশেষতঃ হিড়িম্ববধের পর অর্জ্জুন ভীমসেনকে বলিয়াছিলেন—

ন দূরং নগরং মন্যে বনাদস্মাদহং বিভো।
শীঘ্রং গচ্ছামো ভদ্রং তেন নো বিদ্যাৎ—সুযোধনঃ ॥ ৩৫

১৫৪ অঃ আদিপর্ব্ব।

আমার বোধ হয়, এই বন হইতে হস্তিনা নগর দূরে নহে, অতএব আমরা শীঘ্র এ স্থান হইতে চলিয়া যাই। তাহা হইলেই দুর্য্যোধন আমাদিগকে জানিতে পারিবে না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, হিড়িম্ব রাক্ষসের রাজ্য দিল্লীর কিঞ্চিদ্দক্ষিণে অবস্থিত হইবে। পাণ্ডবগণ হিড়িম্বের বনের পর নানা বন পরিভ্রমণ করিয়া মৎস্য ও পাঞ্চাল দেশের নিকট দিয়া "একচক্রা" নগরে চলিয়া যান। ইহাতেও হিড়িম্বের বন যে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

ভীমপত্নী হিড়িম্বা বা তৎপুত্র ঘটোৎকচ হইতে হেড়ম্ব রাজ্যের পত্তন হইয়াছিল, এইরূপ সিদ্ধান্তও সহজ নহে। মহাভারতে প্রকাশ, ঘটোৎকচ উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছিল এবং তীর্থযাত্রাকালে নিজ অনুচর রাক্ষসগণসহ গন্ধমাদন আরোহণে পাণ্ডবদের সাহায্য করিয়াছিলেন। ভীমসেন পর্ব্বতারোহণ-কালে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, "এই পর্ব্বত রাক্ষসে পরিপূর্ণ, এই বনে আপনাকে যাইতে দেওয়া হইবে না।" ইহার পরেই ঘটোৎকচের সহিত

দেখা, ইহাতেও বুঝা যায় ঘটোৎকচ হিমালয় পর্ব্বতের কোনও এক স্থানে রাক্ষসে পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতেন। ইহার কয়েক বৎসর পরেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ঘটোৎকচের মৃত্যু হয়।

হিড়িম্বা ঘটোৎকচকে প্রসব করিয়া (স্বাংগতিং প্রত্যপদ্যত) স্বীয় গতি লাভ করিয়াছেন। তবে কি হিড়িম্বা তাহার পূর্ব্বকথিত নীলমেঘনিভ বনে চলিয়া গিয়াছিলেন? অথবা স্বাংগতিং শব্দের অর্থ ভীমের সহবাসার্থ যে রমণীয় মানুষরূপ ধারণ করিয়াছিলেন তাহা ছাড়িয়া পুনর্ব্বার রাক্ষসভাব প্রাপ্ত হইলেন। সে যাহাই হউক হিড়িম্বা যে পরে কোনও স্থানে কোনও রূপ রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তেমন কোনও বিবরণ মহাভারতে দৃষ্ট হয় না।

মহাভারতের সভাপর্ব্বের ৩১ অধ্যায়ে হেরম্বক নামে এক রাজ্যের বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, "হেড়ম্ব রাজ্য" ইহারই নামান্তর কি না বলা সহজ নহে। সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে "ড" ও "ল" এই দুই বর্ণের অনেক স্থানেই ঐক্য দেখা যায়, যেমন "বড়ভী" "বলভী"; আবার "ল" ও "র" এই দুই বর্ণেরও ঐক্য আছে। যেমন পর্য্যঙ্ক ও পলাঙ্ক এই স্থানে সেই রীতিতে র—স্থানে ল. ও ল—স্থানে ড হইয়া থাকিলে এই হেরম্ব রাজ্যও হেড়ম্ব রাজ্য হইতে পারে। এই হেরম্ব রাজ্য ইন্দ্রপ্রস্থের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। কারণ সহদেব দক্ষিণ দিক জয় করিতে বহির্গত হইয়া হেরম্ব, প্রাক্‌কোশল ও নাটকেয় প্রভৃতি কয়েকটী পার্ব্বত্য রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত অধ্যায়ের ১৩।১৪।১৫ শ্লোকে বর্ণিত আছে।

হিড়িম্ব রাক্ষসের সেই নীলমেঘনিভ বনই যে হেড়ম্ব রাজ্য একথার বলবৎ প্রমাণ নাই। বরং বিপক্ষে অনেক সন্দেহের অবকাশ আছে। কেন না যদিও হিড়িম্ব রাক্ষস ;—

অস্মদ্ বিষয়-সুপ্তেভ্যো নৈতেভ্যো ভয় মস্তিতে ॥

বলিয়া হিড়িম্বাকে প্রবোধ দিয়াছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার যে একটা বিষয় আছে, তাহাও প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এত বড় রাজ্যের রাজা হিড়িম্ব রাক্ষস, এক প্রকাণ্ড শাল বৃক্ষেই বাস করিতেন। পূর্ব্বকালে রাক্ষসদেরও রাজধানী থাকিত। হিড়িম্ব রাক্ষসেন্দ্রও বটেন। কিন্তু তাহার রাজধানী শাল-বৃক্ষে কেন? পাণ্ডবগণের দিগ্‌বিজয়-কালে হিড়িম্ব নিহত হইয়াছেন, তদীয় ভাগিনেয় ঘটোৎকচ উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে, তবে এ রাজ্যে সহদেবের যুদ্ধ হইবে কাহার সঙ্গে? হিড়িম্বের পুত্রাদি অনুচরবর্গ থাকিলে বখন নিজ

বাসস্থানের নিকটেই হিড়িম্ব নিহত হইল, তখন অবশ্যই ইহারা একবার ভীমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইত। আমার বোধ হয়, হিড়িম্ব যে জঙ্গলের প্রধান শাল গাছে থাকিতেন তাহাই তাহার বিষয়, আর হিড়িম্বা ভগিনীই তাহার অনুচরের সীমা। নতুবা পাণ্ডবগণকে মারিবার জন্য ভগিনীকে না পাঠাইয়া পুত্র, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতিকেও পাঠাইতে পারিত।

ইহাতেই মনে হয়, দক্ষিণ দিকের হেরম্ব রাজ্য হিড়িম্ব রাক্ষসের রাজ্য নহে, ইহা স্বতন্ত্র রাজ্য। তবে কাছাড় হেড়ম্ব রাজ্য বলিয়া যে একটা প্রবাদ আছে, শুদ্ধ প্রবাদও নহে, কাছাড়ের নৃপতিবৃন্দের মুদ্রা, সনন্দ ও অন্যান্য রাজকীয় কাগজপত্রে "হেড়ম্বাধিপতি" "হিড়িম্বাধীশ" প্রভৃতি নাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই সমুদয়ের কি কোনও মূল নাই ?

মহাভারত-পাঠে এতদঞ্চলে ঘটোৎকচ রাক্ষসের কোনও সংস্রবের বা ঘটোৎকচের সন্তান-সন্ততির অস্তিত্বের কোনও সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যায় না।

মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বে ১৫৪ অধ্যায় পাঠে জানা যায়, ঘটোৎকচের অঞ্জন-পর্ব্বা নামে এক পুত্র ছিল, উক্ত অঞ্জনপর্ব্বা শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণায় নৈশ যুদ্ধে অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক নিহত হয়। ঘটোৎকচের অন্য কোনও পুত্র বা পৌত্র ছিল কি না প্রকাশ না থাকিলেও মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বের ১৭৯ অধ্যায় পাঠে জানা যায় যে, ঘটোৎকচ-বধের পর অর্জ্জুন শোকাকুল হইলে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন, তোমার হিতের জন্যই কর্ণপ্রহিত শক্তির আঘাতে ঘটোৎকচ নিহত হইয়াছে ; এই কার্য্য আমিই করাইয়াছি।

হৈড়িম্ব শ্চাপ্যুপায়েন ময়া কর্ণেন ঘাতিতঃ।
যদি হ্যেনং নাহনিষ্যৎ কর্ণঃ শক্ত্যা মহামৃধে।
ময়াবধ্যোঽভবিষ্যৎ স ভৈমসেনি ঘটোৎকচঃ॥
ময়া ন নিহতঃ পূর্ব্ব মেষ যুষ্মৎ প্রিয়েপ্সয়া।
এষহি ব্রাহ্মণদ্বেষী যজ্ঞদ্বেষীচ রাক্ষসঃ॥
ধর্ম্মস্য লোপ্তা পাপাত্মা তস্মাদেষ নিপাতিতঃ।
ব্যংসিতা চাপ্যুপায়েন শক্র দত্তা-ময়ানঘ!
যে হি ধর্ম্মস্য লোপ্তারো বধ্যাস্তে মম পাণ্ডবঃ!
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থং হি প্রতিজ্ঞৈষা মমাব্যয়॥

২৪—২৮ শ্লোক।

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হৈড়িম্বকেও আমি কর্ণের দ্বারা কৌশলে সংহার করি-

য়াছি। যদি কর্ণ সেই বাসবপ্রদত্ত শক্তির প্রহারে ইহাকে নিহত না করিত, তাহা হইলেও আমি নিজেই এই ভীমপুত্র ঘটোৎকচকে সংহার করিতাম। কেবল তোমাদের প্রিয় কামনা করিয়াই আমি ইহাকেই নিহত করি নাই।

এই পাপাত্মা রাক্ষস ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞের বিদ্বেষ্টা ধর্ম্মলোপকারী, সেই জন্যই ইহাকে নিপাতিত করিয়াছি। হে অনঘ! এই ইন্দ্রদত্ত শক্তিটীও কৌশলে ব্যর্থ করিলাম। হে পাণ্ডব! যাহারা ধর্ম্মলোপকারী তাহারাই আমার বধ্য! ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্যই আমি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি।

শ্রীশ্রীভগবানের এই সকল উক্তির দ্বারাও অনুমান হয় যে, তিনি যজ্ঞহন্তা ধর্ম্মলোপকারী পাপাত্মা ঘটোৎকচকে কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধে সবংশে নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। তজ্জন্যই পূর্ব্বে দ্রৌণির হস্তে অঞ্জনপর্ব্বা নিহত হয় এবং ভগবানের প্রেরণায়ই কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়া হৈড়িম্ব যমালয়ে গমন করে। ঘটোৎকচ ভীমের ঔরসজাত হইলেও চন্দ্রবংশ সমুচিত আর্য্যভাব প্রাপ্ত হয় নাই, বীজশক্তি এস্থলে বলবীর্য্য অংশে প্রকাশ পাইলেও চরিত্রে ফলিত হয় নাই। ক্ষেত্রশক্তির প্রাধান্যে তিনি ক্ষত্রিয়কুমার না হইয়া রাক্ষসই হইয়াছিলেন এবং অনার্য্য রাক্ষসে পরিবারিতভাবে বাস করিতেন। রাক্ষসী মায়া অবগত ছিলেন, যুদ্ধকালে নিশাচরের নিয়মে রাত্রিকালেই অধিকতর বলশালী হইয়াছিলেন।

ঘটোৎকচ হইতে কোনও রাজবংশ বিস্তৃত হইবার জন্য ইহার জন্ম নহে। তাহার উৎপত্তির প্রয়োজন মহাভারতের আদি পর্ব্বের ১৫৫ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে।

সহিসৃষ্টো মঘবতা শক্তিহেতো র্মহাত্মনা।
কর্ণস্যাপ্রতিবীর্য্যস্য প্রতিযোদ্ধা মহারথঃ॥ ৪৬

বাসবদত্ত শক্তির প্রভাবে সমরে অজেয় কর্ণের প্রতিযোদ্ধা হইবার জন্য মহাত্মা ইন্দ্র এই মহারথ ঘটোৎকচকে সৃজন করিয়াছেন। ভারত যুদ্ধের পরও ঘটোৎকচের যে সন্তান সন্ততি কেহ জীবিত ছিল তাহা প্রকাশ নাই। এই সকল কারণে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, কাছাড়ের রাজবংশ ঘটোৎকচ হইতে বিস্তৃত হওয়া সুসম্ভব নহে। ঘটোৎকচ অনার্য্য ধর্ম্মবিদ্বেষ্টা নিশাচর; আর ইঁহারা দেব-দ্বিজাদি সেবক ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি; বিশেষতঃ ইঁহাদের রাজ্য পরিচালনা প্রণালী বা দণ্ডবিধি প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিলে ইঁহাদিগকে সনাতন ধর্ম্ম-সেবী প্রাচীন ভারতের ক্ষত্রিয় রাজজাতি বলিয়া মনে হয়।

সুতরাং আমার বোধ হয় সেই সহদেব-বিজিত দাক্ষিণাত্যের হেরম্ব নামক পার্ব্বত্য রাজ্য হইতে কোনও রাজকুমার কাছাড়ের পর্ব্বতেও পৈতৃক রাজ্যের নামে হেরম্ব বা হেড়ম্ব রাজ্য নামে এক অপর রাজ্য সংস্থাপন করিয়া থাকিবেন। বর্ত্তমান ত্রিপুরারাজ্যও এই প্রণালীতে ত্রৈপুররাজ্য নামে অভিহিত হইতেছে।

মহাভারতে দেখিতে পাই, দক্ষিণ ভারতে সুরাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের নিকট ত্রৈপুররাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। সহদেব সেই রাজ্য জয় করিয়া কর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাদ্রীসুত স্ততঃ প্রায়াদ্ বিজয়ী দক্ষিণাং দিশম্।
ত্রৈপুরং স্ববশে কৃত্বা রাজানমমিতৌজসম্॥ ৬০

মহাভারত ৩১ অধ্যায়, সভাপর্ব্ব।

তাহার পর বিজয়ী মাদ্রীপুত্র অমিতবিক্রম ত্রৈপুর রাজকে বশীভূত করিয়া দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন। মৎস্য, মার্কণ্ডেয় ও বামন পুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন পুরাণকারগণ ত্রৈপুর রাজ্যকে বিন্ধ্যপর্ব্বতের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত দাক্ষিণাত্যের রাজ্যসমূহের তালিকায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। পাণ্ডবদের সময়ে বর্ত্তমান ত্রিপুরারাজ্য ত্রৈপুরদের রাজত্ব ছিল না, তখন হেড়ম্ব বা ত্রিপুরা রাজ্য নামে কোনও রাজ্য পূর্ব্বাঞ্চলে থাকিলে পূর্ব্বদিকের রাজ্যজয়ে বহির্গত হইয়া ভীমসেন অবশ্যই এই সকল রাজ্য জয় করিতেন।

প্রাচীনকালে বর্ত্তমান ত্রিপুরা রাজ্য ও হেড়ম্ব রাজ্য শ্রীহট্টের অন্তর্নিবিষ্ট থাকার কথা জানা যায়।

কারণ যোগিনীতন্ত্র, কামাখ্যাতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রীহট্টের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাহা এইরূপ ঃ—

পূর্ব্বে স্বর্ণনদী চৈব দক্ষিণে চন্দ্রশেখরঃ।
লৌহিত্যঃ পশ্চিমে ভাগে উত্তরে চ নীলাচলঃ॥
এতন্মধ্যে মহাদেবি! শ্রীহট্টো নাম নামতঃ॥

পূর্ব্বে স্বর্ণনদী (সুনাই নদ), দক্ষিণে চট্টলের চন্দ্রশেখর পর্ব্বত, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রনদ ও উত্তরে নীলাচল বা আসামের পাহাড়। এতন্মধ্যস্থিত সুবিস্তীর্ণ ভূভাগের নাম শ্রীহট্ট। তাহা হইলে প্রায় সমগ্র কাছাড় জেলা ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ জেলার কিয়দংশ এবং সমগ্র খাসিয়া জন্তিয়া পাহাড়, গারো পাহাড় প্রাচীন শ্রীহট্টে নিবিষ্ট ছিল। তৎকালে ইহার ভিতর হেড়ম্ব বা ত্রিপুরা রাজ্যের কোনও প্রসঙ্গই ছিল না।

মহাভারতের কালে শ্রীহট্ট পূর্ব্বদেশ নামে অভিহিত হইত। "পূর্ব্বদেশঃ মহাবীর্য্যো বিজিগ্যে কুরুনন্দনঃ।"—মহাভারত সভাপর্ব্ব।

পুরাণান্তরেও যে শ্রীহট্টের অপর নাম ছিল পূর্ব্বদেশ, ইহা বেশ প্রতীত হইতেছে।

বরাহ-পুরাণীয় তীর্থমাহাত্ম্যে লিখিত আছে—

বররক্রো মহাতীর্থং পূর্ব্বদেশ সমুদ্ভবঃ।
বক্রে বক্রে মহাপুণ্যং দ্বিগুণং মনুসঙ্গমে॥

এই সকল প্রমাণেও বরাকনদী যে দেশে উৎপন্ন বা প্রবাহিত তাহাই পূর্ব্বদেশ বলিয়া জানা যায়। আমরা পৌরাণিক রাজ্যনির্ণয়ে প্রবৃত্ত সুতরাং পরবর্ত্তী কালের ঐতিহাসিক যুক্তি তর্ক ও সিদ্ধান্ত হইতে নিরস্ত থাকিলাম।

পরিণাম।

[শ্রীযতীন্দ্রনাথ সোম, এল্-এম্-এস]

(১)

সে আজ প্রায় বার বৎসরের কথা। তখন আমি সমস্তিপুরের সব রেজিষ্ট্রার। আমার সংসারে কেবল মাতা ও এক বিধবা জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভিন্ন আপনার বলিবার আর কেহ ছিল না। কিন্তু তাঁহারা ভাগলপুরে আমাদের বাটীতে থাকিতেন। কর্ম্মস্থল সমস্তিপুরে আমি একাকীই থাকিতাম। আমার এখন বয়স চল্লিশ বৎসর। কিন্তু এ পর্য্যন্ত বিবাহ করি নাই।

শৈশবে পিতৃহীন হইয়াছিলাম বলিয়া আমার উপর জোর করিবার কেহই ছিল না। নিজে যাহা করিতাম তাহাই হইত। বিবাহ-বিষয়ে আমার মতটা কিঞ্চিৎ পাশ্চাত্য ভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। নিজে উপার্জ্জন না করিয়া এবং বিবাহের গুরুত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধি না করিয়া বিবাহবন্ধনে বদ্ধ হওয়া আমার বড়ই মতবিরুদ্ধ ছিল।

সমস্তিপুরে একটী বাংলো বাড়ীতে আমি থাকি। উহার প্রাচীরগুলি ইষ্টক-নির্ম্মিত ; কিন্তু ছাদ খোলার। চারিদিকে অনেক খালি জমি পড়িয়াছিল। সম্মুখের খানিকটা জমিতে ফুলের গাছ লাগাইয়াছিলাম।

সব-রেজিষ্ট্রারী চাকুরী আমি বেশী দিন পাই নাই। চাকুরী পাইয়াই আমি সমস্তিপুরে আসিয়াছি। এ স্থান আমার পক্ষে একেবারে নূতন। তাহার উপর আমি বিদেশী। পদমর্য্যাদার জন্য এখানকার লোকদিগের সহিত মিশিতে পারিতাম না অথচ একেলা থাকিতেও ভাল লাগিত না। সেইজন্য সন্ধ্যার সময় বাধ্য হইয়া আমি এই ফুল বাগানটীতে বসিয়া থাকিতাম। ফুলের গন্ধে প্রাণ আকুল হইত।

ক্রমে এখানকার ডাক্তার ও পুলিশ সব ইন্‌স্পেক্টরের সহিত আমার পরিচয় হইল। ইঁহারাও আমার মত বিদেশী—বাঙ্গালী। পরিচয়ের পর হইতে ইঁহারা মাঝে মাঝে আমার বাড়ীতে আসিতেন ও আমি তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতাম। আমার বাড়ীতে আমার পরিজনবর্গ ছিল না বলিয়া তাঁহারা প্রায়ই আমার বাড়ীতেই আড্ডা করিতেন। কাজেই পান, তামাক ও চা খুবই চলিতে লাগিল। আগে আমার একটী মাত্র চাকর ছিল, তাহার নাম রামচরণ। ইহার দ্বারাই আমার সকল কাজকর্ম্ম চলিত ; কিন্তু এখন আর তাহা চলিল না। রামচরণ বলিল, –'বাবু, একটা ঝি না রাখলে বাসন-কোসন মাজার কাজে বড় গোল বেধে যায়।' আমি তাহাকে বলিলাম,—'আচ্ছা একটা ঝি নিয়ে আসিস্।'

পরদিন হইতে রামচরণ এক বৃদ্ধাকে দাসীত্বে নিযুক্ত করিল। তাহার নাম দুনিয়া। দুনিয়া যেদিন হইতে আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিল, সেইদিন হইতে আমার ঘর-সংসারে কেমন লক্ষ্মী-শ্রী ফুটিয়া উঠিল। ঘর-দুয়ার, আসবাব-পত্র সমস্তই যেন ঝক্ ঝক্ তক্ তক্ করিতে লাগিল। বার্দ্ধক্য তাহার শরীরে লোল-রেখা টানিয়া দিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার কর্ম্মক্ষমতা একটুও কমাইয়া দেয় নাই। আমি তাহাকে একদণ্ডও বসিয়া থাকিতে দেখিতাম না। জীবন-সন্ধ্যার অন্ধকার এখনও তাহার দেহের বর্ণের তেমন বিশেষ কিছু ব্যতিক্রম করিতে পারে নাই। কাঁচা সোণার মত উজ্জ্বলবর্ণ এখনও তাহার দেহ মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল। তাহার উপর উহার মুখে কেমন এক মমত্বের ছবি ফুটিয়া থাকিত যে, আমি প্রবাসে থাকিয়াও উহাকে দেখিয়া আত্মীয়-স্বজনের বিচ্ছেদ-যাতনা মাঝে মাঝে ভুলিয়া যাইতাম।

(২)

আমি শুনিয়াছিলাম, বৃদ্ধার এক নাত্‌নী আছে এবং সেই জন্য সে রাত্রিতে আমার বাসায় থাকিত না; বাড়ীতে যাইত।

আজ শরীরটা কেমন খারাপ বোধ হওয়ায় আমি অন্য দিনের চেয়ে একটু সকাল সকাল অফিস হইতে বাসায় আসিলাম। বাসায় ঢুকিয়াই দেখি—ঝুনিয়ার সঙ্গে এক সুন্দরী তরুণী গৃহকার্য্য করিতেছে। ঝুনিয়া বাসন মাজিতেছে এবং তরুণী দাওয়া ঝাঁট দিতেছে।

আমাকে এত শীঘ্র বাড়ীতে ফিরিতে দেখিয়া ঝুনিয়া একটু যেন অপ্রতিভ হইল। পাছে আমি বিরক্ত হই, এই জন্য আগে হইতেই সে আমাকে বলিল, "বাবু আমি বুড়া হয়েছি। কাজ করতে কষ্ট হয়। সেই জন্যে আমার নাত্‌নীকে সঙ্গে এনেছি।" আমি তাহার কথার জবাব দিলাম না। একেবারে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া আফিসের পোঁষাক খুলিয়াই বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। মনে হইতে লাগিল,—খুব জ্বর আসিবে; অনুভবে বুঝিতে পারিলাম—বুকে একটু বেদনাও হইয়াছে।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ঝুনিয়া বাড়ী যাইবার সময় আমার নিকটে আসিল এবং বলিল,—"বাবু আজ এমন ক'রে শুয়ে রয়েছ কেন? শরীর কি ভাল নয়?" আমি বলিলাম,—"ঝুনিয়া আমার বোধ হয় জ্বর হ'বে। তুমি একবার রামচরণকে ডাক, তা'কে বলে দাও, সে যেন ডাক্তারবাবুকে এখনই খবর দেয়।" ঝুনিয়া আমার কথা শুনিয়া একটু যেন চিন্তিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। সে তাড়াতাড়ি তাহার নাত্‌নীকে বলিল,—"কিশোরী দেখ্‌ত রামচরণের ঘর খোলা আছে কি না?" কিশোরী দাওয়ার উপর হইতেই মুখ বাড়াইয়া বলিল —"না, আমি তা'র ঘরে চাবি দেওয়া।"

কিশোরীর কথা শুনিয়া আমি উত্তেজিত হইয়া উঠিলাম। চীৎকার করিয়া বলিলাম,—"রামচরণকে আজই জবাব দাও। কাজের সময়ে আজকাল হতভাগাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।" উত্তেজনায় ও চীৎকারে আমার বুকের বেদনাটা বাড়িয়া উঠিল। আমি বুকে হাত দিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। সঙ্গে সঙ্গে মাথাও দপ্‌ দপ্‌ করিতে লাগিল। আমি ঝুনিয়াকে বলিলাম,—"তুমি বুড়া মানুষ। ডাক্তারবাবুকে খবর দিতে পারিবে কি?" ঝুনিয়া বলিল,—"বাবু ক্রোশখানেক পথ ভেঙ্গে তোমার কাছে চাকরী করতে আসি, আর এই দু' রশি রাস্তা যেতে পারব না!" ঝুনিয়া তখনই ডাক্তার ডাকিতে

চলিয়া গেল ; আমি বুকের ও মাথার যন্ত্রণায় বিছানায় পড়িয়া এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিলাম।

একটু পরেই দুনিয়া ফিরিয়া আসিল। সে বলিল,—"বাবু ডাক্তারবাবু এখন ডাকে বেরিয়েছেন। আধ ঘণ্টা পরে ফিরে আস্‌বেন। তিনি আস্‌লেই তাঁকে এখানে পাঠিয়ে দিতে ব'লে এসেছি।" আমি বলিলাম,—"বেশ করেছ।"

আমার ছট্‌ফটানি দেখিয়া দুনিয়া ঘরের মেজেতে বসিয়া রহিল। কিশোরী বাতি জ্বালিতে লাগিল। তৃষ্ণায় আমার গলা শুকাইয়া যাইতেছিল। আমি দুনিয়াকে বলিলাম,—"দুনিয়া আমায় একটু জল দাও।" দুনিয়া তাড়াতাড়ি এক গেলাস জল আনিয়া আমাকে দিল। জল খাইয়া আমার বেদনাটা একটু কম বোধ হইল। আমি দুনিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"ডাক্তারবাবু ত এখনও এলেন না ? এদিকে রাত্তির হচ্চে ; তোমরা দু'জন মেয়ে মানুষ বাড়ী ফির্‌বে কেমন করে ?" দুনিয়া বলিল,—"বাবু ! সে ভাবনা আপনি কর্‌বেন না। এই দেশে আমরা জন্মেছি ; এখানে রাত্তিরে যেতে আমাদের ভয় হবে না।"

আমি বলিলাম,—"কিশোরী বুঝি তোর নাত্‌নী ? এত বড় মেয়ে ? একে শ্বশুর বাড়ী পাঠাস্ নি ?"

বৃদ্ধা দুনিয়ার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। সে আর্দ্রকণ্ঠে বলিল,—"বাবু ও যখন এক বছরের, তখন ওর বিবাহ হয় ; পাঁচ বছরের সময়ে ওর স্বামী মারা যায়। সেই থেকে ও আমার কাছে আছে। সব কাজ জানে। বাবু আপনি হুকুম দেন ত ও আমার সঙ্গে এসে আপনার কাজ কর্ম্মে আমাকে সাহায্য কর্‌বে।"

আমি তাহার কথার জবাব দিতে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে রামচরণ আসিয়া খবর দিল—"বাবু, ডাক্তারবাবু আস্‌ছেন।" আমি বলিলাম,—"নিয়ে আয়।" ডাক্তারবাবুকে আসিতে দেখিয়া দুনিয়া ও কিশোরী ঘর হইতে চলিয়া গেল।

(৩)

এক মাস অনাহারে রোগ শয্যায় থাকিয়া আমি প্রায় গতিশক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু যেরূপ রোগ হইয়াছিল তাহাতে আত্মীয়স্বজনহীন বিদেশে আমার বাঁচিবার আশা অতি অল্পই ছিল। আমার 'ডবল নিউমোনিয়া' হইয়াছিল। ডাক্তারবাবু বলিয়াছিলেন,—'কিশোরী অত যত্ন না করলে

আপনাকে বাঁচানো অসম্ভব হ'ত। সে দিন-রাত জেগে আপনার সেবা করেছিল। সে যখন আপনার মাথার কাছে আস্তে আস্তে মাথায় হাওয়া দিত, তখন মনে হত সত্যই সে আপনার নিতান্ত আত্মীয়। সে আপনাকে সময় মত পথ্য দিত, সময় মত ওষুধ খাওয়াত; আপনাকে একটু অস্থির দেখ্‌লে রামচরণকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিত। আপনাকে নীরোগ কর্‌তে ভগবানের পর আর যদি কেউ সাহায্য করে থাকে, তবে সে কিশোরী।"

ডাক্তারবাবুর কথা শুনিয়া কেমন এক অজ্ঞাত কৃতজ্ঞতায় আমার হৃদয় ভরিয়া গেল। কিশোরী আমায় ঔষধ দিত বটে, কিন্তু তাহাতে আমি বিরক্তি অনুভব করিতাম; সে আমায় পথ্যও দিত, কিন্তু আমি অনিচ্ছার সহিত তাহা গ্রহণ করিতাম। কিশোরী যে আমার কাছে আসে, আমার সেবা-শুশ্রূষা করে, ইহা আমি একেবারেই পছন্দ করিতাম না। কিন্তু ডাক্তারবাবুর কথা শুনিয়া আমার মনের ভাব নরম হইয়া গেল। কিশোরীর উপর হঠাৎ আমার এমন অনুরাগ জাগিয়া উঠিল যে, তাহার উপর আমার যত অপ্রীতি, যত বিরাগ ছিল তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইল। কিশোরী এক অব্যক্ত আকর্ষণে আমায় এমন ভাবে টানিতে লাগিল যে, আমার হৃদয় তাহার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। ক্রমে এমন হইল, কিশোরীকে দেখিতে না পাইলে হৃদয়টা শূন্য বোধ হইত; তাহার সহিত দুই একটা কথা না কহিলে মনটা খাঁ খাঁ করিত। সে ঘুরিয়া ফিরিয়া গৃহকার্য্য করিত, আমি সেই দিকে চাহিয়া থাকিতাম। তাহার কার্য্যে, তাহার কথায় হঠাৎ প্রেমের বিধাতা এমন মাধুর্য্যের সঞ্চার করিয়া দিলেন যে, কিশোরীকে না দেখিলে আমার সমস্তই তিক্ত বোধ হইত।

(৪)

শেষে এমনই হইল, কিশোরী স্বহস্তে কোনও কার্য্য না করিলে আমি সন্তুষ্ট হইতাম না। কিশোরী পান সাজিত, আমায় জল দিত, আমার কাপড় কাচিয়া দিত, মাঝে মাঝে আমার পোষাকের ট্রাঙ্ক গুছাইয়া দিত। সে আমার টেবিলের উপর বইগুলি পরিষ্কার করিয়া রাখিত। আমি তাহার সহিত দু' একটা কথা কহিতাম, সেও জবাব দিত।

সন্ধ্যার পর প্রত্যহই আমি বেড়াইতে বাহির হইতাম। তাহার পূর্ব্বে দুনিয়া ও কিশোরী বাড়ী চলিয়া যাইত। বেড়াইয়া আসিয়া আমি প্রায়ই দারোগাবাবুর বাটীতে বিশ্রাম করিতাম। দারোগাবাবু পুলিশের লোক; হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়, এই কারণ দেখাইয়া তিনি মদ্যপান করিতেন।

আমি ইহা জানিয়াও যে তাঁহার বাড়ীতে আসিতাম, সে কেবল আমি সঙ্গীহীন ও তিনি বাঙ্গালী বলিয়া। দারোগাবাবু মধ্যে মধ্যে আমাকে বলিতেন,— "ভায়া! এই সেদিন রোগ থেকে উঠলে. মেডিকাল ডোজে একটু একটু ব্রাণ্ডি খাও. না হয় হুইস্কি খাও, গায়ে বেশ জোর পাবে।" আমি বলিতাম— 'না ভাই, ও সব অনুরোধ আমায় ক'রো না।"

কিন্তু সয়তান ঘাড়ে চাপিয়াছিল। একদিন প্রলোভন সামলাইতে পারিলাম না। উপরোধে, অনুরোধে সামান্য পরিমাণ হুইস্কি পান করিলাম। তাহার পরই মজিলাম। অবশেষে আমার এমন অবস্থা হইল যে, প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আমার মদ না হইলে চলিত না।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ঝড় উঠিল। তাহার পরই মুষলধারে বৃষ্টি। সে ঝড়-বৃষ্টিতে ঘরের বাহির হয় কাহার সাধ্য? দুনিয়ার অসুখ বলিয়া সেদিন কিশোরী একাই আমার বাড়ীতে কাজ করিতে আসিয়াছিল। এই দুর্য্যোগে সে আমার বাংলা হইতে বাহির হইতে পারিল না। যত রাত্রি হইতে লাগিল, ঝড়-বৃষ্টির বেগ ততই বাড়িতে লাগিল। আমি কিশোরীকে ডাকিয়া বলিলাম, —'কিশোরী তুমি বাড়ী যা'বে কেমন ক'রে? আজ এখানেই থাক।'

কিশোরী বলিল,—'বোধ হয় আর একটু পরে বৃষ্টি থাম্‌বে, তখন আমি বাড়ী যাব।'

আমি বলিলাম—'আর যদি না থামে।'

কিশোরী বলিল—' না থামে নাই থাম্‌বে; আমি ত মাঠে পড়ি নাই।'

আমি মৃদু হাসিলাম। তার পর কিশোরীকে বলিলাম,—'দেখ আলমারীর ভিতর একটা বোতল আছে, নিয়ে এস ত। আজ বড় ঠাণ্ডা; দাওয়াই খেতে হ'বে।'

কিশোরী ভাবিল,—বাবু অল্পদিন হইল রোগ হইতে উঠিয়াছেন, এখনও বুঝি দাওয়াই খান। এই মনে করিয়া সে বোতল ও গ্লাস টেবিলের উপর উপর রাখিয়া চলিয়া গেল। আমি এক গ্লাস, দুই গ্লাস করিয়া ক্রমে পাঁচ ছয় গ্লাস উদরস্থ করিলাম। সয়তান ইতিপূর্ব্বেই ঘাড়ে চাপিয়াছিল; আজ আমাকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। আমি আস্তে আস্তে কিশোরীকে ডাকিলাম। কিশোরী নিকটে আসিয়া বলিল,—'কি চাই বাবু?'

আমার চোখের পর্দ্দা খুলিয়া গিয়াছিল; মনুষ্যত্বের আবরণ খসিয়া পড়িয়াছিল। আমি বলিলাম—'কিশোরী আমি তোমাকে চাই। যদি হৃদয় চিরিয়া

দেখাবার হ'ত, তা' হলে দেখাতাম, তোমায় আমি কত ভালবাসি। কিশোরী কিশোরী তুমি একবার আমার কাছে এস।'

কিশোরী আমার অবস্থা দেখিয়া যেমন হতবুদ্ধ হইয়াছিল। সে বলিল —'কি বাবু কি বল্‌ছেন?'

আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম,—'কিশোরী—তুমিই আমার হৃদয়-রাজ্যের অধীশ্বরী।'

কিশোরী লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইতে গেল। আমি এক লম্ফে ছুটিয়া গিয়া ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম। তাহার পর জোর করিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিলাম। ঠিক সেই সময়ে বাহিরে উন্মত্ত বায়ু আরও প্রবলবেগে বহিয়া উঠিল; মেঘের গর্জ্জনে চারিদিক প্রকম্পিত হইল। সে ভীষণ শব্দের ভিতরে কিশোরীর ক্ষীণ প্রতিবাদ-ধ্বনি কোথায় মিশিয়া গেল।—সয়তানেরই জয় হইল।

(৫)

এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমি সমস্তিপুর হইতে মাধীপুরায় বদলি হইলাম। এখানে এক রকম আছি মন্দ নয়। পূর্ব্বকার মত কোনও উপসর্গ এখানে নাই। বাদল-রাতের সেই ঘটনা এখনও কেবল মাঝে মাঝে হৃদয়ে বৃশ্চিক-দংশন-যাতনার সঞ্চার করিয়া দেয়।

এখানে আমার সঙ্গী জুটে না। ফলে মদ্যপানের অভ্যাসটা একেবারেই দূর হইল। এখানে আসিয়া ইহাই আমার পরম লাভ। বাড়ী হইতে প্রায়ই চিঠি আসিতে লাগিল। সকল চিঠিতেই একই কথা—'শীঘ্র ছুটি লইয়া বাড়ীতে এস।' আমার ভাল লাগিতেছিল না, আমি বাড়ীতে চিঠি লিখিলাম—এক মাসের মধ্যেই ছুটী লইয়া বাড়ী যাইব।

বাড়ী যাইবার জন্য যাহা যাহা দরকার সকলি বাঁধিয়াছি। কাল প্রাতে রওনা হইব ঠিক করিয়াছি। যাইবার পূর্ব্ব দিন গৃহে বসিয়া কত ভাবিতেছি, কত কথাই মনে উঠিতেছে আবার মিলাইয়া যাইতেছে।

ঘরের সম্মুখে বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছি; সময় যেন আর কাটে না। এই ত সবে বেলা দশটা। আমি স্নানাহার শেষ করিলাম। একটু নিদ্রা দিবার যোগাড় করিতেছি, এমন সময়ে আমার ভৃত্য আসিয়া খবর দিল যে, বাহিরে দুইজন স্ত্রীলোক আমার সহিত দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আমি মনে করিলাম আবার বুঝি একটা নূতন মামলা আসিয়া হাজির হইল।

ভৃত্যকে বলিয়া দিলাম, তাহাদের বল—'আমার এখন ফুরসৎ নাই আর আমি কালই বাটী যাইব, তারা যেন নূতন বাবুর কাছে আসে।' এমনি করিয়া মামলা শেষ করিয়া একটু চক্ষু বুজিলাম। প্রায় দুই তিন মিনিট এইরূপ অবস্থায় রহিলাম কিন্তু নিদ্রা আসিল না, আমি উঠিয়া বসিলাম। এমন সময় আমার ভৃত্য ফিরিয়া আসিল, কিন্তু এবার তাহার ক্রোড়ে একটী প্রায় তিন বৎসরের সুন্দর শিশু। মনে হইল, এই শিশুর মুখ পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছি। আমি ভৃত্যকে বলিলাম, "কার ছেলে আমার কোলে দে ত।" আমি হস্ত প্রসারিত করিলাম। শিশু অমনি আমার কোলে লাফাইয়া আসিল। আমি তাহাকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার আননে গণ্ডদেশে সর্ব্বত্র চুম্বন করিতে লাগিলাম। বালক আমার নাসিকা ও গুম্ফরাশিকে এক অদ্ভুত খেলনা মনে করিয়া তাহার কচি কচি হাত দুখানি দিয়া ধরিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে বালক আধ ভাঙ্গা হিন্দীতে বলিল, "মার কাছে চল।" আমি ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এর মা কোথায়?" ভৃত্য বলিল যে তার মাই দেখা করিতে চাহিতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে আনিতে বলিলাম। অল্পক্ষণ পরে দুই জন রমণী আসিল। আমি রমণীদ্বয়কে দেখিয়া স্তম্ভিতা হইলাম। এ কি! এ যে দুনিয়া আর কিশোরী! কিশোরী এরূপ হইয়া গিয়াছে! তাহার পূর্ব্বের সে লাবণ্য নাই। এখন সে পূর্ব্বাপেক্ষা কৃশা ও মলিন, কিন্তু তাহার সেই কৃশতায় আমি একটা অভাবনীয় সৌন্দর্য্য দেখিলাম; সে সৌন্দর্য্য বর্ণনীয় নহে। সে সৌন্দর্য্য স্থির অচঞ্চল। অথচ তাহাতে প্রাখর্য্য নাই। তাহা চন্দ্রকরের ন্যায় শান্ত শীতল। কিশোরী আমার দিকে চাহিতে পারিতেছিল না; কিন্তু দুনিয়া স্থিরনেত্রে আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে দৃষ্টিতে পূর্ব্ব পরিচয়ের মধুরত্ব ছিল না; পরন্তু তাহা ভীতিব্যঞ্জক।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "দুনিয়া এত দিন পরে কি মনে করে?"

দুনিয়া দৃঢ় অথচ গম্ভীর স্বরে বলিল "বাবু অনেক দিন আগেই আসিতাম কেবল ওই পাপিষ্ঠার কথা শুনে এত দিন আসিনি।"

আমি পূর্ব্বেকার ন্যায় পরিচিত স্বরে বলিলাম, "কেন রে বুড়ি কি হয়েছে?"

বুড়ী অপেক্ষাকৃত দৃঢ়স্বরে বলিল, "কি হয়েছে জান না বাবু! এ কার লেড়কা চিনতে পার কি?" সে মুহূর্ত্তে যদি পৃথিবী আমার পদতলে দ্বিধা হইত, আমি ততদূর স্তম্ভিত হইতাম না। আমি একবার কিশোরীর দিকে

চাহিলাম, দেখিলাম তাহার আনন আনত। তাহার বিশাল চক্ষু দুটী বিস্ফারিত, পলকশূন্য ভূমিতলআবদ্ধ। সে নয়নে কেবল করুণা আর ক্ষমা। ক্ষণেকের জন্য আমার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। আমি বালককে সহসা ক্রোড় হইতে বিচ্যুত করিলাম এবং গম্ভীরস্বরে বলিলাম, "কার লেড়কা আমি কেমন করে জানব বুড়ী ?"

বৃদ্ধা কর্কশস্বরে বলিল, "তুমি জান না বাবু, তোমার বালককে তুমি চিনিতে পারিতেছ না ? ছি ছি বাবু সেদিনকার কথা এর মধ্যে ভুলে গেছ ? সেই যেদিন তুমি নেশার ঘোরে আমার লেড়কীর সর্ব্বনাশ করিলে, সেদিন কি তোমার মনে পড়ে না ? তার কিছুদিন পরে তুমি এখানে চলে এস। সেই অবধি ও যেন কেমন পাগলের মতন হ'য়ে গেছে। আপনার মনে হাসে, কাঁদে, ভাল করে খায় না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে "বাবু—বাবু" ব'লে চীৎকার ক'রে জেগে উঠে। কত হাকিম, কত ডাক্তার দেখালুম। তুমি যে সব টাকা আমাকে বক্‌সিস করেছিলে সমস্ত খরচ হ'য়ে গেল ; কিন্তু ওর রোগ কিছুতেই সারিল না। তার পর এই সন্তান প্রসব হইল। আমার দেশের লোক আর আমাদের মুখ দেখিল না। আমরা সমস্তিপুর পরিত্যাগ করিলাম। আমি কতবার উহাকে ভ্রূণহত্যা করিতে বলিয়াছিলাম, কিন্তু আমার পাপিষ্ঠা লেড়কী বলিত, "আয়ী তুই আমায় মারিয়া ফেল, কিন্তু আমি ও কাজ করিতে পারিব না। তারপর কত যাতনা পাইয়াছি, পাপিষ্ঠ নরাধম পশুপ্রকৃতি বাবু তুমি তাহার কি জানিবে ? আমার হাতে পয়সা যৎসামান্য ছিল, সকলই ফুরাইয়া গেল। তোমার বালকের জন্য, তোমার উপেক্ষিতা রমণীর জন্য আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছি। কেহ ভিক্ষা দিয়াছে, কেহ বা ঠাট্টা করিয়া বিতাড়িত করিয়াছে। কিশোরী গৃহের বাহির হইত না। সে পুত্র হইবার পর অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। দিন রাত সে আপন সন্তানকে বুকে করিয়া বসিয়া থাকিত। পাপের সন্তানের প্রতি পাপীয়সীর মমতা কি ভয়ঙ্কর ! তোমার প্রতিকৃতি—ওই সন্তানকে পাপিষ্ঠা চুম্বনে আকুল করিত। তাহার যেন আর কোনও কর্ম্ম ছিল না। তার পর যখন অন্নাভাবে আর দিন যায় না, আমি তোমার নিকট তোমার পুত্রকে ফিরাইয়া দিতে বলি। কিন্তু পাপিষ্ঠা আমার কথা শুনিল না, ও কিছুতেই তোমার কাছে আসিতে চাহিল না। এত যন্ত্রণা, এত কষ্ট, কিন্তু কিশোরী কিছুতেই তোমার কাছে আসিতে চাহিল না। এখন এমন হইয়াছে ভিক্ষায় আর চলে না। আর শুনিলাম তুমি এখানে আছ ! তাই আজ তোমার কাছে—যাহার ধন

দেখিলে সর্ব্বশরীর জ্বলিতে থাকে, তাহার কাছে আসিতে হইল। তোমার ছেলে ও উহাকে আজ জোর করিয়া লইয়া আসিয়াছি। এখন তোমার পুত্র, তোমার উপেক্ষিতা রমণী তুমি ফিরাইয়া লও।"

রাগে বুড়ীর সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতেছিল; সে আর কথা করিতে পারিল না। বুড়ী আস্তে আস্তে কথা কহিলে সে নিশ্চয়ই আমার সহানুভূতি পাইত; কিন্তু তাহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া আমি রুক্ষস্বরে বলিলাম, "বুড়ী মুখ সামলে কথা ক'স, আমি তোর লেড়কীকেও জানি না, আর ও শিশুকেও জানি না; তুই এখান থেকে চলে যা।" এই কথা বলিয়া আমি চলিয়া যাইতেছিলাম। বৃদ্ধা ব্যাঘ্রীর ন্যায় আমার গতিরোধ করিয়া বলিল, নরাধম পশু তুমি আমার লেড়কীর সর্ব্বনাশ করিয়া তাহাকে জলে ভাসাইতে চাও তাহা কখনই হইতে পারে না; এই লও তার প্রতিফল।" এই কথা বলিয়া আঁখির নিমেষে কোথা হইতে একখানা ছোরা বহির করিয়া আমার বুকে মারিতে উদ্যত হইল। আর এক মুহূর্ত্ত এবং আমার জীবলীলা শেষ হইয়া যায়! কিন্তু ঈশ্বরের অন্যরূপ ইচ্ছা, তাই সেই মুহূর্ত্তেই কিশোরী "আয়ীমা আয়ীমা করিস্ কি" বলিয়া একেবারে আমায় ঢাকিয়া ফেলিল। কিন্তু বৃদ্ধার কম্পিত হস্তের লক্ষ্য ব্যর্থ হইল না। সে উত্তোলিত ছোরা কিশোরীর বক্ষে আমূল বিদ্ধ হইল। আমি কাণ্ড দেখিয়া জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে আমার চৈতন্যোদয় হইল। কিন্তু আমি আর বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইলাম না। কেবল দেখিলাম আমার গৃহের মধ্যে রক্তের নদী বহিতেছে। তাহার মধ্যে শ্বেতপদ্মের ন্যায় কিশোরীর দেহলতা লুটাইতেছে। তাহার মুখে আনন্দের হাসি লাগিয়াছিল—সে হাসি যেন বলিতেছিল,—তোমায় যে বাঁচাইতে পারিয়াছি আর তোমার সম্মুখে যে মরিতে পারিয়াছি, ইহাই আমার সুখ।

বিশ্বজননী।

[শ্রীঅবনীকুমার দে]

বিশ্বপ্রকৃতির দান কি মহান কি মহান
খুলে দেয় অন্ধের নয়ন।
কবিত্ব-কল্পনাভরা জননী—ত্রিদিব ধরা
কোথা পাবে কল্যাণী এমন ?
কোথা এত স্নেহমায়া প্রেম-করুণা ছায়া
প্রিয় উৎস সমবেদনার,
প্রাণে প্রাণে বিনিময় পবিত্র সৌরভময়
কোথা হেথা বিবেক-বিচার ?
এত রস এত রূপ সুরগন্ধ অপরূপ
কোথা এত পরশ সুন্দর,
মহামানবের প্রায় ভক্তি-মুক্তি-ধ্যান-দান
আছে কোন স্বরগ ভিতর ?
হেথায় করিলে কর্ম্ম তবে ত লভিবে ধর্ম্ম
পাবে পরে মোক্ষের সন্ধান,
হেথায় সাধনা করি আনিলে বৈকুণ্ঠ ধরি
তবে সে ত চরম নির্ব্বাণ!
জননীর অঙ্ক ছাড়ি রম্যগেহ কোন বাড়ী
কোন তীর্থ পবিত্র এমন,
লই বিশ্ব বসুন্ধরা সহস্র স্বর্গের সেরা
গৃহে গৃহে ব্রজ-বৃন্দাবন!
আমি ত ইহারি বুকে বাঁচিব মরিব সুখে
হ'য়ে র'ব ধূলামাটি তার
জন্ম জন্ম পরিহরি আবার আসিব ফিরি
এই শ্রেষ্ঠ কামনার সার।

অর্ঘ্য।

অষ্টম বর্ষ।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।